তাসহীলুল হাকায়িক

বাংলা

কানযুদ্ দাকায়িক

মূল
আল্লামা আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে
আহমদ বিন্ মাহমুদ আন্নাসাফী রহ.

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ
মাওলানা আল-মাহ্মুদ যুবায়ের
শিক্ষক
জামিয়া ইসলামিয়া কর্মধা
কুলাউড়া, মৌলভী বাজার।

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

তাসহীলুল হাকায়িক

বাংলা

কানযুদ দাকায়িক

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ ঃ মাওলানা আল-মাহমুদ যুবায়ের

প্রকাশনায়

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

চকবাজার, ঢাকা।

ফোন ঃ ৭৩১০১৫৩, ০১৯২৫০০৯৮২৫

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন ঃ ৭১১৭৫০৮২, ০১৯২৫০০৯৮২৬

প্রথম প্রকাশ

সফর ১৪৩১ হিজরী

ফেব্রুয়ারী ২০১০ ইং

মূল্য

চারশত (৪০০) টাকা মাত্র

তাসহীলুল হাকায়িক

বাংলা

কানযুদ্ দাকায়িক

সূচীপত্র

كتاب الطهارة

অধ্যায় : পবিত্রতা/৩৩

كتاب الصلوة

অধ্যায় : নামায/৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

كتاب الحج

অধ্যায় : হজ্ব/২৯১

পূর্বকথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى بِيَدِهٖ كَنْزُ الْعُلُوْمِ وَالْعِرْفَانِ وَ وَفَّقَ الْمُجْتَهِدِيْنَ عَلٰى كَشْفِ حَقَائِقِ الدِّيْنِ وَ نَصَبَ بِهِمُ الْغُفْرَانَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ مَنْ قَالَ اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَخِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا اَمَّا بَعْدُ -

হিজরী ছয়শত শতকের শেষাংশের কিংবদন্তি ফকীহ মুজাদ্দীদে মিল্লাত, ওলীকুল শিরমণী আল্লামাহ আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ বিন মাহমুদ আন নাসাফী রহ. এর রচিত হানাফী ফিকহ শাস্ত্রে অমর কির্তী কানযুদদাকাইক। যা হানাফী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ সমাদৃত মূল চারটি গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম ও অতুলনীয়। তখনকার সময় থেকে এ যাবত তা উম্মতে মুসলিমার কাছে যথা মর্যাদায় সমাদৃত। বর্তমান সময়েও বিশ্বের অধিকাংশ মাদ্রাসায় তা পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লামাহ নাসাফী রহ. তার ওয়াফী গ্রন্থের সার নির্জাস অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত ইবারতে ফিকহে হানাফীকে ফুটিয়ে তুলতে যে নিপুনতার পরিচয় দিয়েছেন তা অনস্বীকার্য। তবে গ্রন্থখানী মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য উপযোগী হলে ও বাংলা ভাষাবাসী শিক্ষার্থীরা তার মর্ম উপলব্ধি করতে হিমশিম খেয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের এহেন দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজন বাংলা ভাষায় আরবী কিতাবাদীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করা। তাই ছাত্রদের উন্নতি ও অগ্রগতির দিক বিবেচনা করে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে মূল ইবারতের অনুবাদ প্রয়োজনীয় কঠিন শব্দালীর বিশ্লেষণ এবং মাসআলা মাসাঈলের ব্যাখ্যা সহ অন্যান্য বিষয়াদী উপস্থাপনের ক্ষুদ্র চেষ্টা করেছি। এবং তার নাম দিয়েছি তাসহীলুল হাকাইক। আল্লাহ তাআলা অধমের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন।

পরিশেষে যারা এ কাজে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন এবং কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সফলতার জন্য আন্তরিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, বিশেষ করে জামিয়া ইসলামিয়া কর্মধার স্বনামধন্য উস্তাদ মহোদয়গণ ও মুহতারাম আব্বা হযরত মাওলানা আবদুল খালিক (সাবেক সিনিয়র শিক্ষক, জামেয়া ইসলামিয়া কর্মধা) এবং জামেয়া সিদ্দিকিয়া বেতিয়ারকান্দী কুলিয়ারচর এর স্বনামধন্য পরিচালক প্রাক্তন শাইখুল হাদীস জামিয়া ইসলামিয়া কর্মধা, মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতি উবায়দুল্লাহ আনোয়ার সাহেবের অক্লান্ত কুরবানী এবং নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী এর পরিবার যারা গ্রন্থখানি ছাপানোর জন্য এগিয়ে এসেছেন। আজ তাদেরকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করছি। তাদের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা রইল।

এ পৃথিবীর মানব মন্ডলী সীমিত জ্ঞানের অধিকারী, তাই ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। স্বহৃদয় পাঠক বৃন্দের কাছে অনুরোধ কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা আমাদের জানিয়ে দিলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধণের আশা করছি।

হে মাওলা! আপনি আপনার অনুগ্রহে অধমের এ মেহনতটুকু কবুল করুন। এ দ্বারা ছাত্র/ছাত্রীদের যথাযথ উপকৃত করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার এ আরজু কবুল করলে সেটাই হবে আমার বড় সফলতা। আমীন।

—আল্-মাহ্মুদ যুবায়ের

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইলমে ফিকহের ভূমিকা

فقه এর আভিধানিক অর্থ : فَقِهَ (س) فِقْهًا - فَقُهَ (ك) فَقَاهَةً - জ্ঞানী হওয়া, ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বা জানা। فَقِهَ (س) فِقْهًا - تَفَقَّهَ (تفعل) تَفَقُّهًا - বুঝা, উপলব্ধি করা। فَقَّهَ (تفعيل) تَفْقِيْهًا - أَفْقَهَ (افعال) اِفْقَاهًا - জ্ঞান দান করা, (শিক্ষা দেয়া,) বুঝানো। اَلْفِقْهُ - কোন কিছু জানা ও বুঝা। ফিকহ শাস্ত্র (শরীয়াতের বিধান শাস্ত্র)।

فقه এর পারিভাষিক অর্থ : فقه এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উসূলবিদ ওলামায়ে কিরামগণ বলেন—

هُوَ عِلْمٌ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ -

'শরিয়াতের ব্যাপক প্রমাণাদি থেকে উদঘাটিত শরীয়াতের শাখা প্রশাখা সম্পর্কিত বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ বলা হয়। ফিকহবিদ উলামায়ে কেরামদের মতে فقه হল حفظ الفروع 'শাখা প্রশাখার সংরক্ষণ'। অর্থাৎ শরীয়াতের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত হুকুম আহকামের সংরক্ষণ করাকে ফিকহ বলে।

সূফী সাধকের মতে ফিকহ হল- اَلْفِقْهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ -ইলম ও আমলের সমষ্টির নাম ফিকহ।

আল্লামা জালাল উদ্দীন রহ. বলেন—

اَلْفِقْهُ الْمَعْقُوْلُ مِنَ الْمَنْقُوْلِ -

কুরআন হাদীস থেকে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে ফিকহ বলে।

প্রসিদ্ধ আরেকটি সংজ্ঞা হল—

اَلْفِقْهُ مَجْمُوْعَةُ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ فِى الْإِسْلَامِ -

ফিকহ হল ঐ হুকুমাদির সমষ্টির নাম যা ইসলামে বিধিবদ্ধ। মোটকথা, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় কর্মপন্থায় সু-শৃংখল নিয়মাবলী, ব্যবস্থাবলী ও আইন-কানুন হল ফিকহে ইসলামী তথা ইসলামের আইন শাস্ত্র।

ইলমে ফিকহ-এর আলোচ্য বিষয় :

ইলমে ফিকহ এর আলোচ্য বিষয় হল— اَفْعَالُ الْمُكَلَّفِيْنَ مِنْ حَيْثُ التَّكْلِيْفِ - মুকাল্লিফীন তথা প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানবান মানুষের সামগ্রিক কার্যাবলী শরীয়াতের বিধি নিষেধ আরোপিত হওয়া হিসাবে।

অর্থাৎ, এ শাস্ত্রের মধ্যে মানুষের কর্মের স্তর ও ক্ষেত্র সম্পর্কে শরীয়াতের বিধানাবলীর আলোচনা করা এবং এ সকল বিধানের দলীল-প্রমাণ ও যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা হয়।

ইলমে ফিকহ এর উদ্দেশ্য : ইলমে ফিকহ এর উদ্দেশ্য হল— اَلْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য ও সফলতা লাভ। অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহে আরোপিত সোনালী বিধিমালার জ্ঞান অর্জন

করত সে অনুযায়ী আমল করে অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে রূপায়ণ করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জন করাই হল ইলমে ফিকহ এর উদ্দেশ্য।

উক্ত শাস্ত্রকে فقه করে নাম করণ : উক্ত শাস্ত্রের নাম فقه তা কুরআন হাদীস থেকেই গৃহিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ 'যাতে করে তারা দ্বীনের যথার্থ জ্ঞানার্জন করতে পারে।'

রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ -আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান দান করেন। মোটকথা, আয়াত ও হাদীসে উল্লেখিত تَفَقُّهُ فِي الدِّيْنِ ই হল ইলমে ফিকহ।

ইলমে ফিকহ এর প্রয়োজনীয়তা :

ইলমে ফিকহ এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ফিকহ যেহেতু কুরআন সুন্নাহ থেকে নিঃসৃত তাই ফিকহ এর স্থান কুরআন সুন্নাহর পর। কুরআন সুন্নাহ মানুষের জীবনের সার্বিক বিষয়ে দিক নির্দেশনা করেছে। তবে এসব দিক নির্দেশনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ হওয়ার দরুন সকল মানুষ তা জানা, বুঝা এবং তার উপর আমল করা একেবারেই অসম্ভব। যেমন কুরআন হাদীসে নামাজের কথা বলা হয়েছে, তবে কারো নামাজে কোন ভুল অথবা কোন আমলে বাড়াবাড়ি বা ছুটে যাওয়া তা কোন পর্যায়ের কুরআন হাদীস দ্বারা তা বুঝা অনেক কঠিন। কেননা, এ জাতীয় বিষয়ের স্পষ্ট সমাধান কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই। সুতরাং এসকল সমস্যার সমাধান কল্পে আল্লাহ কিছু আলোকিত মানবীয় মেধাতে ফিকহ এর জ্ঞান ঢেলে দিয়েছেন। তাঁরা খোদা প্রদত্ত তীক্ষ্ম মেধা দিয়ে কুরআন সুন্নাহের আলোকে তার সমাধান দিয়েছেন আর তাই হল ফিকহ।

রাসূলুল্লাহ্ সা. এর জামানায় ফিকহ ছিল, ফিকহের চর্চাও ছিল। দরবারে নববী থেকে তা'লীমপ্রাপ্ত হয়ে সাহাবায়ে কেরাম ফিকহ এর চর্চা ও ইজতেহাদ করেছেন। যার প্রমাণ হাদীসের কিতাবে অনেক আছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সা. যখন হযরত মুয়াজ ইবনে যাবাল (রহ.)-কে ইয়ামনের গভর্নর করে ইয়ামনে পাঠিয়েছিলেন, যাবার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ সা. জিজ্ঞাসা করেছিলেন— بِمَا تَقْضِى يَا مُعَاذُ হে মুয়াজ তুমি কিসের ভিত্তিতে ঝগড়া ফাসাদের ফায়সালা করবে। উত্তরে হযরত মুয়াজ রাযি. বললেন, بِكِتَابِ اللّٰهِ আল্লাহর কিতাব দ্বারা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন— فَاِنْ لَمْ تَجِدْ যদি কুরআনে না পাও? জবাবে তিনি বললেন, بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ তবে রাসূলুল্লাহ্ সা. এর সুন্নাতের আলোকে। রাসূলুল্লাহ্ সা. এরশাদ করলেন— فَاِنْ لَمْ تَجِدْ যদি তাতেও না পাও। জবাবে হযরত মুয়াজ রাযি. বললেন— اَجْتَهِدُ بِرَائِي আমি আমার রায় এবং ফিকহের দ্বারা ফায়সালা করব। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَهُ بِمَا يَرْضٰى رَسُوْلَهُ

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি তার রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বনের তাওফিক দান করেছেন যে ব্যাপারে রাসূল সন্তুষ্ট আছেন।

অপর এক হাদীসে আছে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, দুজন সাহাবী সফরে বের হলে পথিমধ্যেই নামাজের সময় হওয়ায় তারা পানি না পাওয়াতে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়লেন। অতঃপর নামাজের ওয়াক্ত বাকী থাকা অবস্থায় পানি পেয়ে গেলেন। তাই তাদের একজন অজু করে নামাজ দোহরিয়ে নিলেন। আর অপর জন অজু করলেন না এবং নামাজও পড়লেন না। সফর শেষে তারা দরবারে নববীতে আসলেন এবং ঘটনাটি বিস্তারিত ব্যক্ত করলেন। সব শুনে রাসূলুল্লাহ্ সা. যে ব্যক্তি অজু ও নামাজ পুনরাবৃত্তি করেন নি, তাকে বললেন— اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ اَجْزَأَتْكَ صَلٰوتُكَ তুমি সুন্নাত মত করেছ তোমার নামাজ তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যিনি ওজু ও নামাজের পুনরাবৃত্তি করেছেন তাকে বললেন, لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ তোমার দ্বিগুন ছওয়াব রয়েছে।' (সুনানে আবূ দাঊদ) আরো অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. এর যোগেও ফিকহ ছিল। তবে ফিকহ শাস্ত্রের বর্তমান রূপ

ছিল না। কেননা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সা. ধরাধামে ছিলেন, আর সাহাবায়ে কেরামগণও তার অনুসরণ করে চলতেন। অপর দিকে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতেও কোন বিতর্ক সৃষ্টি হত না।

অতঃপর হুজর সা. এর অনুপস্থিতি, স্থান, কাল ও অবস্থার পরিবর্তন, কুরআন মাজীদের পরস্পর দু আয়াতে বাহ্যিক বিপরীত দৃষ্টিকোন হওয়া, কখনো কখনো কুরআন হাদীসের হুকুমের মাধ্যমে ও বাহ্যিক দৃষ্টিতেও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হওয়া, তেমনি অনেক হাদীসে পরস্পর বাহ্যিক অসঙ্গতি প্রকাশ পাওয়া এবং আরবী ভাষার পাণ্ডিত্যার্জনের পাশাপাশি কুরআন সুন্নার সমুদয় জ্ঞান প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান না থাকার দরুন ইলমে ফিকহ নামক একটি শাস্ত্রের দার উন্মোচন করার প্রয়োজন পড়ে তাই তো মহা জ্ঞানী আলীম উলামাগণ উল্লেখিত সমস্যাগুলোর সমাধান কল্পে কুরআন সুন্নাহর আলোকে মাসআলা মাসাইলের উদ্ভাবন ও استنباط করতে শুরু করেন। আর তা-ই হল ইসলামী আইন শাস্ত্রের এক মহামূল্যবান ভান্ডার যা আজ ইলমে ফিকহ্ নামে পরিচিত।

উল্লেখ্য যে, ইসলামী শরীয়াতে ফিকহ প্রণয়নের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা যেমন অনস্বীকার্য তেমনি তার অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। তাই তো মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের তার দৈনন্দিন আমলের জন্য ইলমে ফিকহ অর্জন করা ফরজে আইন। আর ইলমে ফিকহে ভুৎপত্তি অর্জন করা ফরজে কিফায়া।

কুরআন হাদীস ও ফিকহের মধ্যে সম্পর্ক :

কুরআন হাদীস হলো মূল বা اصل। আর ফিকহ হল তারই শাখা প্রশাখা বা فرع সুতরাং যেভাবে মাতা ছাড়া সন্তানের কল্পনা করা অসম্ভব তেমনি কুরআন হাদীস ছাড়া ফিকহ এর চিন্তাভাবনা করা নিরর্থক ও অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, দুধের মধ্যে যেভাবে মাখন মিলে থাকে তেমনি কুরআন সুন্নার সাথে ফিকহ মিলে আছে। গোয়াল যেমন তার চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা দুধের মধ্য থেকে মাখনের অস্তিত্ব দেখিয়ে দেয়, তেমনি ফকীহগণ কুরআন সুন্নাতে মিশে থাকা অনেক বিধি-বিধান মাসাইল ও সমস্যাবলীর সমাধান দীর্ঘ সাধনা ও গবেষণা দ্বারা মানুষের সামনে ফিকহের নামে উপস্থাপন করেছেন।

ইলমে ফিকহের ফজিলত :

কুরআন হাদীসের দীর্ঘ সাধনা ও গবেষণালব্ধ নির্জাসই হল ইলমে ফিকহ। এদিকে বিবেচনায় লক্ষণীয় যে, কুরআন হাদীসের উদ্দেশ্যই হল ইলমে ফিকহ। একারণেই ফিকাহ হাসীলের জন্য কুরআন হাদীসে অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ -

তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল কেন বের হয় না যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে ফিকহ হাসিল করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। যাতে তারা সতর্ক হয়। অন্য আয়াতে মহান প্রভু ইরশাদ করেন—

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا -

'যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।' উক্ত আয়াতে 'হিকমত' দ্বারা ফিকহ শাস্ত্র বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন—

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ (مشكوة)

'আল্লাহ যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ

করেন—

اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ خِيَارُهُمْ فِي الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا -

মানুষ খনিতুল্য স্বর্ণ রূপ্যের খনির ন্যায়। তাদের থেকে যারা জাহিলিয়্যাতের যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামি যুগেও তারা শ্রেষ্ঠ যদি তারা ফিকহ (তথা দ্বীনের জ্ঞান) অর্জন করে থাকে। তিনি আরো ইরশাদ করেন—

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

একজন ফকীহ শয়তানের নিকট এক হাজার আবিদ থেকেও ভয়ঙ্কর। অন্যত্র ইরশাদ করেন—

مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً

ফিকহ মজলিসে কিছু সময় বসা ষাট বছর নফল ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। হযরত উমর রাযি. বলেন—

تَفَقَّهُوْا قَبْلَ اَنْ تَسَوَّدُوْا -

'নেতৃত্ব লাভের আগেই ফিকহ হাসিল কর।' অপর এক হাদীসে রাসূল সা. ইরশাদ করেন—

وَلِكُلِّ شَيْئٍ عِمَادٌ وَ عِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ الْفِقْهُ -

'এবং প্রত্যেক বস্তুরই একটি স্তম্ভ রয়েছে এবং দীন ইসলামের স্তম্ভ হল ফিকহ।' এ ধরনের আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে যা দ্বারা ইলমে ফিকার গুরুত্ব ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ইলমে ফিকহ অর্জন করা ও তদনুযায়ী আমল করা অতীব জরুরী।

ফিকহ শাস্ত্রের সংকলণ ও ক্রমবিকাশ :

ইসলামের মূল উৎস যদিও কুরআন ও হাদীস তবে এ দুই উৎসের পরেও অর্থাৎ এ দুই উৎসকে মূল ভিত্তি রেখে পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত সমস্যাবলীর সমাধান ইজমা তথা উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বসম্মত অভিমতের আলোকে এবং কিয়াস তথা কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা মিমাংসিত কোন বিষয়ের সাথে অনুরূপ কোন বিষয়কে উপমা দ্বারা সাদৃশ্যতা করে উপমানের হুকুম উপমেয়ের উপর আরোপ করা। অতএব ইজমা এবং কিয়াস ও ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে স্বীকৃত। হুজুর সা. এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় থেকেই ফিকহের চর্চা শুরু হয়েছে। তবে হুজুর সা. যেহেতু ধরাধামে ছিলেন তাই ফিকহ বিষয়টির বর্তমান রূপ ছিল না। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এসে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। তারপর থেকে ফিকহ শাস্ত্রের ক্রম বিকাশের দ্বারা অব্যাহত থাকে। কাল ও সময়ের তারতম্যের ভিত্তিতে ফিকহের এ ক্রমবিকাশকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম যুগ : এ যুগের প্রারম্ভ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে দীর্ঘ দশ বৎসর। অর্থাৎ এ যুগের সমাপ্তি ঘটে দশম হিজরী সনে হুজুর সা. এর ইন্তিকালের মধ্য দিয়ে। এ যুগের সার্বিক পরিস্থিতি, ফাতওয়া ও দ্বীনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ স্বয়ং রাসূল সা. অহীর মাধ্যমে দিতেন। এ সময় ইসলামী ফিকহের উৎস ছিল মাত্র দুটি : (ক) কুরআন (খ) হাদীস। এ যুগে রাসূল সা. অহীর মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সহজ সাবলীল সমাধান পেশ করতেন যাতে সাহাবারা কোন দ্বিমতের অবতারণা করতেন না এবং তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিরোধের সামান্যতম সম্ভাবনা ও পরিলক্ষিত হত না। মোটকথা, রাসূল সা. এর হাদীসের মাধ্যমে দ্বীন ধর্মের সার্বিক বিষয়ের বিধিমালা ও তৎকালীন সমাজের উদ্ভূত সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন।

দ্বিতীয় যুগ : কিবারে সাহাবায়ে কেরামের যুগ। এ যুগের সূচনা হুজুর সা. এর তিরোধানের পর থেকে অর্থাৎ একাদশ হিজরী থেকে এবং তা শেষ হয় চল্লিশ হিজরী সনে। এ ত্রিশ বৎসর ছিল খুলাফায়ে রাশেদীনের সুনালী যুগ। এ সময়ে ইসলাম পৃথিবীর আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু দেশ ইসলামী শাসনের অনুগত হয়।

সুতরাং বহুজাতীয় সংমিশ্রনে পারিবারিক ও সামাজিক অনেক সমস্যাবলী দেখা দেয়। সাহাবায়ে কেরামগণ এসকল সমস্যাবলীর সমাধান কুরআন হাদীসে খোজ করতেন। পেয়ে গেলে ভাল, অন্যথায় তার সমাধান তাঁরা দু' পদ্ধতিতে দিতেন :

(১) সাহাবায়ে কেরামের ইজমা, তথা সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আর তাকেই ইজমায়ে সাহাবা বলা হয়। আর তাই হল ইজমা গ্রহণযোগ্যতার মূল ভিত্তি। তারপর থেকে ইসলামী ফিকহে ইজমা তৃতীয় স্থান দখল করে নেয়।

(২) বিশিষ্ট সাহাবয়ে কেরামের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ তথা সাহাবায়ে কেরাম উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কুরআন হাদীসে না পাওয়াতে কুরআন হাদীসে এরকমই অন্য কোন সমস্যার সমাধানের উপর ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিমত পেশ করেছেন। আর তাই হল কিয়াসের ভিত্তি। তারপর থেকে ইসলামী ফিকহে কিয়াস চতুর্থ স্থান দখল করে নেয়।

তৃতীয় যুগ : সিগারে সাহাবা ও তাবেঈনে কেরামের যুগ। এ যুগের সূচনা একচল্লিশ হিজরীসন থেকে তথা খুলাফায়ে রাশিদীনের সমাপ্তিকালের পর হযরত মুআবিয়া রাযি. এর শাসন আমল থেকে এবং এ যুগের সমাপ্তি প্রথম শতকের শেষ অথবা হিজরী দ্বিতীয় শতকের সূচনাকালে।

এ সময় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে শরীয়তের বিধি-বিধান ও মাসআলা মাসাইলকে শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তাকে তীব্র করে তুলে। কেননা, এসময়ে যে সকল সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন। তারা ইসলাম প্রচারে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। সকল সাহাবী এক স্থানে জামায়েত ছিলেন না। ২। রাজনৈতিক কারণে শিয়া, রাফেজী, খারেজী ইত্যাদি ভ্রান্ত দলের উদ্ভব ঘটে। যারা তাদের মনগড়া জাল হাদীস বা রায় অনুযায়ী মাসআলা মাসাইলের মিথ্যা সমাধান দিতে লাগলেন। যার কারণে মাসআলা মাসাইলের ভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হতে লাগল।

৩। অনারব লোকদের বিপুল সংখ্যক ইসলামে দীক্ষা নেয়া এবং তারাও ফাতওয়ার কাজে লেগে যাওয়াটা। মোটকথা বাস্তব অবস্থার অনেক সমস্যা এসে সঠিক ইসলামী জীবন যাপনে বিঘ্নতা সৃষ্টি হলে ইসলামী সালতানাতের শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনগণের আপ্রান প্রচেষ্টায় উল্লেখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে ইসলামের হেফাজতের লক্ষে শরীয়াতের হুকুম আহকামকে সুবিন্যস্ত করা। অর্থাৎ ফিকহ ও উসূলে ফিকহ প্রণয়ন ও সংকলনের দৃঢ় উদ্যোগ নিয়ে এ তৃতীয় যুগেই মুসলিম জাহানের বিভিন্ন শহরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফতোয়া দানের জন্য কতিপয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্যে সাতটি কেন্দ্র অতি প্রসিদ্ধ।

১। মদীনা মুনাওয়ারাহ : রাসূলুল্লাহ্ সা. এর যুগ থেকে হযরত উসমান রাযি. এর শাসনামল পর্যন্ত মদীনা ছিল ফাতাওয়া প্রদানের মূল কেন্দ্র। এ সময়ে আমীরুল মুমিনীনগণ সহ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ফাতওয়া প্রদানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন হযরত আয়েশা রাযি.। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল রাযি., হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি., হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি., হযরত উবাই ইবনে কাব রাযি., হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি., হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাযি., হযরত আবু দারদা রাযি., হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযি., হযরত মু'আবিয়া রাযি.সহ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম।

তাবেঈনদের অন্যতম হলেন হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ., হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের আসাদী রহ., হযরত আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম মাখজুমী রহ., হযরত আলী ইবনে হুসাইন যাইনুল আবেদীন রাযি., হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ রাযি., হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি., হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রাযি., হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর রাযি., হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে যুহরী রহ., হযরত আবুয যিনাদ আবদুল্লাহ্ ইবনে

যাকওয়ান রহ., হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী রহ., হযরত রাবীআ ইবনে আবু আবদুর রহমান রহ.।

২। **মক্কা মুকাররামা** : মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ সা. কিছু দিনের জন্য হযরত মুআয রাযি. কে মক্কার মুআল্লিম ও মুফতি নিয়োগ করেছিলেন। তাছাড়া মক্কা মুকাররামায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ফাতাওয়া প্রদান করতেন। তাবেঈনদের থেকে হযরত মুজাহিদ ইবনে যুবায়ের রহ. হযরত ইকরামা রাযি. (হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর আযাদকৃত গোলাম) হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ রাযি. হযরত আবু [illegible]য়র মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম রহ. প্রমুখ হযরত তাবেঈনগণ ফাতাওয়া প্রদান করতেন।

৩। **কুফা (ইরাক)** : হযরত উমর রাযি. এর শাসনামলে তারই নির্দেশে ইরাকে কুফা ও বসরা নামক দুটি নগর গড়া হয়। সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত এ দুটি শহরে বসবাস শুরু করলেও হযরত উমর রাযি. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কে কুফার মু'আল্লীম মুফতী ও গভর্ণর হিসাবে নির্বাচিত করে তথায় নিয়োগ করেন। তাই তিনি সেখানে দীর্ঘ দশ বৎসর অবস্থান করতঃ ফিকহে ইসলামীর মহান খেদমত করে গেছেন। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাযি. এর শাষনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণ কেন্দ্রছিল কুফাতে। সুতরাং হযরত আলী রাযি. ও হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর অক্লান্ত চেষ্টার বিনিময়ে কুফা নগর ইলমে দ্বীন চর্চা ও তার বিশ্লেষণে সবার শীর্ষে চলে যায়, যার প্রেক্ষিতে সেখানকার মুজতাহিদ ও তাবেঈনগণ দ্বীনের খেদমতে কিংবদন্তি অবদান রেখে ইতিহাসের পাতায় খ্যাতির শীর্ষস্থান দখল করে নিতে সক্ষম হন। তাদের থেকে অন্যতম হলেন হযরত আলকামা ইবনে কায়স নখয়ী রহ., হযরত মাসরুক ইবনে আজদা হামদানী রহ. হযরত উবায়দা ইবনে আমর সালমানী রহ. হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নাখয়ী রহ. হযরত সুরায়হ ইবনে হারিস কিন্দি রহ. হযরত ইব্রাহীম ইবনে ইয়াযীদ নাখয়ী রহ., হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহ., হযরত আমর ইবনে শুরাহবিল শাবী রহ.।

৪। **বসরা (ইরাক)** : পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, হযরত উমর রাযি. এর শাসনামলে বসরা শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিল। কুফার ন্যায় বসরাও ছিল মহা মনিষীদের মিলনভূমি। তাই তাতে ইলমে দ্বীনের অনেক বরকতময় রাহা সম্প্রসারিত হয়। বসরাতে ফাতাওয়া দানকারী সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি.। যিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সা. এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন।

তাবেয়ীনদের মধ্যে অন্যতম হলেন : হযরত আবুল আলীয়া রফী ইবনে মিহরান রহ., হযরত আবুশ শা'সা জাবির ইবনে যায়েদ রহ., হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ., হযরত কাতাদা ইবনে দা'আমা দূসী রহ. প্রমুখ ফাতাওয়া প্রদানে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৫। **শাম (সিরিয়া)** : ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. তার শাসনামলে শামদেশে হযরত মু'আয রাযি., হযরত উবাদাহ ইবনে সাবিত রাযি., হযরত আবুদারদা রাযি.কে শাম দেশের মু'আল্লিম ও মুফতি হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। তারা এ দায়িত্বের মহান ব্যক্তিত্ব হিসাবে দায়ীত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীকালে তাবেয়ীনদের থেকে যারা ফাতাওয়া প্রদানে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাদের অন্যতম হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম আশ'আরী রাযি. হযরত আবু ইদরীস খাওলানী রহ., হযরত কাযীসা ইবনে যুওয়াইব রহ., হযরত মাকহুল ইবনে আবু মুসলিম রহ., হযরত রাজা ইবনে হায়ওয়া রহ., হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. তিনি ফিকহে ইসলামীর খেদমের পাশপাশি হাদীস সংকলনের ব্যাপারে সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহন করেছিলেন।

৬। **মিশর** : দ্বীন প্রচারে ও দ্বীন পালনে সার্বিক সমস্যাগুলোর সমাধান কল্পে আগত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রধান ফকীহ ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রহ.। আর তাবেয়ীনদের মধ্যে দুজন ফকীহ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তারা হলেন হযরত আবুল খায়র মুরশিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ রহ., হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবু হাবীব রহ. (হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. তাকে মিসরের প্রধান মুফতী হিসাবে

নিয়োগ করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম মিসরে হালাল হরাম সম্পর্কিত বিষয়ের চর্চা শুরু করেন। তার মাধ্যমেই মিসরে ইলমে দ্বীনের চর্চা বৃদ্ধি পায়। তিনি ১২৮ হিজরী সনে ইনতিকাল করেন।)

৭। **ইয়ামান :** ইয়ামান রাসূলুল্লাহ্ সা. এর যুগেই ইসলামী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সা. ইয়ামানে হযরত আলী রাযি. কে গভর্নর হিসাবে প্রেরণ করেন। পর্যায়ক্রমে সেখানে আবু মূসা আশআরী রযি. কেও আমীর ও ম'আল্লীম হিসাবে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া নিম্নোক্ত তাবেয়ীনগণ ইয়ামানে ফাতওয়া প্রদানে সবার শীর্ষে ছিলেন। হযরত তাউস ইবনে কায়সার রহ., হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ., হযরত ইয়াহয়া ইবনে আবু কাসীর রহ.।

বি: দ্র: উল্লেখিত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ও তাবেয়ীন রহ. তারা তাদের যুগে ফাতওয়া প্রদানের সাথে সাথে হাদীসও বর্ণনা করতেন। আর ফাতওয়া প্রদানের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন ফিকহ এর অনুসরণ করতেন না। এবং তখনকার যুগে তাকলিদে সাখসী (تقليد شخصى) এর উপর আমল করা হত না, বরং তখনকার সময়ে তাকলীদে মুতলাক (تقليد مطلق) এর উপর আমল করা হত।

চতুর্থ যুগ : ফিকহ শাস্ত্রের সংকলণ ও ইজতিহাদ :

এ যুগের সূচনা হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভ থেকে হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ অথবা চতুর্থ শতকের অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগেই ফিকহ শাস্ত্র লিপিবদ্ধাকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং এ শাস্ত্রের মহান কিংবদন্তি মুজতাহিদগণ ধরা পৃষ্ঠে অবতরণ করেন, যাদের অনবদ্য কীর্তি ও অবিস্মরণীয় দ্বীনের খেদমত তখন থেকে এযাবৎ স্মরণীয় হয়ে আসছে ও থাকবে। এ যুগেই কালের শ্রেষ্ট ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা রহ. এ ধরাপৃষ্ঠে এসে তার সহকর্মী ও শাগরেদ, শিষ্যগণকে নিয়ে ফিকহে ইসলামীর নিয়মতান্ত্রিক রচনা শুরু করেন। এবং তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় ফিকহে ইসলামীর উপর গ্রন্থাদী রচনাসহ নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরীর ভেতর দিয়ে এর সম্পাদনা ও পূর্ণাঙ্গ করেন। পরবর্তীতে অন্যান্য ইমামগণ ও ফকীহগণ এ শাস্ত্রের উপর মতামত প্রকাশ ও গ্রন্থাদি রচনাসহ এ শাস্ত্রের অন্যান্য প্রয়োজনাদী পূর্ণ করতে থাকেন। এ যুগ থেকেই ইমামগণের তাকলীদের দার উন্মোচন হয় এবং জনগণ ধীরে ধীরে সকলেই ইমাম আবু হানীফা রহ.সহ অন্যান্য ইমামগণের তাকলীদ করতে শুরু করে। পর্যায়ক্রমে কাজী ও বিচরকবৃন্দ উক্ত ইমামগণের ফিকহের অনুসরণে মুকাদ্দামা, মামলার ফায়সালা দিতে থাকেন। এ যুগেই উক্ত ইমামগণের ছাত্র-শিষ্যরা তাদের উস্তাদের ফিকহের প্রচার প্রসারে তীব্রতর হন এবং তাদের অভিমতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ হন। এ যুগ থেকেই উসূলে ফিকহ তথা ফিকহ শাস্ত্রের মূল নীতিও উদ্ভাবিত হতে থাকে।

এ যুগের বিশিষ্ট ফুকাহায়ে কেরাম হলেন :

হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ., হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ., শরীফ ইবনে আবদুল্লাহ নখয়ী রহ., মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে লায়লা রহ.। উক্ত ফুকাহায়ে কেরামদের থেকে ইমাম আবু হানিফা রহ. ছিলেন সবার শীর্ষে। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে তিনি ৮০ হিজরী সনে পারস্য সাম্রাজ্যের কুফা নগরে জন্মগ্রহন করেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য মক্কা মদীনাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন এবং প্রায় চারশহস্র উস্তাদের নিকট থেকে ইলমে কালাম, ইলমে হাদীস ও ইলমে ফেকাহ অর্জন করেন। তিনি উদ্ভাবনী মনন এবং অসাধারণ আইন প্রণয়ন প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ফিকহ শাস্ত্রকে স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদায় আসীন করেন। মাসআলা বা ধর্মীয় কোন প্রশ্নের জবাব দানের কোন সঠিক ও বিধিবদ্ধ পদ্ধতি তার সময়ের পূর্বে ছিল না। সর্বপরিতৎকালে এবং বহু মাসআলা এবং অনেক সমস্যা দেখা দিল যার স্পষ্ট কোন সমাধান কুরআন-হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণীতে পাওয়া যেত না। এহেন পরিস্থিতিতে আবু হানিফা রহ. ইসলামী ফিকহ বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। তাই তিনি সর্বপ্রথম ফিকহ শাস্ত্রের নিয়ম পদ্ধতি তথা ফিকহ শাস্ত্রকে

মানুষের সামনে সহজ-সরল যুক্তির মাধ্যমে কুরআন হাদীসের আলোকে উদ্ভাবন করত: ফিকহ শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করে দেন। আর তখন থেকেই ফিকহ শাস্ত্রের সংকলন ও সম্পাদনার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ছাত্রদের থেকে যারা সবার শীর্ষে ও বিপুল পান্ডিত্বের অধিকারী তারা হলেন : ইহাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম রহ.। তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতানুসারে কিতাব রচনা করে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতামতকে সারা বিশ্বে প্রচার করেন। খলীফা মাহ্দীর খিলাফাতকালে তিনি কাজীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইমাম যুফার রহ., তিনি হাদীস ও ফিকাহ অর্জন করতঃ শেষ পর্যন্ত কিয়াসের ইমাম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী রহ., ইমাম আবু হানিফা রহ. বাগদাদের কারাগারে থাকাকালীন সময় তিনি তার কাছ থেকে ফিকহ অর্জন করেন এবং ইমামে আজমের ইন্তিকালের পর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে ফিকহ এর জ্ঞানার্জন সমাপ্ত করেন। মাসআলার বিশ্লেষণে তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর সময়েই তিনি এতো প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, মাসআলার ব্যাপারে দলে দলে লোক মোহাম্মদ রহ. এর সরণাপন্ন হত। তাতে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ধারা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ রহ., তিনি ফিকহে হানাফীর উপর অনেক কিতাবাদী রচনা করেন। ফিকহে হানাফী যদিও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দিকে সম্পর্কযুক্ত, তবে তার প্রচার ও প্রসার তার এ মহান চার শাগরীদে রশীদের মাধ্যমে হয়েছে। কাজেই ইমাম আবু হানিফা রহ. ও এই চার ইমামের রায়ের সমষ্টির নামই হল ফিকহে হানাফী।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর যেসব শিষ্যরা তার মাযহাবের উপর কিতাবাদী রচনা করে হানাফী মাযহাবের প্রচার প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন তাদের অন্যতম হলেন : ইব্রাহীম ইবনে রুস্তম মিরওয়াযী রহ.। তিনি নাওয়াদিরে ইমাম মুহাম্মদ রহ. সংকলন করেন। হযরত আহমদ ইবনে হাফস রহ., তিনি ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর কিতাবাদীর রাবী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মাসবুত গ্রন্থটি তারই হাতে লিখিত। হযরত বশির ইবনে গিয়াস মুরীসী রহ.। হযরত বিশর ইবনে ওয়ালীদ কিন্দি রহ., তিনি ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর কিতাবাদীর রাবী ছিলেন। হযরত ঈসা ইবনে আবান রহ.। হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিমাআ তামীমী রহ., তিনি নাওয়াদীরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও নাওয়াদীরে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর সংকলক ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে শুজা সালাজী রহ.। তিনি তাসহীহুল আসার, কিতাবুন নাওয়াদীর, কিতাবুল মুযারাবা ইত্যাদি গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন।

হযরত হিলাল ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মুসলিম বসরী রহ., তিনি 'ওয়াকফের বিধান ও শর্ত' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবু জাফর আহমদ ইবনে ইমরান রহ.। হযরত আহমদ ইবনে ওমর আল খাসসাফ রহ., তিনি কিতাবুল খারাজ, কিতাবুল হিয়াল, কিতাবুল ওয়াসায়া, কিতাবুশ শরুত, কিতাবুল ওয়াকফ ইত্যাদি গ্রন্থাবলী রচান করেছেন। হযরত বাককার ইবনে কুতাইবা ইবনে আসাদ রহ., হযরত ইমাম আবু হাযিম আবদুল হামীদ ইবনে আবদুল আযীয রহ., তিনি কিতাবুল আদাবিল কাযী ও কিতাবুল ফারাইজ গ্রন্থ রচনা করেছেন। হযরত আবু সাঈদ আহমদ ইবনে হুসাইন বারদাই রহ., হযরত শায়খ আবু আলী দাক্কাক রহ.।

হযরত ইমাম আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালাম আযদী তাহাভী রহ. তিনি হানাফী মাযহাবের একজন উচ্চস্তরের ফকীহ ও মুহাদ্দীস ছিলেন। তিনি হানাফী মাযহাবের উপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদী রচনা করে হানাফী মাযহাবকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করেছেন। এ যুগে হানাফী আলীম উলামা ছাড়াও অনেক ইমাম ও মুজতাহিদীনে কেরাম আগমন করেছেন এবং দ্বীন ইসলামের খেদমত করে গেছেন। তাদের থেকে ইমাম মালিক রহ. ও তার শিষ্যবৃন্দ ইমাম শাফিয়ী রহ. ও তার শিষ্যবৃন্দ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ও তার শিষ্য বৃন্দের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম মালিক রহ. । তিনি ৯৩ হিজরী সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মদীনাতেই শিক্ষা লাভ করেন। তার শায়েখদের নির্দেশক্রমে তিনি হাদীস ও ফতোয়া প্রদানের কাজে লিপ্ত হন। তিনি বলেন, সত্তর জন উস্তাদ আমার যোগ্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া পর্যন্ত আমি ফতোয়া প্রদানের এ কাজে আত্মনিয়োগ হইনি। ইমাম মালিক রহ. এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের সংকলণের নাম হল الموطا। উক্ত গ্রন্থ থেকে বহু ফকীহ, মুহাদ্দীস ও আমীর উমারা উপকৃত হয়েছেন।

ফিকহ সংকলন ও ফতোয়া দানে তার মূলনীতি হল প্রথম চাহিত বিষয়টিকে কুরআন মজীদে অনুসন্ধান করতেন। অতঃপর না পাওয়াতে তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশুদ্ধ হাদীসে খোজ করতেন। তার মতে হিজাজের প্রবীনতম ও শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দীসগণ ছিলেন শুদ্ধাশুদ্ধির মাপকাঠি। মদীনাবাসীদের افعال ও اعمال এর প্রতি তিনি যথার্থ গুরুত্ব দিতেন। বিধায় মদীনাবাসী আমল করেনি দেখে তিনি অনেক বিশুদ্ধ হাদীসকে পরিত্যাগ করেছেন। তার মতে ফিকহের উৎস কুরআন হাদীস তারপর মদীনাবাসীদের আমল। অতঃপর ইজমা, সর্বশেষে কিয়াসের স্থান। সুতরাং হানাফী মাযহাবের মত তার মাযহাবে কিয়াসের গুরুত্ব নেই। অবশ্য হানাফী মাযহাবের استحسان এর ন্যায় মালিকী মাযহাবেও استحسان এর উপর আমল করা হয়।

ইমাম মালিক রহ. এর শিক্ষা মজলিস ছিল খুব শানশওকতের। তিনি কুরআন ও হাদীসের সম্মানার্থে এরূপ করতেন। তিনি আজীবনই মদীনাতে মসজিদে নববীতে বসে শিক্ষা দিতেন। তার দরসগাহে বহু দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এসে জামায়ত হত। শিক্ষা সমাপনান্তে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে তা প্রচার প্রসার করতেন।

মালিকি মাযহাবের প্রচার প্রসার তার মিসরবাসী ছাত্রদের মাধ্যমে হয়েছে। তাদের থেকে অন্যতম হলেন হযরত আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব ইবনে মুসলিম কুরাশী রহ.। হযরত আবু আবদুল্লাহ আবদুর রহমান ইবনে কাসিম আতাফী রহ., হযরত মাশহাব ইবনে আবদুল আযীয আল কায়সী আল আম্বরী আল জাদী রহ. হযরত আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে হাকাম ইবনে আয়ান রহ. হযরত আসবাগ ইবনে ফারাজ উমুভী রহ. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম রহ. হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে যিয়াদ ইসকান্দরী রহ.। এছাড়াও ইমাম মালিক রহ এর ছাত্র-শিষ্যরা সুদূর স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত পরিব্যপ্ত ছিল। স্পেন ও উত্ত আফ্রিকায় তার সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র-শিষ্যরা হলেন, আবু আবদুল্লাহ যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান কুরতুবী রহ., ইসা ইবনে দিনার উন্দোলূসী রহ., ইয়াহিয়া ইবনে কাসির লায়সী রহ., আবদুল মালিক ইবনে হাবীব ইবনে সুলায়মান সুলামী রহ., আবুল হাসান আলী ইবনে যিয়াদ তিউনিসী রহ., আসাদ ইবনে ফুরাত রহ., আবদুস সালাম ইবনে সাঈদ রহ. প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ইরাকে ফিকহে মালেকী প্রচারে দুজন ফকীহ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। (১) আহমদ ইবনে মাজাল ইবনে গিলান রহ. (২) কাজী আবু ইসহাক রহ.।

ইমাম শাফেয়ী রহ. : তিনি আসকালান প্রদেশের গাযাহ নামক স্থানে ১৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি কুরআন মজীদ মুখস্ত করেন। তারপর তিনি মক্কায় পৌছে সেখানকার শায়খ মুসলিম ইবনে খালিদ যানজী রহ. এর নিকট ফিকহ শিক্ষা করেন। পনের বছর বয়সে তার উস্তাদ শায়খ যানজী রহ. তাকে ফতোয়া দানের অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি মদীনা পৌছে ইমাম মালিক রহ. এর নিকট মুআত্তা মালিক অধ্যায়ন করেন এবং তা মুখস্ত করে তাকে শোনান। ইমাম মালিক রহ. এতে পুলকিত হয়ে তাকে কাছে টেনে নেন। এছাড়াও আরো ৮১ জন ফকীহ ও মুহাদ্দীসীনে কেরামের নিকট থেকে ফিকহ ও হাদীস শিক্ষা করেন। খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে তিনি নাজরান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর তিনি ইরাক চলে যান। সেখানে ইমাম মোহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী রহ. এর নিকট ফিকহে হানাফী শিক্ষা করেন। অতঃপর মক্কায় চলে আসেন। তারপর ১৯৫ হিজরীতে পুনরায় ইরাক চলে যান। দুবৎসর যাবৎ তথায় শিক্ষা দানে রত ছিলেন। তখনকার সময়ে তাঁর দেওয়া ফতোয়াকে قول قديم নামে অভিহিত করা হয়। এ সময় তাঁর

মাযহাবের বেশ প্রসার লাভ করে। তারপর তিনি মক্কাতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৮ হিজরী সনে পুনরায় তিনি ইরাক গমন করেন। সেখানে কয়েক মাস অবস্থান করার পর মিসরে চলে যান। ইমাম শাফেয়ী রহ. তখন থেকে তার ফতোয়াদানের পদ্ধতিতে ও চিন্তাধারায় কিছুটা পরিবর্তন সাধিত করেন। তার এ নতুন চিন্তাধারার উপর কিতাবাদী রচনা করেন। আর তাকেই ইমাম শাফেয়ী রহ. এর قول جديد বলা হয়।

ইমাম শাফেয়ী রহ. তার মাযহাবের বুনিয়াদী উসূল তৎপ্রণীত رسالة اصولية নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেন। তা হল তিনি প্রথমে কুরআনের জাহিরী অর্থকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করতেন। আর যদি প্রমাণিত হত যে এখানে যাহিরী অর্থ উদ্দেশ্য নয় তবে তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন না। তারপর তিনি হাদীস থেকে দলীল পেশ করতেন এবং হাদীসের ক্ষেত্রে তার সনদ متصل ও রাবী ثقه হওয়ার শর্ত আরোপ করতেন। তিনি ইমাম মালিক রহ. এর ন্যায় হাদীসের মর্মানোযায়ী কেহ আমল করছে কি না এবং হানাফী মাযহাবের ন্যায় বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হওয়ার শর্তারোপ করেন নি। কুরআন হাদীসে না পাওয়াতে ইজমার উপর। আর তাতেও না পাওয়াতে কিয়াসের উপর আমল করতেন। তবে হা কিয়াসের জন্য শর্তারোপ করতেন যে, এর জন্য নির্দিষ্ট কোন اصول বা নীতি থাকতে হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. ২০৪ হিজরী সনে পরলোক গমন করেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্র যারা ফিকহ শাস্ত্র প্রচার প্রসার করেছেন তাদের অন্যতম হলেন আবু ছাত্তার ইব্রাহীম ইবনে খালিদ কালবী আল বাগদাদী রহ., ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. হাসান ইবনে মোহাম্মদ ইবনে সরাহ আসসাফরানী আল বাগদাদী রহ., আবু আলী হুসাইন ইবনে আলী আল কারাবীসী রহ., আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আবদুল আজিজ আল বাগদাদী রহ. আবু ওসমান ইবনে সাঈদ আনমাতী। আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ওমর ইবনে সুরায়জ রহ. আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবু আহমদ তাবারানী রহ. ইউসুফ ইবনে ইয়াহইয়া মিসরী রহ. আবু ইব্রাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া মুযানী রহ. রবী ইবনে সুলায়মান ইবনে আবদুল জাব্বার মুরাদী রহ. হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ আততুজায়রী রহ. ইউনুস ইবনে আবদুল আলা সাদাফী আল মিসরী রহ. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ওরফে ইবনুল হাদ্দাদ রহ. প্রমুখগণ ফিকহে শাফেয়ী এর প্রচার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. :

তিনি ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহন করেন। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দীস হুশায়ম এবং সুফয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. প্রমুখদের থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। ইরাকে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নিকট থেকে ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। শিক্ষার্জনের পর তিনি শিক্ষা দানের সাথে সাথেই ফিকহ গবেষনায় নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করতে শুরু করেন। তার রচনাবলীর মধ্যে মুসনাদে আহমদ গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করাটা ছিল তার নীতি। তিনি সহীহ সনদে বর্ণিত হওয়া খবরে ওয়াহিদের উপর আমল করতেন। এবং اقوال صحابہ কে কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি শাফেয়ীদের মত দিরায়াত, কিয়াস ও ভাবার্থ গ্রহন করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতেন। মারুফ মাওকুফ উভয় অবস্থায়ই সহীহ হাদীসকে আমলযোগ্য মনে করতেন। আর মালিকীদের মতো মদীনাবাসীদের আমলকে দলিল হিসাবে গণ্য করতেন না। ইমাম আহমদ রহ. থেকে যারা ফিকহে হাম্বলী রিওয়ায়াত করেছেন তাদের অন্যতম হলেন আবু বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হানী ওরফে আসরম রহ., ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ওরফে ইবনে রাহওয়াই রহ., আহমদ ইবনে হাজ্জাজ মিরওয়াসী রহ., আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ., এছাড়া ইমাম আহমদ রহ. এর সুপ্রসিদ্ধ অনেক ছাত্ররা রয়েছেন যারা তার ফিকহে হাম্বলীয় প্রচার প্রসার করেছেন।

পঞ্চম যুগ : ফিকহে ইসলামীর পূর্ণঙ্গতা ও নিজ নিজ ইমামগণের তাকলীদ :

এ যুগের সূচনা হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে হিজরী সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ যুগেই

ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনা পূর্ণাঙ্গতা পায়। এ যুগের মানুষ বিখ্যাত চার ইমামের অনুসরণ ও তাকলীদ করতে লাগল। সর্বপরি এ যুগে ফিকহ শাস্ত্র মানুষের মুখে মুখে চলে আসে এবং তা মুনাযারার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মানুষ নিজ নিজ ইমামের তাকলীদ করতঃ সে বিষয়ে কিতাবাদী প্রণয়নসহ খালিছ মতাদর্শের অনুসরণ করতে লাগল। ইমামগণ কুরআন হাদীসকে সামনে রেখে সেসব মাসাইল বা মাসাইলের উসূল উদ্ভাবন করেছিলেন। মানুষ তা তাহক্বীক ও তাফসীল তথা বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা সমর্থনে বা বিপক্ষে মুনাযারা ও বাহাসের সূচনা করে। এ যুগেই চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালিক রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ. এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর তাকলীদের উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এ যুগে ইজতিহাদ বা স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় তথাপি এ যুগের আলীম উলামাদের এমন কিছু বৈশিষ্ট ছিল যা অনস্বীকার্য। যেমন, তাদের অনেকেই নিজ নিজ ইমামের বর্ণিত মাসআলা মাসায়িলের কারণ বর্ণনা করেন নি তার উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণনা করতে সক্ষম হন। এধরনের ফকীহকে বলা হত أَصْحَابُ التَّخْرِيْجِ।

মাযহাবের প্রবর্তক বা তাদের ছাত্রদের একই মাসআলার বিভিন্ন রায়ের একটি প্রধান্য দেওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন কিছু ফকীহ এ যুগে আগমন ঘটে। তাদেরকে বলা হত اصحاب الترجيح। তাছাড়াও এমন আলীম উলামারা ছিলেন যারা তাদের মাযহাবের বিভিন্ন মাসআলা বা উসূলে মাসআলাকে اجمالا বা تفصيلا বর্ণনা দিতে সক্ষম ছিলেন। এবং মুনাযারা বাহাসের ভিতর দিয়ে নিজ ইমামের মাযহাবকে দৃঢ় মজবুত এবং অন্যান্য মাযহাব থেকে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

এ যুগে হানাফী মাযহাবের প্রচার প্রসার ও তার অক্ষুণ্নতা রক্ষার্থে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের থেকে অন্যতম হলেন ইমাম আবু হাসান উবায়দুল্লাহ ইবনে হাসান কারখী রহ.। আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আবরাযী আল জাসসাস রহ., আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল বলখী রহ., আবুল লায়েস নসর ইবনে মুহাম্মদ সমরকান্দী রহ., আবুল আবদুল্লাহ ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ জুরজানী রহ., আবুল হাসান আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কুদুরী রহ., আবু যায়েদ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আদ দাব্বুসী রহ., আবু আবদুল্লাহ হুসাইন ইবনে আলী আযমীরী রহ., আবু বকর সাহিবজাদা মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল বুখারী রহ., শামছুল আয়িম্মা আবদুল আযীয ইবনে আহমদ হালওয়ানী আল বুখারী রহ.। শামছুল আয়িম্মা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ সারখসী রহ., আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী দামগানী রহ., আলী ইবনে মুহাম্মদ বাজদুবী রহ., শামছুল আয়িম্মা বকর ইবনে মুহাম্মদ জারনাজী রহ., আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে ইসমাঈল সাফফার রহ., তাহির ইবনে আহমদ ইবনে আবদুর রশিদ আল বুখারী রহ., যহিরুদ্দীন আবদুর রশীদ ইবনে আবু হানীফা ইবনে আবদুর রাজ্জাক আল ওয়ালজী রহ., আবু বকর ইবনে মাসঊদ ইবনে আহমদ কাসানী রহ., ফখরুদ্দীন হাসান ইবনে মানসুর আল উযুজুন্দী ওরফে কাজীখান রহ., আলী ইবনে আবদুল জলীল ফারগানী আল মুরগেনানী রহ. (মুছান্নিফে হিদায়া)।

এছাড়াও আরো অসংখ্য অগণিত ফকীহগণ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাযহাবকে এবং অন্যান্য মাযহাবকে দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠা করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

ষষ্ঠ যুগ : এ যুগের সূচনা সপ্ত শতকের প্রারম্ভ থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত। এ যুগে পূর্বের যুগ সমূহের মত মুজতাহিদীনে কেরাম ও বিজ্ঞ মুফতীয়ানে এজামদের মত যোগ্যতা সম্পন্ন লোক সৃষ্টি হননি বিধায় এজতিহাদের প্রক্রিয়া থেমে যায়। তাই উলামায়ে কেরামগণ ও জন সাধারণ সবাই পূর্বেকার ইমাম চতুষ্টয়দের তাকলীদ করতে থাকেন। এদিকে মাসআলা মাসাইলেরও বেশি করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়েনি। কারণ চতুর্থ ও পঞ্চম যুগের উলামাগণ শরীয়াতের সব দিকের মাসআলা মাসাইল এমনকি যা এখন অস্তিত্ব আসেনি তার সম্ভাবনা রয়েছে এমন মাসআলা সমূহ পর্যন্ত কিতাবাদিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাই যদি কোন নতুন সমস্যাবলী দেখা দিত তবে অনেকটাই তাদের পুরাতন লিখিত কিতাবাদীতে তার সমাধান পাওয়া যেত। অধিকন্তু যদি পাওয়া না

যেত তবে তার মূলনীতি অবশ্যই পাওয়া যেত। আর সে মূলনীতির আলোকে মাসআলার সমাধান করা হত। আর যদি একান্ত মূলনীতিও না পাওয়া যায়, তবে ইজতিহাদ করতেন বা করতে হবে। এরূপ ইজতিহাদের প্রক্রিয়া কিয়ামত অবধি স্থায়ী থাকবে। তবে হা এক্ষেত্রে মাযহাব চতুষ্টয়ের মূলনীতি অবশ্যই ধরে রাখতে হবে। মোটকথা ইজতিহাদের দরজা খুলা থাকবে। তাই বলে বল্গাহীনভাবে ইজতিহাদের সুযোগ নেই। এ যুগে মাত্র কয়েকজন ফকীহ মুজতাহিদের স্তরে পৌঁছেছেন। তবে তারা সবাই এ যুগের প্রথম দিকের ব্যক্তিবর্গ। যেমন হানাফী মাযহাবের আল্লামা কামাল ইবনে হুমাস রহ.। আল্লামা জামালুদ্দীন সাইলাবী রহ., আল্লাম কামাল ইবনে পাশা প্রমুখ। মালিকী মাযহাবে আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ., শাফেয়ী মাযহাবের আল্লামা ইযযুদ্দীন, আবদুস সালাম রহ., শায়খ তকী উদ্দীন সবকী, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ., শায়েখ জালালুদ্দীন মাহল্লী রহ. প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। হাম্বলী মাযহাবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. ও আল্লামা ইবনে কায়্যিম রহ. প্রমুখ। তারা সবাই নিজ নিজ ইমামের মতাদর্শের ও মাযহাবের মূলনীতি অনুসরণ করে কিতাবাদী রচনা করে ফিকহের ক্রম বিকাশ ও প্রচার প্রসারের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। এ যুগে গোটা বিশ্বে এমন কি পাক ভরতেও ফিকহের ক্রমবিকাশ ও প্রসারতায় অতুলনীয় ভূমিকা রাখেন যা আজ আমাদের পর্যন্ত হাদীস ফিকহ পৌছার এবং তদনুযায়ী আমল করার মহান একটি সোপান। আমরা তাদের চিরকৃতজ্ঞ। তাদের থেকে উল্লেখযোগ্য হলেন শায়েখ নিজামুদ্দীন রহ., শায়েখ ইয়াহইয়া মুনীরী রহ., শায়েখ ইমামুদ্দীন দেহলভী রহ., শায়েখ আলম ইবেন আলমা আন্দরপতি রহ. (তিনি ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়্যা সংকলন করেন)। শায়েখ আবুল ফাতাহ রুকুন ইবনে হুসসান নাগারী রহ. শায়েখ ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ মুলতানী রহ. মাওলানা হাদ্দাদ জৌনপুরী রহ. (তিনি হিদায়া গ্রন্থের একটি শরাহ লিখেছেন।) মাওলানা সিরাজ উদ্দীন ওমর ইবনে ইসহাক হিন্দী রহ. (তিনি التوشيح নামক হিদায়া কিতাবের একখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন)। মাওলানা হামিদ ইবনে মুহাম্মদ কুনূবী রহ. (ফাতোয়ায়ে হামীদীয়া তার অমর কির্তী।) হযরত মাওলানা মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ., মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ., বাদশা আলমগীর রহ., (তিনি একজন দ্বীনদার আলীম বাদশা ছিলেন। তিনি সাতশত ফকীহদেরকে নিয়ে একটি শরীয়া বোর্ড গঠন করেন এবং তাদের মাধ্যমে শরয়ী বিধানের একটি সংকলণ বের করেন যা ফতোয়াতে আলমগীরী নামে খ্যাত)। মুল্লা নিজামুদ্দীন বুরহানপুরী রহ. (বাদশা আলমগীর কর্তৃক শরীয়া বোর্ডের প্রধান মুফতী ছিলেন)। শায়েখ মুল্লা জিওয়ান রহ., (তিনি আলমানার গ্রন্থের এক খানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ নুরুল আনোয়ার নামে রচনা করেন।) মুল্লা মুহীবুল্লাহ বিহারী রহ. (হানাফী ফিকহের উসূলের উপর مسلم الثبوت নামক গ্রন্থ রচনা করেন)। ইমামুল হিন্দ কাজী সানাউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী রহ., কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি রহ., হযরত শাহ আহলুল্লাহ দেহলভী রহ., মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ., মুফতী আযীযুর রহমান রহ., হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., মুফতী মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী রহ., মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ., মাওলানা ইউসুফ বিনৌরী রহ., এছাড়াও এ উপমহাদেশে আরও অনেক মহামনীষী ফিকহ ও ফতোয়ার ময়দানে বিরাট অবদান রেখেছেন, যা আজ অনস্বীকার্য। এ যুগে এ উপমহাদেশে ছাড়াও বিশ্বের দিকদিগন্তে অনেক আকাবিরে হক্কানী বহুভাবে ইলমে ফিকহের ক্রমবিকাশের ময়দানে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন যা ইতিহাস গ্রন্থে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। যা আমাদের প্রতি তাদের মহান দান হিসাবে গৃহীত।

তাকলীদের এ যুগে ফিকহের ক্রমবিকাশের এধারাকে চির অব্যাহত ও সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশী উলামায়ে কেরাম ও ফকীহবৃন্দের অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয় নিম্নে তাদের কয়েজনের নাম উল্লেখ করা হলো।

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা রহ., মাওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ রহ., মাওলানা হাফেজ আবদুল আওয়াল জৌনপুরী রহ., মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ রহ., মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ রহ., মাওলানা শামছুল হক

ফরীদপুরী রহ., মুফতী আমীমুল আহসান মুজাদ্দিদে বরকতী রহ., মুফতী আবদুল মুঈয রহ., মাওলানা আবদুর রহমান রহ., মুফতী আবদুল ওয়াহিদ রহ., মুফতী মুহাম্মদ আলী রহ., মুফতী মুহাম্মদ ইব্রাহীম রহ., মুফতী বিলায়েত হুসেন রহ., মুফতী নুরুল হক রহ., এসব উলামায়ে কেরাম তাদের জীবনের বেশীর ভাগ দ্বীনের প্রচার প্রসার ও ফতোয়া ফরাইজ দানের মাধ্যমে জন-জীবনকে আনন্দময় করে তুলেছেন। আমরা অতীতের সকল বুযুর্গানে দ্বীনের মাগফিরাত ও দরজা বুলন্দির দোয়া করি।

হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. এর জীবন ও কর্ম :

যুগের শ্রেষ্ঠ ইমাম ইমামে আযম আবু হানিফা রহ. এর নাম নুমান, পিতার নাম ছাবিত। উপনাম আবু হানিফা। উমাইয়া শাসন আমলে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের রাজত্বকালে ৮০ হিজরী সনে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কুফা নগরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তার দাদা চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রহ. এর খিলাফত কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। বাল্যকালেই একটু বড় হয়েই প্রথমে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন। ১২/১৩ বৎসর বয়সে হযরত আনাছ রাযি. এর দরবারে হাজির হন এবং ১৭ বৎসর বয়সে জ্ঞানার্জনে এগিয়ে যান। তাই প্রথমে কালাম শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং তিনি এ বিষয়ে এত গভীর পারদর্শিতা অর্জন করেন যে, লোকেরা তার প্রতি ইশারা করে বলত তিনি ইলমে কালামের শ্রেষ্ঠ ইমাম। তিনি যিন্দিক, নাস্তিক ও বাতিল পন্থিদের বিরুদ্ধে মুনাযারা করে অত্যন্ত সুখ্যাতি অর্জন করেন। অতঃপর প্রখ্যাত ফকীহ হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান রহ. এর নিকট ফিকহ এর ইলম হাসিল করেন এবং আতা ইবনে আবু রায়হান রহ., হযরত নাফে রহ., হযরত আসীম রহ., হযরত আলকামা রহ.সহ অসংখ্য তাবেঈনে কেরাম থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝ থেকে হযরত আনাছ ইবনে মালিক রাযি. এর সাথে বসরায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাযি. এর সাথে কুফায়, হযরত সাহল ইবনে সা'আদ সাঈদী রাযি. এর সাথে মদীনায় এবং হযরত আবু তুফায়েল আমর ইবনে ওয়াসেলা রাযি. এর সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ করেন ও তাদের সান্নিধ্য লাভ করেন। সমসাময়িক কালের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানিফা তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য মক্কা-মদীনাসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং প্রায় চার সহস্র উস্তাদের নিকট থেকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি আঠার বছর পর্যন্ত হযরত হাম্মাদ রহ. এর নিকট লেখাপড়া করেন। ইমাম হাম্মাদ রহ. কে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং তথায় তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন ক্রমান্বয়ে তিনি ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত লাভ করেন। তিনি হযরত হাম্মাদ রহ. এর দরসগাহের অবশিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ইমামদের নিকট যেতেন এবং তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়াদী নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রহ. যেভাবে তাদের থেকে উপকৃত হতেন তেমনিভাবে তারাও ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন। এর ফলে গোটা বিশ্বে তার ইলম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি উদ্ভাবনী মনন এবং অসাধারণ আইন প্রণয়ন প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ফিকহ শাস্ত্রকে স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদায় আসীন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধান কুরআন হাদীসের আলোকে উদ্ভাবন করতঃ ফিকহ শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করে দেন।

তার সম্পর্কে বিভিন্ন আলীম-উলামাদের উক্তি :

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন : اَلنَّاسُ فِى الْفِقْهِ عِيَالُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ ؒ 'ইলমে ফিকহে সমস্ত মানুষই ইমাম আবু হানিফা রহ. এর পরিজন তুল্য।'

ইমাম বুখারী এর উস্তাদ মক্কী ইবনে ইব্রাহীম বলেন : كَانَ اَعْلَمَ اَهْلِ زَمَانِهٖ 'তিনি তার সময়ে সর্বাধিক বড় আলেম ছিলেন'।

শকীক বলখী রহ. বলেন : كَانَ الْاِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنْ اَوْرَعِ النَّاسِ وَ اَعْلَمِ النَّاسِ وَ اَعْبَدِ النَّاسِ 'ইমাম আবু

হানিফা (তৎকালীন সময়ে) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরহেজগার, সবচেয়ে বড় আলেম এবং সর্বাধিক ইবাদতগুজারী।'

সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন : كَانَ الْإِمَامُ اَبُوْحَنِيْفَةَ اَفْقَهُ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ 'ইমাম আবু হানিফা রহ. পৃথিবীবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিকাহবিদ ছিলেন।' এভাবে অনেক ইমাম ফকীহ ও মুহাদ্দীস ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ইলম, ফিকহ ও পরহেজগারীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাকওয়া-পরহেজগারী, ইবাদত-বন্দেগী, খোদাভক্তি ও চারিত্রিক দিক থেকে ইমাম আবু হানিফা রহ. ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাই তো মক্কা-মদীনা, দামেস্ক, বসরা, মুসিল, মিসর, ইয়ামান, বাহরাইন, কুফা, বাগদাদ, জাযীরা এবং রাশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে হাজারো হাজারো ছাত্ররা তার কাছে ফিকহ-হাদীস, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা লাভের জন্য সমবেত হত এবং যথার্থ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্য থেকে অন্যতম হলেন কাজী আবু ইউসুফ রহ. ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী, যাফর ইবনে হুযায়েল আম্বরী, হাসান ইবনে যিয়াদ, হাজাম ইবনে আবদুল্লাহ বলখী, মুগীরা ইবনে মিসকাম, যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদ, মিসআর ইবনে কুদাম, সুফয়ান সাওরী, মালিক ইবনে মিগওয়াল, ইউনুছ ইবনে আবু ইসহাক, হাসান ইবনে সালিহ, আবু বকর ইবনে অয়্যাশ, ঈসা ইবনে ইউনুস, আলী ইবনে মুসাহির, হাফস ইবনে গিয়াস, আবু আসীম নাবীন, জারীর ইবনে আবদুল হামীদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ওয়াকী ইবনে জাররাহ, আবু ইসহাক ফাযারী রহ. প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম আবু হানিফা রহ. হাদীস বিষয়ে বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচিত করে তিনি কিতাবুল আছার (كتاب الاثار) ফিকহী তারতীবে বিন্যস্ত করেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. যদিও ইলমে কালাম, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, তথাপি তিনি তার জীবনে ফিকহকে খিদমত হিসাবে গ্রহন করেছিলেন। তাই তো তাকে আহলুর রায়ও বলা হত। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ইজতিহাদের পদ্ধতি ছিল যেসব বিষয়ে কুরআন সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামগণের অভিমত পাওয়া যেত না সেসব বিষয়ে তিনি কিয়াস করতেন। তবে তিনি বলতেন যদি আমার মতামতের খিলাফ কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তবে তার উপর আমল করা হবে আর আমার মতামত পরিত্যাগ হবে। ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. এর একটি চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড ছিল যারা সবাই যে কোন সমস্যার সমাধান শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে দিতেন। তারা সবাই কোন বিষয়ে একমত হলে তা লিপিবদ্ধ করা হত। আর যদি একান্ত তাদের একজনও এর ব্যতিক্রম ধর্মী মত পেশ করতেন তবে তিনদিন পর্যন্ত তা আলোচনা পর্যালোচনা করা হত। অতঃপর ঐক্যমতে পৌঁছলে তা লিপিবদ্ধ করা হত। কথিত আছে যে, এসব জমা করা মাসাইলের সংখ্যা ৬০ হাজার বা ৮০ হাজার আবার কেহ কেহ বলেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সংকলীত মাসাইলের সংখ্যাও পাঁচলক্ষ।

চারি ইমামের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রহ. সবার শীর্ষে এবং তার অনুসারীর সংখ্যাও সবচেয়ে বেশী। ইমাম আবু হানিফা রহ. শাসকবর্গ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় কাজীর পদ প্রত্যাখ্যান করলে খলীফা মানসুরের রোষানলে পড়ে কারারুদ্ধ হন। অতঃপর কারাগারেই গোপনে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ১৫০ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন। বাগদাদের খিকররান নামক বাসস্থানের পূর্ব পার্শ্বে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তাকে দাফন করা হয়। انا لله و انا اليه راجعون

ফিকহে হানাফীর বৈশিষ্ট্য :

হানাফী ফিকহ অতি সহজ-সরল হওয়ায় তার অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্য হতে কতিপয় বৈশিষ্ট্য এখানে উপস্থাপন করা হল :

১। হানাফী ফিকহে রিওয়ায়েতের সাথে দিরায়াত তথা যুক্তির সামঞ্জস্যতা রয়েছে।
২। হানাফী মাজহাব অধিক সহজ-সরল হওয়ায় তা সর্বাধিকভাবে পালনযোগ্য। তাই তো বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ মানুষ ফিকহে হানাফী-এর অনুসারী।
৩। হানাফী মাজহাবে বাস্তবজীবন ব্যবস্থার অংশ অত্যন্ত ব্যাপক সুদৃঢ় ও মজবুত।
৪। তাহযীব কৃষ্টি কালচারের দিক থেকে অন্য মাজহাবের তুলনায় হানাফী মাজহাবে তার প্রয়োজনাদী বেশী।
৫। হানাফী মাজহাব মতে রাষ্ট্র পরিচালনা সহজ। কেননা, তাতে মুসলমানদের সাথে সাথে বিধর্মীদের দাবিতে চাহিদার প্রতি লক্ষ রাখা হয়।
৬। কুরআন সুন্নাহ থেকে উদ্ভাবিত মাসআলা মাসাঈল অত্যন্ত যুক্তিসম্মত, সুদৃঢ় ও প্রমাণবহ।
৭। হানাফী ফিকহে কুরআন সুন্নাহর প্রভাবে সমম্বয় করা হয়েছে। যার ফলে প্রায় সবটিই আমলের আওতায় এসে গেছে।
৮। হানাফীদের মতে ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম হিকমতপূর্ণ ও কল্যাণকর, তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. ও অন্যান্য ইমামদের মতে শরীয়াতের বিধি-বিধান নিছক দাসানুগ, এতে কল্যাণ নেই। যেমন মদ পান, ব্যাভিচার করা, ফাসিকী এজন্য হারাম যে শরীয়াত এ থেকে মানুষকে নিষেধ করেছে। আর ভাল কাজ করা তথা দান-সহযোগিতা ইত্যাদি এজন্য ভাল যে শরীয়াত একে নির্দেশ দিয়েছে।

পক্ষান্তরে হানাফীদের মতে মদপান, ফাসিকী, শরীয়াত কর্তৃক নিষেধের পাশাপাশি সমাজ ও ব্যক্তি জীবনেও ইহা মন্দ। আর দান সহযোগিতার শরীয়াত আদেশ করার সাথে সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা কল্যাণকর।

ফিকহে হানাফীর দলীল :

ফিকহে হানাফীর দলিল হল মোট সাতটি।

১। **কিতাবুল্লাহ্ :** (কুরআন মজীদ) যা শরীয়াতের প্রদীপ্ত স্তম্ভ, কিয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকবে। শরীয়াতের সর্ব বিষয়ে তাতে كلى ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামী ফিকহের মূল উৎস। এছাড়া আর যত দলিল প্রমাণের দিক রয়েছে সবই মূলত তা থেকে উদগত।

২। **সুন্নাহ :** রাসূলুল্লাহ্ সা. এর হাদীস। পবিত্র হাদীস মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা, যা শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআনে যেভাবে শরীয়াতের প্রামাণ্য দলিল তেমনি হাদীস ও শরীয়াতের প্রমাণ্য দলিল। সুতরাং যারা হাদীস অমান্য করল তারা মূলত ইসলামকেই অমান্য করল।

৩। **আকওয়ালে সাহাবা :** অর্থাৎ পিয়ারা নবীজীর সেই পরশ সাহাবায়ে কেরামের অভিমত ও তাদের ফতোয়া, ইমাম আবু হানিফা রহ. মাসআলা মাসাইল উদ্ভাবন করতে সাহাবাদের অভিমত ও ফতোয়ার প্রতি যথার্থ গুরুত্ব দিতেন এবং তিনি তা মানাকে ওয়াজিব মনে করতেন। তাই সাহাবায়ে কেরামের অভিমতকে গ্রহন করতেন।

৪। **ইজমা :** মুসলিম জনগোষ্ঠীর মুজতাহিদীনে কেরামের শরয়ী কোন হুকুমের ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়া। ইজমার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মোল্লা জিউন বলেন,

هُوَ فِى اللُّغَةِ الْاِتِّفَاقُ وَفِى الشَّرِيْعَةِ اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِيْنَ صَالِحِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَصْرٍ وَاحِدٍ عَلٰى اَمْرٍ قَوْلِيٍّ اَوْ فِعْلِيٍّ -

ইজমার আভিধানিক অর্থ হল একমত হওয়া। শরীয়াতের পরিভাষায় একই যুগের মধ্যে মুহাম্মদ সা. এর উম্মতের নেককার মুজতাহিদগণের উক্তি বা কর্মজাতীয় কোন বিষয়ের উপর ঐক্যমত হওয়াকে ইজমা বলা হয়। সুতরাং ইজমার এ সংজ্ঞা দ্বারা বিদআতী এবং ভ্রান্ত ফিকহসমূহের লোকদের ঐক্যমতকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

কেননা, হানাফী ফকীহগণের মতে এ জাতীয় লোকদের ইজমা গ্রহনযোগ্য নয়।

ইজমার তিনটি স্তর রয়েছে—

১। **সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইজমা** : আর তা হল সাহাবায়ে কেরামের ইজমা। ইহা মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস ও দলীলের ক্ষেত্রে অকাট্য হিসেবে গণ্য।

২। **তাবিঈনগণের ইজমা** : যা গায়রে ইজতিহাদী বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা খবরে ওয়াহিদের পর্যায়ে।

৩। **কিয়াস** : কিয়াস অর্থ হল অনুমান করা। শরীয়তের পরিভাষায় কিয়াস বলা হয়— تَقْدِيْرُ الْفَرْعِ بِالْأَصْلِ فِى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ 'মূল বিষয়ের সাথে হুকুম ও ইল্লতের মধ্যে কোন শাখা বিষয়কে তুলনা করা।'

অর্থাৎ যে বিষয় সম্পর্কে কুরআন হাদীসে স্পষ্ট কোন হুকুম নেই সে বিষয়কে সে জাতীয় কোন বিষয়ের সাথে তুলনা করা যা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং কিয়াস ইসলামী শরীয়াতের প্রমাণ্য দলিল আহলুস সুন্নাহ এর সকল ইমামই কিয়াসকে ফিকহ এর উৎস হিসাবে গ্রহন করেছেন।

ইসতিহসান : উসূলে ফিকহের পরিভাষায় কিয়াস এমন দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যা কিয়াসে জলী এর বিপরীতে আসে। অর্থাৎ কিয়াসে জলীকে কিয়াসে খফী এর দ্বারা ছেড়ে দেয়াকে ইসতিহসান বলা হয়। মূলত ইসতিহসান কুরআন-সুন্নাহ, ইজমার বিরোধী কোন কিছুর নাম নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষ কিয়াসকে পরিহার করে এসবের উপর আমল করার নামই হল ইসতিহসান।

উরফ : ফিকহে হানাফীতে উরফ শরীয়াতের সহকারী উৎস হিসাবে স্বীকৃত। যখন কোন সমস্যার সমাধান কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস দ্বারা সম্ভবপর নয়, তখনই ইসতিহসান বা উরফের ভিত্তিতে সমাধান পেশ করা হয়। উরফ দুই প্রকার :

১। উরফে সহীহ : যা 'নস' এর পরিপন্থী নয়।

২। উরফে ফাসিদ : যা 'নস' এর পরিপন্থী।

উল্লেখিত সাঁতটি বিষয়ই হল হানাফী মাযহাবের ফিকহ উদ্ভাবনের মূল উৎস। তবে প্রথমোক্ত চারটি হল ফিকহে ইসলামির মূল উৎস। আর বাকী তিনটি হল সহকারী উৎস। এসবের উপরই ভিত্তি করে ফিকহে হানাফীর কিতাবাদী রচনা ও সংকলন করা হয়েছে। ফিকহে হানাফীর কোন দলীল প্রমাণ এক কথায় কোন কথাই উক্ত দলিলসমূহের বাহিরে নয়। বিশেষত কুরআন হাদীসের বাহিরে নয়।

তাকলীদ : পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা :

'তাকলীদ' تقليد শব্দটি تفعيل থেকে নির্গত, যার অর্থ গলায় মালা বা হার পরিয়ে দেওয়া, গ্রহণ করা, দায়িত্ব নেয়া, উলামায়ে কেরামের মতে তাকলীদ হল-اَلْعَمَلُ بِقَوْلِ إِمَامٍ مُجْتَهِدٍ مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةِ دَلِيْلٍ দলীল প্রমান খোঁজ করা ব্যতীত কোন মুজতাহিদ ইমামের কথা অনুযায়ী আমল করাকে তাকলীদ বলা হয়। অর্থাৎ মুকাল্লিদ নিজ ইমামের সকল উদ্ভাবিত বিষয়াদির অনুসরণ করবে তবে প্রমাণাদির ব্যাপারে এতটুকু আস্থাশীল হবে যে, অবশ্যই আমরা ইমামের নিকট তার দলীল প্রমাণ আছে। তবে হা নিজ ইমামের অনুসৃত বিষয়াদির প্রমাণ খোঁজ করা তাকলীদের পরিপন্থী কাজ নয়। ইসলামী শরীয়াতের মূল উৎস হল কুরআন, হাদীস। পরবর্তীতে ফুকাহায়ে ইসলামগণ কুরআন সুন্নার আলোকে আর দুটি উৎস উদ্ভাবন করেছেন। আর তা হল ইজমা ও কিয়াস। আর এই দলিল চতুষ্টয়ের উপর ভিত্তি করে মুজতাহীদগণ ইসলামী শরীয়াতের বিভিন্ন মাসআলা-মাসাইল উদ্ভাবন করেছেন। কুরআন হাদীস এক ও অভিন্ন। এতদসত্তেও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিভিন্ন মুজতাহিদগণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য থাকার দরুন মুজতাহিদ ইমামগণের সিদ্ধান্তে বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। যার দরুন পৃথিবীতে বিভিন্ন মাজহাবের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীতে সেসব মাযহাবের মধ্যে চারটি মাযহাবের উপর মুসলিম উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহল—

১। হানাফী। ২। শাফেয়ী। ৩। মালেকী। ৪। হাম্বলী।

সুতরাং এই চার মাযহাবের যেকোন একটির তাকলীদ করে নিলে কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল হয়ে যায়।

ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা :

কুরআন-হাদীসের মর্ম দু শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। শরীয়াতের বিধান আরোপের বেলায় যেসব দলিল প্রমাণ অকাট্য ও স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তার মর্ম উদ্ধারে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা দন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। এবং এসবের হুকুমাদী সবাই কুরআন হাদীস হতে উদ্ধার করতে সক্ষম। যেমন নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরজ হওয়া এবং চুরি, ডাকাতী, ব্যভিচার ইত্যাদি হারাম হওয়া। কাজেই এরকম আয়াত বা হাদীসের মর্ম অনুধাবন করতে ইজতিহাদ ও তাকলীদের কোন প্রয়োজন নেই।

২। এমন সব দলীল প্রমাণাদী যাতে বাহ্যত কোন না কোন অস্পষ্টতা বা কোনরূপ দন্দ্ব সন্দেহ ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে। সেসব বিধানাবলীর জন্য আলোচ্য দলিল কোন অর্থে বা তার কোন মর্ম এখানে উদ্দেশ্য তা নিরূপনে ইজতিহাদ প্রয়োজন। আর এ ইজতিহাদ সাধারণত মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেননা, এ সবের মর্ম সাধারণ মানুষ তার বিবেক দ্বারা করতে গেলে মারাত্মক ভ্রান্তির আশংকা রয়েছে। আর এতে গিয়ে ইসলামের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদের অনুসরণে সে আশংকা নেই। এজন্যই ইমাম চতুষ্টয়ের কোন এক জনের অনুসরণ করাকে অপরিহার্য করে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে হা ইমামের অনুসরণ মানে কুরআন হাদীস ত্যাগ করা নয়। বরং কুরআন হাদীসের উপর পূর্ণরূপে আমলের জন্যই কুরআন হাদীস বিশেষজ্ঞগণ ব্যাখ্যাকার হিসেবে তাদের অনুসরণ করা। পক্ষান্তরে যারা তাকলীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন তারাও মূলত কারো না কারো অনুসরণ করছেন। কেননা, হাদীস সহীহ, যয়ীফ, মুনকার ইত্যাদি পরিচয় করতে হলে পূর্বেকার হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতামত অবশ্যই গ্রহন করতে হবে। সুতরাং যদি হাদীস সহীহ নাকি যয়ীফ এসব বিষয়ে পূর্বেকার বিশেষজ্ঞদের অনুসরণ করা যায়, তবে ফিকহের ব্যাপারে ইমামদের অনুসরণ করা যাবে না কেন। বস্তুত তাকলীদ দু' প্রকার। ১। তাকলীদে মুতলাক। ২। তাকলীদে শাখসী। তাকলীদে মুতলাক বলা হয় নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ না করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইমামের মতের অনুসরণ করা। আর তাকলীদে শাখসী হল শরীয়াতের সার্বিক ব্যাপারে, সকল মাসআলায় যে কোন একজন ইমামের অনুসরণ করা। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ সা. এর জীবিতাবস্থায় কোন তাকলীদ ছিল না। কেমনা, সবাই রাসূলুল্লাহ্ সা. এর অনুসরণ সর্বক্ষেত্রে করতেন। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাকলীদ ও ইজতিহাদের সূচনা হয় এবং তাদের মাঝে তাকলীদে মুতলাকই প্রচলিত ছিল। পর্যায়ক্রমে তাবেঈনদের যুগে তাকলীদে শাখসীর সূচনা হয়। যা তাকলীদে মুতলাকেরই শেষ পর্যায়। বর্তমান তাকলীদ বলতে তাকলীদে শাখসী তথা হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী বুঝানো হয় এবং এর কোন একটির অনুসরণের উপর মুসলিম উম্মাহ ইজমা সংগঠিত হয়েছে। তাই শরীয়াত মুতাবিক জীবন পরিচালনার জন্য কোন না কোন এক ইমামের অনুসরণ একান্তভাবে অপরিহার্য। কেননা, মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ

'তোমরা যদি না জান তবে আল্লাহ প্রেরিত কিতাবের জ্ঞান যাদের আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।' উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা জানে না তারা জ্ঞাত তথা আলীম-উলামাদের জিজ্ঞাসা করে তার উপর আমল করবে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা তাকলীদের অপরিহার্যতা ও আবশ্যকতা প্রমাণিত হল। আর তাকলীদে শাখসীর গুরুত্ব ও আবশ্যকতা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় তা হল রাসূল সা. বলেন—

اِنِّیْ لَا اَدْرِیْ مَا بَقَائِیْ فِیْكُمْ فَاقْتَدُوْا بِالَّذِیْنَ مِنْ بَعْدِیْ اَبِیْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ

আমি জানি না যে কতদিন পর্যন্ত তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান থাকবে। সুতরাং তোমরা আমার পরে এই দুই জনের অনুসরণ করবে। অর্থাৎ, আবু বকর রাযি. ও উমর রাযি. এর। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সা. ইঙ্গিত করেছেন যে, তার তিরোধানের পর পর্যায়ক্রমে তারা দুজন খলিফা হবেন। এবং তখন শুধু যিনি খলিফা হবেন তিনিকেই অনুসরণ করতে হবে। আর এ হাদীস দ্বারা তাকলীদে শাখসী প্রমাণিত হল। অপর দিকে তাকলীদে শাখসীটি যুক্তি দ্বারাও প্রমাণিত। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের যুগে যা নবীজী সা. এর যুগের কাছাকাছি বিধায় তাদের ভেতর প্রবৃত্তির অনুসরণ করতেন না। বরং যখন যে বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন, তখন তারা সে সিদ্ধান্তকে গ্রহন করতেন। তবে পরবর্তীতে তথা তৃতীয় শতাব্দীতে মানুষের মাঝে প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সুবিধা মত নিজ নিজ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মাসআলার বিভিন্ন ইমামের মতামতকে গ্রহন করার ব্যাপক তা বৃদ্ধি পায় তাই চতুর্থ শতাব্দীর ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা সংঘটিত হয় এ কথার উপর যে তাকলীদে মুতলাক রহিত এবং তাকলীদে শাখসী চার ইমামের নির্দিষ্ট কোন এক ইমামের করা ওয়াজিব। তখন থেকেই তাকলীদে শাখসী অদ্যাবধি চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চলতে থাকবে।

ফকীহ ও মুজতাহিদদের প্রকারভেদ :

আল্লামা শামছুদ্দীন ইবনে কামাল পাশা রহ. বলেন, ফকীহ ও মুজতাহিদ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। (مُجْتَهِدٌ فِی الشَّرْعِ) মুজতাহিদ ফিশ শরীয়াত। তাদেরকে مُجْتَهِدٌ مُسْتَقِلٌّ ও مُجْتَهِدٌ مُطْلَقٌ ও বলা হয়। তারা হলেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং তাদের যুগের আরো কতিপয় ইমাম।

২। مُجْتَهِدٌ فِی الْمَذْهَبِ মুজতাহিদ ফিল মাযহাব। তাদেরকে مُجْتَهِدٌ مُنْتَسِبٌ ও বলা হয়। তারা হলেন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ইমাম যুফার, ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ প্রমুখ।

৩। (مُجْتَهِدٌ فِی الْمَسَائِلِ) মুজতাহিদ ফিল মাসাঈল। তারা হলেন ইমাম কারখী, ইমাম সারখসী রহ. প্রমুখ।

৪। (اَصْحَابُ التَّخْرِيْجِ) আসহাবুত তাখরীজ। তারা হলেন ইমাম আবু বকর রাযী, শায়েখ বুরহানুদ্দীন মুরগেনানী রহ.।

৫। (اَصْحَابُ التَّرْجِيْحِ) আসহাবুত্তারজীহ। তারা হলেন ইমাম আবুল হাসান আহমদ ইবনে আবু বকর মুহাম্মদ রহ. প্রমুখ।

৬। (اَصْحَابُ التَّمْيِيْزِ) আসহাবুত্তাময়ীয। তারা হলেন ওয়াকায়া, কানয এবং মুখতার ইত্যাদি গ্রন্থের গ্রন্থকার বৃন্দ।

৭। (مُقَلِّدِيْنَ مَحْضٌ) মুকাল্লিদীনে মাহাজ। যারা উপরে উল্লেখিত যোগ্যতা থেকে কোনটারই অধিকারী নয়, বরং চার ইমামের কোন একজনের মুকাল্লিদ। সুতরাং তাদের নিজস্ব মতামতের কোন গ্রহনযোগ্যতা নেই।

ফিকহে হানাফীর কতিপয় পরিভাষা :

শরীয়াতের দৃষ্টিকোণে মুসলমানের কাজগুলো প্রথমত দুভাগে বিভক্ত : ১। মাশরূ (مشروع) অর্থাৎ শরীয়াত কর্তৃক অনুমোদিত এবং তা সাত প্রকার :

প্রথম : ফরজ অবশ্যই পালনীয়। যা দলীল কাতঈ তথা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং ফরজ অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে। আর তা তরককারী ফাসীক বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে ফরজ দু প্রকার : ১। ফরজে আইন যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। ফরজে কিফায়া যা আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ নয়, বরং কিছু সংখ্যক মানুষ তা আদায় করলে চলবে।

দ্বিতীয় : ওয়াজিব। ওয়াজিবও ফরজের ন্যায় আদায় করা অবশ্য পালনীয়। যা দলীলে সুন্নী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাই তা অস্বীকারকারী কাফের হবে না।

তৃতীয় : সুন্নাত। ফরজ বা ওয়াজিব ছাড়া দ্বীনের যে সকল কাজ রাসূলুল্লাহ্ সা. নিজে করেছেন বা করার নির্দেশ করেছেন, অথবা অন্য কোন সাহাবার কাজে অনুমোদন করেছেন। শরীয়াতের পরিভাষায় তাকে সুন্নাত বলা হয়। এছাড়াও খুলাফায়ে রাশেদীন যেসকল কাজ প্রত্যাবর্তন করেছেন তাও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. তার অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন—

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ -

তোমাদের উপর আবশ্যকীয় হল আমার সুন্নাত এবং হিদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা। উল্লেখ্য যে, সুন্নাত দু প্রকার। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আর তা হল যেসব আমল রাসূলুল্লাহ্ সা. ইবাদাত হিসাবে নিয়মিত করেছেন। তবে কখনো ওজর বশত ছেড়ে দিয়েছেন। সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা আর তা হল যেসব আমল রাসূলুল্লাহ্ সা. ইবাদাত হিসাবে নিয়মিত করেছেন তবে কখনো ওজর ছাড়াও ছেড়ে দিয়েছেন।

চতুর্থ : মোস্তাহাব। আর তা হল যেসব কাজ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সা. কখনো কখনো সাহাবাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। (মুস্তাহাব) مستحب (নফল) نفل (মানদুব) مندوب এবং تطوع তাতাউও বলা হয়।

পঞ্চম : হারাম আর তা হল যেসব কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং তা অস্বীকারকারী কাফির বলে গণ্য হবে।

ষষ্ঠ : মাকরূহে তাহরীমী। যেসব কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

সপ্তম : মাকরূহে তানযীহী। যেকাজের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি শরীয়াতের দৃঢ়তার সাথে প্রমাণিত নয়, বরং যা বর্জন করলে ছওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু করলে শাস্তিযোগ্য হবে না।

অষ্টম : মুবাহ যা করাতে কোন গুনাহ নেই এবং ছেড়ে দেওয়াতেও কোনরূপ গুনাহ নেই।

কানযুদদাক্বায়িক্ব গ্রন্থের সম্মানিত লেখকের জীবন চরিত

নাম বংশ ও জন্মস্থান : নাম আবদুল্লাহ্‌ উপনাম আবুল বারাকাত। পিতা আহমদ এবং দাদার নাম মাহমুদ। তবে তিনি হাফেজ উদ্দীন নাসাফী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি তুর্কিস্থানের নাসফ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তার নামের শেষে নাসাফী সম্বন্ধ যুক্ত হয়।

জ্ঞানার্জন : ইমাম নাসফী রহ. সে যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দীস শামছুল আইম্মা আল্লামা মুহাম্মদ বিন আবদুস সাত্তার কুরদী রহ. আল্লামা হামীদ উদ্দীন আস-যারীর রহ. এবং আল্লামা বদরুদ্দীন খাহির যাদা রহ. প্রমুখ মহামান্য ব্যক্তি বর্গের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন।

ইমাম নাসাফী রহ. এর ফেকহী যোগ্যতা : তিনি তাহার যুগের প্রখ্যাত ইমাম ও অদ্বিতীয় আলেম ছিলেন। তিনি ফিকহ ও উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে মুজতাহিদ সুলভ শানের অধিকারী বলিয়া গণ্য হতেন। এবং হাদীস ও হাদীস বিষয়ক শাস্ত্রসমূহের অবিসম্বাদিত ইমাম হিসাবে খ্যাত ছিলেন। আল্লামা ইবনে কামাল পাশা রহ. তাকে ফুকাহাদের ৬ষ্ঠ স্তরে গণনা করেছেন। যারা روايت ضعيفه (দুর্বল বর্ণনা) সমূহকে روايت قوية (শক্তিশালী বর্ণনা) সমূহ থেকে পৃথক করেন।

আবার কেহ কেহ সম্মানিত গ্রন্থকারকে মুজতাহিদ ফিল মাজহাব হিসাবে গণ্য করেন। যেভাবে সাধারণত ইজতেহাদের দরজা ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে শেষ হয়েছে তদ্রূপ ইজতিহাদ ফিল মাজহাব তার উপর শেষ হয়ে গেছে। সর্বপরি তিনি ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত মহান ইমাম ও জাতীয় কল্যাণের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তাকওয়া

রহেজগার ও ইসতেগনায়ও তিনি ছিলেন উজ্জল ধ্রুব নক্ষত্র স্বরূপ।

রচনাবলী : গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী, যা তার বিভিন্ন রচনাবলী থেকে স্পষ্ট টে উঠে। তিনি উম্মতে মুসলিমার উপকারার্থে উসূলে ফিকহ ফিকহ ও আকাঈদ শাস্ত্রসহ অন্যান্য বেশ শাস্ত্রের নেক গ্রন্থ রচনা করে আমাদের কৃতার্থ করেন। তা থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণ্য মতন কানযুদদাকাইক ন্যতম। দ্বিতীয় উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে চির অমর গ্রন্থ আল মানার অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং তার একখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ াশফুল আসরার যা বিপুল তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ একটি কিতাব বলে সর্বমহলে প্রশংসিত। এছাড়াও তিনি দারিকুত তানযীল ওয়া হাক্বাইকুত তাবীল, ওয়াফী এবং উহার শরাহ, কাফী, উমদা, আক্বীদাতু আহলিস সুন্নতি য়াল জামাত প্রভৃতি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাহার রচনাসমূহের গ্রহনযোগ্যতার অনুমান ইহা দ্বারা অতি সহজেই করা াতে পারে যে, সেইগুলির অধিকাংশই আজ শত শত বৎসর ধরে আরব ও আজমের ইসলামী বিদ্যাপিঠসমূহের াঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কানযুদ দাকাইকের প্রসিদ্ধতা : কানযের মত সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের কিতাব যা আজ বড় বড় অক্ষরে বিশদ াখ্যার সাথে দেখা যায় যা মনে হয় অনেক বড় কিতাব, কিন্তু যদি তা আজকের পত্রিকার লেখার ন্যায় ছোট াট অক্ষরে লিখা হয় তবে নিতান্ত একটি ছোট পাণ্ডুলিপির ন্যায় হবে। তবে আমাদের পূর্বসূরীরা তার অনেক াখ্যা বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করে সম্মানিত গ্রন্থকারের কানযকে যথার্থ হিসাবে প্রকাশ করেছেন। অপর দিকে এত ংক্ষিপ্ত গ্রন্থে লিখা যা এক দু লাইনে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা-ই অন্যান্য ফিকহী কিতাবে দশ পনের লাইনে পিবদ্ধ করেছেন। যা লিখকের অনন্য অবদান। গ্রন্থকার রহ. তার অনবদ্য কিতাবখানাতে ফিকহী মাসআলা সাইলের পূর্ণ ধারাবাহিকতার সাথে সাথে মৌলিক বিষয়াদির যে নিপুনতার পরিচয় দিয়েছেন তা অনস্বীকার্য। ই তো গ্রন্থনার সময় থেকে অদ্যবধি সর্বদা কলম সৈনিকদের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হয়েছে। এবং বিভিন্ন স্ত্রের বিশেষজ্ঞরা যেমন হযরত যাঈলয়ী রহ., হযরত আঈনী রহ., হযরত হালভী রহ., হযরত মুকাদ্দাসী রহ. ও রত কিরবানী রহ. প্রমুখগণ তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখে গ্রন্থকার ও তার কিতাবের যথার্থ মূল্যায়ন ও সমাদৃত করেন। শেষত হযরত আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী এর 'البحر الرائق ، كشف مغلقات' (যা কানযুদদাকাইক কিতাবের াখ্যা) কানজের গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থটিই যথেষ্ট।

মৃত্যু : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. পৃথিবীর মুসলিম জাতীর জন্য বহুবিদ খিদমত আঞ্জাম দিয়ে মহান প্রভূর ন্নিধ্যে তারই ডাকে তার কাছে চলে যান, তবে তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে শেখ তাওয়াম দীন ইতক্বানী ও মুল্লা আলীকারী রহ. এর মতে তিনি ৭১০ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। কেহ কেহ তার মৃত্যু রিখ ৭১০ হিজরীও বলেন।

الاصل فى بيان الوصل والفصل। নামক গ্রন্থে স্বীয় লিখক তার মৃত্যু তারিখের ব্যাপারে ৭১০ হিজরীর পরে ়ণ করেছেন। শেখ হুময়ী রহ. তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে মাওসুফের মৃত্যু তারিখ ৭১১ হিজরী সনের রবিউল আউয়ালের ান এক জুমার রাত্রে বলে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইতকানী রহ. মৃত্যু স্থান شهر ايذج ইজয নামক শহরে এবং ل। আল জালাল নামক স্থানে কবরস্থ করার কথা উল্লেখ করেছেন।

والله اعلم بحقيقة الحال

(মা'দিনুল হাকাইক পৃ: ৬৮)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعَزَّ الْعِلْمَ فِى الْاَعْصَارِ وَ اَعْلٰى حِزْبَهٗ وَالْاَنْصَارَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْمُخْتَصِّ بِهٰذَا الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهِ الَّذِيْنَ فَازُوْا مِنْهُ بِحَظٍّ جَسِيْمٍ -

অনুবাদ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি ইলমে দ্বীনকে সর্বযুগেই সম্মানিত করেছেন এবং আহলে ইলম ও তার সাহায্যকারীদের মর্যাদা আরো সমুন্নত করেছেন। অফুরন্ত সালাত বর্ষিত হউক আল্লাহর রাসূল সা. এর উপর, যাকে এমহান মর্যাদার সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে ও তার পরিবারবর্গের উপর যারা তার বিশাল সৌভাগ্যের দ্বারা সফল হয়েছেন।

শব্দার্থ : اَعَزَّ - افعال থেকে اِعْزَازًا - সম্মানিত করা, মর্যাদা দেয়া, শক্তিশালী করা। اَلْاَعْصَارُ - ইহা عَصْرٌ ব.ব. অর্থ- যুগ, কাল, উক্ত শব্দে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হল فَعْلٌ এর ব.ব. اِفْعَالٌ এর ওজনে شاذ যুক্তির চাহিদা হল اَفْعَلُ এর ওজনে হওয়া। তবে কেন গ্রন্থকার এর বিপরীত করলেন। এর জবাব হল যখন جمع قلت টি الف لام استغراقى হয় তখন তা جمع كثرت এর সমান হয়ে যায়। বিধায় افعال এর ওজনে ব্যবহার করাতে কোন সমস্যা নেই। اعلى افعال থেকে إعْلَاءً উপরে উঠানো, উর্ধ্বে তোলা, উন্নত করা। اَحْزَابٌ (ج) حِزْبٌ - দল, সজ্ঞ, সংগঠন, اَلْاَنْصَارُ - সাহায্যকারীগণ। اَلْمُخْتَصُّ (م) مُخْتَصَّةٌ - বিশেষ, নির্দিষ্ট। اَلْفَضْلُ الْعَظِيْمُ - মহান ফযীলত, মহান কৃতিত্ব। فَازُوْا (ن) فَوْزًا - সফল হওয়া, কৃতকার্য হওয়া। حَظٌّ (ج) حُظُوْظٌ - ভাগ, অংশ, সৌভাগ্য। جَسِيْمٌ (ج) جِسَامٌ - বিরাট, বিশাল, স্থুলকায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

গ্রন্থকার রহ. স্বীয় গ্রন্থখানা بسملة ও حمدلة দ্বারা আরম্ভ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা : **পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করে**। কেননা, কুরআনে পাকে আল্লাহর নামে পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। যেমন- اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ 'পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'

অপর দিকে কালামে মাজীদ সূচনা করা হয়েছে بسم الله ও حمد لله দ্বারা। **পবিত্র হাদীসের অনুসরণার্থে**। কেননা, হাদীসে এসেছে كُلُّ كَلَامٍ لَايُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ اَجْزَمُ প্রত্যেক বাক্য যা আলহামদুলিল্লাহ ছাড়া শুরু হয় তা বরকতহীন হয়ে থাকে। অন্যত্র এসেছে—

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِسْمِ اللهِ فَهُوَ اَقْطَعُ -

যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যদি আল্লাহর নামের সাথে শুরু না করা হয়, তবে তা বরকতহীন হয়ে যায়। সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. কুরআন হাদীসের অনুসরণের সাথে সাথে সলফে সালেহীন যারা তাদের কিতাবাদী রচনার শুরুতে بسملة ও حمدلة দ্বারা শুরু করেছেন। তাদেরও অনুকরণে তিনি তার কিতাব بسملة ও حمدلة দ্বারা শুরু করেছেন।

قوله : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الخ : الحمد لله এর الف ও لام বর্ণটি جنس - সুতরাং তার অর্থ দাড়াল جنس حمد তথা সকল প্রকার حمد (প্রশংসা) আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট অথবা استغراق এর জন্য।

حمد এর শাব্দিক অর্থ : প্রশংসা করা, আর পরিভাষায় حمد বলা হয়-

هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلٰى جَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِىْ نِعْمَةً كَانَ اَوْ غَيْرَهَا -

ইখতিয়ারী সৌন্দয্যের উপর মৌখিকভাবে আল্লাহর প্রশংসা করা, চাই তা নিয়ামতের বিপরীত হউক বা না হউক।

قوله : لِلّٰهِ : বিশুদ্ধ বর্ণনামতে আল্লাহ শব্দটি আরবী, যদিও কারো কারো মতে তা ইবরানী বা সুরয়ানী। আবার তা عَلَم না কি صفت এনিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। যারা বলেন তা علم তাদের মধ্যে থেকেও দুটি মতামত রয়েছে। কেহ কেহ বলেন তা مشتق আবার কেহ কেহ বলেন তা جامد আর ইহাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আল্লামা তাফতাযানী রহ. তার রচিত শরহে তাহযীবে আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন—

اَللّٰهُ عَلَمٌ عَلٰى اَصَحِّ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوَجُوْدِ الْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِ -

বিশুদ্ধ মতানুসারে আল্লাহ শব্দটি ঐ চিরন্তন যাতের সত্তা বাচক নাম, যার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী এবং যিনি সমস্ত প্রশংসা ও উত্তম গুণাবলী দ্বারা মন্ডিত।

قوله : اَعَزَّ الْعِلْمِ الخ : اعز العلم দ্বারা علم شرائع তথা علم فقه উদ্দেশ্য। কেননা, গ্রন্থকার রহ. এর লক্ষই হল ইলমে ফিকহে নিয়ে সামনে আলোচনা করা। সুতরাং اعزاز علم দ্বারা উদ্দেশ্য প্রত্যেক অন্বেসী ও আমলকারীর অন্তরে ইলমে ফিকাহ এর সম্মান, মর্যাদা পরিপূর্ণ প্রবিষ্ট হওয়া। তাহলে সামনের আলোচিত বিষয়াদী তথা মাসআলা মাসাইলের জ্ঞান লাভ করতে আগ্রহী হবে।

قوله : وَاَعْلٰى حِزْبَهٗ الخ : গ্রন্থকার রহ. اَعْلٰى শব্দটি প্রয়োগ করে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তা হল এই— وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ 'তোমরাই বিজয়ী হবে যদি মুমিন হও। অন্যত্র রয়েছে—

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُتُو الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ -

আল্লাহ তা'আলা মুমিন ও আলিমদের মর্যাদাকে উন্নত করেছেন। সুতরাং এখানে- اَعْلٰى حِزْبِهٖ দ্বারা কুরআন ও হাদীসের পান্ডিত্য অর্জনকারী জ্ঞানী সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। যারা কুরআন হাদীস থেকে অসংখ্য অগণিত মাসআলা মাসাঈল বের করে ইসলামী বহু মৌলিক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন, বর্তমানে যারা ফকীহ নামে খ্যাত, ইলমে দ্বীন ভিন্ন অন্যান্য ইলমের ক্ষেত্রে আল্লামা রুমী রহ. বলেন—

علم دین فقہ ست و تفسیر و حدیث * ہر کہ خواند جز ازیں گردد خبیث

ইলমে দ্বীন হল হাদীস তাফসীর ও ফিকাহ। এগুলো ছাড়া যে অন্য কোন ইলম চর্চা করে সেই (খবিছ) খারাপ।

অতঃপর انصار দ্বারা উদ্দেশ্য এমন আমীর উমারা যারা স্বীয় সামর্থানুযায়ী আহলে ইলমদের সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

قوله : والصَّلٰوةُ الخ : صلوة শব্দের ব্যবহার গত চারটি অর্থ রয়েছে। (১) اَلصَّلٰوةُ مِنَ اللّٰهِ রহমত, দয়া, অনুগ্রহ। (২) اَلصَّلٰوةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ইস্তেগফার, ক্ষমা প্রার্থনা করা। (৩) اَلصَّلٰوةُ مِنَ النَّاسِ দোয়া। (৪) اَلصَّلٰوةُ مِنَ الطُّيُوْرِ وَ غَيْرِهَا তাসবীহ। সুতরাং রহমত, ইস্তেগফার, দোয়া, তাসবীহ সবটিই صلوة এর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তাই সম্মানের দিক বিবেচনা করলে صلوة শব্দটি বিভিন্ন অর্থবোধক। উল্লেখ্য যে, সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. صلوة শব্দের সাথে سلام শব্দটি উল্লেখ করেন নি। যার কারণ হল, পাঠকদের একথা বুঝানো যে, صلوة শব্দের সাথে سلام শব্দ উল্লেখ না করা মাকরূহ নয়। যেমনটি কিছু কিছু উলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত। মূলত মাকরূহ হওয়া বা না হওয়ার সম্পর্ক মুখে উচ্চারণের সাথে সম্পৃক্ত। লিখার সাথে নয়। হতে পারে গ্রন্থকার রহ. সালাম মুখে বলেছেন। আর صلوة মুখে বলা ও লিখার দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

قوله : وَ عَلٰى اٰلِهٖ الخ : গ্রন্থকার রহ. রাসূল সা. এর পরিবার পরিজনের উপর দরূদ পড়তে على কে ব্যবহার করে শীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। কারণ, তারা নবীজী পরিবারের প্রতি দরূদ পড়াকে নাজায়েয মনে করে।

قَالَ مَوْلَنَا حِبْرُ النَّحْرِيْرِ مُحْرِزُ قَصَبَاتِ السَّبَقِ فِى التَّقْرِيْرِ وَ التَّحْرِيْرِ عَلَمُ الْهُدٰى عَلَّامَةُ الْوَرٰى مَالِكُ اَزِمَّةِ الْفُتْيَا مُظْهِرُ كَلِمَاتِ اللهِ الْعُلْيَا كَشَّافُ الْحَقَائِقِ مُبَيِّنُ الدَّقَائِقِ سُلْطَانُ عُلَمَاءِ الشَّرْقِ وَالصِّيْنِ حَافِظُ الْحَقِّ وَالْمِلَّةِ وَالدِّيْنِ وَارِثُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ اَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَبْنِ مَحْمُوْدِ النَّسَفِى مَتَّعَ اللهُ الْمُقْتَبِسِيْنَ بِدَوَامِ بَقَائِهٖ لَمَّا رَأَيْتُ الْهِمَمَ مَائِلَةً اِلَى الْمُخْتَصَرَاتِ وَ الطِّبَاعَ رَاغِبَةً عَنِ الْمُطَوَّلَاتِ اَرَدْتُ اَنْ اُلَخِّصَ الْوَافِىْ بِذِكْرِ مَا عَمَّ وُقُوْعُهٗ وَ كَثُرَ وُجُوْدُهٗ لِتَتَكَثَّرَ فَائِدَتُهٗ وَ تَتَوَفَّرَ عَائِدَتُهٗ -

---

অনুবাদ : মাওলানা অভিজ্ঞ পন্ডিত, রচনা ও বক্তব্যের জগতে শীর্ষস্থান অধিকারকারী, হিদায়াতের ঝান্ডা, সৃষ্টি জগতের সুবিজ্ঞ, ফাতাওয়ার তত্ত্বাবধানদের অধিপতি, আল্লাহর সুউচ্চ বাণী প্রস্ফুটিতকারী, (حقائق) প্রকৃত অবস্থাসমূহের উদ্ভাবক, (دقائق) সূক্ষ্মসমূহের স্পষ্টকারী, পূর্ব ও পশ্চাত্যের উলামাদের সম্রাট, ধর্ম ও জাতির হাফিজ, নবী ও রাসূলগণের প্রকৃত উত্তরসূরী আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন মাহমুদ আননাসাফী বলেন, (আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান অন্বেশণকারীদেরকে তার দীর্ঘায়ু দ্বারা উপকৃত করুন) যখন দেখলাম হিম্মতসমূহ সংক্ষিপ্তের দিকে আকৃষ্ট এবং স্বভাব দীর্ঘায়িত থেকে অনাগ্রহী, তখন ইচ্ছা করলাম ওয়াফী কিতাবের সংক্ষিপ্ত করতে এমন কিছু বিষয়াদী উল্লেখের মাধ্যমে যার সংগঠন ব্যাপক ও অস্তিত্ব বহুল যেন তার উপকার বেশী হয় এবং মুনাফা পরিপূর্ণ হয়।

শব্দার্থ : اَلْحِبْرُ (ج) اَحْبَارٌ - শিক্ষিত লোক, পন্ডিত। اَلنَّحْرِيْرُ (ج) نَحَارِيْرُ- দক্ষ, অভিজ্ঞ। مُحْرِزٌ - ইহা اسم فاعل যা افعال থেকে احراز সংরক্ষণ করা, হেফাজত করা। قَصَبَاتٌ ইহা قَصَبَةٌ এর ব.ব., অর্থ- ঐ ছোট তীর যা দৌড় প্রতিযোগিতার মাঠের শেষ প্রান্তে পুতিত থাকে। এজন্য যে যিনি অগ্রগামী হবেন তিনিই তা উঠাবেন। اَلسَّبَقُ - অগ্রবর্তীতা, পূর্ববর্তীতা। اَلتَّقْرِيْرُ - প্রতিবেদন, রিপোর্ট। اَلتَّحْرِيْرُ - রচনা, সম্পাদনা। عَلَمٌ (ج) اَعْلَامٌ - পতাকা, ঝান্ডা, বিশিষ্ট ব্যক্তি। اَلْهُدٰى হিদায়াত, পথ প্রদর্শন। عَلَّامَةٌ - মহা জ্ঞানী, সুবিজ্ঞ। اَلْوَرٰى সৃষ্টিজগত। اَزِمَّةٌ - ইহা زِمَامٌ এর ব.ব., অর্থ- লাগাম, তত্ত্বাবধান। فُتْيًا (ج) فَتَاوِى - ফতোয়া, রায়। مُظْهِرٌ - ইহা اسم فاعل - افعال থেকে اِظْهَارًا প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা। كَشَّافٌ (ج) كَشَّافُوْنَ - আবিস্কারক, উদ্ভাবক, স্কাউট (scout)। اَلْحَقَائِقُ ইহা حَقِيْقَةٌ এর ব.ব. অর্থ বাস্তবতা, প্রকৃত অবস্থা। مُبَيِّنٌ - ইহা اسم فاعل - تفعيل থেকে تَبْيِيْنٌ - প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা। اَلدَّقَائِقُ ইহা دَقِيْقٌ এর ব.ব., সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র। سُلْطَانٌ (ج) سَلَاطِيْنُ -সুলতান, সম্রাট। حَافِظٌ - রক্ষক, হিফাজতকারী, পরিভাষায় হাফিজ বলা হয়, যার জ্ঞান একলক্ষ্য হাদীসকে বেষ্টন করে। اَلْمِلَّةُ (ج) مِلَلٌ - মিল্লাত, জাতি, ধর্ম। وَارِثٌ (ج) وَارِثُوْنَ উত্তরাধিকারী, বংশধর। مَتَّعَ - تفعيل থেকে تَمْتِيْعًا - উপভোগ করানো, উপকৃত করা। مُقْتَبِسِيْنَ ইহা مُقْتَبِسٌ এর ব.ব., افتعال থেকে اِقْتِبَاسٌ - লাভ করা, সংগ্রহ করা। اَلْهِمَمُ ইহা هِمَّةٌ

এর ব.ব. অর্থ ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আকাঙ্খা। مَائِلَةٌ (م) مَائِلٌ - আকৃষ্ট, আগ্রহী, প্রবণ। اَلْمُخْتَصَرَاتُ ইহা مُخْتَصَرَةٌ এর ব.ব. সংক্ষিপ্ত, সংক্ষেপিত, সার-সংক্ষেপ। اَلطِّبَاعُ - প্রকৃতি, স্বভাব, মেজাজ। رَاغِبَةٌ - আগ্রহী, কামনাকারী, ইচ্ছুক। اَلْمُطَوَّلَاتُ - ইহা مُطَوَّلٌ এর ব.ব., অর্থ- দীর্ঘায়িত, বিস্তৃত, বিস্তারিত। اَلْخِصُ - تفعيل থেকে تَلْخِيصًا সংক্ষিপ্ত করা, সারাংশ নির্ণয় করা। عَمَّ (ن) عُمُوْمًا - ব্যাপক হওয়া, সাধারণ হওয়া। وُقُوْعٌ সংঘটন, উপবেশন। عَائِدَ (ج) عَوَائِدُ মুনাফা, উপকার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قَالَ مَوْلَنَا الْحِبْرُ الخ থেকে بِدَوَامِ بَقَائِهِ পর্যন্ত ইবারত মূল গ্রন্থকার তথা আল্লামা আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন মাহমুদ আননাসাফী রহ. এর নয়; বরং উক্ত ইবরত তার হাতে কলমে গড়া কোন ছাত্র বাড়িয়েছেন উস্তাদের প্রতি অধিক সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে। যা মূল গ্রন্থে উল্লেখ নেই। মুল্লা মিসকীন রহ. এর কাউল অনুযায়ী মূল কপিতে এভাবে ছিল যে—

قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ الْفَقِيْرُ اِلَى اللهِ الْوَدُوْدِ اَبُوْ الْبَرَكَاتِ عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوْدِ النَّسَفِي غَفَرَاللّٰهُ لَهُ لِوَالِدَيْهِ وَ اَحْسِنْ اِلَيْهِمَا وَ اِلَيْهِ ....

قوله : لَمَّا رَأَيْتُ الْهِمَمَ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. এখান থেকে তার উক্ত কিতাব তথা কানযুদদাদাকাইক গ্রন্থখানী লিপিবদ্ধ করার কারণ বা প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতেছেন। যার সারমর্ম হল—তখনকার যুগের মানুষের অভিপ্রায় ও স্বভাব লম্বা চৌড়া, বিস্তৃত কিতাবাদী বা আলোচনা থেকে অমনোযোগী ও বিমুখ ভাব দেখা দিল। অর্থাৎ তখনকার সময়ের মানুষের চাহিদা সংক্ষিপ্ত ও ছোট লিখার দিকে ধাবিত হল। তারা চায় সংক্ষিপ্ত কিতাবাদী ও আলোচনা থেকে পরিতৃপ্ত ও ধ্যানিত হতে। তাই গ্রন্থকার রহ. এর পূর্বের লিখিত ওয়াফী (وافى) গ্রন্থখানা যা ফিকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন স্বনামধন্য বিস্তৃত কিতাবাদীর ন্যায় অত্যন্ত ব্যাপক ও ব্যাপ্ত ছিল। গ্রন্থকার রহ. উক্ত কিতাবখানাকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী এমন মাসআলা মাসাইলের যার অস্তিত্ব বহুল এবং সংগঠন ব্যাপক সেগুলোর উল্লেখের ভিতর দিয়ে সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। যাতে তার উপকার বেশী হয় এবং মুনাফা পরিপূর্ণ হয়। মোটকথা, গ্রন্থকার রহ. সে যুগে ইলমে ফিকাহ অন্বেষণকারীদের চাহিদা অনুযায়ী ওয়াফী গ্রন্থের একখানা ملخص বা সারসংক্ষেপ গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছা পোষণ করলেন। আল্লাহ তাআলা তার ইচ্ছাকে কবুল করলেন। তিনি কানযুদদাকাইকের মত ফিকহ শাস্ত্রের অনবদ্য ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনা করলেন—

فَشَرَعْتُ فِيْهِ بَعْدَ اِلْتِمَاسِ طَائِفَةٍ مِنْ اَعْيَانِ الْاَفَاضِلِ وَ اَفَاضِلُ الْاَعْيَانِ الَّذِيْنَ هُمْ بِمَنْزِلَةِ الْاِنْسَانِ لِلْعَيْنِ وَالْعَيْنُ لِلْاِنْسَانِ مَعَ مَابِى مِنَ الْعَوَائِقِ وَ سَمَّيْتُهُ بِكَنْزِ الدَّقَائِقِ هُوَ وَاِنْ خَلَاعَنِ الْعَوِيْصَاتِ وَالْمُعْضَلَاتِ فَقَدْ تَحَلّٰى بِمَسَائِلِ الْفَتَاوٰى وَالْوَاقِعَاتِ مُعْلَمًا بِتِلْكَ الْعَلَامَاتِ وَ زِيَادَةِ الطَّاءِ لِلْاِطْلَاقَاتِ وَاللهُ الْمُوَفِّقُ لِلْاِتْمَامِ وَالْمُيَسِّرُ لِلْاِخْتِتَامِ -

---

অনুবাদ : শ্রেষ্ঠতর ও নেতৃস্থানীয় এক জামাত উলামায়ে কেরাম যারা এ রকম যেমন মানুষের জন্য চোখ ও চোখের জন্য মানুষ তাদের দরখাস্তে আমার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সাথে আমি তার সংক্ষিপ্ত করণ শুরু করি এবং কান্‌যুদ্‌দাক্বায়িক্ব করে তার নামকরণ করেছি। আর তা জটিল ও কঠিন মাসাইল থেকে মুক্ত। তবে

প্রকৃত ব্যাপার ও মুফতা বিহা মাসাইল দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে। যা ঐ নিদর্শন দ্বারা চিহ্নযুক্ত এবং ইতলাকাতের জন্য (অর্থাৎ সাধারণতার জন্য) طاء তওয়া অতিরিক্ত। আল্লাহই পূর্ণ করার তাওফীক দাতা এবং শেষ করার জন্য সহজসাধ্যকারী।

শব্দার্থ : اَلْتِمَاسْ ইহা افتعال থেকে, অনুসন্ধান, অন্বেষণ, দরখাস্ত। طَائِفَةٌ (ج) طَوَائِفُ দল, জামাত, শ্রেণী। اَلْأَعْيَانُ ইহা اَلْعَيْنُ এর ব.ব., অর্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। العَوَائِقُ - ইহা عَائِقٌ এর ব.ব., অর্থ- বাধা, প্রতিবন্ধকতা। كَنْزٌ (ج) كُنُوزٌ - সঞ্চিত ধনভান্ডার। كَنَزَ (ض) كَنْزًا - সঞ্চিত করা, ভান্ডারজাত করা। دَقَائِقُ -ইহা دَقِيْقٌ এর ব.ব. সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র। خَلَا (ن) خُلُوٌّ - খালি হওয়া, শূন্য হওয়া। اَلْعَوِيْصَاتُ ইহা عَوَائِصُ এর ব.ব. অর্থ- কঠিন, দুরূহ। اَلْمُعْضَلَاتُ ইহা مُعْضَلَةٌ এর ব.ব. অর্থ- জটিল, রহস্যময়, কঠিন। تَحَلِّي - تفعل থেকে تَحَلِّي - সজ্জিত হওয়া, অলঙ্কৃত হওয়া। مُعْلَمٌ (م) مُعْلَمَةٌ চিহ্নিত, চিহ্ন যুক্ত। عَلَامَاتٌ ইহা عَلَامَةٌ এর ব.ব. অর্থ- চিহ্ন, নিদর্শন, প্রতীক। اَلْمُوَفِّقُ তাওফীক দাতা। اَلْمُيَسِّرُ সহজসাধ্যকারী, সহজলভ্যকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. উক্ত ইবারতে গ্রন্থখানি রচনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার সাথে সাথে প্রণয়নের দ্বিতীয় কারণ উল্লেখ করতেছেন যে, তখনকার সময়ের আলীমকুল শিরমনি ও নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরামদের দরখাস্ত তার শত সমস্যা ও ব্যস্ততার পরও গ্রন্থখানি লিখতে বাধ্য করে। তাই গ্রন্থকার রহ. সময়ের দাবী ও জ্ঞানীগুণীদের আবদার পুরণার্থে গ্রন্থখানী প্রণয়ণ করেন। আর যেহেতু তিনি ওয়াফী গ্রন্থের সারসংক্ষেপ অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সূক্ষ্মভাষা ও মর্মের সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাই তার নাম দিয়েছেন كنز الدقائق 'কানযুদ্দাক্বায়িক্ব'।

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

অধ্যায় : পবিত্রতা

فَرْضُ الْوَضُوْءِ غَسْلُ وَجْهِهٖ وَ هُوَ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِهٖ اِلٰى اَسْفَلِ ذَقْنِهٖ وَ اِلٰى شَحْمَتَى الْأُذُنِ وَيَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ بِكَعْبَيْهِ وَ مَسْحُ رُبُعِ رَأْسِهٖ وَ لِحْيَتِهٖ -

অনুবাদ ঃ ওযুর ফরজ ঃ নামাজীর চেহারা ধৌত করা। আর তা হল ললাটের চুল থেকে নিয়ে থুতনির নিচ পর্যন্ত (দৈর্ঘে) ও উভয় কানের লতিকা পর্যন্ত (প্রস্থে)। কনুইসহ উভয় হাত (ধৌত করা) ও উভয় পা গোড়ালিসহ (ধৌত করা) এবং মাথার একচতুর্থাংশ ও দাড়ী মাসেহ করা।

শব্দার্থ ঃ كتاب শব্দটি فعال এর ওযনে اسم ذات - এটি مكتوب অর্থে ব্যবহৃত। যার অর্থ লিখিত বা লিপিবদ্ধ। كتاب বলা হয় যাতে এক জাতীয় (এক جنس এর) মাসআলাগুলোকে একত্রিত করা হয়। আর باب এর অধীনে এক প্রকারের মাসআলাগুলোকে বর্ণনা করা হয়। আর فصل এর মধ্যে ঐ বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়, যা পূর্বোক্ত বিষয় হতে সম্পূর্ণ পৃথক।

اَلطَّهَارَةُ ঃ اَلطَّهَارَةُ (এর طاء বর্ণে فتحه এর সাথে) পবিত্রতা, اَلطُّهَارَةُ (এর طاء বর্ণে ضمه এর সাথে) পবিত্রতা অর্জনের পর অবশিষ্ট পানি। اَلطِّهَارَةُ (এর طاء বর্ণে كسره এর সাথে) পবিত্রতা অর্জনের পাত্র।

فرض ঃ ঐ হুকমে শরয়ীকে বলে যার অস্তিত্ব অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। فرض দু প্রকার ঃ (১) فرض اعتقادى যার অস্বীকারকারী কাফের আর লঙ্ঘনকারী ফাসিক এবং গুনাহগার (২) فرض عملى যা ছাড়া দৈনন্দিন আমাল সঠিক হয় না।

قصاص شعره ঃ মাথার চুল বের হওয়ার শেষ প্রান্ত তা সামনের হউক বা পিছনের হউক বা কোন এক পার্শ্বের হউক।

ذَقَنْ (ج) أَذْقَانٌ চিবুক, থুতনি, দাড়ি। شَحْمَةُ الْأَذْقَانِ ঃ উভয় কানের লতি। مِرْفَقَيْنِ ঃ উভয় কনুই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : كِتَابُ الطَّهَارَةِ কানজুদ দাকাইক গ্রন্থ প্রণেতা তার গ্রন্থে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পর্বসমূহের প্রথমে كِتَابُ الطَّهَا কে আনার উদ্দেশ্য হল যেহেতু ওযু ও গোসল দ্বারা নাজাছাতে হুকমী দূরীভূত হয়। আর ইসতিঞ্জা দ্বারা নাজাছাতে হাকীকী বা প্রকৃত নাপাকী দূর করা হয় কেননা عبوديت (দাসত্ব) এর অর্থ عبادت (উপাসনা) দ্বারাই যোজ্য। এদিকে ইবাদতের মধ্যে সালাত একটি গুরুত্বপূর্ণে ইবাদত আর উহার পূর্ব শর্ত হল طهارة বা পবিত্রতা। হুজুর সা. ইরশাদ করেন مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ اَلطُّهُوْرُ (নামাজের চাবি পবিত্রতা)। তাই গ্রন্থকার এদিকগুলো বিবেচনা করে তার কিতাবকে كتاب الطهارة দ্বারা আরম্ভ করেছেন।

قوله : فَرْضُ الْوُضُوْءِ الخ ঃ طهارة বা পবিত্রতা দু প্রকার : طهار صغراء - তাহল ওযু। (২) طهارة كبراء তা হল গোসল। গ্রন্থকার ওযুকে গোসলের পূর্বে আনার কারণ হল যেহেতু ওযু সংক্রান্ত আয়াত তথা :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -

'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাজ পড়তে ইচ্ছা কর, তখন তোমরা (পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে)

তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় কনুই (সহ) পর্যন্ত ধৌত কর। আর তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং পাগুলো গোড়ালিসহ ধৌত কর।'

উক্ত আয়াতে এবং জিব্রাঈল (আ.) এর ওযু শিক্ষা দেওয়া সংক্রান্ত হাদীসে যেহেতু ওযুর কথা প্রথমে তাই গ্রন্থকার তার কিতাবের প্রথমে ওযুর বর্ণনা করেছেন। এদিকে গোসলের চেয়ে ওযুর ব্যবহার বেশী তাই সেদিক লক্ষ করে ওযুকে গোসলের প্রারম্ভে এনেছেন।

قوله : وَهُوَ مِنْ قُصَاصِ الخ : মুখমণ্ডল ধৌত করার সীমা : কপালের চুলের গোড়া হতে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত। এজন্য ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ রহ. এর নিকট যে শ্মশ্রু চেহারা ও কানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত উহা ধৌত করা ফরয।

قول : وَإِلَى شَحْمَتَيِ الْأُذُنِ الخ : এখানে الاذنين না এনে الاذن আনার কারণ হল, যেহেতু الاذن ইহা اسم جنس যা কম হউক বা বেশী হউক সবকে শামিল রাখে। তাই الاذن এক বচন হওয়া সত্ত্বেও উভয় কর্ণই বুঝায়েছে।

قوله : وَ يَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ بِكَعْبَيْهِ الخ : ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে উভয় হাতের কনুই এবং উভয় পায়ের গোড়ালি ধৌত করার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম যুফার রহ. এর মতে কনুই এবং গোড়ালি ধৌত করা ফরয নয়। তিনি তার মতের স্বপক্ষে দলিল দিতে সাওমের বিধান সম্পর্কীয় আয়াত উল্লেখ করেন যে, أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ অর্থাৎ তোমরা রাত পর্যন্ত সাওম সম্পন্ন কর। এখানে الى এর পরবর্তী অংশ তথা রাত সাওমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এভাবেই ওযু এর আয়াতে أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ও أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ এর মধ্যে الى এর পরবর্তী অংশ তার পূর্বের অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে না। জমহুর উলামাদের পক্ষ হতে জবাব الى এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বস্তুটি যদি এক জাতীয় হয় তাহলে উভয়টি এক হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি এক জাতিয় না হয় তাহলে পূর্ববর্তী অংশ পরবর্তী অংশ ভিন্ন হওয়ার দরুন একটি অন্যটির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন, সাওমের আয়াতে الى এর পরবর্তী অংশ ও পূর্ববর্তী অংশ এক জাতীয় নয়। কেননা, একটি হল দিন অপরটি হল রাত, বিধায় উভয়টি এক হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু ওযুর আয়াতে الى এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অংশ এক জাতীয় বিধায় উভয়টি এক হুকুমের অধিনে তথা ওযুতে হাত ও পায়ের সাথে কনুই ও গোড়ালী ধৌত করা ফরয।

قوله : وَمَسَحَ رُبُعَ رَأْسِ الخ : হানাফীদের নিকট মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ। ইমাম মালিক রহ. এর মতে সমস্ত মাথা মাসেহ করা ফরজ। ইমাম শাফেয়ী রহ. হতে দুটি মত (বর্ণনা) রয়েছে। ১। কমপক্ষে তিন চুল পরিমাণ মাসেহ করা ফরয। ২। কমপক্ষে যতটুকু মাসাহ করলে মাসাহ বলা হয় ততটুকু মাসাহ করা ফরয।

ইমাম মালিক রহ. এর দলিল : যেহেতু তায়াম্মুমে সমস্ত চেহারা মাসেহ করা ফরয, বিধায় ওযুতে ও সমস্ত মাথা মাসেহ করা ফরয। অপর দিকে আয়াতে কুরআনীতে برءوسكم শব্দের باء অক্ষরটি অতিরিক্ত তথা وامسحو برءوسكم এর অর্থ হবে وَامْسَحُوْ رُءُوْسَكُمْ (তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ করবে) তার একথা অতি স্পষ্ট যে মাথা বলতে পূর্ণ মাথাকেই বুঝায় বিধায় পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিল : যেহেতু আল কুরআনে ওযু সংক্রান্ত নির্দেশ শর্তহীন বা মুতলাক তাই হাদীস দ্বারা কুরআনের শর্তহীনকে শর্তযুক্ত করা অবৈধ।

হানাফীদের দলিল : কুরআনের আয়াত وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ এখানে পুরো মাথা মাসেহ করার নির্দেশ দেননি; বরং মাথার কোন অংশ মাসেহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তার ব্যাখ্যা হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা রাযি. এর হাদীসে পাওয়া যায়—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَ خُفَّيْهِ -

'মহানবী সা. একবার কোন কওমের আবর্জনা ফেলার স্থানে গমন করে পেশাব করলেন। অত:পর ওযু

করলেন এবং মাথার সম্মুখের অংশ ও মোজাদ্বয় মাসেহ করলেন। উল্লেখিত হাদীসের সারমর্ম হল হুজুর সা. ওযুতে মাথার সম্মুখ ভাগ পরিমাণ মাসেহ করেছেন। সম্মুখভাগ হল মাথার চারি ভাগের এক ভাগের পরিমাণ। তাই এ পরিমাণ মাসেহ করা ফরয।

হানাফীদের পক্ষ থেকে জবাব হল : মাথা মাসেহ সংক্রান্ত আয়াত হল مجمل (সংক্ষিপ্ত) আর مجمل এর জন্য بيان اجمال অত্যাবশ্যকীয়। বিধায় উক্ত مجمل আয়াতের بيان اجمال হল হযরত মুগিরা ইবনে শুবা রাযি. এর আলোচিত হাদীসটি।

وَسُنَّتُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ اِلَى رُسْغَيْهِ ابْتِدَاءً كَالتَّسْمِيَةِ وَالسِّوَاكِ وَ غَسْلُ فَمِهِ وَ اَنْفِهِ بِمِيَاهٍ وَ تَخْلِيْلُ لِحْيَتِهِ وَ اَصَابِعِهِ وَ تَثْلِيْثُ الْغَسْلِ وَ نِيَّتُهُ وَ مَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ مَرَّةً وَ اُذُنَيْهِ بِمَائِهِ وَالتَّرْتِيْبُ الْمَنْصُوْصُ وَالْوِلَاءُ وَمُسْتَحَبَّتُهُ التَّيَامُنُ وَ مَسْحُ الرَّقَبَةِ -

---

অনুবাদ : ওযুর সুন্নত : প্রথমে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করা এবং বিসমিল্লাহ পড়া, মিসওয়াক করা। মুখ ধৌত করা (কুলি করা) নাকে পানি দেয়া। দাড়ি ও আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা। প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা। পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা। একবার সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা। মাথা মাসেহের পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা উভয় কান মাসেহ করা। শরীয়ত নির্ধারিত নিয়মতান্ত্রিকতা অনুসরণ করা (অর্থাৎ কুরআনে ওযুর আয়াতে আল্লাহ যে তারতীব উল্লেখ করেছেন সে তারতীবে ওযু করা) পরপর ধৌত করা (তথা এক অঙ্গ শুষ্ক হবার পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করা) এবং ওযুর মুসতাহাব হল ডান দিক থেকে শুরু করা এবং গর্দান মাসেহ করা।

শব্দার্থ : سُنَّةٌ (ج) سُنَنٌ পন্থা, সুন্নাত, স্বভাব। رُسْغٌ (ج) اَرْسُغٌ বা اَرْسَاغٌ কবজি, মনিবন্ধন। فَمٌ (ج) اَفْوَاهٌ মুখ, প্রবেশ পথ। اَنْفٌ (ج) اُنُوْفٌ নাক, সরু, অগ্রভাগ। مِيَاهٌ ইহা مَاءٌ এর ব.ব.। অর্থ : পানি। تَخْلِيْلٌ খিলাল করা। اِصْبَعٌ (ج) اَصَابِعُ - আঙ্গুল। اَلْوِلَاءُ - واو বর্ণে كسره এর সাথে। অর্থ : ধারাবাহিকতা, পরপর করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : سُنَّةٌ الخ : শরীয়তের আলোকে سنة বলা হয় দ্বীনে ইসলামের ঐ পন্থা যাহার উপর হুজুর সা. আমল করেছেন, তবে ওয়াজিব হিসেবে নয়। এরকম হুজুর সা. এর সর্বদা আমলকে سنة مؤكده বলে এবং যেগুলো কখনও কখনও ছেড়েছেন, সেগুলো হল سنة غير مؤكده -

قوله : غَسْلُ يَدَيْهِ الخ : ওযুর শুরুতে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নত। কারণ হাত অন্যান্য অঙ্গ পবিত্র করণের হাতিয়ার। সুতরাং প্রথমেই তাহা পবিত্র করা উচিত। গ্রন্থ প্রণেতা এখানে غسل يد (হাত ধৌত করা)কে استقاظ من النوم ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে নির্দিষ্ট করেন নাই। কারণ, ইহা শুধু স্বপ্ন দ্রষ্টার সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং যখনই ওযু করা হবে তখনই উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নত।

قوله : كَالتَّسْمِيَةِ الخ : ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত। কারণ হুজুর সা. ইরশাদ করেন, 'বিসমিল্লাহ ছাড়া ওযু হয় না।' (এখানে না হওয়ার দ্বারা ওযুর ফজিলত থেকে বঞ্চিত থাকা উদ্দেশ্য)। উল্লেখ্য যে, تسمية শুধু بسم الله الرحمن الرحيم এর সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং সাধারণভাবে ذكر الله উদ্দেশ্য।

قوله : وَالسِّوَاكُ الخ : মিসওয়াক করা সুন্নাত। কিন্তু ওযুর নাকি নামাজের এব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী মাজহাব অনুযায়ী মিসওয়াক ওযুর সুন্নাত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে মিসওয়াক নামাজের সুন্নাত। তাদের দলীল হুজুর সা. এর হাদীস—

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ -

'যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করতাম তবে প্রত্যেক নামাজের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ করতাম।' হানাফী মাজহাব মতে মিসওয়াক ওযুর সুন্নাত। দলীল হল উপরে উল্লেখিত হাদীসটি। তবে عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ এর মধ্যে وضوء শব্দটি উহ্য রয়েছে। তথা عِنْدَ وَضُوْءِ كُلِّ صَلٰوةٍ অর্থাৎ প্রত্যেক সালাতের ওযুতে'। এদিকে নামাজের পূর্বে মিসওয়াক করলে মুখে ময়লা ছড়িয়ে পড়া ও রক্ত বের হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করলে এগুলো দুরিভূত হয়ে যায়।

উল্লেখিত মতানৈক্যের সারমর্ম : যদি কেহ মিসওয়াকসহ ওযু করে জুহরের নামাজ পড়ে, অতঃপর এই ওযু দ্বারা আছরের নামাজ পড়ে তবে হানাফীদের মতে পুনরায় মিসওয়াক করতে হবে না। কিন্তু শাফিয়ীদের নিকট আছরের নামাজের সময় সুন্নাত পালনার্থে মিসওয়াক করতে হবে।

قوله : وَ غَسْلُ فَمِهِ الخ : কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নাত। গ্রন্থকার রহ. مضمضة ও استنشاق না বলে غَسْلُ فَمِهِ وَ اَنْفِهِ بِمِيَاهٍ সংক্ষিপ্ত করণের জন্য বলেছেন। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, غسل শব্দে استيعاب এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। ইবনে নুজাইম রহ. বলেন غسل ইহা مضمضة এর মধ্যে পাওয়া যায়। কেননা, فَاِنَّهَا اِصْطِلَاحًا اِسْتِيْعَابُ الْمَاءِ جَمِيْعَ الْمَاءِ -

কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার নিয়ম :

১। তিনবার কুলি করা প্রত্যেক বার নতুন পানির সাথে। অতঃপর তিনবার নাকে পানি দেয়া প্রত্যেক বার নতুন পানির সাথে। হানাফী মাজহাবে ইহাই উত্তম। ঈমাম তিরমিযী রহ. এর বর্ণনায় ইমাম শাফেয়ী রহ. ইহাকে উত্তম বলেছেন। ২। প্রত্যেক আজলা পানি দ্বারা কুলি ও নাকে পানি দেয়া ইমাম মাজনী রহ. এর বর্ণনায় ইমাম শাফেয়ী রহ. ইহাকে উত্তম বলেছেন। উল্লেখ্য যে, উভয়টি সুন্নত হওয়া না হওয়া নিয়ে মতানৈক্য নয় বরং উত্তম হওয়া না হওয়া নিয়ে মতানক্য।

قوله : تَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ الخ : দাড়ি খিলাল করা সুন্নাত। ইমাম আবু ইউসুফ রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ. এক বর্ণনায় ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, দাড়ি খিলাল করা সুন্নাত। কারণ অনেক সাহাবাদের হাদীস দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয় যে, হুজুর সা. নিরবচ্ছিন্নভাবে দাড়ি খিলাল করেছেন। আবু দাউদ শরীফে হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত 'হুজুর সা. যখন ওযু করতেন তখন এক চিলু পানি দ্বারা দাড়ি খিলাল করতেন এবং বলতেন, 'আমার প্রভু আমাকে এভাবে আদেশ দিয়েছেন।' (তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. দাড়ি খিলালকে মুসতাহাব মেনেছেন।)

قوله : اَصَابِعِه : আঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত। হুজুর সা. ইরশাদ করেন তোমরা আঙ্গুলী খিলাল কর, তাহলে তাতে জাহান্নামের অগ্নি প্রবেশ করতে পারবে না।

হাতের আঙ্গুলী খিলালের পদ্ধতি : উভয় হাতকে ভালভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে খুলে নেয়া।

পায়ের আঙ্গুলী খিলালের পদ্ধতি : বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা খিলাল করা। ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলী হতে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলীতে শেষ করা। উল্লেখ্য যে, যদি পানি পৌঁছে যায় তবে খিলাল করা সুন্নাত। আর যদি পানি পৌঁছে না তবে খিলাল করা ফরয। (তথা পানি পৌঁছানো ফরয)।

قوله : وَ تَثْلِيْثُ الْغَسْلِ الخ : প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা সুন্নত। হুজুর সা. প্রতি অঙ্গ এক একবার ধৌত করে বলেছেন ইহা এমন ওযু যা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা নামায কবুল করেন না। আবার দু দু বার ধৌত করে বলেছেন, এই ওযুর উপর আল্লাহ দ্বিগুন প্রতিদান দিয়ে থাকেন। অতঃপর তিন তিন বার ধৌত করে বলেছেন, ইহা আমার ওযু এবং আমার পূর্ববর্তী সকল নবীগণের ওযু যে ব্যক্তি এ থেকে কম বা বেশী করবে সে জুলুম করল ও সীমা লঙ্ঘন করল। সুতরাং প্রতিয়মান হল, প্রত্যেক অঙ্গ এক এক বার করে ধৌত করা ফরজ ও দু দু বার ধৌত করা সুন্নাত এবং তিন তিন বার ধৌত করা ওযুকে পূর্ণ করে।

قوله : وَ نِيَّتِه الخ : নিয়ত করা। শরীয়তের আলোকে আল্লাহর আনুগত্য বা নৈকট্যার্জনের নিমিত্তে কোন কিছুর ইচ্ছা করাকে نيت বলা হয়। নিয়াত ফরয নাকি সুন্নত, আহনাফ, সুফিয়ান ছুরী, আওজায়ী, হাসান বসরী রহ. প্রমুখদের মতে ওযুতে নিয়াত করা সুন্নাত। ইমাম শাফেয়ী রহ., মালিক, আহমদ, রাবিয়া, জুহরী, লাইছ, ইসহাক, আবু ছাওর, আবু উবাইদ, দাউদ জাহেরী রহ. প্রমুখদের মতে ওযুতে নিয়ত করা ফরয। তাদের দলীল হল, হযরত উমর রাযি. এর হাদীস اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - প্রথম পক্ষের উলামাগণ এর জবাবে বলেন, ওযুর মধ্যে দুটি দিক রয়েছে। (১) ইহা পৃথক ইবাদত হওয়া। (২) ইহা নামাজের জন্য মাধ্যম হওয়া। তাই ওযু এক দিক দিয়ে ইবাদত যা নিয়ত ছাড়া হবে না। অর্থাৎ ওযুকারী যদি নিয়ত করে না তবে ইবাদতে ওযু এর ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কিন্তু নামাজের মাধ্যম হওয়ার জন্য নিয়ত বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বরং পবিত্রতা নিয়ত ছাড়াও অর্জিত হয়। কেননা, পানি সে নিজেই পবিত্রকারী। ইচ্ছা হউক বা না হউক। (التفصيل فى المطولات)

قوله : وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِه الخ : সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নাত। আহনাফদের নিকট মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নাত এবং নতুন পানির প্রয়োজন নেই বরং হাত ধৌত করার পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করা যাবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন যেভাবে ওযুর অঙ্গকে তিনবার করে এবং নতুন পানি দিয়ে ধৌত করতে হয় সেভাবেই মাথা মাসেহ এর ক্ষেত্রে তিনবার ও প্রত্যেকবার নতুন পানি দ্বারা করা সুন্নাত। তিনি মাথা মাসেহকে অন্যান্য ধৌতকৃত অঙ্গের সাথে তুলনা করেন।

আহনাফের দলীল : হযরত আনাস রাযি. ওযুর প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিন বার ধৌত করলেন এবং মাথা একবার মাছেহ করলেন। অতঃপর বললেন ইহা হুজুর সা. এর ওযু। এভাবেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত হুজুর সা. তার পবিত্র মাথা একবার মাসেহ করেছেন। (صحيحين سنن اربعة)

যেহেতু মাথা মাসেহ করা হয় তাই অন্যান্য মাসেহ এর সাথে কিয়াস করা যৌক্তিকতা যেমন তায়াম্মুমের প্রতিটি অঙ্গ একবার মাসেহ হয় এবং মুজার উপর মাসেহ একবার করতে হয় বিধায় মাথাও একবার মাসেহ করলে চলবে।

قوله : أُذُنَيْه الخ : উভয় কর্ণ মাসেহ করা সুন্নাত।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম মালিক রহ. এবং তিরমিযী রহ. এর বর্ণনায় অধিকাংশ উলামাদের মাজহাব হল মাথা মাসেহ এর পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা কর্ণদ্বয় মাসেহ করা সুন্নাত। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও আবু ছাউর রহ. এর মতে উভয় কর্ণ তিন তিন বার করে এবং প্রতিবার নতুন পানি দ্বারা মাসেহ করা সুন্নাত। তাদের দলিল হল, হুজুর সা. কর্ণদ্বয় মাসেহের জন্য নতুন পানি নিয়েছেন। জমহুরের দলিল, হযরত আবু উমামা রাযি. এর হাদীসটি। যার শেষে وَقَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ (এবং বললেন, কানের সম্পর্ক মাথার সাথে) এছাড়া ও হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান, হাকিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন এবং হযরত রবিয়া ইবনে মাআউয়াজ রাযি. এর হাদীস আবু দাউদ ও তিবরানী এবং হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদীস ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করেছেন যা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ - হুজুর সা. এর فعل ছিল।

قوله : وَالتَّرْتِيْبُ الخ : নিয়ম তান্ত্রিকতা অনুসরণ করা সুন্নাত। কুরআন পাকে যেভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ, প্রথমে চেহারা ধৌত করা অতঃপর উভয় হাত অতঃপর মাতা মাসেহ করা অতঃপর উভয় পা এভাবে ধারাবাহিকভাবে ধৌত করা সুন্নাত ইহা ইমাম আবু হানিফা রহ. জুহরী রহ. রাবিয়া রহ. নখয়ী রহ. মাকহুল আতা রহ. মালিক রহ. আউযায়ী রহ. ছাওরী রহ. লাইছ রহ. এবং অধিকাংশ উলামাদের অভিমত। ইমাম শাফেয়ী রহ. আহমদ রহ. ইসহাক রহ. আবূ ছাউর রহ., কাতাদা রহ. আবু উবাইদ রহ. এদের মতে উক্ত ধারাবাহিকতা ওযুতে ফরজ। তাদের দলিল : ওযু সংক্রান্ত আয়াতে যে فاء এসেছে তা تَعْقِيْبُ مَعَ الْوَصْلِ এর জন্য যা দ্বারা ওযুতে

তারতীব ফরয হওয়াটা প্রমাণ করে। আমরা তাদের জবাবে এই বলি যে فاء تعقيبيه এর উদ্দেশ্য হল যে, ওযুর সমস্ত অঙ্গের পবিত্রতার প্রয়োজন তখন হবে যখন নামাজী নামাজের পূর্ণ ইচ্ছা করে নিবে। সুতরাং এ দ্বারা তারতীব ফরয প্রমাণিত হবে না।

قوله : وَ مُسْتَحَبَّتُهُ الخ : ওযুর মুসতাহাব থেকে একটি হল ডান থেকে শুরু করা সিহাহসিত্তা এর মধ্যে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুজুর সা. সকল কাজ ডান থেকে শুরু করাকে পছন্দ করতেন। গর্দান মাসেহ করাও মুসতাহাব। ফতহুল কদীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, উভয় হাতের পিঠ দ্বারা গর্দান মাসেহ করা মুসতাহাব এবং গলা মাসেহ করা বেদআত।

وَيَنْقُضُهُ خُرُوْجُ نَجَسٍ مِنْهُ وَ قَيْءٌ مَلَأَ فَاهُ وَلَوْ مِرَّةً أَوْ عَلَقًا أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً لَا بَلْغَمًا أَوْ دَمًا غَلَبَ عَلَيْهِ الْبُزَاقُ وَ السَّبَبُ يَجْمَعُ مُتَفَرِّقَهُ وَ نَوْمٌ مُضْطَجِعٌ وَ مُتَوَرِّكٌ وَ إِغْمَاءٌ وَ جُنُوْنٌ وَ سُكْرٌ وَ قَهْقَهَةُ مُصَلِّي بَالِغٍ وَ لَوْ عِنْدَ السَّلَامِ وَ مُبَاشَرَةٌ فَاحِشَةٍ لَا خُرُوْجُ دُوْدَةٍ مِنْ جُرْحٍ وَ مَسُّ ذَكَرٍ وَ اِمْرَأَةٍ -

---

অনুবাদ : (নামাজীর শরীর থেকে) নাজাছাত বের হওয়া, মুখ ভরে বমি করা, যদিও ইহা পিত বা জমাট বাধা রক্ত হয় বা খাবার হয় বা পানি হয় তাহলে ওযু ভেঙ্গে যাবে, তবে কফ অথবা এ পরিমাণ রক্ত হয় যার উপর থুথু প্রবল তবে ওযু ভঙ্গ হবে না। বিক্ষিপ্ত বমিকে একই কারণ একত্র করবে, শয়ন বা নিতম্বে ভর করে নিদ্রা যাওয়া, সংজ্ঞাহীনতা, পাগলামী, মাতাল হওয়া, বালেগ নামাজীর অট্টহাসী, যদিও সালামের সময় হয়, মুবাশিরাতে ফাহিশা দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে। তবে জখম থেকে পোকা বের হলে অথবা যৌনাঙ্গ বা মহিলা স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হবে না।

শব্দার্থ : قَيْءٌ বমি, বমন। مِرَّةٌ - পিত্ত। عَلَقًا - রক্ত, জোক। بَلْغَمًا (ج) بَلَاغِمٌ - কফ, শ্লেষ্মা। بُزَاقٌ - থুথু, নিষ্ঠাবন। مُضْطَجِعٌ (ج) مُضْطَجِعَاتٌ -শয্যা, শয়নস্থল। متوارك নিতম্বে ভর করে উপবিষ্ট। اِغْمَاءٌ - সংজ্ঞাহীনতা, মুর্ছা। جُنُوْنٌ -পাগলামী। سُكْرٌ - মাতাল হওয়া। قَهْقَهَةٌ - অট্টহাসি, সশব্দ হাসি। مُبَاشَرَةٌ فَاحِشَةٌ - পুরুষাঙ্গ বিস্তীর্ণ হওযার সাথে স্ত্রীলিঙ্গের সাথে মিলে যাওয়া কোন আবরণ ছাড়া। دُوْدَةٌ (ج) دِيْدَانٌ - কীট, পোকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَيَنْقُضُهُ الخ : মুসান্নিফ রহ. এখান থেকে ওযু ভঙ্গের কারণগুলো উপস্থাপন করতেছেন। তিনি বলেন ওযু ভঙ্গ হয়ে যায় নামাজীর শরীর থেকে নাপাকী বের হওয়া দ্বারা, এমর্মে কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ الخ তোমাদের কেহ যদি কাজায়ে হাজত সেরে আসে আর পানি না পায় তবে সে যেন তায়াম্মুম করে নেয়। বুঝা গেল নাপাকী বের হওয়া দ্বারা অজু ভেঙ্গে যায়, কেননা, এমতাবস্থায় পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে মুখ ভরে বমি করা দ্বারাও অজু ভেঙ্গে যায়। যদিও তা পিত হয় বা জমাট বাধা রক্ত হয়, কিংবা খাবার ও পানিও হয়। উল্লেখ্য যে, কফ শ্লেষ্মা যদি এমন হয় যে তাতে থুথু প্রবল তবে অজু ভঙ্গ হবে না।

قوله : اَلسَّبَبُ يَجْمَعُ الخ : ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে যদি বমির কারণ তথা পেটে মাতলামী এক হয় অর্থাৎ যদি কেহ বার বার কিছু কিছু করে বমি করে আর পেটে মাতলামী এক বার হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির বমিতে

অনুমান করা যাবে যদি মুখ ভরা পরিমাণ হয় তবে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি মুখ ভরা পরিমাণ হয় না তবে ওযু ভঙ্গ হবে না। আর যদি পেটে মাতলামী বার বার হয় এবং বমিও অল্প অল্প হয় তবে ওযু ভঙ্গ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে যদি এক বৈঠকে অল্প অল্প করে বমি করে, অতঃপর এ পরিমাণ হয় যে, মুখ ভরে যাবে তবে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি কয়েক বৈঠকে অল্প অল্প বমি করে তবে ওযু ভঙ্গ হবে না। অল্প অল্প বমি যা মুখ ভরা পরিমাণ হয় তার চারটি অবস্থা রয়েছে (১) যদি মাতলী এক হয় এবং বৈঠকও এক হয় তবে সর্ব সম্মতিক্রমে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। (২) যদি উভয়টি পৃথক হয় অর্থাৎ মাতলী ও বৈঠক কয়েক বার হয় তবে সর্ব সম্মতিক্রমে ওযু ভঙ্গ হবে না। (৩) যদি মাতলী এক হয় আর বৈঠক কয়েকটি হয় তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে ওযু ভঙ্গ হবে না। (৪) যদি মাতলী কয়েকটি হয় আর বৈঠক এক হয় তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে ওযু ভঙ্গ হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

قوله : وَنَوْمُ مُضْطَجِعٍ الخ : চিত বা কাত হয়ে ঘুমিয়ে গেলে অথবা এমন বস্তুতে হেলান দিয়ে ঘুমাল যা সরিয়ে ফেললে সে পড়ে যাবে তবে এসব অবস্থায় ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, এসব অবস্থায় তার পায়খানার রাস্তা ঢিলা হয়ে বায়ু বের হবার সম্ভাবনা প্রবল। এ বিষয়ে প্রকৃত প্রমান হল, হুজুর সা. পবিত্র ইরশাদ তিনি বলেন কাত হয়ে ঘুমালে ওযু চলে যায়। কেননা, এসময় শরীরের জোড়াসমূহ ঢিলা হয়ে যায়। (আবূ দাউদ, তিরমিযী) শয়নের মোট তেরটি অবস্থা হতে পারে। (১) কাত হয়ে (২) এক নিতম্বে ভর করে (৩) কোন কিছুতে হেলান দিয়ে (৪) আসন ধরে বসে (৫) বসে (৬) পা লম্বা করে (৭) বক্র হয়ে (৮) কুকুরের বসার মত (৯) চলা অবস্থায় (১০) আরোহী অবস্থায় (১১) দাড়ানো অবস্থায় (১২) রুকু অবস্থায় (১৩) সাজদা অবস্থায়।

উপরে উল্লেখিত অবস্থা থেকে প্রথম তিন অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং বাকী অবস্থায় ওযু ভঙ্গ হবে না।

قوله : وَإِغْمَاءٌ : সংজ্ঞাহীন, পাগলামী, মাতাল অবস্থায় ওযু ভেঙ্গে যায়। কারণ এসময় মানুষের জোড়সমূহ ঢিলা হয়ে যায়। যার দরুন বায়ু বের হবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

قوله : اَلْقَهْقَهَةُ الخ : ক্বাহক্বাহা ঐ হাসিকে বলে যার আওয়াজ অন্য লোক শুনে। হানাফীদের মতে বালেগ ব্যক্তি রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাজে এরূপ হাসলে তার ওযু ও নামাজ উভয়ই ভেঙ্গে যাবে। তবে জানাযার নামাযে ওযু ভঙ্গ হবে না। কেননা, তাতে রুকূ-সিজদা নেই।

ইমাম শাফেয়ী রহ., মালিক রহ., আহমদ রহ. এর মতে এরকম হাসি ওযু ভঙ্গ করে না, কারণ উক্ত হাসিতে শরীর থেকে কোন নাপাক বস্তু বের হইতেছে না।

হানাফীদের দলীল : তাদের দলীল হল আবূ মূসা আশয়ারী রা. এর হাদীস যে হুজুর সা. নামাজ পড়াইতেছেন এমন সময় এক সল্প দৃষ্টি শক্তি ব্যক্তি মসজিদের ভেতর গর্তে পড়ে গেলেন। নামাজী সাহাবারা অনেকে হেসে ফেললেন। হুজুর সা. যারা হেসেছেন তাদেরকে বললেন, ওযু করে নামাজ পুনরায় পড়তে। অন্যান্য ইমামদের দলিলের জবাব হল যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় তার বিপরীতে কিয়াসের কোন স্থান নেই।

টিকা : হাসি তিন প্রকার (১) القهقهة (অট্টহাসি, যার আলোচনা হয়েছে) (২) ضحك (মৃদু হাসি) এটা এমন হাসি যার আওয়াজ হবে না, শুধুমাত্র এ হাসিতে দাঁত দেখা যাবে। এতে নামাজ ভেঙ্গে যাবে, তবে ওযু ভঙ্গ হবে না। (৩) تبسم (মুচকি হাসি) এ হাসিতে সামান্যও আওয়াজ হবে না এবং সামান্যও দাঁত দেখা যাবে না। এরূপ হাসি শরীয়তে বৈধ। এতে নামাজ ও ওযু কোনটাই ভঙ্গ হয় না।

قوله : لَاخُرُوْجُ الخ : যখম থেকে পোকা বের হওয়া ওযু ভঙ্গের কারণ নয়। কেননা, পোকা একটি প্রাণী যা মূল হিসাবে পবিত্র এবং পেশাব পায়খানার রাস্তা ছাড়া পবিত্র বস্তু বের হওয়া ওযু ভঙ্গের কারণ নয়। তবে পোকার

গায়ে অধিক নাপাকী মিশ্রিত হলে ওযু ভেঙ্গে যাবে তবে অল্প হলে ওযু নষ্ট হবে না। কারণ পেশাব পায়খানার রাস্তা ছাড়া যদি অল্প নাজাছাত বের হয় তবে ওযু ভেঙ্গে যায় না। দ্বিতীয়ত: যখমের পোকা গোস্ত থেকে সৃষ্টি হয় তাই পোকা বের হয়ে পড়া ইহা গোস্তের টুকরা পড়ার নামান্তর। আর গোস্তের অংশ পড়ে গেলে ওযু ভঙ্গ হয় না। তবে যদি পোকা বা অন্য কিছু পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয় তবে ওযু ভেঙ্গে যাবে।

قوله : وَمَسُّ ذَكَرٍ اَوْ اِمْرَأَةٍ الخ : যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হবে কি না এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী রহ., মালিক রহ., আহমদ রহ. প্রমুখের মতে যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাদের দলিল হল, হযরত বুসরা বিনতে ছফওয়ান রাযি. এর হাদীস—

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهٗ فَلَا يُصَلِّ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ -

নিশ্চয় নবী করীম সা. বলেন, যে ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে সে ওযু করা ব্যতিত নামায আদায় করবে না। (তিরমিযী)

ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইবনে খুযাইমাহ এর বর্ণনায় ইমাম আহমদ ও মালিক রহ. এর মতে যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হয় না। তাদের দলিল হল : হযরত ত্বলক ইবনে আলী রাযি. এর হাদীস। তিনি বলেন—

قَالَ رَجُلٌ مَسَسْتُ ذَكَرِيْ (اَوْ قَالَ) الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهٗ فِي الصَّلٰوةِ أَعَلَيْهِ وَضُوْءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اِنَّمَا هُوَ بُضْعَةٌ مِنْكَ -

এক ব্যক্তি বলল, আমি আমার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করেছি (অথবা বলল) একটি লোক নামাযের মধ্যে স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করেছে। তার উপর কোন প্রকার ওযু ওয়াজিব হবে কি? তখন নবী করীম সা. বললেন না, এটা তো তোমার শরীরের একটি গোস্তের টুকরা মাত্র। (আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)

অর্থাৎ, শরীরের অন্যান্য স্থানে স্পর্শ করার দরুন যেমন ওযু ভঙ্গ হয় না তেমনি যৌনাঙ্গ স্পর্শ করার দরুন ওযু ভঙ্গ হবে না। এদিকে ইমাম তিরমিযী রহ. উল্লেখিত হাদীসকে অধিকতর সহীহ এবং হাসান বলেছেন। সুতরাং যৌনাঙ্গ স্পর্শ করার দরুন ওযু ভঙ্গ হবে না।

قوله : اِمْرَأَةٌ الخ : আহনাফের নিকট মহিলা স্পর্শ করাতে ওযু ভঙ্গ হয় না উত্তেজনায় হউক বা না হউক।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে যদি কোন ব্যক্তি ওযু অবস্থায় কোন মহিলাকে স্পর্শ করে তবে তার ওযু ভেঙ্গে যাবে। উত্তেজনার সাথে হউক বা না হউক ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক। তিনি দলিল দেন, কোরআনের আয়াত— اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ দ্বারা। আহনাফের দলিল হিসাবে হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদীসই যথেষ্ট। তিনি বলেন, 'আমি তাহাজ্জুদের সময় রাসূল সা.-এর সামনে শোয়া থাকতাম। যখন তিনি সিজদায় যেতেন আমাকে স্পর্শ করতেন তখন আমি পা সরিয়ে নিতাম। (বুখারী শরীফ) অন্যত্র হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ্ সা. তার জনৈকা স্ত্রীকে চুম্বন করলেন এবং পরে নামাজের জন্য বের হয়ে গেলেন, কিন্তু ওযু করলেন না।

শাফেয়ী রহ. এর দলিলের জবাব : উল্লেখিত আয়াতে لمس نساء তথা মহিলা স্পর্শ দ্বারা সাধারণ স্পর্শ উদ্দেশ্য নয়। বরং لمس نساء দ্বারা جماع (সহবাস) উদ্দেশ্য। আর সহবাস দ্বারা অযুতো ভঙ্গ হয়, অধিকন্তু গোসল ফরয হয়।

فَرْضُ الْغُسْلِ غَسْلُ فَمِهٖ وَ اَنْفِهٖ وَ بَدَنِهٖ لَادَلْكِهٖ وَ اِدْخَالُ الْمَاءِ دَاخِلَ الْجِلْدِ لِلْاَقْلَفِ وَ سُنَّتُهٗ اَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَ فَرْجَهٗ وَ نَجَاسَةً لَوْ كَانَتْ عَلٰى بَدَنِهٖ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى بَدَنِهٖ ثَلٰثًا وَ لَاتَنْقُضُ ضَفِيْرَةً اِنْ بَلَّ اَصْلُهَا -

অনুবাদ : গোসলের ফরজ : মুখ, নাক এবং শরীর ধৌত করা। তবে শরীর ঘর্ষণ বা খতনাহীন ব্যক্তির চামড়ার ভিতরে পানি প্রবেশ করানো ফরয নয়। গোসলের সুন্নাত হল হস্তদ্বয় ও লজ্জাস্থান ধৌত করা আর যদি শরীরে নাপাক থাকে তবে ধৌত করা অতঃপর ওযু করবে এবং সমস্ত শরীরে তিবার পানি প্রবাহিত করবে এবং যদি চুলের গোড়া ভিজে যায় তবে মহিলারা কেশগুচ্ছ ধৌত করবে না।

শব্দার্থ : دَلْكٌ - মর্দন, ঘর্ষণ, মালিশ। اَقْلَفٌ - খতনা বিহীন পুরুষ। يَفِيْضُ এটা اِفَاضَةٌ থেকে অর্থ প্রবাহিত করা, ঢেলে দেওয়া। ضفيرة চুলের খোপা, কেশগুচ্ছ, বেণী। بل ভিজানো, সিক্ত করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَفَرْضُ الْغُسْلِ الخ : গোসল তথা অপবিত্রতা পরবর্তী গোসল ও হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্রতার গোসল। গোসলের ফরয তিনটি : (১) গড়গড়া করে কুলি করা অর্থাৎ এমনভাবে মুখের ভিতর পানি নড়াচড়া করা যে, কণ্ঠনালীর গোড়ায় যেন পানি পৌঁছে। আর পানি ভিতরে প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকলে রোজা অবস্থায় গড়গড়া করা যাবে না। (২) নাকে পানি দেওয়া, তথা হাতে পানি নিয়ে হালকা ভাবে টান দেয়া, যাতে নাকের শক্ত অংশে পৌঁছে যায়। এভাবে তিনবার করে প্রত্যেকবার পানি ঝেড়ে ফেলে দিবে। রোজা অবস্থায় এরূপ করা উচিত নয়। (৩) সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা তথা মাথার উপর পানি ঢেলে শরীরের সমস্ত অংশে পানি পৌঁছে দেবে। এভাবে তিনবার করবে।

قوله : وَلَاتَنْقُضُ ضَفِيْرَةٌ الخ : স্ত্রীলোকের জন্য গোসলের সময় চুলের খোঁপা খোলা আবশ্যক নয়, যদি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে। কেননা, চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো আবশ্যক। চুলের আগায় নয়। এটাই জমহুর ফকীহদের অভিমত। তবে ইমাম আহমদ রহ. এর মতে ফরয গোসলের (ঋতুস্রাবের পরবর্তী) অবস্থায় মহিলাদের গোসলের সময় চুল খোলা ওয়াজিব। জানাবাতে ওয়াজিব নয়।

وَفُرِضَ عِنْدَ مَنِيٍّ ذِيْ دَفْقٍ وَ شَهْوَةٍ عِنْدَ اِنْفِصَالِهٖ وَ تَوَارِيْ حَشْفَةٍ فِيْ قُبُلٍ اَوْ دُبُرٍ عَلَيْهِمَا وَ حَيْضٍ وَ نِفَاسٍ لَا مَذْيٍ وَ وَدْيٍ وَ اِحْتِلَامٍ بِلَا بَلَلٍ -

অনুবাদ : গোসল ফরয হয় বেগে নির্গতশীল বীর্য যা কামভাবের সাথে পৃথক হয়। এবং যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ (মহিলাদের) যৌনিপথে বা পশ্চাদ্ভাগে প্রবেশ হলে তবে উভয়ের উপর গোসল ফরয এবং হায়েয ও নেফাস বন্দ হওয়ার পর মজি ও ওদি (বের হওয়াতে) এবং আদ্রতাহীন স্বপ্নদোষে গোসল ফরয হয় না।

শব্দার্থ : منى - শুক্র, বীর্য।

দরসে তিরমিযীতে মনীর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন—

ماء البيض ثخين يتولد منه الولد وهو يتدفق فى خروجه و يخرج بشهوة من بين صلب رجل و ترائب المرأة و ستعقبه الفتور وله رائحة كرائحة الطلع (و رائحة الطلع قرينة من رائحة العجين) -

ذِى دَفَقٍ বেগে নির্গতশীল। اِنْفِصَالٌ বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্কহীনতা। تَوَارِى আত্মগোপন করা। حَشَفَةٌ যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ। قُبُلٌ মহিলাদের যোনিপথ। دُبُرٌ (ج) اَدْبَارٌ পশ্চাদভাগের রাস্তা (পায়খানার রাস্তা)

مَذِى-এর সংজ্ঞা—

هو ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر الجماع او ارادته من غير شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور و ربما لا يحس بخروجه وهو غلب فى النساء من الرجال وهذا ملخص ما قاله ابن حجر وابن نجيم -

وَدِىٌ এর সংজ্ঞা—

هو ماء ابيض كدر ثخين يشبه المنى فى الثخانة و يخالفه فى الكدورة ولا رائحة له ويخرج عقيب البول اذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شئ ثقيل و يخرج قطرة او قطرتين و نحوهما (البحر الرائق)

اِحْتِلَامٌ - স্বপ্নদোষ হওয়া, সাবালক হওয়া। দুঃস্বপ্ন দেখা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَفَرْضُ عِنْدَ مَنِيِّ الخ : সাধারণ উত্তেজনা বশত বীর্য বের হলে সবসম্মতিক্রমে গোসল ফরয হবে। কিন্তু কোন রোগ বা অন্য কোন কারণে বিনা উত্তেজনায় নারী পুরুষের বীর্যপাত হলে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে গোসল ওয়াজিব হবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে গোসল ফরয হবে। অর্থাৎ, উত্তেজনা বশত অথবা উত্তেজনা ছাড়া মনি বের হলেই গোসল ফরয হবে। তিনি দলিল দেন হুজুর সা. এর হাদীস (مسلم) اَلْمَاءُ بِالْمَاءِ (বীর্যস্খলনী গোসল) অর্থাৎ, মনির কারণে গোসল ওয়াজিব হয়।

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দলিল : কুরআন পাকের আয়াত وان كنتم جنبا فاطهروا (এবং যদি তোমরা অপবিত্র থাক তখন পবিত্রতা অর্জন কর) এর হুকুমে جنبى তথা এমন লোক যে অপবিত্রতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আর جنابت বলা হয় উত্তেজনার সাথে বীর্য বের হওয়াকে। সুতরাং গোসল ওয়াজিব হবে উত্তেজনার সাথে বীর্য বের হলে। কিন্তু উত্তেজনা ছাড়া তথা কোন রোগে বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হবে না।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর আলোচিত হাদীস— الماء بالماء এর জবাব : (১) উক্ত হাদীস ব্যাপক নয়। যদি এমন হয় তবে পেশাব, মজি, ওয়াদিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যা কেহ বলেন নি। বরং الماء بالماء দ্বারা নির্দিষ্ট পানি উদ্দেশ্য, যা আয়াত ও লুগাত সমর্থন করে। অর্থাৎ উত্তেজনার সাথে বের হওয়া বীর্য। (২) الماء بالماء এর অনুমোদন ইসলামের প্রথম সময়ে ছিল। অতঃপর তা রহিত হয়ে যায়। যেমন, উবাই ইবনে কাব রহ. বলেন, الماء بالماء ইহা ইসলামের প্রথম সময়ে অনুমোদিত ছিল, পরে রহিত হয়ে যায়।

قوله : ذِى دَفَقٍ الخ : আল্লামা ইবনে নুজাইম মিছরী রহ. বলেন আলোচ্য ইবারতে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমতঃ ইহা মহিলাদের বীর্যকে অন্তর্ভুক্ত করে না। কারণ, دفق (তথা বেগে নির্গতশীল) এর শর্ত লাগানো হয়েছে। অথচ মহিলাদের বীর্য বক্ষ থেকে বের হয়ে دفق ছাড়া জরায়ুতে চলে যায়। দ্বিতীয়তঃ دفق এর শর্ত লাগানোতে ইহা বুঝা যায় যে বীর্য উত্তেজনা সাথে বের হবে। কিন্তু عند انفصاله তা বারণ করে। উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের জবাবে আল্লামা ইবনে আবেদীন রহ. বলেন, دفق শব্দটি সাধারণত متعدى (সকর্মক ক্রিয়া) হিসাবে ব্যবহার হয়। কিন্তু এখানে دفق তথা دفوق - لازم (অকর্মক ক্রিয়া) এবং عند انفصاله ইহা ظرف متعلق হয়েছে فرض এর। যেভাবে عند منى - ظرف متعلق হয়েছে فرض এর সুতরাং এবার شهوة عند الانفصال অথবা شهوة عند الخروج হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত হবে না।

قوله : وَتَوَارِى حَشَفَةٌ الخ : মহিলাদের যোনি পথে অথবা পশ্চাদ্ভাগের রাস্তা দিয়ে পুরুষের যৌনাঙ্গের

অগ্রভাগ প্রবেশ কারলে উভয়ের উপর গোছল ফরয হয়। হুজুর সা. এরশাদ করেন যখন পুরুষ মহিলার চার শাখার (হাত ও পা) মধ্যভাগে বসে এবং একটি খতনা অপর খাতনার সাথে মিলে (সহবাস করে) তখন গোছল ওয়াজিব হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)। ইমাম মুসলিম রহ. এর বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, যদিও তার বীর্যপাত না হয়।

قوله : لَامَذْيٍ الخ : প্রাগুক্ত منى এর উপর عطف হওয়ার দরুন مذى ودى احتلام সবটিই مجرور হয়েছে। مذى ودى বের হওয়াতে গোসল ফরয হয় না। বরং শুধু ওযু করে নিলেই হবে। হযরত আলী রাযি. বর্ণনা করেন, হুজুর সা. বলেছেন, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার মযী বের হয় এজন্য সে যেন তার পুরুষাঙ্গ এবং অন্ডকোষ ধৌত করে নেয় এবং নামাযে যেমন ওযু করে তদ্রূপ ওযু করে নেয়।

قوله : اِحْتِلَامٌ الخ : যদি কেহ স্বপ্নে সহবাস দেখে কিন্তু আদ্রতা দেখতে পায় না তবে গোসল ফরয হবে না। হযরত আবু তালহা রাযি. এর স্ত্রী হযরত উম্মে সুলাইম রাযি. নবী করীম সা. এর নিকট আসলেন এবং বললেন হে আল্লাহর রাসূল! আমার احتلام হয়েছে। (হক্ব তাআলা সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।) তাই মহিলাদের উপর কি গোসল রয়েছে, যখন তার احتلام হয়, হুজুর সা. বললেন, হাঁ যখন সে পানি তথা বীর্যকে দেখবে। (বুখারী, মুসলিম) এবার যদি কেহ জাগ্রত হওয়ার পর কাপড়ে আদ্রতা বা অন্য কিছু দেখতে পায় তবে তাতে বিশ্লেষণ এবং সামান্য কিছু মতভেদও রয়েছে, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. উক্ত মাসআলায় ১৪ সুরত লিখেছেন।

(১) ভিজা জিনিস যদি বীর্য হওয়ার ইয়াক্বীন হয়। (২) মজি হওয়ার এয়াক্বিন হয়। (৩) ওদি হওয়ার ইয়াক্বীন হয়। (৪) প্রথম দু অবস্থায় সন্দেহ হয় অর্থাৎ মনি না মজি। (৫) শেষ দু অবস্থায় সন্দেহ জাগে অর্থাৎ মজি না ওদি। (৬) মনি নাকি ওদি এ ব্যাপারে সন্দেহ জাগে। (৭) সবটির ব্যাপারে সন্দেহ হয়।

অতঃপর এ প্রত্যেক সুরতে احتلام স্মরণ থাকে বা থাকবে না এভাবে মোট ১৪ সুরত হয়। তন্মধ্যে ৭ সুরতে গোসল করা ওয়াজিব— (১) মনি হওয়ার ইয়াক্বীন হয় এবং স্বপ্ন স্মরণ হয়। (২) মনি হওয়ার ইয়াক্বীন হয় এবং স্বপ্ন স্মরণ না হয়। (৩) মজি হওয়ার ইয়াক্বীন হয় এবং স্বপ্ন স্মরণ হয়। (৪) মনি ও ওদির ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং স্বপ্ন স্মরণ হয়। (৫) মনি ও মজির মধ্যে সন্দেহ হয় এবং স্বপ্ন স্মরণ হয়। (৬) মনি ও ওদির ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং স্বপ্ন স্মরণ না হয়। (৭) মনি ও মযির মাঝে সন্দেহ হয় এবং স্বপ্ন স্মরণ না হয়।

এবং চার সুরতে সকলের ঐক্যমতে গোসল ওয়াজিব নয়।

(১) ওদি হওয়ার ইয়াকীন হয় এবং স্বপ্ন স্মরণ হয়। (২) ওদি হওয়ার ইয়াকীন হয় এবং স্বপ্ন স্মরণ হয় না। (৩) মনি ও ওদির মধ্যে সন্দেহ হয় এবং স্বপ্ন স্মরণ হয় না। (৪) মজি হওয়ার ইয়াক্বীন হয় এবং স্বপ্ন স্মরণ না হয়।

নিম্নের তিন সুরতে মতভেদ রয়েছে।

(১) মনি ও মজির ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং সপ্ন স্মরণ না হয়। (২) মনি ও ওদির মধ্যে সন্দেহ হয় এবং সপ্ন স্মরণ না হয়। (৩) মনি মজি ওদি সবটির মধ্যে সন্দেহ হয় এবং সপ্ন স্মরণ না হয়। উক্ত সুরতগুলোতে তরফাইন এর নিকট সতর্কতা অবলম্বন করতঃ গোসল ওয়াজিব। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে গোসল ওয়াজিব নয়।

وَسُنَّ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْإِحْرَامِ وَ عَرَفَةٍ وَ وَجَبَ لِلْمَيِّتِ وَلِمَنْ أَسْلَمَ جُنُبًا وَ إِلَّا نُدِبَ -

অনুবাদ : জুমুআ, উভয় ঈদ, ইহরাম এবং আরাফার জন্য গোসল করা সুন্নত আর মৃতের জন্য এবং যে অপবিত্র অবস্থায় মুসলমান হয়েছে তার জন্য গোসল ওয়াজিব। আর যদি সদ্য মুসলমান হওয়া ব্যক্তি অপবিত্র না হয় তবে তার জন্য গোসল মুস্তাহাব।

শব্দার্থ : سُنَّ - سُنَّةٌ সুন্নাত, রীতি, নিয়ম, স্বভাব, পন্থা। احرام (হজ্জ বা উমরার জন্য) এহরাম বাধা তথা সিলাই বিহীন দুটি সাদা কাপড় পরিধান করা। عرفة - আরাফার ময়দান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَالْعِيدَيْنِ الخ : উভয় ঈদের জন্য গোসল করা সুন্নাত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন। হুজুর সা. উভয় ঈদের জন্য গোসল করতেন। (ইবনে মাজা, তিবরানী) এহরাম বাধার জন্যও গোসল করা সুন্নাত। হুজুর সা. এহরাম বাধার আগে গোসল করতেন। (তিরমিযী)

আরাফাতে অবস্থানের জন্য গোসল করা সুন্নাত। হযরত ফাকাহ বিন সাআদ রাযি. বলেন, হুজুর সা. ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং আরাফার দিন গোসল করতেন।

قوله : وَ وَجَبَ الخ : মুসলমানের উপর মৃতের গোসল দেয়া ওয়াজিব। এখানে ওয়াজিব দ্বারা ফরযে কেফায়া উদ্দেশ্য।

قوله : وَلِمَنْ أَسْلَمَ الخ : لمن এর لام তার প্রকৃত অর্থে নয়, বরং لام ইহা على এর অর্থে তথা اِفْتَرَضَ الْغُسْلُ عَلٰى مَنْ أَسْلَمَ حَالَ كَوْنِهٖ جُنُبًا 'যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় মুসলমান হয়, তাকে গোসল করা আবশ্যক। আর যদি প্রথম থেকে অপবিত্র না হয় তবে গোসল করা মুস্তাহাব।

গোসলের প্রকারভেদ :

গোসল মোট তিন প্রকার : (১) ফরয গোসল। ইহা পাঁচভাগে বিভক্ত—

(১) উত্তেজনার সহিত বীর্য নির্গত হলে। (২) লিঙ্গদ্বয়ের মিলনে বীর্যপাত না হলেও (৩) হায়েজের পর (৪) নিফাসের পর (৫) মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো।

(২) সুন্নাত গোসল, এটাও চার প্রকার— (১) জুমুআর নামাযের পূর্বে। (২) উভয় ঈদের নামাযের পূর্বে (৩) ইহরাম বাধার পূর্বে। (৪) আরাফার ময়দানে অবস্থানের জন্য সেদিনের গোসল।

(৩) মুস্তাহাব গোসল : ইহা প্রায় আঠার প্রকার। (১) কাফের হতে মুসলমান হলে যদি তার মধ্যে অপবিত্রতা না থাকে। (২) বালেগ হওয়ার পর গোসল। (৩) পাগলামী থেকে সুস্থ হওয়ার পর গোসল করা ইত্যাদি।

وَيَتَوَضَّأُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْعَيْنِ وَالْبَحْرِ وَإِنْ غَيَّرَ طَاهِرٌ أَحَدَ أَوْصَافِهٖ أَوْ أَنْتَنَ بِالْمَكْثِ لَا بِمَاءٍ تَغَيَّرَ بِكَثْرَةِ الْأَوْرَاقِ أَوْ بِالطَّبْخِ أَوِ اعْتُصِرَ مِنْ شَجَرٍ أَوْ ثَمَرٍ وَلَا بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهٗ أَجْزَاءً وَ بِمَاءٍ دَائِمٍ فِيْهِ نَجَسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَشْرًا وَ إِلَّا فَهُوَ كَالْجَارِيْ وَهُوَ مَا يَذْهَبُ بِتَبْنَةٍ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَرَ أَثَرَهٗ وَهُوَ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيْحٌ أَوْ مَوْتُ مَالَا دَمَ لَهٗ فِيْهِ

كَالْبَقِّ وَ الذُّبَابِ وَالزَّنبُورِ وَالْعَقْرَبِ وَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ وَالسَّرْطَانِ لَايُنَجِّسُهُ وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لِقُرْبَةٍ أَوْ رَفْعِ حَدَثٍ إِذَا اسْتَقَرَّ فِي مَكَانٍ طَاهِرٌ لَا مُطَهِّرٌ -

অনুবাদ : বৃষ্টির পানি, ঝর্ণার পানি এবং সমুদ্রের পানি দ্বারা অযু করা যাবে যদিও কোন পবিত্র বস্তু তার কোন এক গুণকে পরিবর্তন করে ফেলে। অথবা এক যায়গায় অধিক দিন থাকায় দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। কিন্তু অযু হবে না সে পানি দ্বারা যাতে অধিক পাতা পড়ার দরুন বা রান্না করার দরুন বা বৃক্ষ নিংড়ানো বা ফলমূল মিশ্রনে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এমন পানি দ্বারা ওযু জায়েয নয় যাতে অন্য কোন জিনিস প্রভাব বিস্তার করে অংশ হিসাবে। অজু হবে না স্থির পানি দ্বারা যাতে নাপাকি রয়েছে এবং তা দশ হাত দশ হাত না হলে। আর দশ হাত দশ হাত পানি হলো প্রবাহিত পানির ন্যায়। আর ইহা এভাবে যে যা খড়কুটা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং তা দ্বারা ওজু হয়ে যাবে। যদিও তার প্রভাব তথা স্বাদ রং অথবা ঘ্রান দেখা যায় না। পানি নাপাক হয় না এমন প্রাণী মরে যাওয়াতে যার রক্ত নেই। যেমন, ছারপোকা, মক্ষী, ভীমরুল, বিচ্ছু, মাছ, ব্যাঙ, কাকড়া, ইত্যাদি ব্যবহৃত পানি এমন পানি যা পুণ্যার্জনে বা অজুহীনতা দূরীভূত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তা যদি কোন স্থানে স্থির থাকে তবে তা নিজে পাক অন্যকে পাক করতে পারবে না।

শব্দার্থ : اَلْعَيْنُ (ج) عُيُوْنٌ ، اَعْيُنٌ ঝর্ণা। اَلْبَحْرُ সমুদ্র। اَلْمَكْثُ অবস্থান করা। تَغَيُّرًا تَفَعُّلٌ - تَغَيَّرَ থেকে পরিবর্তিত হওয়া। বিকৃত হওয়া। اَوْرَاقٌ ইহা وَرَقٌ এর বহুবচন, অর্থ পাতা। طَبْخٌ রান্না করা, রন্ধন। تِبْنَةٌ খড়কুটা। طَعْمٌ স্বাদ, মজা। لَوْنٌ রং, رِيْحٌ (ج) اَرْيَاحٌ - ঘ্রান, বাতাস। بَقٌّ - بَقَّةٌ ছারপোকা। اَلذُّبَابُ (ج) اَذِبَّةٌ মক্ষী, মাছি। اَلزُّنْبُوْرُ (ج) زَنَابِيْرُ ভীমরুল, বোলতা। اَلْعَقْرَبُ (ج) عَقَارِبُ বিচ্ছু, বৃশ্চিক। اَلسَّمَكُ (ج) سِمَاكٌ মাছ, মৎস। اَلضِّفْدَعُ (ج) ضَفَادِعٌ বেঙ, ব্যাঙ্গ, বেঙ্গ। اَلسَّرْطَانُ (ج) سَرْطَانَاتٌ কাকড়া, ক্যাঙ্গার। اِسْتَقَرَّ ইহা استفعال থেকে অবস্থান করা, স্থির হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : يَتَوَضَّأُ الخ : বৃষ্টি, ঝর্ণা এবং সমুদ্রের পানি দ্বারা ওযু করা যায় যদিও কোন পবিত্র বস্তু পানির اوصاف ثلاثة তথা রং, ঘ্রান স্বাদ থেকে কোন একটিকে নষ্ট করে ফেলে অথবা পানি অধিক দিন অবস্থান করার দরুন দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। বৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি। হুজুর সা. এরশাদ করেন, পানি পবিত্র বস্তু তাকে কোন বস্তু নাপাক করতে পারে না। (সুনানে আরবা) সমুদ্রের ব্যাপারে হুজুর সা. বলেন, তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত পবিত্র। (তথা সমুদ্রের মৃত মৎস হালাল) (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

قوله : وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ الخ : যে পানি পুণ্যের আশায় ব্যবহার হয়। যেমন কেহ ওযু অবস্থায় আবার ওযু করল। অথবা হুকমী অপবিত্রতাকে দুর করার জন্য ব্যবহার করা হল। যেমন, ওযু চলে যাওয়ার দরুন দ্বিতীয় বার ওযু করল। তখন উক্ত পানি কোথাও একত্রি হল। সুতরাং সে পানি নিজে পাক। অর্থাৎ, যদি শরীরে বা কাপড়ে লেগে যায় তবে তা ধৌত করতে হবে না। তবে অন্যকে পবিত্র করতে পারবে না। তাই পানি দ্বারা দ্বিতীয় বার অযু করা যাবে না। তবে হ্যাঁ, যদি কোন প্রকৃত নাপাকি বস্তু ধৌত করা হয় তবে তা পাক হয়ে যাবে।

قوله : لِقُرْبَةٍ الخ : গ্রন্থকার উক্ত এবারতে ওযুর পানি ব্যবহৃত হওয়ার কারণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে পানি ব্যবহৃত হওয়ার কারণ দুটি।

(১) অপবিত্রতা দূর করণার্থে (২) নৈকট্য ও পুণ্যার্জনার্থে। উভয়টি এক সাথে পাওয়া যাক বা যে কোন একটি পাওয়া যাক। উভয় অবস্থাই পানি ব্যবহৃত হিসাবে বিবেচিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে ব্যবহৃত পানি হওয়ার কারণ নৈকট্য ও পুণ্যার্জনে ব্যবহৃত হওয়া। ইমাম যুফার রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে ব্যবহৃত পানি হওয়ার কারণ যা অপবিত্রতা দুরি করণার্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং কোন محدث (তথা অযুহীন ব্যক্তি নৈকট্য ও পুণ্য অর্জনের ইচ্ছায় ওযু করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে ইহা ব্যবহৃত পানি। আর যদি ওযুকারী ব্যক্তি শীতলতা অনুভবের জন্য ওযু করে তবে উক্ত পানি সর্বসম্মতিক্রমে ব্যবহৃত নয়। আর যদি ওযুহীন ব্যক্তি শীতলতা অনুভবের জন্য ওযু করে তবে শায়খাইন, ইমাম যুফর রহ. এর মতে পানি ব্যবহৃত হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে পানি ব্যবহৃত হবে না। তবে উভয়ের কারণ ভিন্ন। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে এ কারণে যে, এ অবস্থায় নৈকট্য ও পুণ্যের নিয়ত ছিল না। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে এ কারনে যে, নিয়ত ব্যতিত নাপাক দূর হয় না।

قوله : اِذَا اسْتَقَرَّ فِى مَكَانٍ الخ : গ্রন্থকার উক্ত ইবারতে ওযুর পানি কখন থেকে ব্যবহৃত প্রমাণিত হবে এদিকে ইঙ্গিত করে বলতেছেন, যখন ওযুর পানি কোন স্থানে একত্র হয়ে যাবে।

উলামায়ে আহনাফের নিকট যখন পানি অঙ্গসমূহের উপর থাকবে তথা অঙ্গ থেকে পৃথক হবে না তখন পর্যন্ত তা ব্যবহৃত হিসাবে পরিগণিত হবে না। তবে যদি অঙ্গ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে যায় আর তা কোথাও অবস্থান করে না তখন তা ব্যবহৃত না কি অব্যবহৃত এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী, ইব্রাহীম নাখঈ এবং বলখের অনেক মাশায়েখের মতে তা ব্যবহৃত নয়, তবে হা যদি কোন স্থানে অবস্থান করে তবে তা ব্যবহৃত হয়ে যাবে।

হানাফীদের মতামত হল পানি যখনই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তখন সাথে সাথেই তা ব্যবহৃত হিসাবে পরিগণিত হবে। কোথাও অবস্থান করুক অথবা নাই করুক।

قوله : طَاهِرٌ الخ : উক্ত ইবারত দ্বারা গ্রন্থকার ব্যবহৃত পানির হুকুমের দিকে ইংগীত করে বলেছেন, 'যখন অজুর পানি অঙ্গ থেকে পৃথক হয়ে অবস্থান করে তখন তা নিজে পাক অন্যকে পাক করতে পারে না।'

ব্যবহৃত পানি তিন প্রকার। (১) পবিত্র বস্তু ধৌত করার জন্য ব্যবহৃত। যেমন পবিত্র কাপড় ধৌত করণ। ইহা সর্ব সম্মতিক্রমে পবিত্র। (২) نجاست حقيقيه তথা প্রকৃত অপবিত্রতা দূরি করণার্থে ব্যবহৃত পানি। যেমন ইসতিঞ্জার পানি অথবা অপবিত্র কোন বস্তু ধৌত করা পানি। ইহা সর্বসম্মতিক্রমে অপবিত্র। (৩) نجاست حكمى (তথা বে অজুর অজুকৃত পানি) অথবা নৈকট্য ও পুণ্যার্জনের জন্য ওযুকৃত পানি এর হুকুমের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে উক্ত পানি সে নিজেও পবিত্র ও অপরকেও পবিত্র করতে পারে। ইমাম যুফর রহ. এর মতে ওযুওয়ালা ব্যক্তি সাধারণ পানি ব্যবহার করে তবে উক্ত ব্যবহৃত পানি নিজে পাক অন্যকেও পবিত্র করতে পারে। আর অজুহীন ব্যক্তির ওযুকৃত ব্যবহৃত পানি সে নিজে পাক অন্যকে পাক করতে পারে না। ইহা ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ এর অভিমত। ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে এমন অভিমত রয়েছে। অর্থাৎ طاهر غير مطهر -

শায়খাইন তথা ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন, ব্যবহৃত পানি নাপাক। অতঃপর ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে হাসান বিন যিয়াদ কর্তৃক বর্ণিত যে, ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে গলিজা তথা গাড়ো নাপাক। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করে বলেন, ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে খফিফা তথা লঘু নাপাক।

مَسْئَلَةُ الْبِئْرِ جَحْطٌ - وَ كُلُّ اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ اِلَّا جِلْدُ الْخِنْزِيْرِ وَالْاٰدَمِيِّ وَ شَعْرُ الْاِنْسَانِ وَالْمَيْتَةِ وَ عَظْمُهُمَا طَاهِرَانِ وَ تَنْزَحُ الْبِيْرُ بِوُقُوْعِ نَجَسٍ لَا بِبَعْرَتَى اِبِلٍ وَ غَنَمٍ وَ خُرْءِ حَمَامٍ وَ عُصْفُوْرٍ -

অনুবাদ : এবং কুপের মাসআলা جحط বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষ ও শুকরের চামড়া ছাড়া প্রত্যেক কাচা চামড়া যা দেবাগত করা হয় (তথা পরিশোধন করা হয়) তা পবিত্র হয়ে যায়। মানুষের এবং অন্য মৃত প্রাণীর চুল ও উভয়ের হাড্ডি পবিত্র। নাজাসাত পতিত হওয়ার দরুন কুপ নিষ্কাশন করা হবে (তথা কুপের পানি বের করা হবে) তবে উট ও ছাগলের লাদি এবং কবুতর ও চড়ুই পাখির বিষ্টা পতিত হওয়াতে নিষ্কাশনের প্রয়োজন নেই।

শব্দার্থ : مَسْئَلَةٌ (ج) مَسَائِلُ সমস্যা, প্রশ্ন, মাসআলা। اَلْبِئْرُ (ج) اَبَارٌ কুপ, কুয়া। اِهَابٌ কাচা চামড়া, অপরিশোধিত চামড়া। دُبِغَ পরিশোধিত চামড়া। دَبَغَ (ض،ن) دَبْغٌ - دِبَاغَةٌ চামড়া পাকা করা। جُلُوْدٌ (ج) جِلْدٌ চামড়া, ছাল। اَلْخِنْزِيْرُ (ج) خَنَازِيْرُ শুকর, শুয়র। ادمى মানুষ। شَعْرٌ (ج) اَشْعَارٌ চুল, পশম। مَيْتَةٌ মৃত। عَظْمٌ (ج) عِظَامٌ পশুমল, লাদ, গোবর। خُرْءٌ বিষ্টা। حَمَامٌ (ج) حَمَامَاتٌ কবুতর। عُصْفُوْرٌ চড়ুই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَمَسْئَلَةُ الْبِئْرِ جَحْطٌ الخ : উক্ত ইবারতে مسئلة হল مبتداء এবং جحط টি خبر হয়েছে। উহ্য ইবারত হল مسئلة البئر يضبط فيها بحروف جحط কুপের মাসআলায় (তিনটি মতামতকে) হরূফে جحط দ্বারা সম্পৃক্ত করা যায়। ج দ্বারা نجاست অপবিত্রতার দিকে ইঙ্গিত। ح দ্বারা (حال خود) স্বীয় অবস্থায় থাকার দিকে ইঙ্গিত। ط দ্বারা (طهارت) পবিত্রতার দিকে ইঙ্গিত। অতঃপর ج বর্ণ দ্বারা ইমাম আবু হানীফা রহ.এর দিকে এবং ح দ্বারা ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর দিকে এবং ط দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মাসআলাটির ব্যাখ্যা এভাবে যে যদি কোন জুনুবী ব্যক্তি (বালতি উত্তোলন বা শিতলতার জন্য) কুপে (যা ১০ × ১০ হাত নয়) ডুব দিল এমতাবস্থায় যে তার শরীরে কোন حقيقى نجاست থাকে এবং সে ওযু অথবা গোসলের নিয়াত করল না তখন প্রশ্ন দাড়ায়, ঐ পানি ও ব্যক্তি কি পাক না নাপাক। এবার এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন উক্ত পানি ও ব্যক্তি নাপাক। এজন্য যে, অপবিত্র ব্যক্তি পানিতে প্রবিষ্ট হওয়ায় পানি শরীরের কিছু অংশে লেগে যাওয়াতে সে স্থানের جنابت দুর হয়ে গেল। যা দ্বারা পানি مستعمل (ব্যবহৃত) প্রমাণিত হল। এবং مستعمل (ব্যবহৃত) পানি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে নাপাক। আর جنبى ব্যক্তি এজন্য নাপাক যে বাকি অঙ্গসমূহ নাপাক আর তা ব্যবহৃত পানিতে পৌঁছেছে। আর ব্যবহৃত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব নয়। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে কুপের পানি পাক তথা পবিত্র এবং উক্ত ব্যক্তি নাপাক তথা অপবিত্র। কেননা, তার নিকট ফরয আদায়ের জন্য সর্ব শরীরে পানি প্রবাহিত করা শর্ত। কিন্তু তা পাওয়া যায়নি বিধায় পানি ব্যবহৃত হয়নি। বরং তা পবিত্র রয়ে গেল। আর ঐ ব্যক্তি এজন্য অপবিত্র রয়ে গেল যে, তার হদস দূর হয়নি এবং নৈকট্যের ইচ্ছাও করে নি। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে উক্ত পানি ও ব্যক্তি উভয়ই পবিত্র। কারণ তার মতে ফরয আদায়ের লক্ষ্যে পবিত্র হওয়ার জন্য পানি প্রবাহিত করা শর্ত নয়। সুতরাং পানি প্রবাহিত ব্যতিরেকে ফরয আদায়ের কারণে উক্ত ব্যক্তি পাক। আর পানি এজন্য যে তিনির মতে পানি مستعمل হওয়ার জন্য নৈকট্যেরই ইচ্ছা করা শর্ত, যা এখানে পাওয়া যায়নি। বিধায় পানি পবিত্র রয়ে গেল। (কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর বিশুদ্ধ মত হল হদস দুর করার দ্বারাও পানি ব্যবহৃত হয়। তবে প্রয়োজনের ব্যাপার ভিন্ন।

قوله : وَكُلُّ اِهَابٍ الخ : প্রত্যেক প্রকারের চামড়া দিবাগত (পরিশোধন) করলে পবিত্র হয়ে যায় এবং শরয়ীভাবে তাতে উপকৃত হওয়া যায়। তার উপর নামাজ পড়া যায় এবং তা দ্বারা মসকিজা (পানির পাত্র) ইত্যাদি বানিয়ে পানি নেয়া যায়। হুজুর সা. ইরশাদ করেন, কাঁচা চামড়া পরিশোধ করলে পবিত্র হয়ে যায়। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী) তবে মানুষের এবং শুকরের চামড়া ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তা থেকে উপকার নেয়া হারাম। শুকরের চামড়া এ জন্য যে শুকর নিজেই نجس العين (মূলগতই নাপাক) এবং তার চামড়া পাট পাট হওয়ার দরুন তা দিবাগত (পরিশোধন) যোগ্য নয়। বিধায় তা সর্বদা নাপাক থাকে মানুষের চামড়া এজন্য যে ইহা অত্যান্ত সরু ও পাতলা যার দরুন তা দিবাগত দেওয়ার যোগ্য নয়। আর যদি একান্ত তা পরিশোধন করা যায় তবুও সৃষ্টির সেরা হওয়ার দরুন তার মান মর্যাদার ক্ষুণ্নতার দিক বিবেচনা করে তা থেকে উপকৃত হওয়াকে শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে।

قوله : وَ شَعْرُ الْاِنْسَانِ وَالْمَيْتَةُ الخ : হানাফী মাজহাবে মানুষের চুল ও হাড় পাক। এভাবে মৃত পশুর পশম, হাড়, খুর, শিং, নখ ও ঠোঁট, পাক।

শাফেয়ী মাজহাবে মানুষের চুল ও হাড় নাপাক। এভাবে মৃত পশুর পশম, হাড়, খুর, শিং, নখ ও ঠোঁট নাপাক। তাঁরা বলেন, মানুষের চুল ও হাড় এজন্য নাপাক যে মানুষের চুল ও হাড় উপকার লাভের যোগ্য নয়। এবং এগুলো বিক্রি করাও জায়েয নয়। বিধায় উভয়টি নাপাক। অন্যান্য প্রাণীর উপরোল্লিখিত বস্তু নাপাক হওয়ার কারণ বলেন, এগুলো মৃত পশুর অংশ। আর মৃত পশুর সবকিছু নাপাক।

হানাফী মাযহাবের দলিল : মানুষের চুল, হাড়, ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হল, মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা। তবে এগুলো নাজাসাতের পরিচায়ক নয়। তাছাড়া একথা সতঃসিদ্ধ যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. নিজের মাথার চুল হলক করে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বন্টন করেছেন। এগুলোও তো চুল পাক হওয়ার পরিচয় বহন করে। মৃত পশুর আলোচিত অঙ্গ পাক হওয়ার দলিল হল মৃত পশুর সমস্ত অঙ্গ নাপাক নয়, বরং শুধু ঐ সমস্ত অঙ্গ নাপাক যেগুলোর মধ্যে প্রাণ আছে। আর তা মউতের দ্বারা দুর হয়ে যায়। চুল হাড়ের প্রাণ নেই। কেননা, এগুলোর কোনটাকে যদি কাটা হয় তখন পশুর কোন কষ্ট অনুভূত হয় না। তাই প্রাণ না থাকায় এগুলোতে মৃত্যু প্রবেশ করতে পারে না। অথচ মৃত্যু হলো প্রাণ বিলোপ করার নাম।

قوله : وَتَنْزِحُ الْبِئْرُ الخ : কূপ সংক্রান্ত মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে সালফে সালেহীনের ফাতওয়ার উপর এখানে কিয়াসের কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং কিয়াসের দ্বারা কোন নির্ধারিত পরিমাণ বের করা যাবে না। কারণ এক্ষেত্রে বিপরিতমুখী দুটি কিয়াস রয়েছে। প্রথম কিয়াস হল পানি একেবারেই নাপাক না হওয়া। কেননা, কূপের নিম্নদেশ হতে পানি অনবরত বের হচ্ছেই তাই কূপের পানি ماء جارى (তথা প্রবাহিত পানি) এর অনুরূপ। আর ماء جارى না পাক পতিত হওয়ার দ্বারা নাপাক হয় না। দ্বিতীয় কিয়াস হল পানি পাকই না হওয়া। কেননা, কূপে নাপাক পড়ার দরুন পানি নাপাক হয়ে গেছে। এমনকি কূপের সবকিছুই নাপাক হয়ে গেছে। কাজেই কূপ সংক্রান্ত সকল মাসআলার ভিত্তি হবে সাহাবী ও তাবিয়ীনদের ফতোয়ায়, কিয়াসে নয়।

قوله : لَاِبَعْرَتَى اِبِلٍ الخ : যদি কূপে উট বা বকরীর দু একটি লাদি পড়ে, তবে ইসতিহসানের চাহিদা হল পানি নাপাক না হওয়া। (দু একটি লাদি দ্বারা সল্প পরিমাণ উদ্দেশ্য) ইসতিহসানের কারণ দুটি— ১. বন জঙ্গলের কূপে বাধা দানকারী কোন কিছু থাকে না। বরং গবাদী পশু তার আশপাশে মল ত্যাগ করে। ফলে বাতাস তা কূপে ফেলে। তাই প্রয়োজনের তাগিদে অল্প পরিমাণকে ক্ষমা করা হয়েছে। আর অধিক পরিমাণের মধ্যে যেহেতু প্রয়োজনের তাগিদ নেই, তাই তাকে ক্ষমা করা হয় নি। (২) ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, লাদি শক্ত জাতিয় জিনিস, তার সাথে অন্ত্রের আর্দ্রতা লেগেই থাকে। এজন্য লাদির ভিতর পানি প্রবেশ করতে পারে না। তাই নাজাসাতের প্রভাবও পানিতে পড়ে না। একারণে অল্প পরিমাণ ক্ষমার যোগ্য।

قوله : وَ خُرءِ حَمَامٍ وَ عُصفُورٍ الخ : কুবুতর ও চড়ুই পাখির বিষ্টা নিয়ে উলামায়ে কিরামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের মতে তা পাক বিধায় তা কুপে পতিত হলে কুপ নাপাক হবে না। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে নাপাক। তাই কুপে পড়লে কুপ নাপাক হয়ে যাবে। কিয়াসের চাহিদাও তাই। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিল হল—খাদ্য এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় রূপান্তরিত হয় দুভাবে। (এক) দুর্গন্ধ ও পঁচা পদার্থে রূপান্তরিত হওয়া। যেমন, পেশাব, পায়খানা, এগুলো সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। (দুই) ভালো ও উত্তম পদার্থে রূপান্তরিত হওয়া। যেমন, দুধ, ডিম, প্রভৃতি। এগুলো সর্বসম্মতিক্রমে পাক। এখানে কবুতর ও চড়ুই পাখির বিষ্টা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো মুরগীর বিষ্টার অনুরূপ। বিধায় তা নাপাক। আমাদের দলিল হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনগণ মসজিদে কবুতরের অবাধ বিচরণের অনুকুলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। অথচ মসজিদের পবিত্রতার নির্দেশ রয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী ان طهرا بيتى (আমার ঘর তথা মসজিদ পবিত্র রাখ) অনেক হাদীসে মসজিদ পবিত্র রাখার নির্দেশ করা হয়েছে। বিধায় কুরআন হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে মসজিদ পবিত্র রাখা জরুরী। মোটকথা, সাহাবারা অবাধে মসজিদে কবুতর বিচরণ করতে দিতেন। এমন কি মসজিদে হারামে কবুতরের মেলা জমে যেতো। কবুতরের বিষ্টা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামগণ অবগত ছিলেন। সুতরাং মসজিদে কবুতর অবাধে বিচরণ করার ইজাজত এ কথার দলিল যে, কবুতরের বিষ্টা পাক। সুতরাং তা যদি কুপে পড়ে তবে কুপের পানি নাপাক হবে না।

وَ بَولُ مَا يُؤكَلُ لَحمُهٗ نَجِسٌ لَا مَالَم يَكُن حَدَثًا وَ لَا يُشرَبُ اَصلًا وَ عِشرُونَ دَلوًا اَوسَطًا بِمَوتِ نَحوِ فَارَةٍ اَو اَربَعُونَ بِنَحوِ حَمَامَةٍ وَ كُلُّهٗ نَحوِ شَاةٍ وَ اِنتِفَاخِ حَيَوَانٍ اَو تَفَسُّخِهٖ وَمِائَتَانِ لَو لَم يُمكِن نَزحُهَا و نَجَّسَهَا مُذ ثَلٰثٍ فَارَةٌ مُنتَفِخَةٌ اَو مُتَفَسِّخَةٌ جُهِلَ وَقتُ وُقُوعِهَا وَ اِلَّا مُذ يَومٍ وَ لَيلَةٍ -

---

অনুবাদ : এবং হালাল পশুর প্রস্রাব (নজস) অপবিত্র, তবে যাতে হাদাস হয় না এবং মূলত পান করা যায় না, তা নজস হয় না। কুপে ইঁদুরের অনুরূপ প্রাণী মরে যাওয়াতে মধ্যম পর্যায়ের বিশ বালতি পানি বের করা হবে এবং কবুতর পরিমাণ প্রাণী মরে যাওয়াতে চল্লিশ বালতি এবং বকরীর সম পর্যায়ের প্রাণী মরে যাওয়াতে এবং তা ফুলে উঠাতে বা ফেটে যাওয়াতে কুপের সম্পূর্ণ পানি বের করতে হবে। পূর্ণ পানি বের করা সম্ভব না হলে দুইশত বালতি পানি বের করতে হবে। ফুলে উঠা বা ফেটে যাওয়া ইঁদুর (যদি পাওয়া যায় তবে) তিন দিন তিন রাত কুপ নাপাক ধরে নিচ্ছে যদি পতিত হওয়ার সময় জানা না থাকে। নতুবা (অর্থাৎ যদি ফুলে না বা ফাটে না তবে) এক দিন এক রাত, (কুপ নাপাক ধরে নিতে হবে।)

শব্দার্থ : دَلوٌ (ج) دِلَاءٌ ، اَدْلَاءٌ - বালতি। اَوسَطُ (م) وُسطٰى (ج) وُسَطٌ - মধ্য, মধ্যবর্তী, মধ্যম। فَارَةٌ ব.ব. فَارَاتٌ - ইঁদুর। شَاةٌ (ج) شَاءٌ - ছাগল, বকরী। اِنتِفَاخٌ ইহা اِنفِعَالٌ থেকে ফুলে উঠা, স্ফীত হওয়া। تَفَسُّخٌ ইহা تَفَعُّلٌ থেকে পৃথক পৃথক হয়ে যাওয়া। ফাটিয়া যাওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَبَولُ مَا يُؤكَلُ الخ : হালাল পশুর পেশাবে কুপ নাপাক হয়ে যায়। অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে হালাল প্রাণীর প্রস্রাব নাপাক বিধায় তা কুপে পড়লে কুপের পানি নাপাক হয়ে যাবে, এবং সমস্ত পানি বের করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে হালাল প্রাণীর প্রস্রাব পাক তাই কুপে পতিত

হলে কূপের পানি নাপাক হবে না। তবে যদি পেশাব পানির উপর প্রবল হয় তাহলে মুত্তাহির (অন্যকে পবিত্রকারী) থাকবে না। শুধু নিজে পাক থাকবে। শাইখাইনের দলিল হল—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْتَنْزِهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা রাযি. সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন, তোমরা পেশাব থেকে বেচে থাক। কেননা, অধিকাংশ কবরে আজাব এ কারণেই হয়ে থাকে। উক্ত হাদীসে ব্যাপকভাবে পেশাব থেকে পরহেয করার কথা বলা হয়েছে। পেশাব হালাল পশুর হউক বা হারাম পশুর হউক। হাদীসের استنزهوا। শব্দটি صيغه امر যা উজুবের জন্য আসে। বুঝা গেল পেশাব নাপাক। না হয় তা থেকে বেচে থাকার নির্দেশ দেয়া হত না। সুতরাং তা যদি পানিতে পড়ে তবে পানি নাপাক করে দেবে এবং কূপে পড়লে তার সবটুকু পানি বের করে নিতে হবে।

قوله : لَامَالَمْ يَكُنْ الخ : উক্ত ইবারাত بول এর উপর عطف হয়েছে তথা مَالَايَكُنْ حَدَثًا لَايَكُنْ نَجَسًا অর্থাৎ মানুষের শরীর থেকে যে বস্তু বের হওয়াটা হাদাসের কারণ হয় না তা نجس (অপবিত্র) নয়। অর্থাৎ অল্প বমি, রক্ত, পুজ, ইত্যাদি যা তার সস্থান থেকে গড়িয়ে পড়ে না যদি ইহা পানিতে পড়ে অথবা কাপড়ে শরীরে ইত্যাদিতে লেগে যায়। তবে তা নাপাক হয় না। ইহা ইমাম আবু ইউসূফ রহ. এর মতামত। ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, উক্ত পানি বা শরীর বা কাপড় নজস তথা অপবিত্র হয়ে যাবে। আল্লামা ইসকাফ ও হিন্দুয়ানী রহ. ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতের উপর ফাতাওয়া প্রদান করেন। হিদায়া গ্রন্থকার রহ. ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতামতকে সত্তায়ন করেন।

قوله : وَعِشْرُوْنَ الخ যেসকল প্রাণী কূপে পড়ে তার সাতটি সূরত হতে পারে। কেননা, ঐ পশু হয়তো ইঁদুর বা তার অনুরূপ হবে। অথবা মুরগী বা তার অনুরূপ হবে। কিংবা বকরী বা তার অনুরূপ হবে। ফুলে ফেটে গেছে বা যায় নি। আলোচিত প্রাণীগুলো যদি জীবিত বের হয় তবে কূপ নাপাক হবে না। কিন্তু শুকর যেহেতু نجس العين বিধায় তা যদিও জীবিত বের হয় তথাপি কূপের পানি নাপাক হয়ে যাবে। উক্ত প্রাণীগুলো যদি মৃত বের হয় (কিন্তু এখনও ফেটে যায় নি) তবে তার হুকুম নিম্নরূপ: প্রাণীটি যদি ইঁদুর বা তার অনুরূপ হয় তবে তাকে বের করে বিশ বালতি পানি বের করা ওয়াজিব, আর ত্রিশ বালতি মুস্তাহাব।

দলিল হল : হযরত আনাস রাযি. এর হাদীস, হুজুর সা. বলেছেন, ইঁদুর কূপে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তৎক্ষণাৎ তা বের করে বিশ বালতি পানি তুলে ফেলে দিতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস রাসূল সা. ত্রিশ বালতি পানি ফেলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। উভয় হাদীসের সামঞ্জস্য এভাবে যে, আনাস রাযি. এর হাদীস ওযুব এর উপর, আর ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস মুস্তাহাব এর উপর। (বালতি দ্বারা মাঝারি ধরণের বালতি উদ্দেশ্য)।

(২) প্রাণীটি কবুতর বা তার অনুরূপ হয় তবে তা বের করে চল্লিশ থেকে ষাট বালতি পানি বের করতে হবে।

দলিল : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি মুরগী সম্পর্কে বলেছেন, যদি তা কূপে পড়ে মৃত্যু বরণ করে তবে চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে। (৩) প্রাণীটি যদি বকরী বা তার অনুরূপ হয় তবে কূপের বিদ্যমান সবটুকু পানি বের করে ফেলতে হবে। দলিল : একবার এক [illegible] ব্যক্তি কূপে পড়ে মৃত্যুবরণ করল। তখন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ও ইবনে যুবায়ের রাযি. কূপের সবটুকু পানি বের করে ফেলে দেওয়ার ফতোয়া দিয়েছিলেন।

উল্লেখিত প্রাণী বা তাদের অনুরূপ প্রাণী কূপে পড়ে মৃত্যু বরণ করে [illegible] পচে গলে ফেটে যায় তবে কূপের সবটুকু পানি বের করতে হবে। দলিল হল, প্রাণীটি ফুলে পচে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে তার নাপাক অংশের

আদ্রতা পানিতে ছড়িয়ে পড়বে, যার দরুন কুপের সর্বপানি নাপাক হয়ে যাবে। বিধায় কুপের সব পানি তুলে ফেলে দিতে হবে।

قوله : نَجَّسُهَا مُذْ الخ : কুপে কোন প্রাণী মৃত পাওয়া গেলে যা এখনও ফুলেনি ও ফাটেনি এবং উক্ত কুপের পানি দ্বারা মানুষ ওযু করে নামাজ পড়ে থাকে তবে একদিন এক রাতের নামাজ পুনরায় পড়ে নিবে এবং প্রত্যেক ঐ বস্তু যা উক্ত কুপের পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে তা (একদিন একরাতের) পুনরায় ধৌত করে নিবে। কিন্তু প্রাণী ফেটে যায় এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তবে তিন দিন ও তিন রাত্রের নামায পুনরায় পড়তে হবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতামত। সাহেবাইন রহ. এর মতে প্রাণী পতিত হওয়ার সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কিছুই পুনরায় করতে হবে না।

وَالْعِرَقُ كَالسُّوْرِ وَ سُوْرُ الْاٰدَمِيِّ وَالْفَرَسِ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ وَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ وَ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ وَالْهِرَّةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَ سَوَاكِنِ الْبُيُوْتِ مَكْرُوْهٌ وَالْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مَشْكُوْكٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَ يَتَيَمَّمُ اِنْ فَقَدَ الْمَاءُ وَاَيًّا قَدَّمَ صَحَّ بِخِلَافِ نَبِيْذِ التَّمَرِ

অনুবাদ : (প্রত্যেক প্রাণীর) ঘাম (তার) উচ্ছিষ্টের ন্যায় (বিবেচ্য হয়ে থাকে) মানুষ ও ঘোড়া এবং হালাল প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পবিত্র (পাক)। কুকুর, শুকর ও হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র (নাপাক)। বিড়াল ও ছেড়ে দেয়া মুরগি ও হিংস্র পাখি এবং গৃহে অবস্থানকারী প্রাণীর উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত। যদি গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পানি ছাড়া অন্য পানি পাওয়া না যায় তবে তা দ্বারা ওযু করবে ও তায়াম্মুম করবে এবং যে কোনটিকে (অর্থৎ ওযু অথবা তায়াম্মুম) আগে করা বিশুদ্ধ। কিন্তু নবীজে তামার (খুরমা ভিজানো পানি) এর ব্যতিক্রম। (অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, যদি খুরমা ভিজানো পানি ছাড়া আর পানি পাওয়া যায় না তবে তা দ্বারা ওযু করবে কিন্তু তায়াম্মুম করবে না।)

শব্দার্থ : العِرَقُ - ঘাম, ঘর্ম। اَلسُّوْرُ (ج) اَسَارٌ - খাদ্য বা পানীয়ের অবশিষ্টাংশ। فَرَسٌ (ج) أَفْرَاسٌ - ঘোড়া, অশ্ব। سِبَاعٌ - হিংস্র। بَهَائِمٌ - ইহা بَهِيْمَةٌ এর ব.ব. পশু, চতুষ্পদ প্রাণী। اَلْمُخَلَّاةُ প্রকাশ্যে চলাফেরাকারী। سِبَاعُ الطَّيْرِ হিংস্র পাখি। حِمَارٌ গাধা। بَغْلٌ - খচ্চর। مَشْكُوْكٌ - সন্দেহপূর্ণ। نَبِيْذُ التَّمَرِ খেজুর ভিজানো পানি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَالْعِرَقُ الخ : প্রত্যেক প্রাণীর ঘামের হুকুম তার উচ্ছিষ্টের হুকুমের মত। অর্থাৎ যদি তার উচ্ছিষ্ট পাক হয় তবে তার ঘামও পাক। তার উচ্ছিষ্ট নাপাক হলে তার ঘামও নাপাক। কেননা, ঘামও হালাল গোশত হতে সৃষ্টি হয়। বিধায় গোসতের যে হুকুম হবে লালা ও ঘামের একই হুকুম হবে।

قوله : وَسُوْرُ الْاٰدَمِيِّ الخ : আমাদের মতে سؤر মোট চার প্রকার : (১) পাক : যেমন মানুষ ও হালাল প্রাণীর উচ্ছিষ্ট। অর্থাৎ মানুষের উচ্ছিষ্ট পাক। সে মুসলমান, কাফির, জুনুবী, হায়েযা, যাই হউক না কেন। এমনিভাবে হালাল প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পাক। যেমন, গরু, বকরী, উট ইত্যাদি। দলিল : যেহেতু কোন বস্তু মুখের লালার সাথে মিশ্রিত হয়ে উচ্ছিষ্ট হয়, আর লালা সৃষ্টি হয় গোশত থেকে। আর এসকল প্রাণীর গোশত পাক, তাই লালাও পাক হবে। যেহেতু লালা পাক সেহেতু লালার সাথে মিশ্রিত বস্তুও পাক।

قوله : وَالْهِرَّةِ الخ : (২) মাকরূহ যেমন বিড়ালের উচ্ছিষ্ট। বিড়ালের উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে ফুকাহায়ে আহনাফের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তরফাইনের মতে পাক, তবে মাকরূহ। ইমাম তাহাবী রহ. এর মতে

মাকরূহে তাহরিমী আর ইমাম কারখী রহ. এর মতে মাকরূহে তানজিহী। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে মাকরূহও নয়। ইহা ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অভিমতও বটে। তরফাইন এর দলিল হল, হুজুর সা. বলেছেন, الهرة سبع বিড়াল হিংস্রপ্রাণী। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হল বিধান বর্ণনা করা। অর্থাৎ বিড়াল হিংস্র প্রাণীর অনুরূপ। তাই হিংস্র প্রাণীর ন্যায় তার উচ্ছিষ্টও নাপাক হওয়া উচিত। অথচ নাপাক বলা হয় না। কারণ সে ঘরের অভ্যন্তরে সর্বদা ঘুরাফিরা করে বিধায় তার নাজাসাতের বিধান রহিত হয়ে যায়। আর মাকরূহ হওয়ার বিধান বাকি থেকে যায়।

قوله : وَ سُوْرُ الدَّجَاجَةِ الخ : ছেড়ে দেওয়া মুরগীর উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। কেননা, উক্ত মুরগী নাজাসাত, মলমূত্র ইত্যাদিতে ঘুরে। তাই তার উচ্ছিষ্ট মাকরূহ থেকে খালি নয়। তবে যদি মুরগী বাধা থাকে এবং তার ঠোঁট তার পায়ের নিচ পর্যন্ত না পৌঁছে তবে তার উচ্ছিষ্ট মাকরূহ হবে না।

قوله : وَسَوَاكِنُ الْبُيُوْتِ الخ : ঘরে অবস্থানকারী প্রাণী যথা সাপ, ইঁদুর ইত্যাদির উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। দলিল হলো, এগুলোর গোশত হারাম হওয়া একথার প্রমাণ বহন করে যে, তার উচ্ছিষ্ট নাপাক হোক, তবে এগুলো গৃহে ঘুরাফেরা করার কারণে নাজাসতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। আর কারাহাত বাকি রয়ে গেছে।

قوله : وَالْبَغْلِ مَشْكُوْكٌ الخ : গৃহপালিত গাধা এবং খচ্চর যা গাধার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, উভয়ের উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত। অধিকাংশ মাশায়েখের মতে এটাই হুকুম। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, এগুলোর উচ্ছিষ্ট তাহির মুতাহহির। তার মতে যে প্রাণীর চামড়া উপকার যোগ্য তার উচ্ছিষ্ট পাক। গাধার ঘাম এর ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে তিনটি রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে— (১) গাধার ঘাম পাক। নামাজ জায়েয হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। (২) নাজাসাতে খফিফা। (৩) নাজাসাতে গলীযা। তবে মশহুর বর্ণনা অনুযায়ী পাক। সুতরাং ঘামের ন্যায় তার উচ্ছিষ্টও পাক হবে। কেননা, ঘাম ও লালা গোশত থেকে সৃষ্টি হয়। তাই উভয়টির হুকুম একই। ইমাম মুহাম্মদ রহ. গাধার উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরও বলেন, চারটি বস্তুতে কাপড় ডুবে গেলে কাপড় নাপাক হবে না। ঐ চারটি জিনিস হলো : গাধার উচ্ছিষ্ট, ব্যবহৃত পানি, গাধার দুধ এবং হালাল প্রাণীর পেশাব। গাধার উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত হওয়ার কারণ দুটি। (এক) তা হালাল ও হারাম হওয়া দলিলের ভিত্তিতে। যেমন বর্ণিত আছে—

اَنَّ غَالِبَ ابْنِ اَبْحُرٍ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَمْ يَبْقَ لِيْ مَالٌ اِلَّا حُمَيْرَاتٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلْ مِنْ سَمِيْنِ مَالَكَ -

'গালিব ইবনে আবহার রাযি. রাসূলুল্লাহ্ সা. কে জিজ্ঞেস করলেন— হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট গাধা ছাড়া আর কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, যা মোটাতাজা তা খেয়ে নাও।' এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল গাধার গোশত হালাল। অন্যত্র বর্ণিত আছে, اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُوْمَ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرٍ (রাসূল সা. খায়বারের দিন পালিত গাধার গোশত হারাম করেছেন।) উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গাধার গোশত হারাম। দ্বিতীয় কারণ : গাধার গোশত হারাম হালাল হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে নাপাক আর ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে পাক হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। শায়খুল ইসলাম রহ. বলেন, গাধার গোশত কোন ধরণের সন্দেহ ব্যতিত হারাম এবং তার উচ্ছিষ্ট নাপাক। কেননা, এখানে মুহাররিম ও মুবীহ একত্রিত হয়েছে। এ অবস্থায় মুহাররিমটা মুবীহ এর উপর প্রাধান্য পায়।

قوله : وَ يَتَوَضَّأُ الخ : ওযুকারী ব্যক্তির কাছে যদি সন্দেহযুক্ত পানি ছাড়া অন্য কোন পানি না থাকে তবে তার হুকুম হল ঐ পানি দ্বারা ওযু করবে পরে তায়াম্মুম করবে। আগপিছ করতে কোন সমস্যা নেই। তবে ইমাম যুফার রহ. এর মতে শুধু ওযু অগ্রে করা জায়েয। দলিল : সন্দেহযুক্ত এমন পানি শরীয়তের হুকুম মতে যা ব্যবহার করা ওয়াজিব তাই তা স্বাধারণ সাদৃশ্য।

আমাদের দলিল : সন্দেহযুক্ত পানি দ্বারা ওযু ও তায়াম্মুমের মধ্য থেকে যে কোন একটি পবিত্রকারী। তাই উভয়ের একত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ক্রমবিন্যাস দ্বারা কোন ফায়দা নেই।

قوله : بِخِلَافِ نَبِيْذِ الخ : খেজুর ভেজানো পানি যদি পুরুপুরি মিষ্টিও ঘন হয়ে যায় তবে সর্ব সম্মতিক্রমে তা দ্বারা ওযু হবে না। আর যদি পুরুপুরি মিষ্টি না হয় এবং তরল থাকে তবে সর্ব সম্মতিক্রমে তা দ্বারা ওযু জায়েয। আর যদি খেজুর ভেজানো পানি পুরুপুরি মিষ্টি হয়ে যায় কিন্তু তরল থাকে। অর্থাৎ সিরকার ন্যায় ঘন না হয় তবে তা দ্বারা ওযু হবে কি না এনিয়ে উলামাদের নিকট মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এ ব্যাপারে দুটি উক্তি আছে। তা দ্বারা ওযু করবে তায়াম্মুমের প্রয়োজন নেই। আহকামে কুরআনে আবু বকর রাজী রহ. ইহাকে প্রসিদ্ধ লিখেছেন। নূহ বিন আবি মারয়াম ও উসাইদ ইবনে উমর হাসান বিন যিয়াদ এর বর্ণনা মতে তা দ্বারা ওযু জায়েয নেই। বরং তায়াম্মুম করতে হবে। ইহা ইমাম শাফেয়ী রহ., মালিক রহ., আহমদ রহ. ও আবু ইউসুফ রহ. এরও অভিমত। নাবিযে তামার দ্বারা ওযু যায়েয হওয়ার প্রমাণ হাদীসে লাইলুতুল জিন। সে রাতে হুজুর পানি না পাওয়ার দরুন নাবিজে তামার দ্বারা অযু করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) যাদের কাছে নাবিযে তামার দ্বারা ওযু জায়েয তাদের কথা হলো হাদীসে লাইলাতুল জিন তায়াম্মুমের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কেননা, তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। আর লাইলাতুল জিন ঘটনাটি ঘটেছে মক্কাতে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, নবীযে তামার দ্বারা ওযুর সাথে তায়াম্মুম করতে হবে। কেননা, লাইলাতুল জিন এর হাদীসে ইজতেরাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত: লাইলাতুল জিন এর হাদীসে তায়াম্মুমের আয়াতে কোনটি প্রথমে এবং কোনটি শেষে সেটি নির্ধারণ করা জটিল যদ্বারা একটিকে রহিত এবং অপরটিকে রহিতকারী ধরা যাবে।

بَابُ التَّيَمُّمِ

পরিচ্ছেদ তায়াম্মুমের বিবরণ

يَتَيَمَّمُ لِبُعْدِهِ مِيلًا عَنْ مَاءٍ أَوْ لِمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ خَوْفِ عَدُوٍّ وَ سَبُعٍ أَوْ عَطَشٍ أَوْ فَقْدِ آلَةٍ مُسْتَوْعِبًا وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ وَلَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا بِطَاهِرٍ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَقْعٌ وَبِهِ بِلَا عِجْزٍ نَاوِيًا فَلَغَا تَيَمُّمُ كَافِرٍ لَا وَضُوْءُهُ -

অনুবাদ : তায়াম্মুম করা যায় পানি থেকে এক মাইল দুরে হলে অথবা অসুস্থ হলে বা ঠান্ডা হলে (তথা পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বৃদ্ধি হওয়ার শংকা থাকে) অথবা পিপাসার্ত হওয়ার ভয় থাকে (তথা পানি যে পরিমাণ আছে যদি তা দিয়ে অজু করে নেয় তবে পরে পান করার মত কোন পানি না পাওয়া গেলে) অথবা বালতির রশি ইত্যাদি হারিয়ে গেলে। (উপর উল্লেখিত অবস্থাসমূহে তায়াম্মুম করা সহীহ।)

(তায়াম্মুমের পদ্ধতি) মুখ এবং উভয় হাত কনুইসহ পূর্ণভাবে মাটি জাতীয় কোন পবিত্র বস্তু দ্বারা মাসেহ করা যদি ও জুনুবী বা ঋতুবতী হয় এবং যদিও উক্ত মাটিতে ধুলো বালি নাও হয়। মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে অপারগ না হওয়া অবস্থায়ও ধুলি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয নিয়ত করা অবস্থায়। (তথা তায়াম্মুমে নিয়ত করা শর্ত।) সুতরাং কাফিরের তায়াম্মুম নিরর্থক, তবে অজু হয়ে যাবে। (কেননা অজুতে নিয়ত করা শর্ত নয়।

শব্দার্থ : اَلتَّيَمُّمُ তায়াম্মুম এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শরিয়তের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলা হয় তাহারাত লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটির ইচ্ছা করা (ব্যবহার করা)। শায়খুল আদব রহ. শরহে নিকায়া এর টিকায় আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. এর বরাত দিয়ে লিখেন যে, শরীয়াতের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলা হয় পবিত্র মাটি দ্বারা চেহারা ও উভয় হাত মাসেহ করা। (আশরাফুল হিদায়া) مِيْلٌ (ج) اَمْيَالٌ মাইল। عَدُوٌّ (ج) اَعْدَاءٌ - শত্রু, দুশমন। عَطَشٌ - তৃষ্ণা, পিপাসা। فَقْدٌ - হারানো। اَلَةٌ (ج) الات অস্ত্র, যন্ত্র, হাতিয়ার, কল। مستوعبا - استفعال থেকে استعاب আয়ত্ব করণ, ধারণ (Comprehensjon) এখানে مستوعبا উহ্য موصوف এর صفت হয়েছে (يَتَيَمَّمُ تَيَمُّمًا مُسْتَوْعِبًا) আল্লামা যাইলায়ী (রহ.) مُسْتَوْعِبًا কে يتيمم এর ضمير থেকে حال হওয়াটাকে যায়েজ বলেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : তায়াম্মুম এর সুবুত কোরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন। فَلَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُ صَعِيْدًا طَيِّبًا الخ তোমরা যদি পানি না পাও তবে, পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' (মায়িদা)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

جُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَ طُهُوْرًا اَيْنَمَا اَدْرَكَتْنِى الصَّلٰوةُ تَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ -

(জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে যেখানেই নামাজের সময় হয় তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নেই)। অন্য এক হাদীসে আছে—

اَلتُّرَابُ طُهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلٰى عَشْرِ حِجَجٍ مَالَمْ يَجِدِ الْمَاءَ -

মাটি মুসলমানের পবিত্রকারী যদিও দশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে যায় যে পানি পাওয়া যায় না। (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

কোরআন হাদীসের আলোকে শরিয়তে তায়াম্মুমের অবস্থান সুদৃঢ় তবে তার নির্ধারিত নিয়ম কানুন রয়েছে যা নিম্নে প্রদত্ব হল।

قوله : يَتَيَمَّمُ الخ : তায়াম্মুম কখন জায়েয। (১) পানি এক মাইল দূর হলে। (২) অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা থাকলে। (৩) অধিক ঠান্ডার দরুন অসুস্থ হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হলে। (৪) শত্রু বা হিংস্র প্রাণীর ভয় হলে। (৫) কূপ থেকে পানি তুলার কোন বস্তু না থাকলে তখন তায়াম্মুম করা জায়েয।

قوله : وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ الخ : এখানে দুটি মাসআলা রয়েছে। তায়াম্মুমের সময় দু'হাত কতটুকু পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। (২) তায়াম্মুমের সময় কতবার হাত মাটিতে মারতে হবে। প্রথম মাসআলা : ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম মালিক রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. এবং জমহুরের মতে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা ওয়াজিব। (২) ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রহওয়াই ইমাম আউযায়ী এবং আহলে জাহের এর মতে শুধু মাত্র কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করা ওয়াজিব। (৩) আল্লামা ইবনে শিহাব জুহরী রহ. এর মতে হাতের তায়াম্মুম গর্দান ও বগল পর্যন্ত হবে। জমহুরের উভয় মাসআলার দলিল। প্রথম দলিল—

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ -

২য় দলিল হযরত আম্মার রাযি. এর হাদীস যাহাতে বলা হয়েছে—

كُنْتُ فِى الْقَوْمِ حِيْنَ نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ فَاَمَرْنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرْبَةً اُخَرَ لِلْيَدَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ

উপর উল্লেখিত হাদীস সমূহের মর্মার্থ হল তায়াম্মুমের জন্য দুবার হাত মারা এবং একবার মুখ মাসেহ করা এবং একবার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা।

قوله : مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ الخ : ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে প্রত্যেক ঐ বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয যা মাটি বা মাটি জাতীয় হয়। মাটি জাতীয় যেমন বালু, পাথর, সুরকি, চুনা ইত্যাদি। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে শুধু মাটি ও বালু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, শুধু উৎপাদন কারি মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দলিল— আল কোরআনের আয়াত فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا الخ উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত صعيد ভূ-পৃষ্ঠের নাম। অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠের উঁচু অংশ। প্রত্যেক ঐ বস্তু যা, صعيد হবে তথা মাটি জাতীয় হবে তার দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ হবে। এদিকে طيب এর অর্থ ইমাম শাফেয়ী রহ. উৎপাদনকারী বলেছেন। আমরা বলি طيب দ্বারা তাহির অর্থও হতে পারে। আল্লাহর বাণী حلالا طيبا এর মধ্যে طيب অর্থ তাহির তথা পাক, সুতরাং এখানেও طيب দ্বারা পাকই উদ্দেশ্য হবে। কেননা, এস্থানটি হলো তাহারাতের স্থান।

قوله : وَاِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَقْعٌ الخ : ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে মাটির উপরে ধুলি থাকা শর্ত নয়। কেননা, কুরআনুল করীমে طيبا صعيدا শব্দটি مطلق বালু হওয়া না হওয়া কোন ব্যাখ্যা এখানে নেই। সুতরাং সাধারণ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয।

قوله : نَاوِيًا الخ : হানাফীদের মতে তায়াম্মুম সহিহ হওয়ার জন্য নিয়ত করা ফরয। কেননা, তায়াম্মুমের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা করা। আর ইচ্ছার নাম হল নিয়াত। আর নিয়ত ছাড়া ইচ্ছা সঠিক হয় না। তবে যদি তাহারাতের কিংবা নামাজের বৈধ হওয়ার নিয়ত করে তাহলে তাই যথেষ্ট। আর তায়াম্মুমকারী নিয়তের আহাল তথা মুসলমান হওয়া জরুরী। তাই কোন কাফির তায়াম্মুম করে তবে তার তায়াম্মুম হবে না। কিন্তু যদি সে ওযু করে তবে তার ওযু হবে। কেননা, ওযুতে নিয়ত শর্ত নয়।

وَلَا يَنْقُضُهُ رِدَّةٌ بَلْ نَاقِضُ الْوُضُوْءِ وَقُدْرَةُ مَاءٍ فَضَلٍ عَنْ حَاجَتِهٖ وَهِىَ تَمْنَعُ التَّيَمُّمَ وَ تَرْفَعُهُ وَ رَاجِى الْمَاءِ يُؤَخِّرُ الصَّلٰوةَ وَ صَحَّ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلِفَرْضَيْنِ وَ خَوْفِ فَوْتِ صَلٰوةِ جَنَازَةٍ اَوْ عِيْدٍ - وَ لَوْ بِنَاءً لَا لِفَوْتِ جُمُعَةٍ وَ وَقْتٍ وَلَمْ يَعُدْ اِنْ صَلّٰى بِهٖ وَنَسِىَ الْمَاءَ فِى رَحْلِهٖ وَ يَطْلُبُهُ غَلْوَةً اِنْ ظَنَّ قُرْبَهُ وَاِلَّا لَا وَيَطْلُبُهُ مِنْ رَفِيْقِهٖ فَاِنْ مَنَعَهُ تَيَمَّمَ وَ اِنْ لَمْ يُعْطِهٖ اِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهٖ وَلَهٗ ثَمَنٌ لَا يَتَمَّمُ وَ اِلَّا تَيَمَّمَ وَ اَوْ اَكْثَرُهٗ مَجْرُوْحًا تَيَمَّمَ وَ بِعَكْسِهٖ يَغْسِلُ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا -

---

অনুবাদ : ধর্ম ত্যাগে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয় না, বরং ওযু ভঙ্গ হওয়ার কারণে ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহারে সামর্থ হলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। পানি ব্যবহারে সামর্থ হওয়াটা তায়াম্মুমকে বাধা দেয় এবং তায়াম্মুম শেষ করে দেয়। পানির প্রত্যাশি ব্যক্তি নামাজকে একটু পিছিয়ে দিবে। তায়াম্মুম করা সহীহ ওয়াক্তের পূর্বে বা দু ফরজ আদায়ের জন্য বা জানাজার নামাজ অথবা ঈদের নামাজ ছুটে যাওয়ার ভয় হলে, যদিও বিনা অবস্থায় হয়। (অর্থাৎ নামাজ তো শুরু করেছিল অজু দ্বারা কিন্তু হঠাৎ অজুহীন হয়ে গেল তবে তাৎক্ষণিক তায়াম্মুম করে নামাজ পূর্ণ করতে পারবে। কারণ উক্ত নামাজদ্বয়ের কোন কাযা নেই।) কিন্তু জুমআ বা ওয়াক্তি নামাজ ছুটে

যাওয়ার আশংকা হলে তায়াম্মুম জায়েজ নহে এবং পুনরায় আদায় করতে হবে না যদি তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে অথবা বাহনের জীনে পানির কথা ভুলে যায়, (অর্থাৎ, পুনরায় ওযু করে পড়তে হবে না।) আর যদি ধারণা হয় নিকটেই পানি তবে প্রায় চারশত গজ পর্যন্ত পানি অন্বেষন করতে হবে নতুবা না (অর্থাৎ নিকটে পানি পাওয়ার কোন ধারণা না থাকে তবে অন্বেষন করার প্রয়োজন নেই। সফর সঙ্গীর কাছে পানি চাইবে (যদি তার কাছে পানি থাকে) যদি সে পানি না দেয় তবে তায়াম্মুম করবে। আর যদি নির্ধারিত মূল্য ব্যতিরেকে না দেয় এদিকে গ্রহিতার নিকট মূল্য থাকে তবে তায়াম্মুম করা যাবে না। আর যদি মূল্য না থাকে তবে তায়াম্মুম করা যাবে। আর যদি অঙ্গের অধিকাংশ স্থান জখমী হয় তবে তায়াম্মুম করা যাবে। আর তা না হলে ধৌত করতে হবে। কিন্তু উভয়টি একসাথে একত্র করা যাবে না।

শব্দার্থ : رِدَّةٌ - মুরতাদ হওয়া, স্বধর্মত্যাগী। فَضَلَ (ن) فَضْلًا অতিরিক্ত হওয়া। উদ্বৃত্ত থাকা। راجي الماء পানির আশাবাদী। يُؤَخِّرُوْ - تفعيل থেকে تَوْخِيْرًا বিলম্বিত করা, দেরি করানো। فوت ছুটে যাওয়া, হাত ছাড়া হওয়া। نَسِيَ (س) نِسْيَانٌ ভুলে যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া। رَحْلٌ (ج) رِحَالٌ জিন, মালপত্র। يَطْلُبُ (ن) طَلَبًا সন্ধান করা, খোজ করা, চাওয়া। رَفِيْقٌ (ج) رِفَاقٌ - رُفَقَاءُ সাথী, সঙ্গী, বন্ধু। ثَمَنٌ (ج) أَثْمَانٌ মূল্য, দাম। مَجْرُوْحٌ (م) مَجْرُوْحَةٌ - আঘাত প্রাপ্ত, আহত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَايَنْقُضُهُ رِدَّةٌ الخ : কোন মুসলমান তায়াম্মুম করার পর ধর্মচ্যুত হয়ে যায়। তারপর পুনরায় ইসলাম গ্রহন করে তাহলে তার পূর্বেকার তায়াম্মুম অক্ষুণ্ন থাকবে। কিন্তু ইমাম যুফর রহ. বলেন, বাতিল হয়ে যাবে কেননা, কুফর ও তায়াম্মুম উভয়টি বিপরীতমুখী বিষয়। তার প্রথম ও শেষ অবস্থা উভয়ই সমান হবে। অর্থাৎ যেমনিভাবে প্রথম অবস্থায় কুফর তায়াম্মুমের বিপরীত এমনিভাবে শেষ অবস্থা ও বিপরীত, সুতরাং প্রথম অবস্থায় যখন কাফিরের তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য নয় এমনিভাবে শেষ অবস্থায় ও তার তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য হবে না।

আমাদের দলীল হল : তায়াম্মুম করার পর সত্তাগতভাবে তা আর বিদ্যমান থাকে না; বরং ঐ তাহারাতই বাকি থাকে যা তায়াম্মুম দ্বারা অর্জিত হয়েছে। যেমন ওযু করার পর কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তার ওযু বহাল থাকে।

قوله : بَلْ نَاقِضُ الْوُضُوْءِ الخ : যে সকল কারণে ওযু ভঙ্গ হয়ে যায় সেসব কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায়, কেননা তায়াম্মুম হল ওযুর স্থলাভিষিক্ত। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে আসল স্থলাভিষিক্ত থেকে অধিক শক্তিশালী হয়, সুতরাং যেসকল বস্তু শক্তিশালী তথা ওযুর ভঙ্গকারী সেসব বিষয় স্থলাভিষিক্তের তথা তায়াম্মুমের ভঙ্গকারীও বটে।

قوله : وَقُدْرَةُ مَاءٍ الخ : এমনও কিছু বস্তু আছে যা ওযু ভঙ্গকারী নয় কিন্তু তায়াম্মুম ভঙ্গ করে দেয়, যেমন তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি পানির সন্ধান পেল বা দেখল, এবং সে এ পানি ব্যবহারে সক্ষম তবে তা তার তায়াম্মুম ভঙ্গকারী হিসাবে গণ্য হবে।

قوله : وَرَاجِيُ الْمَاءِ الخ : যে ব্যক্তি পানি পাচ্ছে না অথচ পানি পাওয়ার আশা করছে, তার জন্য ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত নামাজকে বিলম্ব করা মোস্তাহাব, যাতে দুটি পবিত্রতার পূর্ণতমটি দ্বারা নামাজ আদায় করা হয়। যে বিলম্বে নামাজ আদায় করলে জামাতের সাথে পড়া যাবে আশাবাদী ব্যক্তির অনুরূপ। উসূল বহির্ভূত বর্ণনামতে শায়খাইন থেকে বর্ণিত আছে পানি পাওয়ার আশায় নামাজকে বিলম্ব করা ওয়াজিব, কেননা, প্রবল ধারণা বাস্তব বতুল্য, সুতরাং পানি থাকা অবস্থায় এবং তা ব্যবহার করার পূর্ণ যোগ্যতা থাকলে যেমন তায়াম্মুম জায়েয নেই এমনিভাবে পানি পাওয়ার প্রবল আশা থাকলেও তায়াম্মুম করা যাবে না। বরং নামাজকে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব

করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নিকটও এমতাবস্থায় বিলম্বের সহিত নামাজ পড়া বিশুদ্ধ। উল্লেখ্য যে, তায়াম্মুমের জন্য ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত পানির অপেক্ষা তখন হবে যখন পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা হবে। শুধু সন্দেহ ও কল্পনা যথেষ্ট নয়, আর ওয়াক্তের শেষ দ্বারা উদ্দেশ্য মুসতাহাব ওয়াক্ত এ থেকে বিলম্ব করা মাকরূহ।

قوله : وَصَحَّ قَبْلَ الْوَقْتِ الخ : আমাদের মতে ওয়াক্ত আসার পূর্বেও তায়াম্মুম করা জায়েয এবং এক তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক নামাজ আদায় করা যায়। নামাজগুলো ফরজ হউক বা নফল হউক। অর্থাৎ, তায়াম্মুম ভঙ্গকারী কোন কিছু না পাওয়া পর্যন্ত তায়াম্মুম বহাল তবিয়াতে থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রাযি. হযরত নখয়ী রহ. হযরত হাসান বসরী রহ. প্রমুখদেরও এরকম মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে এক তায়াম্মুম দ্বারা এক ফরজ আদায় করা যায়। দ্বিতীয় ফরজ আদায় করার জন্য দ্বিতীয়বার তায়াম্মুম করা জরুরী। তবে এক তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক নফল নামাজ আদায় করা যায়। তিনি বলেন, তায়াম্মুম হল জরুরী অবস্থার পবিত্রতা। আমাদের দলিল হল, পানির অনুপস্থিতিতে মাটি পবিত্রকারী যা হাদীস দ্বারা সাবিত। সুতরাং যতক্ষণ তার শর্ত উপস্থিত থাকবে ততক্ষণ তা কার্যকর থাকবে।

قوله : وَخَوْفِ فَوْتِ الصَّلٰوةِ الخ : জানাযার নামাজ ছুটে যাওয়ার আশংকা হলে তায়াম্মুম করে জানাযার নামাজ পড়তে পারবে যখন মাইয়্যেতের অভিভাবক সে ব্যতিত অন্য হবে, তেমনি ঈদের নামাজ ছুটে যাওয়ার ভয় হলে তায়াম্মুম করে ঈদের নামাজ পড়তে পারবে। কেননা, উক্ত নামাজ দ্বয়ের কাজা নেই। কিন্তু জুমআর নামাজের ও ওয়াক্তি কোন নামাজের জন্য এমনিতেই তায়াম্মুম করা জায়েয নেই। কারণ উক্ত নামাজের বদলা ও ক্বাজা বিদ্যমান।

قوله : وَ يَطْلُبُهُ غَلْوَةً الخ : যদি প্রবল ধারণা হয় যে, নিকটেই পানি রয়েছে, তবে এক গুলওয়াহ পর্যন্ত পানি অন্বেষণ ছাড়া তায়াম্মুম জায়েয হবে না। আর যদি প্রবল ধারণা না হয় তবে অন্বেষণ করার প্রয়োজন নেই।

غلوة এর পরিচয় : হযরত জহীর রহ. এর মতে غلوة হল চারশত গজ পরিমাণ। ইমাম হালবী রহ. বলেন, غلوة হল তিনশত গজ। কেহ কেহ غلوة এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যতটুকু দূর পর্যন্ত তীর যায় সে পরিমাণ হল غلوة। বেদায়া গ্রন্থে লেখা আছে যে, এতটুকু পরিমাণ অন্বেষণ করা যাতে নিজের ও সাথীদের অপেক্ষা করার কষ্ট পোহাতে না হয়।

قوله : وَ يَطْلُبُهُ مِنْ رَفِيْقِهِ : যদি সঙ্গীর কাছে পানি থাকে তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে পানি চাওয়া ওয়াজিব। যদি সে পানি না দেয় তবে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়তে হবে। আল্লামা আইনী তাজরীদ থেকে বর্ণনা করেন, 'সাথীর কাছে পানি চাওয়া তারফাইনের নিকট ওয়াজিব নয়।' ইমাম হাসান ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অভিমতও তাই।

অথবা সাথী পানির ন্যায্য মূল্যে পানি বিক্রয় করতে চায় এবং তার কাছেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা বিদ্যমান, এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয নয়। কিন্তু যদি সাথী অধিক মূল্য কামনা করে বা তার কাছে প্রয়োজনের বাহিরে টাকা পয়সা না থাকে তবে তায়াম্মুম করা জায়েয আছে।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

পরিচ্ছেদ : মোজার উপর মাসেহের বিবরণ

صَحَّ وَ لَوْ اِمْرَأَةً لَا جُنُبًا اِنْ لَبِسَهُمَا عَلَى وُضُوءٍ تَامٍّ وَقْتَ الْحَدَثِ يَوْمًا وَ لَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثًا مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا مَرَّةً بِثَلٰثِ اَصَابِعَ يَبْدَءُ مِنَ الْاَصَابِعِ اِلَى السَّاقِ -

অনুবাদ : মোজার উপর মাসেহ হাদাসের পর থেকে একদিন এক রাত মুকিমের জন্য বিশুদ্ধ, যদিও তিনি মহিলা হন, যতক্ষণ পর্যন্ত জুনুবী না হবেন। যদি পূর্ণ ওযুর উপর উভয় মোজা পরিধান করেন আর হাদাসের সময় থেকে তিন দিন তিনরাত মুসাফিরের জন্য বিশুদ্ধ। (মাসেহের নিয়ম) উভয় মোজার উপরিভাগে তিন আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুল থেকে গোড়ালি পর্যন্ত (মাসেহ করা)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

মোজার উপর মাসেহ এর বৈধতা : মোজার উপর মাসেহ হাদীসে মাশহুর দ্বারা প্রমাণিত। আবার হাদীসগুলো فعلى ও قولى রয়েছে। حديث فعلى : হযরত আবু বকর রাযি. হযরত ওমর রাযি. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের বিরাট জামাত থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ সা. তার উভয় মোজার উপর মাসেহ করেছেন।

حديث قولى : হযরত ওমর রাযি. ও হযরত আলী রাযি. বর্ণনা করেন, اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَ لَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا 'রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, মুকীম ব্যক্তি একদিন এক রাত (মোজার উপর মাসাহ করবে) এবং মুসাফির ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত মোজার উপর মাসাহ করবে। (মুসলিম শরীফ) হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ সা. অজু করছিলেন। আর আমি তাকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। ঐ সময় তিনি একটি শাম দেশীয় জুব্বা পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। যার আস্তিন ছিল খুবই সংকীর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ সা. স্বীয় হাত মোবারক জুব্বার নিচের দিক দিয়ে বের করে তার মোজার উপর মাসেহ করেন, আমি বললাম আপনি পা ধৌত করতে ভুলে গেছেন। তিনি বললেন, আমার প্রতিপালক আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মোজার উপর মাসেহের উপর বিভিন্ন ইমামদের অভিমত : ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, যতক্ষন পর্যন্ত আমার নিকট দিনের আলোর ন্যায় মোজার উপর মাসেহের ব্যাপারে দলীল প্রমাণাদি স্পষ্ট হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তার ঘোষক হইনি। ইবনে আবি হাতিম বলেন, ৪১ জন সাহাবা থেকে মোজার উপর মাসেহের বর্ণনা রয়েছে। اشراق গ্রন্থে হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত যে, ৭০ জন সাহাবা আমাকে মোজার উপর মাসেহের রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন। শায়খুল ইসলাম রহ. বলেন, ইমাম আবু হানিফা রহ.কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—

هُوَ اَنْ تُفَضِّلَ الشَّيْخَيْنِ وَ تُحِبَّ الْخَتَنَيْنِ وَ تَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

শায়খাইনকে মর্যাদা দেয়া, দু জামাতাকে মুহাব্বত করা এবং মোজার ওপর মাসেহ করাকে জায়েয মনে

করা। মোটকথা, রাওয়াফিজ ও খাওয়ারিজ ছাড়া সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদিয়া একমত যে, مسح على الخفين শরীয়তে প্রমাণিত। যাতে তিল পরিমাণ কোন সন্দেহ ও সংশয় নেই।

قوله صَحَّ الخ : **হদস গ্রস্ত ব্যক্তি দুধরনের** : এমন হদস যাতে গোসল করা ওয়াজিব এক্ষেত্রে মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নেই। আর এমন হদস যাতে শুধু অজু ওয়াজিব হয় সে ব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা যদি পূর্ণাঙ্গ তাহারাতের অবস্থায় উভয় পায়ে মোজা পরে তাহলে তার উপর মাসেহ করা জায়েয আছে।

قوله : يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ الخ : **জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে** মুক্বীম ব্যক্তি একদিন এবং এক রাত মোজার উপর মাসেহ করতে পারবে। আর মুসাফির তিনদিন এবং তিনরাত মাসেহ করতে পারবে। কিন্তু ইমাম মালিক রহ. এর মতে মাসেহ এর কোন সময় সীমা নির্ধারিত নেই। বরং যত দিন মোজা পরে থাকবে ততদিন মাসেহ করতে পারবে। ইহা হযরত লইস বিন সা'দ রহ. এরও অভিমত। তাদের দলীল হল হযরত আম্মার বিন ইয়াসার রাযি. এর হাদীস—

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ يَوْمًا قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ حَتّٰى اِنْتَهَيْتُ اِلٰى سَبْعَةِ اَيَّامٍ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِذَا كُنْتَ فِىْ سَفَرٍ فَامْسَحْ مَا بَدَا لَكَ -

হযরত আম্মার বিন ইয়াসার রাযি. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একদিন মোজার উপর মাসেহ করব, তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর আমি বললাম, দু' দিন, তিনি বললেন, হাঁ। এভাবে আমি সাত দিন পর্যন্ত পৌছলাম। তিনি বললেন, তুমি যখন সফল অবস্থায় থাকবে তখন যতদিন ইচ্ছা ততদিন মোজার উপর মাসেহ করতে পার।

আমাদের দলিল : (১) حديث مشهور যা হযরত আলী, হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত—

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَ لَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَ لَيَالِيْهَا -

রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, মুক্বীম ব্যক্তি একদিন একরাত্র (মোজার উপর) মাসেহ করবে, আর মুসাফির ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত্র।

(২) হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাযি. থেকে বর্ণিত—

قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِىْ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ طَلَبُ الْعِلْمِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ فَمَاذَا جِئْتَ فَسْئَلْهُ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ وَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَ لَيَالِيْهَا -

তিনি বলেন একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সা. এর দরবারে হাজির হলাম। তিনি আমাকে বললেন, কি জিনিসে তোমাকে নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, ইলম এর তলব। তিনি বললেন, তালিবে ইলমের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরিশতাগণ তালিবে ইলমদের জন্য নিজেদের পর বিছিয়ে দেন। যাহোক যে উদ্দেশ্যে এসেছ সে সম্পর্কে প্রশ্ন কর। হযরত ছাফওয়ান রাযি. বললেন, আমি হুজুর সা. কে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মুক্বীমদের জন্য একদিন এক রাত আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত। এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত হল মুক্বীমের জন্য একদিন এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয।

ইমাম মালেক রহ. এর পেশকৃত হাদীসের জবাব : উক্ত হাদীসের ব্যাপারে মাহাদ্দীসগণ বিভিন্ন রকম আপত্তি উত্থাপন করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী রহ. বলেন, এই হাদীসটি মাজরূহ। ইমাম আবু দাউদ রহ.

বলেন, এর সনদের ব্যাপারে اختلاف রয়েছে এবং সনদ খোব মজবুত নয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, এর সকল رجال ই غير معروف - ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন, এই হাদীসের সনদের মধ্যে اضطراب রয়েছে। এবার এই شاذ ও অপ্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা মাশহুর হাদীসকে বর্জন করা যাবে না।

قوله : مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ الخ : অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে মাসেহের সময় সীমা শুরু হবে হদস এর সময় থেকে। তবে হযরত হাসান বসরী রহ. এর মতে মাসেহ এর সময় সীমা শুরু হবে মোজা পরিধানের সময় থেকে। হযরত আহমদ রহ. ও আওযায়ী রহ. এর মতে যখন মাসাহ করা শুরু হয় তখন থেকেই এর সময় সীমা ধর্তব্য হবে।

قوله : عَلٰى ظَاهِرِ الخ : আহনাফদের মতে মোজার উপরের অংশ মাসেহ করা জরুরী। ডান হাতের তিন আঙ্গুল ডান পায়ের মোজার সামনের দিকের অংশে রাখবে। অতঃপর উভয় হাতকে টেনে গোড়ালির দিকে এনে নলীর দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং আঙ্গুলগুলো খোলা ও প্রশস্ত থাকবে, আর এটাই মোজার উপর মাসেহ করার সুন্নত তরীকা।

وَالْخَرْقُ الْكَبِيْرُ يَمْنَعُهُ وَهُوَ قَدْرُ ثَلٰثَةِ اَصَابِعِ الْقَدَمِ اَصْغَرِهَا وَالْقَلِيْلُ لَا وَيُجْمَعُ فِي خُفٍّ لَا فِيْهِمَا بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ وَالْاِنْكِشَافِ وَ يَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوْءِ وَ نَزْعُ خُفٍّ وَ مُضِيُّ الْمُدَّةِ اِنْ لَمْ يَخَفْ ذِهَابَ رِجْلَيْهِ مِنَ الْبَرْدِ وَ بَعْدَهُمَا غَسْلُ رِجْلَيْهِ فَقَطْ - وَ خُرُوْجُ اَكْثَرِ الْقَدَمِ نَزْعٌ وَلَوْ مَسَحَ مُقِيْمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مَسَحَ ثَلٰثًا وَلَوْ اَقَامَ مُسَافِرٌ بَعْدَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ نَزَعَ وَ اِلَّا يُتِمُّ يَوْمًا وَ لَيْلَةً -

---

অনুবাদ : বড় ধরণের ছেঁড়া মুসেহকে বারণ করে আর তা হল পায়ের ছোট তিন আঙ্গুল পরিমাণ। তবে তা থেকে কম হলে মুসেহ থেকে বারণ করবে না। এক মোজার ছেড়াকে একত্রে ধরা যাবে। উভয়টি একত্রে ধরা যাবে না। তবে নাপাকী এবং খুলে যাওয়া ভিন্ন। ওযু যেসব কারণে ভঙ্গ হয় সেসব কারণে তাও ভঙ্গ হয়ে যায় এবং মোজা খোলাতে ও সময় সীমা অতিবাহিত হয়ে যাওয়াতে (মোজার উপর মাসেহ শুধু ঠান্ডার জন্য নয় বরং) ঠান্ডায় যদিও পাদ্বয়ের চলার শক্তি রহিত হওয়ার ভয় না থাকে। আর মোজা খুলাতে ও সময়সীমা অতিবাহিত হওয়াতে শুধু পাদ্বয় ধৌত করলে চলবে। অধিকাংশ পা বের হওয়া মোজা খোলার মত। আর যদি মুক্বীম ব্যক্তি মাসেহ করে অত:পর এক দিন এক রাত্র পূর্ণ হওয়ার ভেতরে সফর করে তবে তিনদিন পর্যন্ত মাসেহ করবে। আর মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীম হয় একদিন এক রাত্র পর তবে মোজা খুলে ফেলবে এবং যদি এক দিন এক রাত্রের ভেতরে মুক্বীম হয়ে যায় তবে একদিন এক রাত্র পূর্ণ করবে।

শব্দার্থ : اَلْخَرْقُ (ج) خُرُوْقٌ ছিদ্র, গর্ত, ফাটল। اَصَابِعُ ইহা اِصْبَعٌ এর বহুবচন। অর্থ- আঙ্গুল। خُفٌّ (ج) اَخْفَافٌ উটের পায়ের খুর, মোজা। اَلنَّجَاسَةُ নাপাকী, ময়লা, কলুষ। اَلْاِنْكِشَافُ ইহা انفعال থেকে। অর্থ- উন্মুক্ত হওয়া, খুলে যাওয়া। نَزَعَ (ض) نَزْعًا অপসারিত করা, উৎপাটন করা, খুলে ফেলা। তার صله টি الى হলে অর্থ হবে আগ্রহী হওয়া, কামনা করা এবং তার صله টি عن হলে অর্থ হবে বিরত থাকা, পরিহার করা, দূরে থাকা। سَافَرَ ইহা مفاعلة থেকে مُسَافَرَةٌ সফর করা, ভ্রমণ করা, প্রস্থান করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَالْخَرْقُ الْكَبِيرُ الخ : মোজা যদি ছিঁড়ে বা ফেটে গিয়ে থাকে তাহলে এর উপর মাসেহ করা বৈধ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ভিন্ন মতামত রয়েছে। আমাদের মতে ছেড়া কম হলে তার উপর মাসেহ করা বৈধ আর যদি ছেঁড়া বেশী হয় তথা পায়ের ছোট তিন আঙ্গুলের সমপরিমাণ হয় তাহলে তার উপর মাসেহ করা বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী রহ. এবং যুফার রহ. এর মতে ছেড়া কম হউক বা বেশি সর্বাবস্থায়ই মাসেহ বৈধ হবে না তাদের দলীল হল কেয়াসী। অর্থাৎ যেহেতু অধিক ফাটা থাকা মাসেহ এর জন্য প্রতিবন্ধক তাই স্বল্প পরিমাণও এর জন্য প্রতিবন্ধক বলে গণ্য হবে। যেমন, حدث مطلق - ناقض مسح চাই কম হোক বা বেশী হোক, আমাদের দলীল হল : সাধারণত অল্প সল্প ছেড়া পাড়া মোজাতে থেকে থাকেই। সুতরাং এ হালকা কারণে যদি মোজা খুলে পা ধৌত করতে হয় তবে ইহা মানুষের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে। তাই সাধারণ ছেঁড়া ফাটার বিষয়টি ক্ষমা করে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে বেশী পরিমাণ ফাটা থেকে মোজা খুলে পা ধৌত করার হুকুম দেওয়াতে ব্যাপক হারে মানুষ কষ্ট পতিত হবে না। এজন্যই বেশি পরিমাণ ফাটা হলে তা ক্ষমা যোগ্য নয়।

قوله : وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ الخ : যেসব বস্তু ওযু ভঙ্গকারী সেসব বস্তু মোজার মাসাহ ভঙ্গকারী। কারণ মোজার উপর মাসাহ করাটা ওযুরই অংশ বিশেষ। এবং মোজা খুলে ফেললে অথবা মিয়াদ শেষ হয়ে গেলেও মাসহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এক জিহাদে সফরে থাকা অবস্থায় মোজা খুলে উভয় পা ধৌত করেছেন, তবে অজুর অবশিষ্ট অঙ্গগুলো ধৌত করেন নি।

وَصَحَّ عَلَى الْجُرْمُوقِ الْجَوْرَبِ الْمُجَلَّدِ وَالْمُنَعَّلِ وَالثَّخِينِ لَا عَلَى عِمَامَةٍ وَ قَلَنْسُوَةٍ وَ بُرْقُعٍ وَ قُفَّازَيْنِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَ خِرْقَةِ الْقَرْحَةِ وَ نَحْوُ ذٰلِكَ كَالْغَسْلِ فَلَا يَتَوَقَّتُ وَ يُجْمَعُ مَعَ الْغَسْلِ وَ يَجُوزُ وَإِنْ شَدَّهَا بِلَا وُضُوءٍ وَ يَمْسَحُ عَلَى كُلِّ الْعِصَابَةِ كَانَ تَحْتَهَا جِرَاحَةٌ اَوْ لَا فَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ وَ اِلَّا لَا وَلَا يَفْتَقِرُ اِلَى النِّيَّةِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَ الرَّأْسِ -

---

অনুবাদ : জারমুকে (আবরণী মোজাতে) স্থূল কাপড়ের অথবা উপরে ও নিচে যুক্ত জাওরাবে মুসেহ করা সহিহ। তবে পাগড়ী টুপি বোরকা ও হাত মোজার উপর মাসেহ সহিহ নয়। আর ভাঙ্গা হাড় বাধার কাষ্ঠ খন্ডে, জখমের পট্টিতে অথবা তার মত বস্তুতে মাসেহ করা ধৌত করার ন্যায়। সুতরাং তাতে সময় নির্ধারণ করা যাবে না। ধৌত করার সাথে তাকে একত্র করা যাবে এবং জায়েয আছে যদিও তা বাধা হয় অজুহীন অবস্থায়। আর মাসেহ করবে পূর্ণ পট্টিতে তার নিচে যখমত থাক বা নাই থাক। যদি জখম ভাল হওয়ার দরুন পট্টি পড়ে যায়, তবে মাসহ বাতিল হয়ে যাবে। আর ভাল না হওয়া অবস্থায় পড়লে বাতিল হবে না। মাথা ও মোজা মাসহের বেলায় নিয়্যাতের প্রয়োজন নেই।

শব্দার্থ : اَلْجُرْمُوقُ - জারমুক ঐ কাপড়কে বলে যা মোজার হেফাজতের লক্ষ্যে মোজার উপর পরিধান করা হয়। اَلْجَوْرَبُ (ج) جَوَارِبُ - (পায়ের) মোজা। ثَخِينٌ (م) ثَخِينَةٌ - মোটা, স্থূল। এখানে ثخين দ্বারা উদ্দেশ্য এমন মোটা কাপড় যার ভেতরে পানি প্রবেশ করতে পারে না। قُفَّازَيْنِ (ج) قَفَافِيزُ হাত মোজা, স্ত্রী লোকের হাত ও

পায়ের অলংকার। اَلْجَبِيْرَةُ (ج) جَبَائِرُ ভাঙ্গা হাড় বাধার কাষ্ট খন্ড বা পট্টি। خِرْقَةٌ (ج) خِرَقٌ - বস্ত্রখন্ড, নেকড়া। اَلْقَرْحَةُ - ক্ষত, আঘাত। يَتَوَقَّتُ ইহা تفعل থেকে تَوَقُّتًا সময় নির্ধারণ করা। عِصَابَةٌ (ج) عَصَائِبُ - পট্টি (দল, পাগড়ী, পাখির ঝাঁক)। يَفْتَقِرُ - افتعال থেকে اِفْتِقَارًا প্রয়োজন অনুভব করা। (দরিদ্র হওয়া।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَضَعَ عَلَى الْجَرْمُوْقِ الخ : জারমুক ঐ মোজাকে বলে যা মূল চামড়ার মোজার উপরে আবরণী হিসাবে পরিধান করা হয়। উক্ত জারমুকের উপর মাসেহ জায়েয কি না সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে জারমুকের উপর মাসেহ জায়েয। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে জারমুকের উপর মাসহ জায়েয নয়। তিনি বলেন, মোজা হল পায়ের বদল আর মোজার বদল হল জারমুক। এদিকে শরীয়ত মোজার উপর মাসাহ জায়েয করেছে পায়ের বদল হিসাবে, কিন্তু যদি মোজার বদলের উপর মাসহ করা হয় তবে বদলের বদলে মাসহ করা লাজেম হবে। অথচ বদলের বদল হয় না। বিধায় জারমুকের উপর মাসহ জায়েয নেই।

হানাফীদের দলিল হল : হযরত ওমর রাযি. এর হাদীস—

قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَرْمُوْقَيْنِ

তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সা. কে জারমুকের উপর মাসহ করতে দেখেছি। অন্যত্র হযরত বিলাল রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন—

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْمُوْقَيْنِ

আমি রাসূলুল্লাহ্ সা. কে মুকদ্বয়ের উপর মাসেহ করতে দেখেছি। (মুক জারমুকের অপর নাম)।

কিয়াসী দলিল হল : জারমুক ব্যবহারও উদ্দেশ্যগতভাবে তা মোজার تابع বা অনুগামী হয়ে থাকে। কেননা, জারমুক সর্বদা মোজার সাথেই থাকে এবং মোজার হিফাজতের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। অতএব জারমুক যেমন দুপাট বিশিষ্ট মোজার ন্যায় তাই যেভাবে উভয় পাটের উপরের পাটে শুধু মাসাহ জায়েয তেমনি জারমুকের উপরও মাসাহ জায়েয।

قوله : لَا عَلَى عِمَامَةٍ الخ : আমাদের মতে পাগড়ী, টুপি, বোরকা ইত্যাদির উপর মাসেহ করা জায়েয নেই। কিন্তু ইমাম আওযাঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মতে পাগড়ীর উপর মাসেহ জায়েয। আমাদের দলিল হল : অসুবিধা দূরীভূত করার জন্য মোজার উপর মাসেহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু উল্লেখিত বস্তুগুলো খোলা যেহেতু অসুবিধাজনক নয় বিধায় তার উপর মাসেহর অনুমতি দেয়া হয় নাই।

قوله : وَالْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ الخ : جبيرة (ج) جبائر ঐ কাষ্ঠখন্ডকে বলে যা ভাঙ্গা হাড়ের উপর বাধা হয়। উক্ত জাবীরার উপর মাসেহ তখন জায়েয যখন জখমের উপরই মাসেহ করা কষ্ট সাধ্য হয়। পট্টির উপর মাসেহ করা জায়েয। প্রমাণ হল : উহুদের দিনে যখন হযরত আলী রাযি. এর হাতের গিট্টু ভেঙ্গে গিয়েছিল তখন হুজুর সা. হযরত আলী রাযি. কে পট্টির উপর মাসেহ করার নির্দেশ করেছিলেন।

পট্টির উপর মাসেহের কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। বরং ভালো হওয়া পর্যন্ত তার উপর মাসেহ করা জায়েয।

بَابُ الْحَيْضِ

পরিচ্ছেদ : হায়েযের বিবরণ

هُوَ دَمٌ يَنْفُضُهُ رِحْمُ امْرَأَةٍ سَلِمَةٍ عَنْ دَاءٍ وَ صِغْرٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلْثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَمَا نَقَصَ أَوْ زَادَ اِسْتِحَاضَةٌ -

অনুবাদ : হায়েয হল এমন রক্ত যা কোন রোগ ও বয়সের স্বল্পতা ব্যতিরেকে মহিলাদের জরায়ু থেকে বের হয়। সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিনদিন এবং সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে দশদিন। আর যা তিনদিন থেকে কম হবে অথবা দশদিন থেকে বেশী হবে তা استحاضة তথা ব্যধি।

শব্দার্থ : رَحْمٌ ، رِحْمٌ (ج) أَرْحَامٌ গর্ভ, জরায়ু, আত্মীয়তা, সম্পর্ক। سَلِمَةٌ তার পু: سَلِمٌ নিরাপদ, মুক্ত, সুস্থ, সঠিক। دَاءٌ (ج) أَدْوَاءٌ রোগ, ব্যধি, পীড়া। دَاءُ السُّكَّرِ বহুমূত্র, Diabets।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

حيض শব্দের শাব্দিক অর্থ হল প্রবাহিত হওয়া। যেমন حَاضَ الْوَادِي أَيْ جَرَى وَ وَسَلَ - শরীয়তের পরিভাষায়- هُوَ دَمٌ يَنْفُضُهُ رِحْمُ امْرَأَةٍ سَلِمَةٍ عَنْ دَاءٍ وَ صِغْرٍ হায়েয হল এমন রক্ত যা কোন রোগ ও বয়সের স্বল্পতা ব্যতিরেকে মহিলার জরায়ু থেকে বের হয়। অর্থাৎ, প্রাপ্ত বয়স্কা রমণীর বাচ্চাদানী হতে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে যে রক্ত বের হয় তাই হায়েয।

قوله : أَقَلُّهُ ثَلْثَةُ أَيَّامٍ الخ : হানাফীদের মতে হায়েযের সর্বনিম্ন মুদ্দত তিনদিন তিনরাত, আল্লামা ছদরুস সাহির্দ রহ. এর বাণী অনুযায়ী ইহার উপরই ফাতওয়া। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ রহ. এর মতে হায়েয এর সর্বনিম্ন মুদ্দাত একদিন একরাত। তিনি বলেন, রক্তের প্রবাহ যখন পূর্ণ একদিন একরাত ব্যাপী চলতে থাকে, তখন বুঝা যাবে যে, এ রক্ত বাচ্চাদানী থেকে নির্গত। তাই হায়েয এর রক্ত বুঝার জন্য এর চেয়ে বেশী সময়ের প্রয়োজন নেই। ইমাম মালেক রহ. এর মতে কম সময়ের কোন সীমা নেই; বরং রক্তই হায়েয। তিনি বলেন, হায়েয হচ্ছে একটি হাদাস। সুতরাং অন্যান্য হাদাসের ন্যায় এই হায়েয নামক হাদাসটিও কোন কিছুর সাথে নির্ধারিত থাকবে না। **হানাফীদের দলীল হল :** আবু উমামা রাযি., আয়েশা রাযি., ওয়াইলা রাযি. প্রমুখ সাহাবাদের বর্ণিত হাদীস—

أَنَّهُ قَالَ أَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَ الثَّيِّبِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ

রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন, বাকেরা ও ছাইয়্যেবা নারীর হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিনদিন তিনরাত। এবং তার সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে দশদিন। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত—

لَا حَيْضَ دُوْنَ ثَلَاثَةٍ وَلَا حَيْضَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ

অর্থাৎ তিন দিনের নিম্নে কোন হায়েয নেই এবং দশ দিনের উপরে কোন হায়েয নেই। এই সময় সীমার কথাই বর্ণিত আছে হযরত ওমর, আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, উসমান রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের বর্ণিত হাদীস সমূহে। অন্যান্য ইমামদের পেশকৃত দলীলের জবাব হল যে, হায়েযের সর্বনিম্ন মুদ্দাত শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত।

এখন যদি কেউ তার চেয়ে কম সময়কে হায়েয পরিচয়ের সময় হিসাবে নির্ধারণ করে তবে তা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কম হয়ে যাবে। অথচ তা জায়েয নেই। এদিকে শরীয়ত হায়েযের নিম্ন সময় সীমা তিনদিন ও সর্বোচ্চ সময় সীমা দশদিন ধার্য করেছে। বিধায় এর চেয়ে কমবেশ করা যাবে না।

قوله : وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ الخ : হানাফীদের মতে হায়েযের সর্বোচ্চ সময় হল দশদিন। এর চেয়ে বেশী হলে তা استحاضة হিসাবে ধরে নিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে তার সর্বোচ্চ মিয়াদ হল পনের দিন। তিনি দলীল হিসাবে এ হাদীস পেশ করেন যা হুজুর সা. স্ত্রীলোকের দ্বীনি ত্রুটির ব্যাপারে বলেছেন, হুজুর সা. বলেন—

تَقْعُدُ اِحْدٰهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تَصُوْمُ وَلَا تُصَلِّيْ

অর্থাৎ, স্ত্রীলোকেরা তাদের জীবনের অর্ধেক সময় বসে থাকে। নামাযও পড়ে না রোজাও রাখে না। উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল এভাবে যে মানুষের জীবন ও বয়স নির্ধারণ করা হয় বৎসর গণনার মাধ্যমে। আর বৎসর নির্ধারণ করা হয় মাস গণনার (দ্বারা) মাধ্যমে। আর এক মাসের অর্ধেক হল পনের দিন। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হল স্ত্রীলোকেরা হায়েযের কারণে পনের দিন নামাযও পড়ে না রোযাও রাখে না।

আমাদের দলীল হচ্ছে এই হাদীস যা পূর্ববর্তী মাসআলায় বর্ণিত হয়েছে, তথা— واكثره عشرة ايام -

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর পেশকৃত দলিলের জবাব, ইবনে জাওযী ইমাম শাফেয়ী রহ. এর পেশকৃত হাদীসের ব্যাপারে বলেন, هٰذَا حَدِيْثٌ لَا يُعْرَفُ ইমাম বাইহাকী বলেন, لا اجده এবং স্বয়ং আল্লামা নববী শাফেয়ী রহ. বলেন, حَدِيْثٌ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ - যদিও উক্ত হাদীসটিকে সহীহ ধরে নেওয়া হয়, তবুও شطر শব্দের ব্যবহার যেমন অর্ধেকের উপর প্রযোজ্য হয় তেমনি ইহা অনির্ধারিত অংশও বুঝায়, যা অর্ধেকের কমও হতে পারে। বিধায় যেহেতু হায়েযের সর্বোচ্চ মুদ্দত সম্পর্কে প্রকাশ্য হাদীস বিদ্যমান রয়েছে, তাই তার উপরই আমল করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

قوله : وَمَا نَقَصَ اَوْ زَادَ اِسْتِحَاضَةٌ الخ : তিনদিন তিনরাত থেকে কম রক্ত স্রাব হলে তা হায়েয হবে না। বরং তা ইস্তেহাযাহ্। এমনি দশ দিনের বাহিরে রক্ত স্রাব হলে তা হায়েয হবে না; বরং استحاضة হিসাবে ধরে নিতে হবে। কেননা, শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন কিছু নির্ধারিত করে দেয়া একথার প্রমাণ করে যে, নির্ধারিত করে দেওয়াটাই এর সাথে গ্রহণীয়, অন্য কিছু তার সাথে সম্পৃক্ত করা সমিচিন নয়।

وَمَا سِوَى الْبَيَاضِ الْخَالِصِ حَيْضٌ يَمْنَعُ صَلٰوةً وَ صَوْمًا وَ تَقْضِيْهِ دُوْنَهَا وَ دُخُوْلَ مَسْجِدٍ وَ الطَّوَافَ وَ قُرْبَانَ مَا تَحْتَ الْاِزَارِ وَ قِرَأَةَ الْقُرْاٰنِ وَ مَسَّهُ اِلَّا بِغِلَافٍ وَمَنَعَ الْحَدَثُ الْمَسَّ وَ مَنَعَهُمَا الْجَنَابَةُ وَالنِّفَاسُ وَ تُوْطَأُ بِلَا غُسْلٍ بِتَصَرُّمٍ لِاَكْثَرِهٖ وَلَا قَلَّهٖ لَا حَتّٰى تَغْتَسِلَ اَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا اَدْنٰى وَقْتِ صَلٰوةٍ -

---

অনুবাদ : স্বচ্ছ শুভ্রতা ছাড়া যা আসে (তথা স্বচ্ছ শুভ্রতা ছাড়া যা মহিলার জরায়ু থেকে বের হয় অর্থাৎ, কালো, হলুদ, গাদলা ইত্যাদি।) সবই হায়েয। এবং তা নিষেধ করে নামায ও রোযাকে। তবে রোজার কাযা করতে হবে। নামাযের কাযা করতে হবে না। এবং (নিষেধ করে) মসজিদে প্রবেশ করা থেকে। (কাবা ঘরের) তাওয়াফ করা থেকে, যৌনাঙ্গের নিকটবর্তী হওয়া থেকে। (তথা এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নিষেধ।) কোরআন শরীফ পড়া ও গিলাফ ছাড়া স্পর্শ করা থেকে (নিষেধ করে)। বেওযু নিষেধ করে কোরআন স্পর্শ করাকে এবং জানাবাত ও নেসাফ উভয়টি থেকে বারণ করে (তথা কোরআন তেলাওয়াত ও স্পর্শ করা

থেকে নিষেধ করে।) এবং বেশ মুদ্দত (তথা দশ দিনের পর) বন্ধ হলে গোসল ছাড়া সহবাস করা যাবে। আর কম মুদ্দাতে বন্ধ হলে সহবাস করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মহিলা গোসল করছে না। অথবা এমতাবস্থায় তার উপর আদনা একটি নামাযের ওয়াক্ত চলে যাবে না।

শব্দার্থ : بَيَاضٌ - শুভ্রতা, দুধ। اَلطَّوَافُ - প্রদক্ষিণ, ঘূর্ণন (এখানে বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ উদ্দেশ্য)। قُرْبَانٌ -নিকটবর্তী হওয়া, নিকটে যাওয়া। اَلْإِزَارُ (ব) أُزُرٌ - দেহের নিম্নাংশে পরিধেয়, লুঙ্গি। غِلَافٌ (ج) غُلُفٌ - اَغْلَافٌ গেলাফ, আবরণী, ঢাকনা, খাম। تصرم বিচ্ছিন্ন হওয়া, অতিবাহিত হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَمَا سِوَى الْبَيَاضِ الخ মহিলাদের জরায়ু থেকে স্বচ্ছ শুভ্র পদার্থ বের হওয়া হায়েয বন্ধ হওয়ার লক্ষণ। আর ১. কাল, ২. লাল, ৩. হলুদ, ৪. গাদলা, ৫. সবুজ, ৬. মেটো রঙ্গের সব পদার্থ হায়েয। তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে ঘোলা রঙ্গের রক্ত কেবল মাত্র তখনই হায়েয বলে গণ্য হবে যখন তা স্বচ্ছ লাল রঙ্গের পরে দেখা দেয় এবং ইমাম আবু হানিফা রহ.-ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে ঘোলা রঙ্গের রক্তও হায়েয। চাই তা হায়েযের প্রাথমিক দিনগুলোতে দেখা যাক অথবা শেষের দিনগুলোতে দেখা যাক। তরফাইন রহ. এর দলীল হল:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِيْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهٖ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ اِلٰى عَائِشَةَ بِالدِّرَاجَةِ فِيْهَا الْكُرْسُفِ فِيْهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ لِيَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلٰوةِ فَتَقُوْلُ لَهُنَّ لَاتَعْجَلْنَ حَتّٰى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ -

হযরত আলকামা ইবনে আবি আলকামা তার মা যিনি হযরত আয়েশা রাযি. এর বাদী তিনি বলেছেন, মহিলাগণ হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট (হায়েযোত্তর) তাদের নামায সংক্রান্ত বিষয়ে জানার জন্য এমন কাপড়ের পোটলা পাঠাতেন যার মাঝে হায়েযের হলুদ রঙ্গের রক্ত মাখা কুরছুপ (নেপকিন) থাকত। হযরত আয়েশা রযি. তাদেরকে বলতেন, তোমরা সাদা কিচ্ছা অর্থাৎ স্বচ্ছ শুভ্র স্রাব দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়া করবে না।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে, হায়েজ চলাকালে সাদা রং ছাড়া সব রঙের রক্তই হায়েযের রক্ত।

قوله : يَمْنَعُ الصَّلٰوةَ الخ : এখান থেকে হায়েযের বিধানাবলীর আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। হায়েযের মোট এগারটি বিধান রয়েছে। যা থেকে সাতটি হায়েয ও নিফাসে সংযুক্ত। আর চারটি শুধু হায়েযের সাথে নির্দিষ্ট। (১) হায়েয ও নিফাস নামাজকে রহিত করে, তবে কাজা করতে হবে না। (২) রোজা (صوم) কেও রহিত করে, তবে পবিত্র হওয়ার পর কাযা করতে হবে। হাদীস দ্বারা প্রমাণ : হযরত আয়েশা রাযি. বলেন—

كَانَتْ اِحْدَانَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا تَقْضِى الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِى الصَّلٰوةَ -

রাসূলুল্লাহ্ সা. এর জীবদ্দশায় আমাদের কেউ যদি হায়েয থেকে পবিত্র হতো তখন সে রোজার কাযা করতো কিন্তু নামাযের কাযা করতো না.।

যুক্তি নির্ভর প্রমাণ হলো : নামায এমন একটি আমল যা প্রতিদিন পাঁচবার ফরয হয়। এমতাবস্থায় যদি ঋতুবতী মহিলা তার হায়েযের দিনের নামাযের কাযা করতে থাকে, তবে তার জন্য অনেক কষ্টদায়ক হয়ে যাবে। কারণ তাকে প্রায়ই দ্বিগুণ নামায পড়তে হবে। আর রোযার ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ তা প্রতিবৎসরে এক বার এসে থাকে বিধায় যদি কোন মহিলা ঋতুগ্রস্ত হওয়ার দরুন কিছু রোযা কাযা হয়ে যায়। তবে সে বাকী এগার মাসে সল্প সংখ্যক রোজা কাযা করতে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হবে না। বিধায় রোজার কাযা করতে হবে। এদিকে মহান প্রভু

তার বান্দা বান্দিদেরকে যে কষ্টে পতিত করেন নি এ ব্যাপারে এরশাদ হচ্ছে—

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ الخ

তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নি। (সূরা হজ্জ আয়াত ৭৮) এমতাবস্থায় নামাযের কাযা করা কষ্টকর বিধায় তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর যেহেতু রোযা কাযা করা তেমন কষ্ট নয় বিধায় তা পালন করার হুকুম রয়েছে।

قوله : دُخُوْلُ مَسْجِدِ الخ : (৩) হানাফীদের মতে ঋতুগ্রস্থ মহিলা মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নেই। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে ঋতুবতী মহিলা ও জুনুবী ব্যক্তি মসজিদ দিয়ে অতিক্রম করতে পারবে। তিনি দলিল হিসাবে কোরআনুল কারীমের একটি আয়াত উল্লেখ করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوا

'তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝতে পারবে তোমরা কি বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও গোসল করা ব্যতীত। (সরা নিসা ৪৩) দলিল প্রদানের পদ্ধতি এভাবে যে উল্লেখিত আয়াতে صلوة দ্বারা নামাযের স্থান বুঝানো হয়েছে আর عابرى سبيل হল পথ অতিক্রমকারী। আয়াতের সারমর্ম হল জুনুবী ব্যক্তি মসজিদে যাওয়া জায়েয নেই। তবে সেখানে অবস্থান না করে পথ অতিক্রমের জন্য মসজিদ হয়ে চলে যাওয়া জায়েজ আছে। হানাফীদের দলিল হল, হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদীস—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّىْ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

হুজুর সা. এরশাদ করেন এই ঘরগুলোর দরওয়াজা মসজিদের দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দাও কেননা, আমি ঋতুগ্রস্থ জুনুবী ব্যক্তির জন্য মসজিদ হালাল জানিনি। উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে জুনুবী হায়েজগ্রস্থ মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নেই। ইমাম শাফেয়ী রহ.এর দলিলের জবাব হল :

তাফসীরবীদগণ উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত الا হরফকে ولا এর অর্থে বলেছেন। অর্থাৎ এর অর্থ এভাবে যে জুনুবী ব্যক্তি মসজিদের নিকটে যাবে না এবং পথ অতিক্রম করার জন্যও মসজিদে প্রবেশ করবে না। দ্বিতীয় জবাব হল : আয়াতে ব্যবহৃত صلوة শব্দটি মূলগতভাবেই صلوة তথা নামাযের অর্থে ব্যবহৃত। আর عابرى سبيل দ্বারা মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে। ফলে মসজিদের ভেতর দিয়ে যাতায়াত জায়েয হওয়ার দলিল গ্রহণ করা যায় না।

قوله : اَلطَّوَافُ الخ হায়েযগ্রস্থ মহিলাদের জন্য বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা নিষেধ। কারণ তাওয়াফ নামাযের অন্তর্ভুক্ত আর যেহেতু হায়েয অবস্থায় নামায পড়া নিষেধ বিধায় তাওয়াফ করাও নিষেধ। তাওয়াফ যে নামাযে অন্তর্ভুক্ত তার প্রমাণ হল, হুজুর সা. এরশাদ করেন— اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা নামাযের অন্তর্ভুক্ত। তাওয়াফটি করতে হয় মসজিদের ভিতরে। অথচ মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করা হায়েযগ্রস্থদের জন্য জায়েয নয়।

قوله : وَقُرْبَانُ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ : হায়েয গ্রস্থ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা হারাম। দলিল হল, আল্লাহ তাআলার ইরশাদ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ তোমরা তাদের সাথে সঙ্গম কর না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না হবে।

হায়েযগ্রস্থ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করে স্পর্শ ও জড়াজড়ি করার বিধান : ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, শাফেয়ী ও ইমাম মালিক রহ. এর মতে হায়েয অবস্থায় হাটুর উপর থেকে নাভী পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী থেকে সঙ্গমহীন জড়াজড়ি করা হারাম। আর সঙ্গম যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। ই

এমতাবস্থায় শরীরের অন্য স্থান থেকে স্বাদ গ্রহণ করা জায়েয আছে।

ইমাম আহমদ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে শুধু লজ্জাস্থানে উপবেশ করা হারাম। আর শরীরের অন্য স্থান থেকে স্বাদ গ্রহণ করা হারাম নয়। তিনি দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন, আল কুরআনের আয়াত يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى লোকেরা আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন তা অরুচি। (সূরায়ে বাক্বারা ২২২) এ ব্যাপারে হুজুর সা. বলেন— اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ শুধুমাত্র সঙ্গম ছাড়া সবই করতে পার।

আমাদের দলীল হল :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِىْ مِنْ اِمْرَأَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ لَكَ مَا فَوْقَ الْاِزَارِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাআদ রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে জিজ্ঞাসা করলাম আমার স্ত্রী হায়েজগ্রস্থ অবস্থায় তার সাথে আমার কি কি করা হালাল। উত্তরে হুজুর সা. বললেন, চাদরের উপর যা আছে। (এখানে الازار এর অর্থ এমন কাপড় যা নাভী থেকে নিচ পর্যন্ত ঢাকা হয়)। সুতরাং প্রতীয়মান হল নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত হায়েয চলাকালিন অবস্থায় সাদ গ্রহণ করা জায়েয নয়।

قوله : والقراءة القران الخ : হায়েজ গ্রস্থ মহিলা এবং জুনুবী মহিলা সবার জন্য কুরআন শরীফ পাঠ করা হারাম। তবে ইমাম মালিক রহ. এর মতে হায়েজ গ্রস্থ মহিলার জন্য কুরআন শরীফ পাঠ করা জায়েয আছে। জুনুবী ও হায়েজগ্রস্থ অবস্থায় পবিত্র কুরআনের যে কোন অংশ পাঠ নিষেধ এ ব্যাপারে আমাদের দলিল হল হুজুর সা.-এর ফরমান—

لَاتَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

হায়েজগ্রস্থ ও জুনুবী কুরআনের কোন অংশ পাঠ করবে না।

قوله : وَمَسُّهُ اِلَّا بِغِلَافٍ الخ : বেওযু, জুনুবী, হায়েয ও নেফাস গ্রস্থ সকলের জন্য কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নেই। তবে কোন গিলাফ দ্বারা স্পর্শ করা জায়েয আছে। প্রমাণ হল, হুজুর সা. এরশাদ করেন— لَاتَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِلَّا طَاهِرًا শুধুমাত্র পবিত্র ব্যক্তি কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে পারবে। অন্যত্র হাকিম ইবনে হিসাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হুজুর সা. আমাকে ইয়ামনে প্রেরণের সময় বলেছিলেন, তুমি পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না।

উল্লেখ্য যে, অযুবিহীন নাবালেগ সন্তানদের হাতে কুরআন শরীফ এর কপী তুলে দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

قوله : وَ تُوْطَأُ بِلَا غُسْلٍ الخ : যদি হায়েয পূর্ণ দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বন্ধ হয় তবে গোসলের পূর্বেও স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে। এবং তা তার জন্য জায়েয। তবে হাঁ হায়েয পরবর্তী গোসলের পর সহবাস করা মুস্তাহাব। আর যদি দশদিনের ভিতরে হায়েয বন্ধ হয়ে যায়, তবে গোসল ছাড়া সহবাস জায়েয নেই। কেননা, এমতাবস্থায় আবারও হায়েয শুরু হতে পারে। অথবা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এজন্য গোসল করে নেওয়া অধিক শ্রেয়। আর যদি গোসল না করেও একটি ছোট নামাযের ওয়াক্ত চলে যায়, তবে তার সাথে সহবাস করা জায়েয আছে। আর তিনদিন থেকে বেশী সময়ে বন্ধ হয়েছে ঠিক কিন্তু তার পূর্বের অভ্যাসের দিনগুলো পৌঁছেনি তবেও অভ্যাসের দিনসমূহ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা উচিত নয়। কারণ, সম্ভাবনা রয়েছে যে পুনরায় হায়েয শুরু হতে পারে। সুতরাং সহবাস থেকে বিরত থাকা অধিক যৌক্তিকতা।

اَلطُّهْرُ الْمُتَخَلِّلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِى الْمُدَّةِ حَيْضٌ وَ نِفَاسٌ وَاَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا حَدَّ لِاَكْثَرِهِ اِلَّا عِنْدَ نَصْبِ الْعَادَةِ فِىْ زَمَانِ الْاِسْتِمْرَارِ -

অনুবাদ : মুদ্দতের মাঝে দু রক্তের মধ্যখানে যে পবিত্রতা পাওয়া যায়, তাহল হায়েয অথবা নেফাস আর পবিত্রতার সর্ব নিম্ন সময় সীমা পনের দিন, আর অধিক সময়ের কোন সীমা নেই। তবে মিয়াদ নির্ধারণ থাকলে (সে অনুযায়ী হবে) রক্তস্রাব অব্যাহতভাবে থাকা কালে। (অর্থাৎ, মহিলার কোন মিয়াদ নির্ধারণ করা থাকে তবে সে মিয়াদ অনুযায়ী হবে)।

শব্দার্থ : اَلْمُتَخَلِّلُ - ইহা تفعل থেকে اَلتَّخَلُّلُ অর্থ- মধ্যবর্তী হওয়া, মধ্যে অবস্থান করা। نَصْبُ الْعَادَةِ নির্ধারিত মিয়াদ। زَمَانٌ (ج) اَزْمِنَةٌ সময়, কাল। اَلْاِسْتِمْرَارُ ধারাবাহিকতা, স্থায়িত্ব।

قوله : اَلطُّهْرُ الْمُتَخَلِّلُ الخ : যে পবিত্রতা দুটি রক্তের মধ্যবর্তী সময়ে দেখা যাবে তাকেও ধারাবাহিক রক্ত হিসাবে ধরে নেয়া হবে। এবং হায়েয চলা কালিন সময়ে এমনটি হায়েয, আর নেফাস চলাকালিন এমনটি হলে তা নেফাস বলে পরিগণিত হবে। পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময়সীমা হল পনের দিন। ইহা কামিল ও তাহজিব প্রণেতাদের অভিমত। ইমাম আবু ছাওর (রহ.) বলেন, আমার ধারণা ইহাতে কোন দ্বিমত নেই। আল্লামা আইনী রহ. বর্ণনা করেন, ছাওরী ও শাফেয়ী রহ. এর ইহাই অভিমত।

উপরোল্লেখিত আলোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, তুহুরে ছহীহ এর সর্বনিম্ন সময়সীমা পনের দিন। কিন্তু তার অধিকতার কোন সময় সীমা নেই।

তুহুরে মুতাখাল্লালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

طهر দুই প্রকার : (১) طهر فاسد (২) طهر كامل -

দ্বিতীয় প্রকার তথা طهر كامل সর্বসম্মতিক্রমে ব্যবধান। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রকারটি ব্যবধান কিনা এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে চারটি মত রয়েছে। (১) ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর সূত্রে তুহুরে নাকিছ এর প্রথম ও শেষ উভয় দিকে যদি রক্ত দেখা যায়, আর তা একদিন বা তার চেয়ে বেশী দশদিনের ভেতরে বা বাহিরে হয়, তবে উক্ত তুহুরে মুতাখাল্লাল হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। এভাবে যে মহিলা مبتداء (তথা এই প্রথম হায়েযগ্রস্থ) হলে পূর্ণ দশদিন হায়েয ধরে নিতে হবে। আর মহিলা معتاده (তথা নির্দিষ্ট একটি মিয়াদ জারী) থাকলে তার অভ্যাস মাফিক দিনসমূহ হায়েয বলে গণ্য হবে এবং উভয় প্রকার মহিলারই অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তি হাজা (استحاضة) হিসাবে গণ্য হবে। (২) হযরত মুহাম্মদ রহ. সূত্রে বর্ণিত : দশদিন বা তার চেয়ে কমে উভয় দিক দিয়ে রক্ত থাকে তবে দশদিন হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। মহিলা مبتداء হোক বা معتاده হোক। দলিল হল, হায়েযের সময় অব্যাহতভাবে রক্তস্রাব চলতে থাকা, কারো দৃষ্টিতে এমন কোন শর্ত নেই। সুতরাং প্রথম ও শেষ রক্তস্রাব পাওয়া গেলেই যথেষ্ট। (৩) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর সূত্রে বর্ণিত, যদি রক্তস্রাব হায়েযের সময়ে বা নির্ধারিত অভ্যস্ত মহিলার উভয় দিকে পাওয়া যায়। আর এই উভয় রক্ত মিলে হায়েযের সর্বনিম্ন তথা তিনদিন হয়ে যায় তবে পূর্ণ দিনগুলো হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। আর উভয় রক্তের মধ্যখানের فاصل কে তুহুর হিসাবে ধরা যাবে না। যেমন : কোন মহিলা প্রথম দুইদিন রক্ত দেখল অতঃপর দশ নম্বর দিন আবার দেখল তবে পূর্ণ দশদিনকে হায়েয হিসাবে ধরে নিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন মহিলা প্রথম দিন রক্ত দেখে অতঃপর দশ নম্বর দিন রক্ত দেখে তবে হায়েযের কম মুদ্দত পূর্ণ না হওয়াতে তা হায়েয হিসাবে গণ্য হবে না। বরং পূর্ণ দিন সেই তুহুর হিসাবে ধরে নিতে হবে। (৪) হযরত হাসান বিন যিয়াদ রহ. এর সূত্রে বর্ণিত : তুহুর যদি তিনদিন বা ততোধিক হয়, তাহলেই তা ফাসিদ হবে। অন্যথায় তা হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ, মধ্যবর্তী তুহুর একদিন

অথবা দুদিন হয় তবে তা হায়েয। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মাযহাব হল : প্রথমোক্ত তিনটি মতামতের শর্তসমূহের পাশাপাশি আর একটি শর্ত হল, যে তুহুর উভয় পার্শ্বের রক্তের সমান হবে বা তার চেয়ে কম হবে। আল্লামা তাজুস শরীয়া রহ. হিদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইহার একটি অনুপম দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যাতে উক্ত পাঁচটি মতামত পাওয়া যায়। যেমন مبتداء মহিলা প্রথম তারিখে রক্ত দেখল। অতঃপর চৌদ্দদিন তুহুর তারপর একদিন রক্ত অতঃপর আট দিন তুহুর পরে একদিন রক্ত। অতঃপর সাতদিন তুহুর তারপর দুইদিন রক্ত। অতঃপর তিনদিন তুহুর পরে একদিন রক্ত। অতঃপর দুইদিন তুহুর তারপর একদিন রক্ত।

নিম্নে উল্লেখিত মাসআলাটি ছক আকাকারে উপস্থাপন করা হলো।

র	এই দশদিন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর বর্ণনায় হায়েয। কেননা, তুহুরে নাকিছে রক্ত পাওয়া গেছে। এবং মহিলাও مبتداء বিধায় দশদিনই হায়েয।
প	
প	
প	
প	
প	
প	
প	
প	
প	
প	
প	
প	
প	
প	
র	এই দশদিন ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে হায়েজ। কেননা, তুহুরের উভয় দিকে রক্ত পাওয়া গেছে।
প	
প	
প	
প	
প	
প	
প	
প	
র	আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর বর্ণনায় এই দশদিন হায়েজ। কেননা, তুহুরে নাকিছের সর্বনিম্ন মুদ্দাত পাওয়া গেছে।
প	
প	
প	

প	
প	
প	
প	
র র	
প	
প	
প	ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে এই দশদিন হায়েয। কেননা, উভয় দিকে রক্ত পাওয়া গেছে।
র	
প	
প	
প	
র	হাসান বিন যিয়াদ রহ. এর মতে এই চার দিন হায়েজ। কেননা, এখানে তুহুর মাত্র দুদিন পাওয়া গেছে। তাই তা فاصل হবে না, বরং তা হায়েজ হিসাবে গণ্য হবে।
প	
প	
র	

وَدَمُ الْاِسْتِحَاضَةِ كَرُعَافٍ دَائِمٍ لَايَمْنَعُ صَوْمًا وَ صَلٰوةً وَ وَطْيًا وَ لَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى اَكْثَرِالْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ فَمَا زَادَ عَلٰى عَادَتِهَا اِسْتِحَاضَةٌ وَلَوْ مُبْتَدَأَةً فَحَيْضُهَا عَشَرَةٌ وَ نِفَاسُهَا اَرْبَعُوْنَ -

অনুবাদ : ইস্তিহাজার রক্তস্রাব নাক থেকে ক্ষরণ হওয়া রক্তের ন্যায় রোজা, নামাজ, সহবাসকে বাধা দেয় না। যদি রক্ত অতিরিক্ত হয় হায়েয বা নেফাসের বেশ মুদ্দতের চেয়ে তবে তার অভ্যাসের অতিরিক্তটা ইস্তেহাজা হবে। আর যদি এই প্রবাহ প্রথম আক্রান্ত হয়, (তথা মহিলা এই প্রথম হায়েজে অথবা নেফাসে পতিত হয়েছে আর সাথে সাথে রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়) তবে তার হায়েজ (গণনা করা হবে) প্রথম দশদিন আর তার নিফাস হলে (গণনা করা হবে) চল্লিশ দিন।

শব্দার্থ : اَلْاِسْتِحَاضَةُ ইহা حَيْض থেকে استفعال এর মাছদার। ইহা مبالغة ও انقلاب ماهيت খাসিয়তদ্বয় অবস্থায় তার অর্থের বেলায় মূল উপাদানই পরিবর্তীত হয়ে গিয়েছে এবং সেটি ইস্তিহাজায় তথা ব্যধিতে রূপান্তরিত হয়েছে। رُعَافٌ : নাক থেকে নিঃসৃত রক্ত, প্রচুর বৃষ্টি رُعَافٌ নাকের প্রচুর রক্ত ক্ষরণে আক্রান্ত رُعَافٌ নাক, নাকের ডগা। مُبْتَدَأَةٌ আরম্ভকারী, সূচনাকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَدَمُ الْاِسْتِحَاضَةِ الخ : ইস্তেহাজা হল মহিলার জরায়ু থেকে নির্গত এমন রক্ত যা হায়েয অথবা নেফাসের কারণে নয় বরং অন্য কোন ব্যধির কারণে নির্গত হয়। মোট পাঁচ প্রকারের রক্তকে استحاضة এর রক্ত বলে। (১) ৯ বৎসর বয়সের পূর্বে রক্ত প্রবাহিত হলে। (২) তিনদিন থেকে কম হলে। (৩) দশ দিন থেকে বেশি সময় প্রবাহিত হলে। (৪) গর্ভাবস্থায় রক্ত প্রবাহিত হলে। (৫) প্রসবান্তে চল্লিশ দিনের বেশি সময় প্রবাহিত হলে।

ইস্তিহাজা গ্রস্থ মহিলার হুকুম :

ইস্তিহাজার রক্ত যেহেতু রগ থেকে আসে তাই তার হুকুমও অন্যান্য রগ থেকে বের হওয়া রক্তের ন্যায়। যেমন নাক থেকে ক্ষরণ হওয়া রক্ত। তাই নাকসীর এর মত استحاضة এর রক্ত নামাজ, রোজা এবং সহবাসের জন্য বাধা দায়ক নয়।

প্রমাণ :

عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّىْ اِمْرَأَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ لَا اِجْتَنِبِى الصَّلٰوةَ اَيَّامَ مَحِيْضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَتَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ثُمَّ صَلِّىْ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ -

হযরত আয়েশা রহ. বর্ণনা করেন একদা হযরত ফাতেমা বিনতে আবি হুবায়শ রাযি. হুজুর সা. এর দরবারে আসলেন এবং বললেন, আমি এমন মুস্তাহাযা মহিলা যে কখনো পবিত্র হই না। তবে কি আমি নামাজ পরিত্যাগ করব। হুজুর সা. বললেন, না; বরং হায়েজের দিনগুলোতে নামাজ ত্যাগ কর। অতঃপর গোসল করে প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু কর এবং নামাজ পড়তে থাক যদিও রক্তের ফোটা চাটাইয়েও পড়তে থাকে। ফিকাহ শাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ হিদায়াতে আছে : যেহেতু উক্ত হাদীস দ্বারা নামাজের হুকুম প্রমাণিত হয়ে গেল, তাই ইজমায়ী ফায়সালার ফলশ্রুতিতে রোজা আর সহবাসের হুকুমও প্রমাণিত হল। অর্থাৎ হায়েজ তথা রক্তস্রাব নামাজের জন্য বাধা। কিন্তু যেহেতু ইস্তেহাজার রক্ত নামাজের জন্য বাধা হল না তাই রোজা ও সহবাসের জন্য তা বাধা হবে না।

টিকা : ইস্তিহাজাগ্রস্থা নারী তিন প্রকারের : (১) مبتدأة প্রারম্ভ কাল। অর্থাৎ সদ্য কিশোরীর এইমাত্র স্রাব আসা শুরু হয়েছে, তারপর অনবরত রক্ত আসতে লাগল। (২) معتادة অভ্যস্ত। অর্থাৎ নারী যার প্রতিবারই একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হায়েজ আসে এবং সে নিয়ম তার স্মরণ আছে পরবর্তীতে এ নিয়মের বহির্ভূত হয়ে ধারাবাহিকভাবে রক্ত প্রবাহ হতে লাগল। (৩) متحيرة সিদ্ধান্তহীনা। অর্থাৎ যে মহিলা নিয়মিতা ছিল। তারপর অনবরত রক্ত দেখা দিল। কিন্তু সে তার পূর্ববর্তী নিয়ম ভুলে গিয়েছে। متحيرة কে ضالة , مضلة ও متحيرة ও ناسية বলা হয়ে থাকে।

متحيرة তিন ধরনের : (ক) مُتَحَيِّرَةٌ بِالْعَدَدِ ঐ মহিলা যার হায়েজ কালীন দিবস সংখ্যা স্মরণ না থাকে। (খ) مُتَحَيِّرَةٌ بِالْوَقْتِ ঐ মহিলা যার হায়েজ আসার সময় স্মরণ না থাকে। (গ) مُتَحَيِّرَةٌ بِهِمَا যে মহিলা একাধারে مُتَحَيِّرَةٌ بِالْوَقْتِ ও مُتَحَيِّرٌ بِالْعَدَدِ -

مبتدأة **এর হুকুম :** সে হায়েজের সর্বোচ্চ সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত রক্তকে হায়েজের রক্ত হিসাবে গণ্য করবে। তারপর গোসল করে নামাজ, রোজা শুরু করে দিবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, দশদিন হায়েজ বাকী দিন استحاضة - আর ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, পনের দিনের কম হলে সব হায়েজ। আর পনের দিনের বেশী হলে এক দিন এক রাত হায়েজ আর বাকী ইস্তিহাজা। ইমাম মালিক রহ. বলেন, পনের দিন রাত্র হায়েজ আর অতিরিক্ত হলে তা ইস্তিহাজা। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, ছয়/সাত দিন হায়েজ আর বাকী ইস্তেহাজা।

معتادہ **এর হুকুম :** যদি অভ্যাসের দিনগুলো পূর্ণ হওয়ার পরও রক্ত আসতে থাকে তবে দশ দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি দশ দিনে বা তার চেয়ে কম দিনে বন্ধ হয়ে যায় তবে মনে করতে হবে যে, তার অভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে বিধায় সমস্ত হায়েজ হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি দশ দিনের চেয়ে অতিরিক্ত হয়ে যায়, তবে অভ্যাসের দিনগুলো হায়েজ আর বাকী দিনগুলো ইস্তেহাজা হিসাবে গণ্য হবে। ইহা হানাফীদের মাজহাব।

متحیرہ **এর হুকুম :** সে ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করবে যদি তার অভ্যাসের দিবস স্মরণ হয়ে যায় অথবা কোন এক দিকে প্রবল ধারণা আসে তবে সে معتادہ এর মত হিসাব করবে। আর যদি প্রবল ধারণা হয় না; বরং সন্দেহ অবশিষ্ট থেকে যায়, তবে غسل لك صلوة তথা প্রত্যেক নামাজের জন্য গুসল করবে এবং নামাজ আদায় করবে।

تَتَوَضَّاءُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهٖ سَلَسُ الْبَوْلِ اَوْ اِسْتِطْلَاقُ الْبَطَنِ اَوْ اِنْفِلَاتُ رِيْحٍ اَوْ رُعَافٌ دَائِمٌ اَوْ جَرْحٌ لَايَرْقَاءُ يَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ فَرْضٍ وَ يُصَلُّوْنَ بِهٖ فَرْضًا وَ نَفْلًا وَ يَبْطُلُ بِخُرُوْجِهٖ فَقَطْ وَ هٰذَا اِذَا لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِمْ وَقْتُ فَرْضٍ اِلَّا وَ ذَالِكَ الْحَدَثُ يُوْجَدُ فِيْهِ -

---

অনুবাদ : ইস্তিহাজাগ্রস্থা মহিলা অব্যাহত মূত্রক্ষরণ বার বার পায়খানায় আক্রান্ত, বার বার বায়ু নির্গতশীল ও সর্বক্ষণিক নাক থেকে রক্তক্ষরণের রোগী এবং এমন ব্যক্তি যার ক্ষতস্থান থেকে নিঃসরণ থামে না এরা সকলে প্রত্যেক ফরজ নামাজের ওয়াক্তে অজু করবে এবং অজু দ্বারা ফরজ নফল (যা ইচ্ছা) নামাজ পড়বে আর অজু বাতিল হয়ে যাবে শুধু ওয়াক্ত চলে যাওয়াতে হা এসব ধারাবাহিক রোগগ্রস্তের অজু ওয়াক্ত চলে যাওয়া ছাড়া অজু ভঙ্গ হওয়ার অন্যান্য কারণেও অজু চলে যাবে। আর ইহা তখন হবে যখন উক্ত ব্যক্তিদের এমন ফরজ ওয়াক্ত যাবে না যাতে এ ধরনের হাদস পাওয়া যায় না। (কিন্তু কাহার কোন ওয়াক্তে এ ধরনের হদস পাওয়া গেল না তবে তাদের অজু বাতিল হবে না।)

শব্দার্থ : سَلَسٌ সহজতা, سَلَسُ الْبَوْلِ -মূত্র বেগ ধারণে অক্ষমতা, অব্যাহত মূত্র ক্ষরণ। مِسْنًا سَلِسٌ - নড়েভড়ে পেরেক। اِسْتِطْلَاقُ الْبَطْنِ - পেট নরম হওয়া তথা বারবার পায়খানা করা। اِنْفِلَاتُ الرِّيْحِ বার বার বায়ু নির্গত হওয়া। جَرْحٌ (ج) جُرُوْحٌ - اَجْرَاحٌ - ক্ষত বা জখম। جَرْحٌ لَايَرْقَاءُ এমন ক্ষত যা থেকে নি:সরণ থামে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَيَتَوَضَّأُ الخ : ইস্তিহাজাগ্রস্তা মহিলা, অব্যাহত মূত্র ক্ষরণ বার বার পায়খানায় আক্রান্ত, বারবার বায়ু নির্গতশীল ও সর্বক্ষনীক নাক থেকে রক্ত ক্ষরণের রোগী এমন ক্ষতগ্রস্থ ব্যক্তি যার ক্ষতস্থান থেকে নিঃসরণ থামে না, এসকল অক্ষম ব্যক্তিদের ব্যাপারে হানাফী মাজহাব হল প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য ওযু করবে এবং এ অজু দ্বারা যা ইচ্ছা ফরজ, নফল, সুন্নাত, মান্নাত ইত্যাদি নামাজ পড়তে পারবে। তবে ওয়াক্ত চলে গেলে অজু চলে যাবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে প্রত্যেক নামাজের জন্য পৃথক অজু করতে হবে। তিনি দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন হুজুর সা. এর বাণী—

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ (ابن ماجة و ابوداود)

মুস্তাহাযা মহিলা প্রত্যেক নামাজের জন্য ওযু করবে।

আমাদের মতের সপক্ষে দলিল : হুযুর সা. এরশাদ করেন— اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ 'মুস্তাহাযাহ মহিলা প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য অজু করবে।'

অন্যত্র হযরত আয়েশা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত—

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ تَوَضَّئِىْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ -

হুজুর সা. ফাতেমা বিনতে হুবাইশকে বললেন, প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য ওযু কর।

উভয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য শুধু ওযু করলে চলবে। প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করার প্রয়োজন নেই। হানাফীদের পক্ষ থেকে শাফেয়ী রহ. এর দলিলের জবাব : হাদীসে উল্লেখিত لكل صلوة এর মধ্যে لام অব্যয় ওয়াক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

১। اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ উক্ত আয়াতে لدلوك এর لام অব্যয়টি ওয়াক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২। اِنَّ لِلصَّلَاةِ اَوَّلًا وَ اٰخِرًا এ হাদীসেও لصلاة এর لام অব্যয় ওয়াক্ত বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। মোটকথা, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিলটি من قبيلة النص আর আমাদের বর্ণিত হাদীস من قبيلة المفسر - এদিকে কায়দা হলো যখন نص আর مفسر এর মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। তখন مفسر প্রাধান্য পায়।

قوله : اِذَا لَمْ يَمْضِ الخ : ইস্তিহাজাগ্রস্ত এবং উপরোল্লেখিত অক্ষম ব্যক্তিবর্গের হুকুম হলো এই সময় যখন তাদের উপর এমন কোন ওয়াক্ত অতিবাহিত হয় না যে ওয়াক্তের সময়ে তাদের সাথে এহেন অক্ষমতা থাকে না। অন্যথায় তারা মা'জুর এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। বরং এরকম অবস্থার সম্মুখিন হলে সাধারণ মানুষের মত তাদেরও অজু চলে যাবে। তবে হা, হঠাৎ অতি সল্প সময়ের জন্য যদি এ অক্ষমতা মানুষের সাথে থাকে না তবে এতে মা'জুর হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

وَالنِّفَاسُ دَمٌ يَعْقُبُ الْوَلَدَ وَ دَمُ الْحَامِلِ اِسْتِحَاضَةٌ وَالسِّقْطُ اِنْ ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهٖ وَلَدٌ وَلَا حَدَّ لِاَقَلِّهٖ وَ اَكْثَرُهٗ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَالزَّائِدُ اِسْتِحَاضَةٌ وَ نِفَاسُ التَّوْاَمَيْنِ مِنَ الْاَوَّلِ -

---

অনুবাদ : নিফাস ঐ রক্তকে বলে যা সন্তান প্রসবের পরে বের হয়। আর গর্ভবতী মহিলার রক্ত ইস্তিহাযা (অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলা গর্ভাবস্থায় দেখলে তা হায়েয অথবা নেফাস কোনটাই হবে না। বরং ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য হবে।) অসম্পূর্ণ সন্তান যার কোন অঙ্গ হয়ে গেছে তার হুকুম পূর্ণ সন্তানের মত (অর্থাৎ এমন সন্তান প্রসব করলে অতঃপর রক্ত আসলে তা নিফাস হিসেবে গণ্য হবে।) নিফাসের নিম্ন সময় সীমা নেই, তবে সর্বাধিক সময় সীমা হলো চল্লিশ দিন। আর এর চেয়ে অতিরিক্ত হলে তা ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য হবে। দুটি সন্তান প্রসব করলে প্রথমটি থেকে নিফাসের সূচনা ধরা হবে।

শব্দার্থ : يَعْقُبُ : اَلْعَقْبُ যা কোন কিছুর পরে আসে। اَلْعَقْبُ এর جمع হলো اعقاب - পরিণাম, পরিণতি। السقط (ج) اَسْقَاطٌ গর্ভচ্যুত অসম্পূর্ণ সন্তান, তাবুর কোণ। اَلسَّقْطُ যা পড়ে। গর্ভচ্যুত অসম্পূর্ণ সন্তান। اَلسِّقْطُ তুষার শিশির, ইতর লোক। اَلتَّوْاَمَيْنِ ইহা تَوْاَمٌ (م) تَوْاَمَةٌ (ج) تَوَائِمُ এর দ্বিবচন। অর্থ- একই গর্ভ থেকে এক সাথে জাত দুই শিশু। দুই জমজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَالنِّفَاسُ الخ : ফকীহদের পরিভাষায় নিফাস ঐ রক্তকে বলে যা সন্তান প্রসবের পর বের হয়। সাহাবাইন থেকে বর্ণিত স্ত্রী লোক যদি সন্তান প্রসবের পর রক্ত দেখে না তবে তা নিফাস হিসাবে গণ্য হবে না।

বিধায় এমন মহিলার উপর গোসল ওয়াজিব নয়। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে আলোচিত মহিলার উপর সতর্কতা বশতঃ গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা, হয়ত যত সামান্য রক্ত বের হয়েছে যা তার দৃষ্টিগোচর হয়নি। এদিকে উল্লেখ্য যে, গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য রক্ত বের হওয়া শর্ত, রক্ত দেখা শর্ত নয়।

قوله : وَالسِّقْطُ الخ : অসম্পূর্ণ সন্তান যার কোন অংশ বিশেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে। এমন সন্তান গর্ভচ্যুত হলে তার হুকুম পূর্ণ সন্তান প্রসবের ন্যায়। অর্থাৎ প্রসব উত্তর রক্ত নিফাস হিসাবে গণ্য হবে যদি কোন দাসীর এমনটি হয়। তবে সে উম্মে ওলদ হয়ে যাবে। আর তালাক প্রাপ্ত নারী হলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে (কেননা, গর্ভবতীর ইদ্দত হল গর্ভপাত।) আর শুধু গোশতের টুকরা বিশেষ প্রসব করে যাতে কোন অঙ্গ সৃষ্টি হয় নাই। তাহলে এমন মহিলাকে নিফাসগ্রস্ত এবং গর্ভপাত সংক্রান্ত কোন হুকুম প্রদান করা যাবে না।

قوله : وَنِفَاسُ التَّوْأَمَيْنِ الخ : যদি কোন মহিলা তার গর্ভ থেকে দুটি সন্তান প্রসব করে তবে শায়খাইন রহ. এর মতে প্রথম সন্তান প্রসবের পর থেকেই নিফাসের সূচনা ধরে নিতে হবে, যদি উভয়টির মধ্যখানে চল্লিশ দিনও ব্যবধান হয়ে থাকে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করার পর থেকে নিফাস শুরু হবে। ইমাম জুফর রহ. এর মতামতও তাই। কেননা, প্রথম সন্তান প্রসব করার পরও মহিলা গর্ভবতী। সুতরাং যেভাবে একজন মহিলার গর্ভাবস্থায় হায়েজ আসে না তেমনি গর্ভাবস্থায় নিফাস ও আসতে পারে না, আর একারণেই সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পর থেকে ইদ্দত শুরু হয়।

শায়খাইন রহ. এর দলিল : জরায়ু বন্ধ থাকার দরুন গর্ভবতী মহিলার রক্ত আসে না। কিন্তু সন্তান প্রসবের দ্বারা জরায়ুর মুখ খুলে যায় এবং রক্ত আসতে থাকে। আর এ অবস্থায় রক্ত বের হওয়াই নিফাস। কিন্তু ইদ্দতের মাসআলার সম্পর্ক হল وضع حمل এর সাথে আর حمل হলো كُلُّ مَا فِي الْبَطْنِ অর্থাৎ যাই পেটে থাকে একেই حمل বলা হয়। সুতরাং প্রথম সন্তান প্রসবের মাধ্যমে পূর্ণ وضع হয় না বরং কিছু হামল وضع হয়। আর গর্ভবতীর ইদ্দত পূর্ণ হয় পূর্ণ হামলকে وضع দ্বারা। এজন্য ইদ্দত পূর্ণ হবে দ্বিতীয় সন্তান প্রসব দ্বারা, প্রথম সন্তান প্রসব দ্বারা নয়।

بَابُ الْإِنْجَاسِ

পরিচ্ছেদ : নাজাসাতের বিবরণ

يُطْهَرُ الْبَدَنُ وَالثَّوْبُ بِالْمَاءِ وَ بِمَاءٍ مُزِيْلٍ كَالْخَلِّ وَ مَاءِ الْوَرْدِ لَا الدُّهْنِ وَالْخُفُّ بِالدَّلْكِ بِنَجَسٍ ذِيْ جَرْمٍ وَ اِلَّا يَغْسِلُ وَ بِمَنِيٍّ يَابِسٍ بِالْفَرْكِ وَ اِلَّا يُغْسَلُ وَ نَحْوُ السَّيْفِ بِالْمَسْحِ وَ الْاَرْضُ بِالْيُبْسِ وَ ذِهَابِ الْاَثَرِ لِلصَّلٰوةِ لَا لِلتَّيَمُّمِ -

অনুবাদ : অপবিত্র দেহ এবং কাপড় সাধারণ পানী দ্বারা এবং প্রত্যেক বিদূরক তরল পদার্থ দ্বারা (ধৌত করলে) পবিত্র হয়ে যায়। যেমন সিরকা, গোলাপজল। তবে তেল দ্বারা পবিত্র করা যাবে না। এবং মুজাকে স্থূল শরীর বিশিষ্ট নাজাসাত থেকে ঘসে নেয়ার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়, নতুবা ধৌত করতে হবে। (অর্থাৎ, ভিজা নাজাসতের ক্ষেত্রে ধৌত করা ছাড়া পবিত্র হবে না।) আর শুকনা বীর্য রগড়ানোর মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়। নতুবা ধৌত করতে হবে। (অর্থাৎ বীর্য আর্দ্র হলে তা ধৌত করতে হবে। এবং তলোয়ার বা তার মত বস্তু মুছে ফেলার

মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়। আর ভূমি শুষ্ক হওয়া বা তার প্রভাব দূর হওয়ার মাধ্যমে নামাজের জন্য পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু তায়াম্মুমের জন্য তা পবিত্র হবে না।

শব্দার্থ : اَلْاَنْجَاسُ ইহা نَجْسٌ - نَجَسٌ এর বহুবচন। অর্থ- অপবিত্র, ময়লা, নাপাক, কুলষিত। (م) مُزِيْلٌ مُزِيْلَةٌ - বিলোপকারী, বিদূরক, পরিস্কারক। خَلٌّ - সিরকা। مَاءُ الْوَرْدِ - গোলাপ পানি। (ج) ادهانٌ الدهن - তৈল, চর্বি। دَلْكٌ - ঘর্ষণ, মালিশ। (ن) دَلَكَ دَلْكًا - ঘর্ষণ করা, ঘষা। ذِيْ جِرْمٍ - স্থূল দেহ বিশিষ্ট। (م) يَابِسٌ يَابِسَةٌ - শুকনা, শুষ্ক, অনুর্বর। اَلْفَرْكُ - ডলা, রগড়ানো, ঘর্ষণ করা। اَلْاَثَرُ - প্রভাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الْاَنْجَاسِ الخ : গ্রন্থকার ইতিপূর্বে নাজাসাতে হুকমী এবং তা থেকে পবিত্রতার নিয়ম কানুন বর্ণনা করেছেন। এবারে নাজাসাতে হাক্বীক্বী এর আলোচনা শুরু করছেন। উল্লেখ্য যে, নাজাসাতে হুকমী নাজাসাতে হাকীকীর তুলনায় অধিক শক্তিশালী, তাই গ্রন্থকার নাজাসাতে হুকমীর আলোচনা প্রথমে তারপরে নাজাসাতে হাকীকী আলোচনা করেছেন।

قوله : يُطْهَرُ الْبَدَنُ وَ الثَّوْبُ الخ : শাইখাইন রহ. এর মতে শরীর কাপড় ইত্যাদি অপবিত্র হলে তা পবিত্র করা যায় সাধারণ পানি দ্বারা এবং ঐ পাক পদার্থ দ্বারা যার মাধ্যমে নাজাসাত দূর করা সম্ভব। যেমন সিরকা, গোলাপজল ইত্যাদি দ্বারা ধৌত করাতে পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম জুফর, মালিক, মুহাম্মদ এবং ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে পানি ছাড়া অন্যান্য পদার্থ দ্বারা ত্বাহারাত হাসিল করা জায়েয নয়।

দলিল হলো : নাজাসাতের সাথে কোন পবিত্র বস্তু মিলিত হওয়ার দরুন তাও নাপাক হয়ে যায়। অর্থাৎ পানি বা অন্য বস্তু যেই মাত্র কোন নাজাসাতে পড়ে তখনই তা নাপাক হয়ে যায়। বিধায় যে বস্তু নিজে নাপাক হয়ে গেল সে অন্যের নাপাকী কিভাবে দূর করবে। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে শুধু পানির ক্ষেত্রে এ কিয়াসকে তরক করা হলো। আর শুধু পানিকেই তাহারাতের জন্য মুফিদ ধরে নেয়া হলো।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ (انفال ٩)

তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন যেন তোমাদেরকে তা দ্বারা পবিত্র করেন।

উক্ত আয়াতে শুধু পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উদ্দেশ্য।

শাইখান রহ. এর দলিল : প্রতিটি প্রবাহিত পানি বিদূরণকারী তথা নাজাসাত পরিস্কার করে দেয়। এদিকে যেভাবে পানির মধ্যে নাজাসাত ইত্যাদি দূর করার শক্তি বিদ্যমান তেমনি প্রতিটি প্রবাহিত বস্তুর মধ্যেও পানির ন্যায় নাজাসাত ইত্যাদি দূরীকরণ শক্তি রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. গংদের দলিলের জবাব : যে প্রয়োজনের কারণে পানির বেলায় কিয়াস রহিত করা হয়েছে সে প্রয়োজনকে সামনে রেখে আমরা বলব প্রত্যেক প্রবাহিত বস্তু যা নাপাকি দূর করার শক্তি রাখে তার ব্যাপারেও কিয়াস রহিত করা উচিত। অপর দিকে যদিও পানি নাজাসাতের সাথে মিলে অপবিত্র হয়েও যায় তথাপি এক পর্যায়ে নাজাসাতের অংশগুলো পানির সাথে প্রবাহিত হয়ে মহল তথা কাপড় ইত্যাদি পাক হয়ে যাবে তার এ দূরীকরণ শুধু যে পানি দ্বারা হয় তা নয়, বরং প্রত্যেক পদার্থ দ্বারা সম্ভব।

আয়াত দ্বারা দলিলের জবাব : কোন বস্তুর আলোচনা দ্বারা তার তাখসীস বুঝায় না। তাই আয়াতে পানির উল্লেখ দ্বারা অন্যান্য তরল পদার্থ যে غير مطهر তা বুঝানো হয় নি।

قوله : وَالْخُفُّ الخ : যদি মুজাতে স্থুল শরীর বিশিষ্ট কোন নাজাসাত যেমন গোবর, পায়খানা, ইত্যাদি লেগে তা শুকিয়ে যায়, অতঃপর তা মাটি বা অন্য কোন খড় ইত্যাদি দ্বারা ঘষে নেয় তবে তা পবিত্র হয়ে যাবে। আর এ ধরণের মুজা পরিধান করে নামাজ পড়া জায়েয। ইহা ইসতিহসানের হুকুম। আর যদি তরল নাজাসাত লাগে তবে তা ধৌত করতে হবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতামত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে উভয় সূরতে ধৌত করতে হবে। অন্যথায় পবিত্র হবে না।

শায়খাইন রহ. এর দলিল হল : হুজুর সা. এর ফরমান 'যদি মুজাতে কোন নাজাসাত লেগে থাকে তবে কেন ভূমিতে ঘর্ষণ করা হয়। কেননা, জমিন তা পবিত্র করে দেয়। (আবু দাউদ)

قوله : وَ بِمَنِيٍّ يَابِسٍ الخ : হানাফী মাজহাব অনুযায়ী বীর্য নাপাক বিধায় কোন পবিত্র বস্তুতে ইহা লাগলে তা অপবিত্র হয়ে যায়। যদি বীর্য কোথাও লেগে শুকিয়ে যায় তবে তা রগড়ানোর মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়। আর যদি তরল হয় তবে ধুয়ে নিতে হবে। কেননা, হুজুর সা. হযরত আয়েশা রাযি. কে বলেছেন, আদ্র হলে তা ধুয়ে ফেলো আর শুষ্ক হলে তা রগড়িয়ে ফেলো। অন্যত্র হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসের শেষের দিকে রয়েছে—

وَإِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْخَمْسِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ وَالْقَيِّ

নিশ্চয়ই পাঁচটি কারণে কাপড় ধৌত করতে হয়। পেশাব, পায়খানা, রক্ত, বীর্য ও বমি।

এদিকে বীর্য সৃষ্টি রক্তের মাধ্যমে আর রক্ত তা নাপাক। তাই রক্ত থেকে গঠিত বীর্যও নাপাক। বিধায় তা শুষ্ক হলে রগড়ানোর মধ্যে পাক হবে। আর তরল হলে ধৌত করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে বীর্য পবিত্র বিধায় তা কোন বস্তুকে অপবিত্র করে না তাই কাপড়েও লেগে গেলে কাপড় পবিত্র করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিল : হযরত আয়েশা রাযি. এর বর্ণিত একটি হাদীস উপস্থাপন করেন, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সা. এর কাপড় থেকে বীর্য খোচাতাম, অথচ তখন তিনি নামাযরত থাকতেন।

আমরা বলব, উক্ত হাদীসে وَهُوَ يُصَلِّيْ এর স্থলে فَيُصَلِّيْ এসেছে। তখন হাদীসের সারমর্ম এই দাড়ায় যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সা. এর কাপড় থেকে বীর্য খোচাতাম, অতঃপর তিনি নামায পড়তেন।

قوله : وَنَحْوُ السَّيْفِ الخ : তরবারী, আয়না ইত্যাদি বস্তুতে নাজাসাত লাগলে তা ভালভাবে মুছেহ করলে পবিত্র হয়ে যায়। কারণ তা এমন যে, তার ভিতরে নাজাসাত প্রবেশ করতে পারে না এবং তার ভিতর নাজাসাতের আছরও প্রবিষ্ট হয় না। বরং তা মুছেহ করার দ্বারা যথেষ্ট।

قوله : وَالْأَرْضُ الخ : মাটিতে নাজাসাত লাগার পর তা রৌদ্র বাতাস বা অন্য বস্তু দ্বারা শুকিয়ে যায় তবে তাতে নামাজ পড়া জায়েয, কিন্তু উক্ত মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। কেননা, তায়াম্মুমের জন্য পবিত্র মাটি হওয়ার শর্ত কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا অতঃপর তোমরা তায়াম্মুম কর পবিত্র মাটি দ্বারা। আর কিতাবুল্লাহ দ্বারা যা প্রমাণিত হয় তা قطعى তথা অকাট্য। এজন্য তায়াম্মুমের জন্য যে মাটি হতে হবে তা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা পবিত্র হতে হবে। কিন্তু এস্থানে মাটির পবিত্রতা সাব্যস্ত হয়েছে। খবরে ওয়াহিদ তথা ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا দ্বারা। আর যা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত হয় তা قطعى তথা অকাট্য হয় না, বরং ظنى হয়। বিধায় যেহেতু অকাট্য ভাবে প্রমাণিত যে পবিত্র মাটি তায়াম্মুমের জন্য শর্ত তাই এহেন ظنى ভাবে প্রমাণিত মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয হবে না।

وَعُفِيَ قَدْرُ الدِّرْهَمِ كَعَرْضِ الْكَفِّ مِنْ نَجَسٍ مُغَلَّظٍ كَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَ خُرْءِ الدَّجَاجَةِ وَ بَوْلِ مَالَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَالرَّوْثِ وَلْخِثْيِ وَمَا دُوْنَ رُبْعِ الثَّوْبِ مِنْ مُخَفَّفٍ كَبَوْلِ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَالْفَرَسِ وَخُرْءِ طَيْرٍ لَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ دَمِ السَّمَكِ وَلُعَابِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَ بَوْلٍ اِنْتَضَحَ كَرَءُسِ الْاِبَرِ -

অনুবাদ : ক্ষমা করা হয়েছে নাজাসাতে গলিজা এক দিরহাম তথা হাতের তালুর মধ্যভাগ পরিমাণ। যেমন রক্ত, মদ, মুরগের বিষ্টা, গোস্ত খাওয়া যায়না এমন প্রাণীর পেশাব, পশুমল এবং গোবর। আর ক্ষমাযোগ্য নাজাসাতে খফিফা কাপড়ের এক চতুর্থাংশের কমে। যেমন গোস্ত খাওয়া যায় এমন প্রাণীর এবং ঘোড়ার পেশাব এবং গোস্ত খাওয়া যায়না এমন পক্ষীর বিষ্টা, মাছের রক্ত, খচ্চর ও গাধার লালা এবং সুইয়ের মাথা পরিমাণ পেশাবের ছিটা।

শব্দার্থ : كَفٌّ (ج) كُفُوْفٌ - اَكُفٌّ - হাতের তালু, হাত। خَمْرٌ (ج) خُمُوْرٌ - শরাব। خَرْءٌ (ج) خُرُوْءٌ - মল, পায়খানা। اَلرَّوْثُ (ج) اَرْوَاثٌ - পশুর পায়খানা, পশুমল। خِثْيٌ - গোবর। لُعَابٌ - (মুখের) লালা। بَغْلٌ (ج) بِغَالٌ - اَبْغَالٌ - খচ্চর (প্রাণী) (م) بَغْلَةٌ (ج) بَغَلَاتٌ - খচ্চরি। حِمَارٌ (ج) حُمُرٌ - গাধা, গর্দভ। اِنْتَضَحَ - ছিটা লাগা। اَلْاِبَرُ - সূচ, সুই, হুল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وعفي الخ : নাজাসাত দুই প্রকার : (১) নাজাসাতে গলিজা। (২) নাজাসাতে খফিফা। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে নাজাসাতে গলিজা বলা হয় যার নাজাসাত হওয়ার প্রমাণ এমন নস দ্বারা হয় যার বিপরীতে অন্য কোন নস তার পবিত্রতা সাব্যস্তকারী না থাকে। আর খফীফা বলা হয় যা নাজাসাত হওয়ার প্রমাণ কোন নস দ্বারা হয় যার বিপরীতে অন্য নস তার অপবিত্রতা প্রমাণিত করে।

সাহেবাইন রহ. এর মতে নাজাসাতে গলিজা হল এমন নাজাসাত যার নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। আর খফিফা হলো ঐ নাজাসাত যার নাপাক হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামগণের মতানৈক্য রয়েছে।

নাজাসাতে গলিজা এর বিধান : নাজাসাতে গলিজা তথা রক্ত, শরাব, মুরগের বিষ্টা পশুমল ইত্যাদি যদি এক দিরহাম পরিমাণ হয় তবে তা মাফ। ইহাতে নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর এক দিরহাম পরিমাণের অধিক হলে মাফ নয় বরং তা ধৌত করতে হবে এবং নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফর রহ. এর মতে অল্প ও অধিক নাজাসাত সমান। অর্থাৎ মুতলাকান নাজাসাত নিয়ে নামাজ জায়েয হবে না। তা কম হোক বা বেশী হোক। তাদের দলিল হল যে নুসুসসমূহে ধৌত করার হুকুম এসেছে তাতে কম বেশীর কোন ব্যাখ্যা নেই। তাই কম হউক বা বেশী হউক তা পাক করা ওয়াজিব।

আমাদের দলিল হল : অল্প পরিমাণ নাজাসাত এমন যার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কেননা, অল্প পরিমাণের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকেও প্রয়োজনকে মুসতাহছান রাখা হয়েছে। নাজাসাতে খফিফা তথা লঘু নাপাকী যেমন হালাল পশুর পেশাব ঘোড়ার পেশাব হারাম পক্ষির বিষ্টা ইত্যাদি। কাপড়ের এক চতুর্থাংশের কমে লাগলে তা ক্ষমাযোগ্য। আর এর চেয়ে বেশী লাগলে তা ক্ষমাযোগ্য নহে।

قوله : وَدَمُ السَّمَكِ الخ : ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে মাছের রক্ত নাপাক নয়। কারণ তা

প্রকৃতপক্ষে রক্তই নয়। কারণ মাছের রক্ত রোদের তাপে সাদা হয়ে যায়। আর অন্যান্য রক্ত রোদের তাপে কালো হয়ে যায়। তাছাড়া জবাই ছাড়াও মাছ খাওয়া জায়েয, বিধায় মাছের রক্ত নাপক নয় এবং তা কাপড় ইত্যাদিতে থাকা সত্ত্বেও নামায জায়েয।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে মাছের রক্ত নাজাসাতে খফীফা। সুতরাং তা যদি কোন কাপড়ে অধিক পরিমাণে লেগে যায়, তবে তা ধৌত করতে হবে। তা নিয়ে নামায জায়েয হবে না। কারণ, ইহা অন্যান্য রক্তের সাদৃশ্য।

وَالنَّجَسُ الْمَرْئِىُّ يَطْهُرُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ اِلَّا مَا يَشُقُّ زَوَالُهُ وَ غَيْرُهُ بِالْغُسْلِ ثَلْثًا وَالْعَصْرِ كُلَّ مَرَّةٍ وَ بِتَثْلِيْثِ الْجَفَافِ فِيْمَا لَايَنْعَصِرُ وَ سُنَّ الْاِسْتِنْجَاءُ بِنَحْوِ حَجَرٍ مُنَقٍّ وَمَا سُنَّ فِيْهِ عَدَدٌ وَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ اَحَبُّ وَ يَجِبُ اِنْ جَاوَزَ النَّجَسُ الْمَخْرَجَ وَ يُعْتَبَرُ الْقَدْرُ الْمَانِعُ وَرَاءَ مَوْضَعِ الْاِسْتِنْجَاءِ لَابِعَظْمٍ وَرَوْثٍ وَطَعَامٍ وَ يَمِيْنٍ اِلَّا بِعُذْرٍ -

---

অনুবাদ : দৃশ্য নাজাসাত পবিত্র হয়ে যায় তার মূল পদার্থ দূর হওয়ার দ্বারা। তবে দূর হওয়া কষ্টকর এমন দাগ লেগে থাকলে দোষ নেই। তাছাড়া তথা অদৃশ্য নাজাসাত তিনবার ধৌত করা ও নিংড়ানোর মাধ্যমে পাক হয়ে যায়। আর যা নিংড়ানো সম্ভব নয়, তা তিনবার শুষ্ক করার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়। ইস্তিঞ্জার সুন্নত হলো পরিস্কারকারী পাথর বা তার মত বস্তু দ্বারা (ইস্তিঞ্জা করা) কিন্তু তাতে সংখ্যা সুন্নত নয়। এবং পানি দ্বারা ধৌত করা অনেক পছন্দসই। আর নাজাসাত তার স্থান ত্যাগ করলে পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব এবং নাজাসাতের মূল স্থান বাদ দিয়ে নামাযে বাধাদানকারী পরিমাণ বিবেচনা হবে। (অর্থাৎ, এক দিরহাম পরিমাণ হলে তা নামাযের জন্য বাধা দানকারী হয়। তবে নাজাসাতের মূল স্থানকে হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হবে।) হাড়, গোবর, খাদ্যদ্রব্য দ্বারা এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে না, তবে অক্ষমতার দরুন ডান হাত ব্যবহার করা যাবে।

শব্দার্থ : اَلْمَرْئِىُّ (م) اَلْمَرْئِيَّةُ - দর্শনযোগ্য, দৃষ্টিগোচর। يَشُقُّ (ن) مُشَقَّةٌ - কঠিন হওয়া। জটিল হওয়া। কষ্টকর হওয়া। اَلْعَصْرُ (ض) تفعيل থেকে اَلتَّعْصِيْرُ -নিংড়ানো, রস বের করা। جَافٌ - শুষ্কতা, নিরসতা। اَلْاِسْتِنْجَاءُ - ইহা استفعال থেকে اِسْتَنْجِى الرَّجُلُ - লোকটি মলমূত্র ত্যাগের পর শৌচ করল। ঢিলা ব্যবহার করল। اِسْتَنْجِى مِنْ كَذَا - মুক্তি পেল, নিস্কৃতি পেল। مُنَقٍّ - সাফ করনেওয়ালা, নির্মলকারী। جاوز - مفاعلة থেকে مجاوزة অতিক্রম করা, ছাড়িয়ে যাওয়া। مَوْضَعٌ (ج) مَوَاضِعُ - স্থান, জায়গা, অবস্থান। عَظْمٌ (ج) عَظِيْمٌ - হাড্ডি, অস্থি। يَمِيْنٌ - ডান হাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَالنَّجَسُ الْمَرْئِىُّ الخ : নাজাসাত দু প্রকার : (১) দৃষ্টিগোচরশীল। অর্থাৎ শুকিয়ে যাওয়ার পর যে নাজাসাতের পদার্থ দেখা যায়, مرئى তথা দৃষ্টিগোচরশীল নাজাসাতের বিধান হল তার মূল সত্তা দূর করে দিতে হবে। যদিও তার রং, ঘ্রান বাকী থেকে যায়। কারণ নাজাসাত মূলগতভাবে স্থানে প্রবেশ করেছে। তাই তার মূল দূর করার মাধ্যমে নাজাসাত দূর হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে রং ইত্যাদি তুলা কষ্টকর হয়ে দাড়ায়। তাই শরীয়ত এমন কষ্ট থেকে রেহাই দিয়েছে। হযরত খাওলা বিনতে ইয়াসার রহ. এর বর্ণিত হাদীস এর সামর্থন করে

তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে মাত্র একটি কাপড় আছে। আর এতেই আমি হায়েযগ্রস্থ হই। হুজুর সা. বলেন, এর উপর পানি ছিটিয়ে দাও। তারপর মলো তারপর তা পানি দিয়ে ধৌত করো। খাওলা রাযি. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারপরও তার দাগ অবশিষ্ট থাকবে। হুজুর সা. বললেন, তোমার জন্য পানিই যথেষ্ট। অতঃপর কোন দাগ ইত্যাদি অবশিষ্ট থাকলে কোন অসুবিধা নেই। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, দৃষ্টিগোচরশীল নাজাসাতের মূল সত্ত্বা ধোয়ে পরিস্কার করলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। যদিও দাগ অবশিষ্ট থাকে।

(২) غَيْرُ مَرْئِيٍّ দৃষ্টিগোচর হীন নাজাসাত। অর্থাৎ নাজাসাতের এমন পদার্থ যা শুকানোর পর দৃষ্টি পটে ভাসে না। তার বিধান হলো, তা এ পরিমাণ ধৌত করা যে ধৌতকারী ব্যক্তির প্রবল ধারণা হয়ে যায় যে, তা পাক হয়ে গেছে। কেননা, এ নাজাসাত দূরিভূত হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ সম্ভব নয়। তাই প্রবল ধারণাই বিবেচিত হবে।

ফুকাহায়ে ইসলাম এই প্রবল ধারণাকে তিন বারের সীমা নির্ধারণ করেছেন। কেননা, এর দ্বারা প্রবল ধারণা লাভ করা যায়। এ মতামতের সমর্থন হাদীস দ্বারা পাওয়া যায়। হুজুর সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে তখন সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ডুবায়। কেননা, সে জানে না নিদ্রিত অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিলো। উক্ত হাদীসে অস্পষ্ট নাজাসাতের কারণে তিনবার ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। নিংড়ানোশীল বস্তু তিনবারই নিংড়ানো জরুরী। আর নিংড়ানো যায় না এমন বস্তু শুকানো জরুরী।

قوله : سُنَّ الْاِسْتِنْجَاءُ الخ : আমাদের মতে ইস্তিঞ্জা করা সুন্নাতে মুআক্কাদা, এই মতটি ইমাম মালিক রহ. এবং মুযানী রহ. গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে ইস্তিঞ্জা করা ফরয। আমাদের দলিল হলো, হুজুর সা. এর সব সময়ের আমল—

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ فِى خَلَاءٍ فَاَحْمِلُ اَنَا وَ غُلَامٌ نَحْوِى اِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَ عَنَزَةٍ فَيَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ - (بخارى و مسلم)

হযরত আনাস রাযি. বলেন, হুজুর সা. যখন পায়খানায় তাশরীফ নিতেন, তখন আমি এবং আমার মত এক ছেলে পানির পাত্র ও লাঠি বহন করতাম। অতঃপর তিনি পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন।

অন্যত্র হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত—

قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ اِلَّا مَسَّ مَاءً -

তিনি বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ্ সা. কে পায়খানা থেকে পানি ব্যবহার না করে বের হতে দেখি নি। উল্লেখিত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল (হুজুর সা.) সর্বদা ইস্তিঞ্জা করতেন (পানি দ্বারা)।

قوله : وَمَا سُنَّ فِيْهِ عَدَدٌ الخ : পাথর বা পাথর জাতিয় যা মাটির ঢেলা ইত্যাদিতে কোন সংখ্যা সুন্নত নয়। বরং যে পরিমাণে ব্যবহার করলে পবিত্রতা অর্জিত হবে সে পরিমাণ ব্যবহার করা।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, পাঁচ, সাত ইত্যাদি বেজোড় সংখ্যায় ঢিলা ব্যবহার করা সুন্নাত। তিনি দলিল পেশ করেন, হুজুর সা. এর বাণী দ্বারা। হুজুর সা. ইরশাদ করেন, তিন পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা উচিত। (আবু দাউদ, নাসায়ী) অন্যত্র হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর বর্ণিত এক হাদীসের শেষে হুজুর সা. বলেছেন, وَيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ এবং সে যেন তিনটি পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে।

আমাদের দলীল হল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর বর্ণিত হাদীস যা আবু দাউদ শরীফে রয়েছে—

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ الخ

হুজুর সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সুরমা ব্যবহার করবে সে যেন বেজোড় (তিন) ব্যবহার করে যে তা

করল সে ভাল করল। আর যে করল না, তার কোন গুনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি পাথর ইত্যাদি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে সে যেন বেজোড় ব্যবহার করে। যে তা করল সে ভালো করল আর যে করল না তার কোন গুনাহ নেই। আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. বলেন বেজোড় তো একটিও হতে পারে। হাদীসে বলা হয়েছে বেজোড় তরক করলে গোনাহ নেই। সুতরাং বুঝা গেল, ইস্তিঞ্জা তরক করলেও কোন ক্ষতি নেই। আর যে বস্তু তরক করাতে কোন গুনাহ বা ক্ষতি হয় না তা কখনও ফরয ওয়াজিব হতে পারে না। এতে পরিষ্কার হল যে, ইস্তিঞ্জা ফরয নয় বরং সুন্নাত।

হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. এর হাদীসের জবাব হল : مَتْرُوْكُ الظَّاهِرِ অর্থাৎ বাহ্যিক অর্থ বর্জন করা হয়েছে। কেননা, যদি কেহ তিন কোন বিশিষ্ট একটি পাথর ব্যাবহার করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা যথেষ্ট হবে। এতে বুঝা যায় মূলত তিন সংখ্যা শর্ত নয়।

قوله : بِعَظْمٍ وَ رَوْثٍ الخ : হাড়, গোবর, খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ। হাড় ও গোবর দ্বারা নিষেধ হওয়ার কারণ হলো হুজুর সা. এর পবিত্র বাণী—

لَاتَسْتَنْجُوْ بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَاِنَّهٗ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

তোমরা হাড় ও গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করো না, কেননা, এগুলো তোমাদের ভাই জ্বিন জাতির খাদ্য।

খাদ্যদ্রব্য দ্বারা নিষেধ হওয়ার কারণ হলো, প্রথমতঃ খাদ্যদ্রব্য এমন যা দ্বারা মানুষ জীবন ধারণ করে। যা খুবই সম্মানিত বস্তু। তাই তা এত নিকৃষ্ট কাজে ব্যবহার করা অনুচিত। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করা ও অপচয়ের শামিল। আর এ দুটুই হারাম।

وَيَمِيْنٍ اِلَّا بِعُذْرٍ الخ : নিজের ডান হাতে ইস্তিঞ্জা নিষেধ। হুজুর সা. ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে বারণ করেছেন—

قَالَ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهٗ بِيَمِيْنِهٖ وَلَا يَسْتَنْجِىْ بِيَمِيْنِهٖ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ - (بخارى و مسلم)

হুজুর সা. বলেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ পেশাব করে তবে সে যেন তার ডান হাত দ্বারা স্বীয় যৌনাঙ্গ স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হলো যে, ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ। তবে হা যদি কোন অক্ষমতা থাকে তবে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ যদি কাহারও বাম হাত না থাকে অথবা আছে কিন্তু যে কোন কারণে ব্যাবহার করতে অক্ষম হয় তবে ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

অধ্যায় : নামায

وَقْتُ الْفَجْرِ مِنَ الصُّبْحِ الصَّادِقِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى بُلُوغِ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ سِوَى الْفَيْءِ وَالْعَصْرِ مِنْهُ إِلَى الْغُرُوبِ وَالْمَغْرِبِ مِنْهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ وَهُوَ الْبَيَاضُ وَالْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ مِنْهُ إِلَى الصُّبْحِ وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْعِشَاءِ لِلتَّرْتِيبِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ وَقْتَهُمَا لَمْ يَجِبَا

অনুবাদ : ফজরের সময়ের সূচনা সুবহে সাদিক তথা ভোরের দ্বিতীয় আলো উদিত হওয়া থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। জোহরের নামাযের সময়ের সূচনা যাওয়াল তথা সূর্য হেলে যাওয়া থেকে মধ্যাহ্ন ছায়া ব্যতীত দ্বিগুনে ছায়া পৌছা পর্যন্ত। আছরের সময়ের সূচনা তা থেকে তথা জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের সূচনা সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে শাফাক অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। আর তা হল শুভ্রতা। এশার ও বিতরের সময়ের সূচনা শাফাক পরবর্তী শুভ্রতা থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। তারতীব বা ধারাবাহিকতার কারণে বিতরকে এশার পূর্বে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। আর যে ব্যক্তি এশা ও বিতরের ওয়াক্ত পেল না তার উপর এশাও বিতর ওয়াজিব হবে না।

শব্দার্থ : فَجْرٌ প্রভাত, উষা। طُلُوْعٌ উদয়, আবির্ভাব। طُلُوْعِ الشَّمْسِ সূর্যোদয়। اَلزَّوَالُ অস্তগামিতা, অবসান। ظِلٌّ ছায়া। اَلْفَيْءُ (ج) اَفْيَاءُ ছায়া। اَلْغُرُوْبُ অস্ত, অস্তগমন। غُرُوْبِ الشَّمْسِ সূর্যাস্ত। اَلشَّفَقُ (ج) اَشْفَاقٌ পশ্চিম দিকের সান্ধ্যলালিমা, সন্ধ্যালোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

গ্রন্থকার রহ. নামাযের শর্ত তথা পবিত্রতার আলোচন শেষ করে নামাযের আহকাম এবং মাসাইল বর্ণনা করা আরম্ভ করছেন। অপরদিকে নামায হল সকল ইবাদতের মূল ও উৎস। তাই তাকে সকল বিধানের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পবিত্রতার অধ্যায়কে তার পূর্বে উল্লেখ করার কারণ হল তা নামাযের জন্য শর্ত। আর শর্ত বস্তুর পূর্বে উল্লেখ হয়ে থাকে।

صلاة এর আভিধানিক অর্থ : صلاة এর চারটি অর্থ রয়েছে—

১. اَلصَّلَاةُ مِنَ اللهِ রহমত, দয়া, অনুগ্রহ।

২. اَلصَّلَاةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ইস্তিগফার, ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৩. اَلصَّلَاةُ مِنَ النَّاسِ দোয়া, আর ইহা থেকেই নামাযকে صلاة বলা হয়।

৪. اَلصَّلَاةُ مِنَ الطُّيُوْرِ وَغَيْرِهَا তাসবীহ।

صلاة এর পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় সুনির্দিষ্ট কর্ম ও রোকনের সমষ্টিকে صلاة বলা হয়।

নামাযের রোকন : দাঁড়ানো, ক্বিরাত পড়া, রুকু করা, সেজদা করা, তাশাহুদ পড়ার সমপরিমাণ সময় শেষ বৈঠক করা।

নামাযের হুকুম : ইসলামের পাঁচটি অন্যতম ফরয থেকে একটি হল নামায। শরিয়তে নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাআলা মানব জাতির জন্য নামাযকে ফরয হিসাবে ধার্য করেছেন। আলকুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন। وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ "তোমরা নামায কায়েম কর।" (বানি ইসরাইল)

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (নিসা:১০৩)

পবিত্র হাদিস শরীফে আল্লাহর রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ মহান আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর রাত্র দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। নামায মোট পাঁচ ওয়াক্ত ফরয এর উপর উলামায়ে কেরামগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

وقوله : وَقْتُ الْفَجْرِ الخ নামায ওয়াজিব হওয়ার কারণ—

নামাযের ওয়াক্ত হওয়াটা নামায ওয়াজিব হওয়ার কারণ। সুতরাং ওয়াক্ত হল সবব। আর সববটি মুসাব্বাবের পূর্বে হয়ে থাকে। তাই মুসান্নিফ রহ. নামাযের অন্যান্য বিধিবিধানের পূর্বে নামাযের ওয়াক্তের বর্ণনা শুরু করেছেন।

ফজরের নামাযের ওয়াক্ত: ফজরের নামাযের সূচনা সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। (সুবহে সাদিক হল পুব আকাশে একটি আলো বিস্তৃত হওয়া যার পরে অন্ধকার হয় না। পক্ষান্তরে সুবহে কাযিব হল ঐ আলো যা পুর্বদিগন্তে লম্বালম্বিভাবে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু তার পরে আবার অন্ধকার হয়ে যায়। আহলে আরব সুবহে কাযিবকে যানবুস-সারহান (বাঘের রক্ত) বলে। **প্রমাণ :** হাদীসে জিবরাইলে এক পর্যায়ে হুযুর বলেন, وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ 'এবং আমাকে নিয়ে ফজর পড়েছেন যখন ফজর তথা সুবহে সাদিক উদিত হয়েছে' সাহেবে হেদায়া বলেন, ফজরের নামাযে সুবহে সাদিক ধর্তব্য সুবহে কাযিব নয়। কেননা তিরমিযী ও মুসলিম শরীফে আল্লাহর রাসুল বলেন- لَايَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ 'বেলালের আযান এবং লম্বালম্বি আলো যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। অর্থাৎ হযরত বেলাল রাযি. সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পূর্বে তাহাজ্জুদের জন্য আযান দিতেন। অতঃপর সুবহে সাদিক হওয়ার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. ফজরের আযান দিতেন। আর فجر مستطيل ঐ আলো যা লম্বালম্বি বিস্তৃত হয়, তা ই হল فجر كاذب

قوله : وَالظُّهْرُ الخ : **জোহরের নামাযের ওয়াক্ত :**

জোহরের ওয়াক্তের সূচনা হয় সূর্য মধ্যাহ্ন থেকে হেলে যাওয়ার পর। প্রমাণ হাদিসে জিবরাইলের এক পর্যায়ে হুযুর সা. বলেন, وَصَلَّى بِي الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَصَارَ الْفَيْءُ مِثْلُ الشِّرَاكِ 'প্রথম দিন আমাকে নিয়ে জোহরের নামায আদায় করেছেন যখন সূর্য হেলে যায় এবং বস্তুর ছায়া জুতার ফিতার সমপরিমাণ হয়'। সুতরাং প্রতিয়মান হল জোহরের ওয়াক্তের সূচনা সূর্য হেলে যাওয়া থেকে শুরু হবে। কিন্তু জোহরের শেষ ওয়াক্ত নিয়ে উলামায়ে আহনাফের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা রহ. হতে এব্যাপারে তিনটি রেওয়ায়েত রয়েছে :

১. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. আবু হানীফা রহ. হতে বর্ণনা করেন, মূল ছায়া ছাড়া প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুন হলে জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

২. হযরত হাসান বিন যিয়াদ রহ. ইমাম আবু হনীফা রহ. থেকে বর্ণনা করেন, মূল ছায়া ছাড়া প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয় তখন জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে। আর ইহাই ইমাম আবু ইউসুফ রহ., ইমাম মুহাম্মাদ রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ. এবং ইমাম যুফার রহ. এর মত।

৩. আসাদ ইবনে ওমর ও আলী ইবনে জা'দ ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণনা করেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার মূল ছায়া ছাড়া তার সমপরিমাণ হবে তখন জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। তবে আসরের নামাযের সূচনা হয় না; বরং আসরের ওয়াক্ত প্রত্যেক ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতিরেকে দ্বিগুন হওয়ার পর থেকে সূচনা হয়।

সাহেবাইন, শাফেয়ী ও ইমাম যুফার রহ. দলীল পেশ করেন হাদিসে জিবরাইল দ্বারা। হযরত জিবরাইল (আঃ) হুযুর সা.-কে নিয়ে প্রথম দিন ঐসময় আসরের নামায পড়েছেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রহ. দলীল পেশ করেন, হযরত আবু সাইদ খুদরী রাযি. এর হাদিস দিয়ে। أَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা জোহরের নামায শীতল করে পড়, কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের তীব্রতা থেকেই আসে'। প্রমাণ এভাবে যে হুযুর সা. জোহরের নামায শীতল করে পড়ার নির্দেশ করেছেন। এদিকে আরব দেশগুলোতে সূর্যের ছায়া বস্তুর সমপরিমাণ হওয়ার সময় প্রচণ্ড গরম বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এক মিছিলের পরও প্রচণ্ড গরম বিদ্যমান থেকে যায়। তাহলে কীভাবে আসরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যাবে। আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. হাদিসে জিবরাইলের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, হাদিসে জিবরাইল প্রথম সময়ের আর আবু সাইদ খুদরি রাযি.এর হাদিসখানা পরের দিকের। এদিকে প্রকাশ থাকে যে পরের হাদিস প্রথম পর্যায়ের হাদিসের জন্য রহিতকারী হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং স্পষ্ট হল যে, হাদিসে জিবরাইল মানসুখ। আর আবু সাইদ খদরি রাযি. এর হাদিস নাসিখ।

قوله : وَالْعَصْرُ مِنْهُ الخ আসরের ওয়াক্ত : আসরের ওয়াক্তের সূচনা জোহরের ওয়াক্তের পরিসমাপ্তির পর থেকে। চাই জোহরের ওয়াক্ত সাহেবাইনদের বর্ণনা মতে এক মিছিলে শেষ হউক বা ইমাম আবু হানীফা রহ. এম বর্ণণ মতে দু মিছিলে শেষ হউক।

আর আসরের শেষ ওয়াক্ত সূর্য অস্ত যায়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকে। প্রমাণ: হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদিস

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ (متفق عليه)

তিনি বলেন হুযুর সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে ফজরের এক রাকাত পেল সে যেন ফজরের নামায পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আসরের এক রাকাত পেল সে যেন আসরের নামায পেল। উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, আসরের ওয়াক্ত সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।

قوله : وَالْمَغْرِبُ مِنْهُ الخ : মাগরিবের ওয়াক্ত: মাগরিবের ওয়াক্ত সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে সূচনা হয় এবং (شفق) পশ্চিম দিকের সান্ধ্য লালিমা দূরিভূত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ.. এর মতে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর শুধু পাঁচ রাকাত নামায পড়া যায় এমন পরিমাণ সময় হল মাগরিবের ওয়াক্ত। তিনি দলীল হিসাবে হাদিসে জিবরাইল পেশ করেন, আর বলেন যে হযরত জিবরাইল আ. উভয় দিনই হুযুর সা. কে নিয়ে একই সময়ে মাগরিবের নামায পড়েছেন। হুযুর সা. বলেন, صَلَّى بِى الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ

অতঃপর দ্বিতীয় দিনের বর্ণনায় বলেন, وَصَلَّى بِى الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ لِوَقْتِهِ بِالْأَمْسِ ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, যদি মাগরিবের ওয়াক্ত লম্বা হত তবে হযরত জিবরাইল (আঃ) উভয় দিনই এক সময় মাগরিবের নামায পড়াতেন না। আমাদের দলীল হল হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদিস—

أَوَّلُ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَآخِرُهُ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ

অর্থাৎ মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত হল যখন সূর্য অস্ত যায় আর তার শেষ সময় হল যখন শাফাক্ব ডুবে যায়। এদিকে হযরত জিবরাইল (আঃ) উভয় দিন একই সময় নামায পড়ার কারণ হল মাগরিবের নামায ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ।

قوله : وَالشَّفَقُ الخ : (শাফাক্ব) এর সীমা নিয়ে উলামায়ে কেরামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে শাফাক্ব ঐ আলোকে বলে যা পশ্চিম দিগন্তে লালিমার পর বিস্তৃত হয়।

ইহা হযরত আবুবকর রাযি. মুয়ায রাযি. আনাস রাযি. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. থেকে বর্ণিত আছে।

২. সাহেবাইন রহ. এর মতে শাফাক্ব হল লালিমা, আর ইহাই ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অভিমত।

قوله : وَالْعِشَاءُ الخ : এশার নামাযের ওয়াক্তের সূচনা শাফাক্ব অস্ত যাওয়ার পর থেকে আরম্ভ হয় আর শেষ ওয়াক্ত হল সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, রাতের তৃতীয়াংশ অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত এশার সময় বিদ্যমান থাকে। তিনি দলীল হিসাবে হাদিসে জিবরাইল (আ.)-কে উল্লেখ করেন। আমাদের দলীল হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদিস-

أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَآخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرَ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এশার শেষ ওয়াক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহে সাদিক উদিত না হয়। সুতরাং প্রমাণিত হল, এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত সুবহে সাদিক পর্যন্ত। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীলের জবাব হল, আমাদের হাদিসখানা পরের আর হাদিসে জিবরাইল হল পূর্বের সুতরাং আমাদের পেশকৃত হাদিসখানা হল রহিতকারী (নাসিখ) আর হাদিসে জিবরাইল হল রহিত (মানসুখ)

قوله : وَالْوِتْرُ الخ বিতর নামাযের ওয়াক্ত: বিতরের প্রথম ওয়াক্ত নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সাহেবাইনের মতে এশার নামাযের পর থেকে বিতরের সময় আরম্ভ হয় এবং সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত বিতিরের ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকে।

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে এশার নামাযের সময়ই বিতরের সময়।

সাহেবাইন রহ. এর দলীল হল, খারিজা ইবনে হুযাফা রাযি. এর হাদিস—

قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ أَضَافَ بِصَلٰوةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ -

খারিজা ইবনে হুযাফা রাযি. বলেন হুযুর (রঃ) আমাদের নিকট আগমন করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা একটি নামায বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা তোমাদের জন্য লাল উষ্ট্রি হতে উত্তম। আর তা হল বিতরের নামায। অতঃপর তিনি এটাকে এশা এবং সুবহে সাদিকের মধ্যখানে রাখেন। (ফাতহুল কাদির)

قوله : وَمَنْ لَمْ يَجِدْ وَقْتَهُمَا الخ যে ব্যক্তি এশা এবং বিতরের ওয়াক্ত না পায় তার উপর এশা এবং বিতর ওয়াজিব হবে না। তবে এই মাসআলাটি অত্যন্ত জটিল, যা আইনুল হিদায়ার প্রণেতা মাওলানা আমির আলী সাহেব বর্ণনা করেছেন, যে দেশে এশা ও বিতরের ওয়াক্ত না হয় তথা শাফাক্ব অস্ত হওয়ার সাথে সাথেই সুবহে সাদিক হয়ে যায় সেখানে এশা এবং বিতর ওয়াজিব কি না সে ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে।

প্রথম অভিমত: এশা ও বিতর ওয়াজিব তবে এভাবে যে সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথেই অনুমান করে এশা ও বিতরের সময় ধরে প্রথমে এশা ও বিতর পড়ে পরে ফজরের নামায পড়ে নিবে।

দ্বিতীয় অভিমত : উভয় নামায তথা এশা ও বিতর ওয়াজিবই হবে না। সুতরাং উলামায়ে কেরামগণের এক দলের মতে যেখানে এশা এবং বিতরের ওয়াক্ত পাওয়া যাবে না সেখানেও উল্লেখিত দুটি নামায পড়া ওয়াজিব। তবে হ্যাঁ তারা যেন কাযার নিয়াত না করে। কেননা আদায়ের ওয়াক্তই বিদ্যমান নেই। বুরহানে কবিরে ইহার উপরই ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। ইবনে হুমাম ও সাহেবে তানওয়ীর ইহাকে পছন্দসই বিশুদ্ধ এবং মাযহাব হিসাবে স্থির করেছেন এবং ইহাও লিখেছেন যে এক বর্ণনা মতে তাদের উপর এশা ও বিতর ফরয নয় কেননা ওয়াক্ত পাওয়া যায়নি।। কারণ নামায ফরয হওয়ার কারণ হল ওয়াক্ত পাওয়া। কানযুদ্ দাক্বাইক, মুলতাকাউল বাহার বক্কালি,হালওয়ায়ী,মুরগেনানী,হালবী প্রমুখ ফক্বিহগণ এমতের সমর্থন করেছেন।

وَنُدِبَ تَأْخِيرُ الْفَجْرِ وَظُهْرِ الصَّيْفِ وَالْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءِ إِلَى الثُّلُثِ وَالْوِتْرِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ لِمَنْ يَثِقُ بِالْانْتِبَاهِ وَتَعْجِيلُ ظُهْرِ الشِّتَاءِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا فِيْهَا عَيْنٌ يَوْمَ غَيْنٍ وَيُؤَخَّرُ غَيْرُهُ فِيهِ -

অনুবাদ : এবং ফজর এবং গ্রীষ্মকালীন জোহর (কে বিলম্ব করা) ও আসরকে সূর্য বিবর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব। এবং এশাকে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (বিলম্ব করা মুস্তাহাব) আর বিতরকে রাত্রের শেষভাগ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব তার উপর যে নিশ্চিত থাকে জাগ্রত হওয়ার প্রতি। এবং শীতকালিন জোহরকে প্রথম সময়ে এবং মাগরিবকে প্রথম সময়ে আদায় করা মুস্তাহাব। এবং যেসব নামাযের শুরুতে ع বর্ণ রয়েছে তথা العصر এবং العشاء কে মেঘাচ্ছন্ন দিনে প্রথম সময়ে পড়ে নেয়া মুস্তাহাব। আর অন্যান্য নামায তথা فجر ، مغرب ، ظهر কে বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব।

শব্দার্থ : اَلصَّيْفُ গ্রীষ্মকাল। يَتَغَيَّرُ - تفعل থেকে تَغَيُّرًا পরিবর্তন হওয়া, বদলে যাওয়া। وَثَاقَةٌ (ض) يَثِقُ নিশ্চিত হওয়া, স্থির হওয়া, দৃঢ় হওয়া। اَلْاِنْتِبَاهُ - افتعال অর্থ : খেয়াল, লক্ষ, মনোযোগ। بِالْاِنْتِبَاهِ মনোযোগ সহকারে, সতর্কতার সাথে। اَلشِّتَاءُ শীতকাল। اَلْغَيْمُ মেঘ, মেঘাচ্ছন্ন, কুয়াশা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَنُدِبَ تَأْخِيرُ الْفَجْرِ الخ : হানাফী মাযহাবে ফজরের নামায إسفار তথা ফরসা করে পড়া মুস্তাহাব। (إسفار এর সঙ্গা- প্রভাতের আলো ফুটার পর সুন্নত তরীকায় ক্বিরাত আরম্ভ করা হবে। অতঃপর যদি কারো কোন কারণবশত: আবার অযু করার প্রয়োজন হয় তাহলে পুনঃ অজু করে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে নামায সুন্নত কেরাতের মাধ্যমে পড়া সম্ভব হয়।)

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মালিক রহ. এর মতে ফজর ওয়াক্তের প্রারম্ভে পড়া মুস্তাহাব অর্থাৎ অবিলম্বে পড়া মুস্তাহাব। তিনি দলীল হিসাবে হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদিস উল্লেখ করেন

قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ (بخاری ومسلم)

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসুল সা. ফজরের নামায পড়ে নিতেন তখন মহিলাগণ স্বীয় উড়নায় আবৃত অবস্থায় ফিরতেন, তাদেরকে অন্ধকারের জন্য পরিচয় করা যেত না। অপরদিকে হুযুর সা. এরশাদ করেন—

أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهِ

'প্রথম সময়টি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং শেষ সময়টি তার মার্জনার সময়। সুতরাং প্রতিয়মান হল, ফজরের নামায প্রথম সময় পড়ে নেয়া মুস্তাহাব। হানাফীদের দলীল হল, হযরত রাফে ইবনে খাদীজ রাযি. এর হাদিস, হুযুর সা. বলেন, أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ 'ফজরের নামায ফরসা করে পড়, কেননা তাতে অধিক ছওয়াব রয়েছে।' এখানে ফজরের নামায ফরসা করে পড়ার أمر তথা নির্দেশ করা হয়েছে এবং أمر এর সর্বনিম্ন স্তর হল মুস্তাহাব হওয়া। একারণে ফজরের নামায إسفار এ পড়া মুস্তাহাব বলা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীলের জবাব হল, হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদিসটি হল فعلی আর রাফে' ইবনে খাদিজ রাযি. এর হাদিসটি قولی এদিকে মূলনীতি হল যখন قولی এবং فعلی হাদিসে বৈপরিত্ব সৃষ্টি হয় তখন قولی হাদিস প্রাধান্য লাভ করে।

বিধায় আমরা হযরত রাফে ইবনে খাদিজের হাদিসটিকে প্রাধান্য দিয়ে বলি ফজরের নামায إِسْفَار এ পড়া মুস্তাহাব।

قوله : وَ ظُهْرُ الصَّيْفِ الخ গ্রীষ্মকালে জোহরের নামায বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব। আর শীতকালে জোহরের নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব। প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যায় বুখারী শরীফের হাদিস হযরত খালিদ ইবনে দীনার রাযি. বলেন, আমাদের নেতা আমাদের জুমার নামায পড়িয়েছেন। অতঃপর হযরত আনাস রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলেন

كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهْرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ -

রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিভাবে জোহরের নামায পড়তেন, তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, যখন তীব্র শীত পড়ত তখন রাসূল সা. নামাযকে প্রথম ওয়াক্তে পড়তেন। আর যখন প্রচণ্ড গরম পড়ত তখন হুযুর সা. জোহরের নামায শীতল করে পড়তেন তথা বিলম্বে পড়তেন।

قوله : وَالْعَصْرُ الخ : আসরের নামায প্রত্যেক মৌসুমে বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব। তবে শর্ত হল সূর্য বিবর্ণ হওয়ার পূর্বে শেষ করতে হবে। তবে ইমাম মালিক রহ. এবং ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে আসরের নামায ওয়াক্তের শুরুতে পড়া উত্তম

قوله : وَالْعِشَاءُ الخ : এশার নামায রাত্রের তৃতীয়াংশের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব। প্রমাণ হল হুযুর সা. এর হাদিস—

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِىْ لَاَخَّرْتُ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ

'যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবে অনুভব না করতাম তবে নিশ্চয় আমি ইশার নামায রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতাম।

এদিকে হুযুর সা. ইরশাদ করেন لَاسَمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ 'ইশার পর আলাপ-আলোচনা নেই'। মোট কথা ইশার পর আলাপ-আলোচনা করা থেকে বারণ করা হয়েছে। সুতরাং ইশার নামায রাত্রের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করার দ্বারা আলাপ আলোচনা, গল্প ইত্যাদির রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ যখন ইশার নামায বিলম্বে পড়বে তখন নামায পড়ার পরপরই মানুষ ঘুমানোর চিন্তা করবে। একারণে রাত্রের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব হিসাবে ধার্য করেছেন।

قوله وَالْوِتْرُ اِلٰى آخِرِ اللَّيْلِ الخ : বিতরের নামায বিলম্বে পড়া তথা রাতের শেষে পড়া তার জন্য মুস্তাহাব যে শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়া এবং তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত। পক্ষান্তরে যদি কেহ শেষ প্রহরে জাগ্রত হওয়ার এবং তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত নয় বা জাগ্রত হওয়ার প্রতি সন্দিহান তার জন্য ঘুমানোর পূর্বে পড়ে নেয়া উত্তম। কেননা হুযুর সা. ইরশাদ করেন—

مَنْ خَافَ أَن لَّايَقُوْمَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَن يَّقُوْمَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ

'যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে শেষ রাতে জাগ্রত হতে পারবে না সে যেন রাতের প্রথম দিকে বিতর আদায় করে। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার আশা পোষণ করে সে যেন শেষ রাতেই আদায় করে।

قوله : وَمَا فِيْهَا عَيْنٌ الخ : যে নামাযের নামের শুরুতে عين বর্ণ রয়েছে (তথা আসর ও ইশা) তা মেঘাচ্ছন্ন সময়ে তাড়াতাড়ি তথা ওয়াক্তের শুরুতে পড়ে নেয়া মুস্তহাব। কারণ মেঘাচ্ছন্ন রাতে ইশার নামায বিলম্বে পড়া হলে জামাতে লোক কম হওয়ার আশঙ্কা প্রবল এবং মেঘাচ্ছন্ন দিনে আসরের নামায বিলম্বে পড়লে আসর মাকরূহ সময়ে পড়ার সন্দেহ থেকে যায় (তবে বর্তমান প্রগতির যুগে যেহেতু সময়ের সঠিক হিসাব সবারই জানা অর্থাৎ

ঘড়ির মাধ্যমে সময় নিরূপণ করা সহজ সাধ্য বিধায় আসরের নামায বিলম্বে পড়াতে মাকরূহ সময়ে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তেমন হয় না। বিধায় একটু বিলম্ব করে মুস্তাহাব সময়ে পড়ে নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া অন্যান্য নামায তথা ফজর, মাগরিব এবং জোহর বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব, কেননা ফজর ও জোহরের যথেষ্ট সময় রয়েছে আর মাগরিবের বেলায় যদি তাড়াতাড়ি পড়া হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে ওয়াক্তের পূর্বেই পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। বিধায় মাগরিব,জোহর,ফজর এই ওয়াক্তগুলোতে বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব।

وَمُنِعَ عن الصَّلَاةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَالاِسْتِوَاءِ وَالْغُرُوبِ إِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ وَعَنِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ لَا عَنْ قَضَاءِ فَائِتَةٍ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ وَوَقْتِ الْخُطْبَةِ وَعَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ إِلَّا بِعُذْرٍ -

---

অনুবাদ : এবং সূর্যোদয়, মধ্যাহ্নে (দ্বিপ্রহরে) ও সূর্যাস্তের সময় নামায ও সাজদায়ে তেলাওয়াত এবং জানাযার নামায নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে সূর্যাস্তের সময় ঐ দিনের আসর পড়া যাবে এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে ফজরের পরে (সূর্যোদয় পর্যন্ত) এবং আসরের পরে নফল নামায পড়া থেকে। তবে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা পড়া ও সাজদায়ে তেলাওয়াত এবং জানাযার নামায পড়া নিষিদ্ধ নয়। ফজর উদয়ের পর ফজরের দু'রাকাত সুন্নাতের অধিক (নামায পড়া) নিষিদ্ধ (মাকরূহ)। মাগরিবের পূর্বে ও খুতবার সময় এবং ওযর ছাড়া এক সময়ে দুই ওয়াক্তের নামাযকে একত্র করা নিষিদ্ধ।

শব্দার্থ : اَلْاِسْتِوَاءُ স্থিরতা, সঠিকতা, মধ্যাহ্ন। اَلتَّنَفُّلُ - التفعل থেকে অর্থ : নফল নামাজ পড়া। فَائِتٌ (ج) فَوَائِتُ হারানো, গত, হাতছাড়া। عُذْرٌ (ج) اَعْذَارٌ ওযর, কৈফিয়ত, অজুহাত।

قوله : وَمُنِعَ عَنِ الصَّلَاةِ الخ এতক্ষণ গ্রন্থ প্রণেতা নামাযের মুস্তাহাব সময়ের বর্ণনা করেছেন। এবার কোন সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ তার বর্ণনা শুরু করছেন। উল্লেখ্য যে নিষিদ্ধ দ্বারা কখনো পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ তথা না জায়েয আবার কখন নিষিদ্ধ দ্বারা মাকরূহ বুঝিয়েছেন। মোট কথা আমাদের মাযহাবে সূর্যোদয়ের সময় ও মধ্যাহ্ন এবং সূর্যাস্তের সময় ফরজ ও নফল নামায পড়া সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং জানাযার নামায নামায পড়া জায়েয নয়। দলীল হল হুযুর সা. এর ইরশাদ—

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَلٰثَةُ أَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهَا مَوْتَانَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتّٰى تَزُوْلَ وَحِيْنَ تَضِيْفُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ -

হযরত উকবা ইবনে আমির (রা) বলেন রাসূল সা. তিনটি সময়ে আমাদেরকে নামায পড়তে এবং মৃতদেরকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন। সূর্যোদয়কালে সূর্য উপরে উঠে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয় তখন থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

উপরোক্ত হাদিসটি ইমাম শাফেয়ী রহ. এর বিপক্ষে দলীল ফরযসমূহ মক্কাতে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর বিপক্ষেও দলীল জুমার দিন মধ্যাহ্ন কালে নফল জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীল হল, রাসূল সা. এর হাদিস—

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا

যে ব্যক্তি নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা নামায পড়তে ভুলে যায় তাহলে ঐ নামায পড়ে নেবে যখন তা স্মরণ হয়। কেননা উহাই তার সময়। এহাদিস দ্বারা বুঝা যায় আলোচিত সময়গুলোতেও ফরয পড়া জায়েয আছে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর দলীল হল,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

'রাসূল সা. মধ্যাহ্নকালে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য হেলে না পড়ে। তবে হা জুমার দিন এর ব্যতিক্রম'।

উপরোল্লেখিত মাযহাবদ্বয়ের দলীলের জবাব: ইমাম শাফেয়ী রহ. কর্তৃক প্রদত্ত দলীলের জবাব হল, বর্ণিত হাদিস দ্বারা তিন ওয়াক্তে নামায পড়া বৈধতা প্রমাণিত হল এবং আমাদের পেশকৃত হাদীস তথা হযরত উকবা ইবনে আমির রাযি. এর হাদিস দ্বারা নামায পড়া হারাম প্রমাণিত হল। এদিকে উসূলে ফিকহ গ্রন্থে রয়েছে যখন বৈধ ও অবৈধ এর মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় তখন অবৈধটি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। সুতরাং উকবা ইবনে আমির রাযি. এর হাদিসটি প্রাধান্য হল এবং উক্ত তিন সময়ে নামায পড়া এবং সাজদায়ে তেলাওয়াত নিষিদ্ধ।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতের সপক্ষে পেশকৃত হাদিসের জবাব হল, এখানে الا يوم الجمعة এর অর্থ হবে لا يوم الجمعة দ্বিতীয় জবাব হল الا يوم الجمعة। এখানে الا অব্যয়টি استثناء منقطع সুতরাং অর্থ দাঁড়ায় 'এবং জুমার দিনে নামায পড়বে না'। তথা ঐ মধ্যাহ্ন কালে জুমার দিনের নামায পড়বে না।

قوله : وَعَنِ التَّنَفُّلِ الخ : ফজরের পর থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল নামায আদায় করা মাকরূহ। প্রমাণ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিস:

شَهِدَ عِنْدِىْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِىْ عُمَرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ -

'হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমার নিকট সন্তোষভাজন ব্যক্তিবর্গ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তন্মধ্যে হযরত উমর সবচেয়ে সন্তোষভাজন ব্যক্তি। (তিনি আমাকে বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। গ্রন্থকার রহ. বলেন, ঐদুই সময় তথা ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে কাযা নামায,সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং জানাযার নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই।

দলীল হল, ফজর এবং আসরের পর নামায মাকরূহ হওয়াটা ফজর এবং আসরের নামাযের কারণে ছিল, যাতে ব্যক্তি পূর্ণ ওয়াক্ত ঐ ওয়াক্তের ফরযের মধ্যে থাকে।

قوله : وعن الجمع بين الصلاتين : অপারগতা থাকা সত্ত্বেও দুই ফরযকে এক ওয়াক্তে একত্র করা মাকরূহ। তবে হা হজ্জের সময়ে আরাফাহ এবং মুযদালিফার চার ওয়াক্ত নামায এর ব্যতিক্রম। ইমাম শাফেয়ী রহ. এবং ইমাম মালিক রহ. বলেন, একত্র করণ জায়েয। কেননা তা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হানাফী হাজরাতদের পক্ষ থেকে জবাব হল, হাদিসে যে একত্র করার কথা ব্যক্ত আছে তা বাহ্যিকভাবে (جمع صورى) তথা এক ওয়াক্তের শেষে আরেক ওয়াক্তের প্রারম্ভে পড়ার কথা বোঝানো হয়েছে। আর মূলগতভাবে এক ওয়াক্তে দুই নামায একত্র করণ নিষিদ্ধ। কারণ হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, শপথ ঐ সত্তার যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যে হুযুর সা. কখনও কোন নামায তার ওয়াক্ত ছাড়া অন্য ওয়াক্তে পড়েন নাই। তবে দুই নামায এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ জোহর ও আসর আরাফার মধ্যে এবং মাগরিব ও ইশা মুযদালিফার মধ্যে পড়েছেন।

بَابُ الْأَذَانِ

পরিচ্ছেদ : আযানের বিবরণ

سُنَّ لِلْفَرَائِضِ بِلَا تَرْجِيعٍ وَلَحْنٍ وَيَزِيدُ بَعْدَ فَلَاحِ فِيْ أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مِثْلُهُ وَيَزِيدُ بَعْدَ فَلَاحِهَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ وَيَتَرَسَّلُ فيه وَيَحْدُرُ فِيهَا -

অনুবাদ : ফরয নামাযের জন্য ترجيع এবং ترنم ছাড়া আযান সুন্নাত এবং حى على الفلاح এর পর ফজরের আযানে الصلاة خير من النوم দু'বার বাড়াবে। আর اقامت তথা তাকবীর আযানের ন্যায়। একামতের حى على الفلاح এরপর قد قامت الصلاة দু'বার বাড়াবে। আযান ধীরলয়ে থেমে থেমে উচ্চারণ করবে। আর একামত না থেমে দ্রুতলয়ে উচ্চারণ করবে।

শব্দার্থ : اَلْأَذَانُ আযান, নামাযের আহ্বান। تَرْجِيعٌ ফেরৎ দান, বারংবারতা। لَحْنٌ (ج) لُحُوْنٌ সুর, বাচনভঙ্গি। يَتَرَسَّلُ ইহা تفعل থেকে অর্থ ধীরে চলা মন্থর হওয়া। حَدَرَ (ن) حَدْرًا দ্রুত পাঠ করা, নামানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الْأَذَانِ الخ ঃ নামাযের জন্য শর্ত হল ওয়াক্ত তথা নামাযের সময় হওয়া, আর আযান হল নামাযের সময় হওয়ার ঘোষণা, এজন্য গ্রন্থকার রহ. পূর্বে নামাযের সময়ের আলোচনা করেছেন। আর এখান থেকে আযানের আলোচনা শুরু করছেন।

আযানের সুবুত : আযানের বিধান কুরআনে কারীম দ্বারা প্রমাণিত,তবে আযানের পূর্ণ শব্দ হাদিসে বিদ্যমান আছে। আয়াত দ্বারা যেমন,

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

'যখন তোমরা নামাযের জন্য ঘোষণা করো তখন তারা একে ঠাট্টা এবং ক্রিড়া কৌতুকের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে। এটা এ কারণে যে, তারা বুঝে না।' উক্ত আয়াতে নামাযের দিকে আহ্বান দ্বারা আযানই উদ্দেশ্য।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে—

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে যে আল্লহর দিকে ভাল কাজের দিকে ডাকে এবং বলে নিশ্চয় আমি মুসলমানদের একজন'।

আল্লামা বগবী রহ. বলেছেন হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, এ আয়াত মুয়াজ্জিনদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইকরিমা রাযি. বলেন, من دعا إلى الله এর দ্বারা মুয়াজ্জিন উদ্দেশ্য। অন্যস্থানে ইরশাদ করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

হে ঈমানদারগণ! যখন জুমার দিন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহর স্মরণের প্রতি ত্বরা কর এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও।

হাদিস দ্বারা আযানের সুবুত : হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে—

أَنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَذَانِ حِيْنَ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ

যখন নামায ফরয হল তখন হযরত জিবরাইল (আঃ) রাসুল সা.কে আযানের হুকুম দিলেন।

তিরমিযি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে—

أَنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ الْأَذَانَ فَنَزَلَ بِهِ فَعَلَّمَهُ بِلَالًا.

'যখন হুযুর সা.কে মিরাজে নেয়া হয় তখন আল্লাহ তায়ালা রাসুল সা. এর প্রতি আযান সম্পর্কে ওহী নাযিল করেছেন।.অতঃপর হুযুর সা. আযানের শব্দমালা হযরত বিলাল রাযি. কে শিক্ষা দেন'। এমনি অনেক আয়াত ও হাদিস দ্বারা আযানের সুবুত পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা শরিয়তের একটি শিয়ার হিসাবে আযানকে ধরে নিতে পারি।

قوله : سُنَّ لِلْفَرَائِضِ الخ : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য এবং জুমার জন্য আযান দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তবে কোন কোন ইমামদের মতে আযান দেওয়া ওয়াজিব। কেননা হযরত ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে ' যদি শহরবাসী আযান না দেওয়ার ওপর ঐক্যমত হয় তবে এমন শহরবাসীর সাথে জিহাদ করা ওয়াজিব' এদিকে জিহাদ ওয়াজিব হয় কোন বিধান লঙ্ঘন করার কারণে। আমরা তার জবাবে বলব যে, আযান মূলগতভাবে সুন্নত। কিন্তু আযান না দেওয়ার উপর ঐক্যমত হওয়ার দরুন দ্বীনের প্রতি অবমাননা হয়। আর দ্বীনের প্রতি অবমাননার অবস্থায় জিহাদ ওয়াজিব হয়। বিধায় এমতাবস্থায় জিহাদ ওয়াজিব হওয়া দ্বারা আযান ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হল না।

আযানে তারজী এর বিধান : তারজী এর সঙ্গা হিদায়া গ্রন্থে এভাবে দিয়েছেন,

أَنْ يُرَجِّعَ فَيَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ مَا خَفَضَ بِهِمَا

অর্থাৎ উভয় কালিমায়ে শাহাদাতকে প্রথমে দু'বার মৃদুস্বরে অতঃপর দু'বার উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা। অর্থাৎ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এবং أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ চারবার উচ্চারণ করা, প্রথম দু'বার মৃদু স্বরে অতঃপর উচ্চ স্বরে। আমাদের মতে এভাবে আযানে তারজী নেই। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে আযানে তারজী আছে। তিনি দলীল পেশ করেন আবু মাহজুরা রাযি. এর হাদিস দ্বারা। যে হুযুর সা. তাকে তারজী এর নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের দলীল হল, আযানের বর্ণনায় যেসব হাদিস প্রসিদ্ধ তাতে তারজী নেই। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. এর হাদিস-

قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً .

তিনি বলেন, হুযুর সা. এর যামানায় আযান ছিল দু'বার আর ইকামাত ছিল একবার। কিয়াসি দলীল হল, যেহেতু আযানের মূল উদ্দেশ্য হল

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ আর এ দু কালিমার মধ্যে তারজী নেই। সুতরাং অন্য কালিমায় অবশ্যই তারজী হবে না।

আবু মাহজুরার হাদিসের জবাব হল, হুযুর সা. আবু মাহজুরাকে একালিমাগুলো বারবার বলানোর শিক্ষা দানের জন্য ছিল। কিন্তু তিনি তা তারজী হিসাবে ধারণা করেছেন। অতএব এ আলোচনা দ্বারা প্রতিয়মান হল যে আযানে তারজী হবে না।

قوله : وَيَزِيْدُ بَعْدَ الْفَلَاحِ الخ : ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এরপর দুবার اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলা মুস্তাহাব। কেননা একবার হযরত বিলাল রাযি. কে রাসুল সা. বললেন, হে বেলাল কতই না সুন্দর এ কথা, একে

তোমার আযানের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। এবার এ বাক্য ফজরের জন্য খাছ করার কারণ হল এ সময়টা ঘুম ও অলসতার সময়। এজন্য এ বাক্যটি শুধু ফজরের আযানে বৃদ্ধি করা হবে।

قوله : وَيَتَرَسَّلُ فِيهِ الخ : ترسل হল দু শব্দের মধ্যে থেমে থেমে ধীরলয়ে উচ্চারণ করা। আযানের ক্ষেত্রে ترسل উত্তম আর حدر হল দু শব্দের মধ্যে থেমে থেমে নয় বরং দুশব্দ মিলিয়ে উচ্চারণ করা। ইকামতের ক্ষেত্রে حدر উত্তম। কেননা রাসুল সা. হযরত বিলাল রাযি. কে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন—

إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ

যখন তুমি আযান দিবে তখন তারাস্সুল কর আর যখন তুমি ইকামাত দিবে তখন হদর কর।

وَيُسْتَقْبَلُ بِهِمَا الْقِبْلَةُ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا وَيَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا بِالصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ وَيَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَيُثَوِّبُ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ وَكَذَا الْأُولَى الْفَوَائِتِ وَخُيِّرَ فِيهِ لِلْبَاقِي -

---

অনুবাদ : আযান ও ইকামাতে কিবলামুখী হবে এবং উভয়টিতে (আযান, ইকামাতের শব্দাবলী ছাড়া ভিন্ন) কথা বলবে না। حي على الصلاة বলার সময় ডানে আর حي على الفلاح বলার সময় বামে (মুখ) ফিরাবে। আযানখানায় প্রদক্ষিণ করবে। উভয় কর্ণে দু আঙ্গুলি স্থাপন করবে এবং تثويب (তাসয়ীব) করবে। মাগরিব ছাড়া অন্য সময় আযান ও ইকামাতের মাঝে কিছু সময় অপেক্ষা করবে। কাজা নামাজের জন্যও আযান ইকামত দিবে। এভাবে একাধিক কাযা নামাযের প্রথমটির জন্য আযান ইকামত দিবে। অবশিষ্টগুলোর ক্ষেত্রে এখতিয়ার রয়েছে। (ইচ্ছা করলে দিতে পারবে নতুবা না)

শব্দার্থ : يَلْتَفِتُ ইহা افتعال থেকে اِلْتِفَاتٌ দৃষ্টি দেয়া তাকানো। يَسْتَدِيرُ গোলাকার হওয়া, প্রদক্ষিণ করা صَوْمَعَةٌ (ج) صَوَامِعُ আশ্রম, উপাসনালয়, এখানে صَوْمَعَةٌ দ্বারা আযানখানা বুঝানো হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَيَسْتَدِيرُ الخ সাওমায়াহ (صومعة) এর অর্থ উপসনালয়, তবে বাহরুর রায়েক গ্রন্থে صومعة বলতে মিনারাকে বলা হয়েছে। মোটকথা মুয়াজ্জিন যদি মিনারায় ঘুরে যায় তাহলে ভাল। শর্ত হল মিনারা প্রশস্ত হতে হবে। অর্থাৎ যদি পদদ্বয় স্বস্থানে রেখে আযানের পূর্ণ ঘোষণা না দিতে পারে (যা আযানের উদ্দেশ্য) তাহলে মুখ ফিরানোর প্রয়োজন পড়লে কোন অসুবিধা নেই। প্রয়োজন ছাড়া স্বস্থান হতে পদদ্বয় সরানো ভাল নয়।

قوله : وَيُثَوِّبُ الخ : تثويب এর শাব্দিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। ফিরে আসা, শরিয়তের আলোকে تثويب বলা হয় اَلْإِعْلَامُ بَعْدَ الْإِعْلَامِ 'ঘোষণার পর ঘোষণা দেয়া। মোল্লাহ আলী ক্বারী রহ. বলেন, আযান ও ইকামাতের মধ্য সময়ে নামাযের ঘোষণাকে تثويب বলে। তাসবীব দু ধরণের। পুরাতন তাসবীব, আর তা হল الصلاة خير من النوم বলা। আর বিশুদ্ধ মত হল উহা حي على الفلاح এর পরেই আযানের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সে অনুযায়ী আমল চলে আসছে। প্রমাণ হল হযরত বিলাল রাযি. এর হাদিস যাহার এক পর্যায়ে হুযুর সা. বলেছিলেন يَا بِلَالُ اِجْعَلْهُ فِيْ اَذَانِكَ হে বিলাল তা তোমার আযানে অন্তর্ভুক্ত করো। সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে তা আযানের অন্তর্ভুক্ত।

দুই- তাসবীবে মুহদাস, বা উদ্ভাবিত তাসবীব, তা হল আযান ও ইকামাতের মাঝে দুবার حي على الصلاة ও

حى على الفلاح অথবা এধরণের অন্য বাক্য যা সমাজে প্রচলিত তা বলা। আর এধরণের তাসবীবকে তাসবীবে মুহদাস বলা হয় কেননা, উহা নবী করীম সা. অথবা সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। বরং তাবেয়ীনদের যুগে যখন অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল এবং মানুষ দ্বীনি কাজে অলসতা করতে লাগল তখন কুফার আলেমরা তা আবিষ্কার করেন। তখনকার এবং পরবর্তী ফকীহগণ তা পছন্দ করেছেন। আর মুসলমানগণের ভাল লাগা আল্লাহর নিকট ভাল লাগা।

قوله : وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا الخ : উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতামত হল আযান ও ইকামাত একত্রে মিলানো মাকরূহ। কেননা রাসূল সা. হযরত বিলাল (রা) কে হুকুম দিলেন,

اِجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْاٰكِلُ مِنْ أَكْلِهِ

অর্থঃ হে বেলাল! তুমি আযান ও ইকামাতের মধ্যে এই পরিমাণ বিরতি দাও যাতে একজন খাবাররত ব্যক্তি খাবার খেয়ে অবসর হতে পারে।

দ্বিতীয় দলীল: আযানের উদ্দেশ্য হল মানুষকে নামাযের সময় হওয়ার সংবাদ দেওয়া, যাতে মানুষ তার অন্যান্য কাজ ছেড়ে নামাযের জন্য মসজিদে এসে হাজির হতে পারে। পক্ষান্তরে আযান ও ইকামতকে মিলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য বাতিল হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, মাগরিবের আযান ও ইকামতের মধ্যে এপরিমাণ বিলম্ব করা মুস্তাহাব যে সময়ের মধ্যে তিনটি ছোট আয়াত বা বড় আয়াত বা বড় একটি আয়াত পড়া যায়।

قوله : وَيُؤَذِّنُ لِفَائِتَةٍ الخ : কাযা নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দিতে হবে। একাকি পড়ুক বা জামাতের সহিত পড়ুক। এটা আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন ইকামতই যথেষ্ট। আযানের প্রয়োজন নেই। আমাদের দলীল হল ليلة التعريس লাইলাতুত তা'রিস এর ঘটনা। ঘটনাটি বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দাবলি দ্বারা বর্ণিত আছে।

আল্লামা ইবনে হুমাম আবু দাউদ রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—

أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حِيْنَ نَامُوْا عَنِ الصُّبْحِ وَصَلُّوْهَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ .

হুযুর সা. হযরত বিলাল রাযি. কে আযান ও ইকামাতের নির্দেশ দিয়েছেন। যখন সাহাবারা ফজরের নামাযের সময় ঘুমিয়ে ছিলেন এবং সূর্যোদয় হবার পর তা কাযা করেছেন।

দ্বিতীয় দলীল: খন্দকের যুদ্ধে যখন রাসুল সা. এর নামায কাযা হল তখন তিনি তা আযান ও ইকামত দ্বারা আদায় করেছেন। উভয় রিওয়ায়েত দ্বারা প্রতিয়মান হল যে কাযা নামাযের জন্য আযান ও ইকামাতের সুন্নত রয়েছে। আর তা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, যদি কারো একাধিক নামায কাযা হয়ে যায় তবে প্রথম নামাযের জন্য আযান ও ইকামাত দিবে। আর অবশিষ্টগুলোর ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা স্বাধীন। যদি ইচ্ছা করে তবে পৃথক আযান ও ইকামত দিতে পারবে। আর যদি চায় শুধু ইকামতের উপর নির্ভরশীল হবে।

وَلَا يُؤَذِّنُ قَبْلَ وَقْتٍ وَيُعَادُ فِيْهِ وَكُرِهَ أَذَانُ الْجُنُبِ وَإِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ الْمُحْدِثِ وَأَذَانُ الْمَرْأَةِ وَالْفَاسِقِ وَالْقَاعِدِ وَالسَّكْرَانِ لَا أَذَانُ الْعَبْدِ وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْأَعْمٰى وَالْأَعْرَابِيِّ وَكُرِهَ تَرْكُهُمَا لِلْمُسَافِرِ لَا لِمُصَلٍّ فِيْ بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَنُدِبَا لَهُمَا لَا لِلنِّسَاءِ -

---

অনুবাদ : ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেয়া যাবে না। (যদি দিয়ে ফেলে তবে) পুনরায় দিবে। আর জুনবীর

আযান ও ইকামাত দেয়া, অজুহীন ব্যক্তির ইকামাত দেয়া এবং মহিলার, ফাসিকের, উপবিষ্ট ব্যক্তির এবং নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির আযান দেয়া মাকরূহ। তবে গোলামের, জারজ সন্তানের, অন্ধের এবং গ্রাম্য ব্যক্তির আযান দেয়া মাকরূহ নয়। মুসাফিরের জন্য উভয়টি ছেড়ে দেয়া মাকরূহ। তবে শহরে নিজ গৃহে নামায আদায়কারীর জন্য উভয়টি ছেড়ে দেয়া মাকরূহ নয় এবং উভয়ের জন্য দেয়া মুস্তাহাব। (অর্থাৎ মুসাফিরের জন্য ও ঘরে নামায আদায়কারীর জন্য আযান ও ইকামাত দেয়া মুস্তাহাব।) মহিলার জন্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَايُؤَذَّنُ قَبْلَ الخ : নামাযের সময় প্রবেশ করার পূর্বে আগত নামাযের জন্য আযান দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়; বরং ওয়াক্ত প্রবেশ করার পর পুন:আযান দিতে হবে। কেননা আযানের মূল উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না। তথা মানুষকে নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে এ সংবাদ দেয়া হল আযান, আর এ আযান ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বে দিলে সংবাদটি সঠিক হল না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এবং ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে কেবল ফজরের আযান রাতের শেষার্ধে দেয়া জায়েয। তাদের দলীল হল, হুযুর সা. এর ইরশাদ—

أَنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ

'রাতে বিলাল আযান দেন, তোমরা খাবার খাও এবং পান করো, ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. এর আযান শ্রবণ করা পর্যন্ত।'

উক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা গেল যে, হযরত বিলাল রাযি. ফজরের আযান ফজরের পূর্বে দিতেন। তাদের দলীলের জবাব: গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করলে প্রতিয়মান হয় যে, এ হাদিসটি আমাদের দলীল। কেননা হযরত বিলাল রাযি. এর আযান ছিল তাহাজ্জুদের নামায ও সেহরী খাওয়ার জন্য। আর ফজরের নামাযের জন্য ছিল হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. এর আযান। সুতরাং পেশকৃত হাদিসটি তাদের দলীল না হয়ে আমাদের দলীল হয়ে গেল।

قوله : وَكُرِهَ تَرْكُهُمَا لِلْمُسَافِرِ الخ : মুসাফিরের জন্য আযান ইকামত বলা উচিত তথা মুস্তাহাব। কেননা হুযুর সা. আবু মুলাইকার দু পুত্রকে নির্দেশ দিয়েছেন, وَاِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا যখন তোমরা সফর কর তখন তোমরা আযান ও ইকামাত দিবে। আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে আছে—

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ -

'তোমার প্রভুর কাছে বকরীর এসব রাখালগণ প্রিয়, যারা পাহাড়ের চূড়ায় আযান দেয় এবং নামায আদায় করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দার প্রতি নযর কর যে, সে আযান এবং নামাযের জন্য ইকামত দেয় আমাকে ভয় করে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

উক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা গেল সফরেও আযান ও ইকামত দেয়া সুন্নত। আর তা ছেড়ে দেয়া মাকরূহ।

بَابُ شُرُوطِ الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : নামাযের শর্তসমূহের বিবরণ

هِيَ طَهَارَةُ بَدَنِهِ مِنْ حَدَثٍ وَخَبَثٍ وَثَوْبِهِ وَمَكَانِهِ وَسَتْرُ عَوْرَتِهِ وَهِيَ مَا تَحْتَ سُرَّتِهِ إِلَى تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ وَبَدَنُ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا وَكَشْفُ رُبْعِ سَاقِهَا يَمْنَعُ وَكَذَا الشَّعْرُ وَالْبَطْنُ وَالْفَخِذُ وَالْعَوْرَةُ الْغَلِيظَةُ وَالْأَمَةُ كَالرَّجُلِ وَظَهْرُهَا وَبَطْنُهَا عَوْرَةٌ -

অনুবাদ : নামাযীর দেহ হুকমী এবং হাকীকী নাজাসাত থেকে পবিত্র হওয়া এবং পবিত্র হওয়া তার কাপড় ও (দাঁড়ানোর) স্থান এবং তার সতর ঢাকা আর তা হল নাভির নীচ থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত এবং স্বাধীন নারীর মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়ের কব্জি ও পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর সতর। (কোন) মহিলার পায়ের গোছার এক চতুর্থাংশ খুলে যাওয়া বাধা প্রদানকারী (নামায হওয়া থেকে) এমনিভাবে চুল,পেট, উরু এবং গুপ্তাঙ্গ (বের হওয়া নামায হওয়ার পরিপন্থি) এবং দাসী পুরুষের মত, তবে তার পিঠ ও পেট সতর।

শব্দার্থ : سُرَّةٌ (ج) سُرَرٌ و سُرَّاتٌ নাভি, কেন্দ্রস্থল, বোটকা। رُكْبَةٌ (ج) رُكَبٌ و رُكَبَاتٌ হাঁটু জানু। سَاقٌ (ج) سِيقَانٌ ، سُوْقٌ নলা, গুড়ি, কাণ্ড। اَلْغَلِيْظَةُ (ج) غِلَاظٌ মোটা, পুরু। عَوْرَةٌ (ج) عَوْرَاتٌ লজ্জা, লজ্জাস্থান, দোষ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

নামাযের শর্ত তিন প্রকার, এক شَرْطُ الْعِقَادِ বা সংঘটিত হওয়ার শর্ত। যেমন, নিয়ত,তাহরিমা,সময় ইত্যাদি। দুই شَرْطُ الدَّوَامِ সার্বক্ষণিক শর্ত। যেমন পবিত্রতা,সতর ঢাকা ইত্যাদি। তিন شَرْطُ الْبَقَاءِ বিদ্যমান থাকার শর্ত। যেমন, ক্বিরাত। গ্রন্থকার রহ. এতক্ষণ সময়ের নিদর্শন তথা আযান নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখন থেকে নামাযের পূর্ববর্তী শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

قوله : وَهِيَ طَهَارَةُ بَدَنِهِ الخ : নামায আদায়কারীর জন্য নামাযের পূর্বেই যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা ফরয। দলীল হল, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন- وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا যদি তোমরা জুনুবী হও তাহলে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। অন্যত্র বলেন- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ তুমি তোমার কাপড় পূর্ণ পাক রাখবে। নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য দুই পায়ের নীচ এবং সিজদার স্থান পবিত্র হওয়া। কেহ কেহ দুই পা ও সিজদার স্থানের সাথে দুই হাত ও হাঁটু রাখার স্থান পবিত্র হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন।

قوله : وَسَتْرُ عَوْرَتِهِ الخ : সতর ঢাকা শর্ত, তার পরিমাণ হল শরীরের যতটুকু খোলা রাখা লজ্জাহীনতা বা নিন্দনীয়। আর ইহা আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এবং আহমাদ রহ. সহ অধিকাংশ ফকীহগণের মতামত। দলীল হল, আল্লাহ তাআলার এরশাদ-

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হিদায়া গ্রন্থকার বলেন—

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اَيْ مَا يُوَارِيْ عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় এমন পোশাক পরিধান করবে যাতে তোমাদের সতর ঢাকে। দ্বিতীয় দলীল হল, হুযুর সা. এরশাদ করেন, لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ حَائِضٍ اِلَّا بِخِمَارٍ সাবালক রমনীর নামায আল্লাহ ওড়না ছাড়া কবুল করেন না।

قوله : وَهِيَ مَا تَحْتَ سُرَّتِهِ الخ : উক্ত ইবারতে পুরুষের সতরে সীমা বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং সাহেবাইন রহ. এর মতে পুরুষের সতর নাভির নীচ থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত। কিন্তু নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে হাটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে হাটু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের স্বপক্ষে দলীল হল হুযুর সা. এর ফরমান- عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে مَا دُوْنَ سُرَّتِهِ حَتَّى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ সতর তার নাভির নীচ থেকে তার হাঁটু অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত। অন্যত্র রাসুল সা. বলেন اَلرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত হাদিস সমূহ দ্বারা বুঝা গেল হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। আর উক্ত রেওয়ায়েতত্রয়ের সমন্বয় হবে যদি الى শব্দকে مع এর অর্থে ধরা হয়।

قوله : وَبَدَنُ الْحُرَّةِ الخ : স্বাধীন রমনীর সমস্ত দেহ সতরের অন্তর্ভুক্ত তবে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রমাণ হল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদিস - أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ মহিলা আওরাত তা ঢেকে রাখা কর্তব্য। যখন সে ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে দেখে। মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি সতরের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ হল এদুটি অঙ্গ সাধারণভাবে বিভিন্ন কাজের জন্য বের করার প্রয়োজন পড়ে। তার সমর্থনে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত মুরসাল হাদিস পাওয়া যায়-

إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهُهَا وَيَدَهَا إِلَى الْمِفْصَلِ

কোন মেয়ে যখন বয়:প্রাপ্ত হয় তখন তাকে দেখা জায়েয নয়। তবে তার মুখমণ্ডল ও হাত কব্জি পর্যন্ত দেখা জায়েয আছে।

পায়ের পাতার ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। একটি হল, পায়ের পাতা সতরের অন্তর্ভুক্ত। অপরটি হল পায়ের পাতা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, هُوَ الْأَصَحُّ এবং তা বিশুদ্ধ। ইমাম কারখী রহ. ইহারই প্রবক্তা। প্রমাণ হল, মহিলার পায়ের পাতা দেখে এমন খাহেশ জাগে না যেমনটি তার চেহারা দেখে জাগে। চেহারার প্রতি অধিক খাহেশ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় পা সতরের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

قوله : وَكَشْفُ رُبْعِ سَاقِهَا الخ : স্বাধীন মহিলা পায়ের গোছার এক চতুর্থাংশ খোলা অবস্থায় নামায পড়ে তবে নামায পুনরায় পড়তে হবে। পক্ষান্তরে যদি এক চতুর্থাংশের কম খোলে যায় তবে নামায পুনরায় পড়তে হবে না। ইহা ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন যদি অর্ধেকের কম খুলে যায় তবে পুনরায় নামায ওয়াজিব হবে না। তিনি দলীল হিসাবে বলেন, কোন বস্তুকে তখন অধিক বলে আখ্যা দেয়া যায় যখন তার বিপরীত বস্তুটি পরিমাণে তার চেয়ে কম হয়। কাজেই কোন অঙ্গের অর্ধেকের কম খুলে গেলে নামায দোহরানো ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রহ. এর দলীল: অনেক আহকাম ও বাক্যের ব্যবহারে এক চতুর্থাংশকে পূর্ণাংশের স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়। যেমন মাথা মাসেহ এর বেলায় এক চতুর্থাংশকে পূর্ণ মাথা হিসাবে ধরা হয় এবং ইহরাম অবস্থায় মাথা নেড়া করে তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। এবার যদি মাথার এক চতুর্থাংশ নেড়া করে তবুও কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়। অপরদিকে পরিভাষাগতভাবেও একচতুর্থাংশকে পূর্ণ হিসাবে ধরে নেয়া যায়। কারণ যদি কেহ কাউকে চারদিকের একদিক দেখে, আর বলে আমি তাকে দেখেছি তবে তা সঠিক মনে করা হয়। অতএব যখন একচতুর্থাংশকে পূর্ণ অঙ্গ হিসাবে ধরা হল। সুতরাং যদি কোন স্বাধীন মহিলার নামাযরত অবস্থায় পায়ের গোছা একচতুর্থাংশ খুলে যায় তবে তার নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

قوله : وَكَذَا الشَّعْرُ وَالْبَطْنُ الخ : চুল, পেট, উরু এবং গুপ্তাঙ্গেরও হুকুম বর্ণিত মাসআলার মত। অর্থাৎ ইমাম

আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রহ. এর মতে যদি একচতুর্থাংশ খুলে যায় তবে নামায পুনরায় পড়তে হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে অর্ধেক খুলে গেলে নামায দোহরাতে হবে। (উভয় পক্ষের দলীল, প্রমাণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে) চুল দ্বারা এখানে মাথা থেকে ঝুলে থাকা অংশ উদ্দেশ্য। এটিই বিশুদ্ধ মত। যে চুল মাথার সাথে মিলিত তা উদ্দেশ্য নয়; বরং তা সতরের অন্তর্ভুক্ত।

قوله : وَالْأَمَةُ كَالرَّجُلِ الخ ঃ পুরুষের মত দাসীর সতর অর্থাৎ নাভির নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত। তবে যেহেতু দাসী মহিলার অন্তর্ভুক্ত তাই তার পেট ও পিঠ সতরের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এগুলো পুরুষকে আকৃষ্ট করে। দলীল হল হযরত উমর রাযি. এক ওড়না পরিহিতা দাসীকে দেখে বললেন— اِكْشِفِي رَأْسَكِ ، وَلَاتَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ তোমার মাথা খুলে রাখো, স্বাধীন নারীর মত হয়ো না।

وَلَوْ وَجَدَ ثَوْبًا رُبْعُهُ طَاهِرٌ وَصَلَّى عُرْيَانًا لَمْ يَجُزْ وَخُيِّرَ إِنْ طَهُرَ أَقَلُّ مِنْ رُبْعِهِ وَلَوْ عَدِمَ ثَوْبًا صَلَّى قَاعِدًا مُومِيًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْقِيَامِ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَالنِّيَّةُ بِلَا فَاصِلٍ وَالشَّرْطُ أَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ أَيَّ صَلَاةٍ يُصَلِّي وَيَكْفِيهِ مُطْلَقُ النِّيَّةِ لِلنَّفْلِ وَالسُّنَّةِ وَالتَّرَاوِيحِ وَلِلْفَرْضِ شُرِطَ تَعْيِينُهُ كَالْعَصْرِ مَثَلًا وَالْمُقْتَدِي يَنْوِي الْمُتَابَعَةَ أَيْضًا وَلِلْجَنَازَةِ يَنْوِي الصَّلَاةَ لِلّٰهِ تَعَالَى وَالدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ -

---

অনুবাদ : যদি কেহ এমন কাপড় পায় যার একচতুর্থাংশ পবিত্র এবং নামায পড়ল উলঙ্গ তবে তা জায়েয হয় নাই। আর যদি একচতুর্থাংশের কম পবিত্র হয় তবে স্বেচ্ছাধীন (অর্থাৎ চাইলে উলঙ্গ পড়তে পারে) আর যদি কাপড় না থাকে তবে নামায বসে পড়বে। আর রুকু সিজদা ইশারা ইঙ্গিতে করবে। ইহা দাঁড়িয়ে রুকু সিজদা করা থেকে উত্তম এবং নিয়ত ব্যবধান ছাড়া হওয়া (অর্থাৎ নিয়ত ও তাকবীরের মধ্যে বিলম্ব না হওয়া) এবং শর্ত হল নিজ অন্তর দ্বারা জানা সে কোন নামায আদায় করছে। আর তারাবীহ, সুন্নাত এবং নফল নামাযের জন্য সাধারণ নিয়তই যথেষ্ট। এবং ফরযের ক্ষেত্রে শর্ত হল তা নির্দিষ্ট করে নেয়া। যেমন আসরের ফরয। এমনিভাবে মুক্তাদিই ইমামের অনুসরণের নিয়ত করবে। এবং জানাযার মধ্যে আল্লাহর জন্য নামায এবং মৃতের জন্য দোয়া এর নিয়ত করবে।

শব্দার্থ : عَارِيًا (ج) عُرَاةٌ উলঙ্গ, নগ্ন, বিবস্ত্র, مُومِيًا ইঙ্গিতকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَوْ وَجَدَ ثَوْبًا رُبْعُهُ الخ : যদি কোন ব্যক্তি এমন কাপড় পায় যার একচতুর্থাংশ পাক থাকে বা তার চেয়ে বেশী তবে সে ঐকাপড় নিয়ে নামায পড়বে। কিন্তু যদি এমতাবস্থায় উলঙ্গ হয়ে নামায পড়ে তবে তার নামায আদায় হবে না। কেননা একচতুর্থাংশ পূর্ণ এর হুকুমে হয়ে থাকে। আর যদি একচতুর্থাংশের কম পবিত্র হয় তবে শায়খাইনের মতে তার ইচ্ছাধীন যদি চায় একাপড় নিয়ে পড়তে তবে পারবে। আর যদি চায় উলঙ্গ হয়ে পড়তে তবে তাও পারবে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর মতে এমতাবস্থায় নামাযীর কোন মতামত নেই বরং সে ঐ নাপাক কাপড় নিয়ে নামায আদায় করবে। আর তা ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দুই মতের এক মত। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অন্য অভিমত হল এমতাবস্থায় উলঙ্গ হয়েই নামায আদায় করে নেবে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর দলীল, নাপাক কাপড় পরে নামায পড়লে মাত্র একটি ফরয তরক হবে। পক্ষান্তরে যদি উলঙ্গ হয়ে নামায পড়ে তবে একাধিক ফরয তরক হয়ে যাবে। যেমন, সতর ঢাকা, কিয়াম করা, রুকু করা ইত্যাদি

ফরযসমূহ লঙ্ঘন হয়ে যাবে। তাই একাধিক ফরয তরকের চেয়ে একটি ফরয লংঘন করা ভাল। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর দলীল হল, সতর খোলা এবং নাপাকি উভয়টিই সক্ষম অবস্থায় নামাযের প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ যদি সতর ঢাকা ও নাপাক কাপড় ধৌত করা সম্ভব হয় তবে সতর খুলে অথবা নাপাক কাপড় নিয়ে নামায পড়া জায়েয নয়। পরিমাণের ক্ষেত্রে উভয়টি সমান অর্থাৎ কম হলে মাফ আর বেশী হলে মাফ নয়। যখন পরিমাণের দিক দিয়ে উভয়টি সমান হল তাহলে নামাযের ক্ষেত্রে উভয়টি সমান হবে।

قوله : وَلَوْ عَدِمَ ثَوْبًا الخ : যার কাছে পাক বা নাপাক কোন ধরণের কাপড় না থাকে তবে সে উলঙ্গ অবস্থায় বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামায আদায় করবে।

দলীল হল- হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. সূত্রে বর্ণিত :

أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبُوْا فِىْ سَفِيْنَةٍ فَانْكَسَرَتْ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَخَرَجُوْا مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً فَصَلُّوْا قُعُوْدًا -

তিনি বলেন রাসুল সা. এর সাহাবীরা কোন এক নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। অতঃপর কিশতি ডুবে গেল। তারা সমুদ্র হতে উলঙ্গ অবস্থায় বের হলেন এবং বসে নামায পড়লেন।

অন্যত্র হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এবং হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত : إِنَّهُمَا قَالَا الْعَارِىْ يُصَلِّىْ قَاعِدًا بِالْإِيْمَاءِ তারা দুজন বলেছেন উলঙ্গ ব্যক্তি বসে ইশারায় নামায আদায় করবে। অন্যদিকে সতর ঢাকা ফরয নামাযের হক হিসাবে এবং মানুষের হক হিসাবে ওয়াজিব। পক্ষান্তরে পবিত্রতা শুধু নামাযের হিসাবে ফরয হয়েছে। এবং সতরের কোন স্থলবর্তী নেই। কিন্তু ইশারা হচ্ছে রুকু সিজদার স্থলবর্তী। আর মূলনীতি হল, যে জিনিসের স্থলবর্তী আছে তা তরক করা উত্তম এমন জিনিস তরক করার তুলনায় যার স্থলবর্তী নেই। সুতরাং উলঙ্গ ব্যক্তি বসে নামায আদায় করার কারণে যদি রুকু সিজদা তরক হয় তবে তার স্থলবর্তী (ইশারা) আছে। পক্ষান্তরে যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তবে খাছ সতর তরক হচ্ছে যার কোন স্থলবর্তী নেই। অতএব উলঙ্গ ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে নামায পড়ার চেয়ে বসে নামায পড়াই উত্তম।

قوله : وَالنِّيَّةُ بِلَا فَاصِلٍ الخ : নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত এবং ইহার উপর ইজমায়ে মুসলিমিন হয়েছে। তবে নিয়ত এবং তাহরিমার মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টিকারী কোন জিনিস হতে পারবে না, যা নামাযের প্রতিবন্ধক। নিয়ত শর্ত হওয়ার দলীল হল, রাসুল সা. এর ইরশাদ— إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এদিকে নামায হল একটি আমল যা নিয়তের সাথে সম্পর্কীয়। অতএব যে নামায নিয়ত ছাড়া হবে তা মূলত নামায হিসাবেই গণ্য হবে না। দ্বিতীয় দলীল হল, নামায শুরু করতে হয় কিয়াম তথা দাঁড়ানোর মাধ্যমে। আর তা অভ্যাস ও ইবাদত উভয়ের মাঝে দোদুল্যমান। অর্থাৎ মানুষ কখন অভ্যাস হিসাবে দাঁড়ায় আবার কখন ইবাদত হিসাবে দাঁড়ায়, সুতরাং নিয়ত করার মাধ্যমে ইবাদতের জন্য তথা নামাযের জন্য দাঁড়ানোকে অভ্যাসভিত্তিক দাঁড়ানো থেকে পৃথক করতে হবে। তাই নামাযের জন্য নিয়তকে শর্ত হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। মোটকথা নিয়তের উদ্দেশ্য হল নামাযী সে নিজে নিজে জেনে নিক যে সে কোন নামাযটি আদায় করতে যাচ্ছে। আর হাঁ যদি ঐ নামায নফল, সুন্নত, তারাবীহ হয়ে থাকে তবে সাধারণভাবে নিয়ত করে নিলে চলবে। আর যদি ফরয হয় তবে তা নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। অর্থাৎ বর্তমানের এ নামায আসরের নাকি জোহরের তা নির্ধারিত করে নিতে হবে।

قوله : وَالْمُقْتَدِىْ يَنْوِىْ الخ : যদি কেহ ফরয নামাযে ইমামের পিছনে পড়ে তবে নামাযের নিয়তের সাথে সাথে ইমামের ইকতিদা তথা অনুসরণের নিয়ত করবে। কেননা ইমামের নামাযের সাথে মুক্তাদির নামাযের সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلِلْمَكِّيِّ فَرْضُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا وَلِغَيْرِهِ إِصَابَةُ جِهَتِهَا وَالْخَائِفُ يُصَلِّي إِلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ وَمَنْ اشْتَبَهَتْ عليه الْقِبْلَةُ تَحَرَّى وَإِنْ أَخْطَأَ لم يُعِدْ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي صَلَاتِهِ اسْتَدَارَ وَلَوْ تَحَرَّى قَوْمٌ جِهَاتٍ وَجَهِلُوا حَالَ إِمَامِهِمْ يُجْزِيهِمْ -

অনুবাদ : (নামাযের অন্য শর্ত হল) কিবলামুখী হওয়া। সুতরাং মক্কাবাসীর জন্য স্বয়ং কা'বামুখী হওয়া ফরয। মক্কাবাসী ভিন্ন অন্যান্যদের জন্য কা'বার দিকের প্রতি মুখ করা ফরয। আর ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তি যে দিকেই সক্ষম হয় সেদিকেই নামায পড়বে। যার উপর কিবলা অজ্ঞাত বা সন্দেহপূর্ণ হয় তবে সে تحرى বা চিন্তাভাবনা করবে। (অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করে কিবলা স্থির করবে।) যদি সে ভুল করে তবে নামাযের পুণরাবৃত্তি করতে হবে না। আর যদি সে নামাযের মধ্যে তা জানতে পারে তবে ঘুরে যাবে। যদি কিছু লোক বিভিন্ন দিকের প্রতি تحرى চিন্তাভাবনা করে এবং তাদের ইমামের অবস্থার ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে। তবে তাদের জন্য তা যথেষ্ট (অর্থাৎ নামায হয়ে যাবে।)

শব্দার্থ : اِسْتِقْبَالٌ (ج) اِسْتِقْبَالَاتٌ মুখ করণ, إِصَابَةٌ সঠিকতা, যথার্থতা اِشْتَبَهَتْ ইহা افتعال থেকে اِشْتِبَاهٌ সন্দেহ, সংশয় تَحَرِّيْ অনুসন্ধান, মনোযোগ, চিন্তাভাবনা اِسْتِدَارٌ ঘুরে আসা, ঘুরে যাওয়া

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ الخ : কিবলামুখী হওয়া নামাযের শর্তসমূহ থেকে একটি। কেননা আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেন-

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

অতএব অবশ্যই আমি আপনাকে সে কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক সেদিকেই মুখ কর। (সুরা বাকারা)

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতিয়মান হল যে মসজিদে হারামের দিকে নামায পড়তে হবে। উল্লেখ্য যে মানুষের নামায দু ধরণের। এক, মক্কা মুকাররমায় নামায আদায় করলে পবিত্র কা'বা শরীফের প্রতি মুখ করা আবশ্যক। কেননা হুযুর সা. যখন মসজিদে হারামে নামায পড়তেন স্বয়ং কা'বার দিকে মুখ করতেন। অপর দিকে সাহাবা তাবেইনদের আমল ও অনুরূপ ছিল। এবং এর উপর ইজমা সংগঠিত হয়েছে।

২য় : মক্কা মুকাররমার সীমারেখা ছাড়া অন্য জায়গায় নামায পড়লে তখন কা'বার দিকের প্রতি মুখ করা ফরয। কেননা হুযুর সা. এবং সাহাবায়ে কেরামগণ মদীনায় থাকা অবস্থায় মহান প্রভু তাদেরকে মসজিদে হারামের দিকে মুখ করার হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং স্পষ্ট হল যে ব্যক্তি পবিত্র মক্কা হতে অনুপস্থিত তার উপর স্বয়ং কাবার দিকে মুখ করা আবশ্যক নয়।

قوله : وَالْخَائِفُ يُصَلِّي إِلَى أَيِّ جِهَةٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তি জানের বা মালের ভয়ের কারণে কিবলার দিকে মুখ করতে সক্ষম হয় না। তবে সে যেদিকে সম্ভব সেদিকেই মুখ করে নামায আদায় করতে পারবে।

দলীল হল- কিবলা অজ্ঞাত বা সংশয়যুক্ত হয়ে যাওয়া ব্যক্তির মত তার অপারগতাকেও গ্রহণ করা হবে।

قوله : وَمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الخ : যদি কোন সময় কারো নিকট কিবলা অজ্ঞাত হয়ে যায় বা সন্দেহপূর্ণ হয়ে পড়ে আর তার কাছে এমন কেহ নেই যাকে সে কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে তবে সাধ্য অনুযায়ী تحرى বা চিন্তা-ভাবনা করে কিবলা স্থির করবে। দলীল- একবার সাহাবায়ে কেরামগণের এক জামাতের কিবলার দিক নিয়ে

সংশয় সৃষ্টি হল, তখন সাহাবাগণ চিন্তাভাবনা করে এক দিককে কিবলা স্থির করে নামায আদায় করেন। পরবর্তীতে এঘটনা হুযুর সা. এর সামনে উপস্থাপন করলে হুযুর সা. ইহার কোন প্রতিবাদ করেননি। তবে হাঁ যদি কিবলার দিক অবগত কোন লোক সেখানে উপস্থিত থাকে তবে চিন্তাভাবনা করে নামায আদায় করা জায়েয হবে না।

قوله : وَإِنْ أَخْطَأَ لَمْ يُعِدْ الخ : কিবলার দিক সন্দেহপূর্ণ হওয়ার দরুন চিন্তাভাবনা করে এক দিককে কেবলা নির্ধারিত করে নামায আদায় করার পর জানতে পারল সেদিক কিবলা নয় তবে এমতাবস্থায় নামায দোহরাতে হবে না। কেননা তার জন্য চিন্তাভাবনা দ্বারা নির্ধারিত দিকই কিবলা। কেননা এব্যাপারে তার সাধ্যই ছিল চিন্তা-ভাবনা করা। আর হুকুম অর্পণ সাধ্যের উপরই নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন যদি কিবলার দিকে পিঠ করে তাহলে ভুল নিশ্চিত হওয়ার কারণে নামায দোহরাতে হবে।

قوله : فَإِنْ عَلِمَ بِهِ الخ : যদি কেহ চিন্তাভাবনা করে একদিককে কিবলা স্থির করে নামায শুরু করে। অতঃপর নামাযের ভিতরেই সঠিক কিবলা সম্পর্কে অবগত হয়, তবে সাথে সাথেই নামাযের ভিতরেই কিবলার দিকে ফিরে যাবে। কেননা কুবাবাসীরা যখন নামাযের মধ্যে জানতে পারল যে, কিবলা পরিবর্তন হয়েছে, অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে পবিত্র কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা সাথে সাথেই তথা নামাযের ভিতরই রুকু অবস্থায় পবিত্র কা'বা শরীফের দিকে ঘুরে গেলেন। যখন রাসূল সা. এঘটনা জানতে পারলেন তখন তা পছন্দ করলেন। কোন প্রতিবাদ করেননি। সুতরাং সঠিক কিবলা অবগত হওয়ার সাথে সাথেই সেদিকে ফিরে যেতে হবে। পক্ষান্তরে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ফিরতে বিলম্ব করে ফেলে তবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।

قوله : وَلَوْ تَحَرَّى قَوْمٌ الخ : অন্ধকার রাতে মুক্তাদিরা চিন্তাভাবনা করে নামায পড়ছে এমতাবস্থায় সবাই নিজ تحري অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে মুখ করে নামায আদায় করল আর ইমাম সাহেবের অবস্থা সম্পর্কে সবাই অজ্ঞ। তবে সবার নামায আদায় হয়ে যাবে। তবে হাঁ যদি কেহ ইমাম সাহেবের আগে অগ্রসর হয়ে যায় তবে তার নামায আদায় হবে না।

بَابُ صِفَةِ الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : নামাযের ধারাবাহিক বিবরণ

فَرْضُهَا التَّحْرِيمَةُ وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالْقُعُودُ الْأَخِيرُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَالْخُرُوجُ بِصُنْعِهِ وَوَاجِبُهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَضَمُّ سُورَةٍ وَتَعْيِينُ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَرِعَايَةُ التَّرْتِيبِ فِي فِعْلٍ مُكَرَّرٍ وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ وَالْقُعُودُ الْأَوَّلُ وَالتَّشَهُّدُ وَلَفْظُ السَّلَامِ وَقُنُوتُ الْوِتْرِ وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدَيْنِ وَالْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ فِيمَا يَجْهَرُ وَيُسِرُّ -

অনুবাদ : নামাযের ফরয হল (সাতটি-প্রথম) তাহরিমা, (দ্বিতীয়) কিয়াম (দাঁড়ানো), (তৃতীয়) কিরাত, (চতুর্থ) রুকু, (পঞ্চম) সিজদা, (ষষ্ঠ) তাশাহুদ পরিমাণ শেষ বৈঠক এবং (সপ্তম) ব্যক্তিগত কোন কাজ দ্বারা বের

হওয়া। (তথা নামায শেষ করা।) আর নামাযের ওয়াজিব হল সুরা ফাতেহা পাঠ করা এবং তার সাথে একটি সূরা মিলানো, প্রথম দুরাকাতের জন্য কিরাত নির্ধারণ করা। যে কাজ বারবার করতে হয় তার ধারাবাহিকতার খিয়াল করা। (অর্থাৎ যে কাজ শরিয়ত কর্তৃক একাধিকবার নির্ধারিত হয়েছে সেগুলোর মাঝে তারতীব রক্ষা করা) তা'দিলে আরকান। প্রথম বৈঠক, তাশাহুদ (পড়া) সালাম শব্দ (তথা শেষে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা। বিতর নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়া। উভয় ঈদে তাকবীরসমূহ বলা। উচ্চস্বরে এবং অনুচ্চস্বরে পড়া, যা নামাযে উচ্চ স্বরে ও অনুচ্চ স্বরে পড়তে হয়। (অর্থাৎ কেরাতসহ অন্যান্য যে নামাযে উচ্চ স্বরে পড়ার সে নামাযে উচ্চ স্বরে পড়া। আর যে নামাযে অনুচ্চ স্বরে পড়ার সে নামাযে অনুচ্চ স্বরে পড়া।

শব্দার্থ : صُنْعٌ কাজ,কর্ম ضَمٌّ যুক্ত করা, একত্রিত করণ رِعَايَةٌ লক্ষ্য, যত্ন, তত্ত্বাবধান تَعْدِيْلٌ ঠিক করণ, পূর্ণ গঠন جَهْر প্রকাশ্য, খোলাখুলিভাবে (উচ্চ আওয়াজে) اَلْإِسْرَارُ গোপন করা, লুকানো।

আনুসাঙ্গিক আলোচনা :

قوله : فَرْضُهَا الخ : গ্রন্থকার রহ. এখান থেকে নামাযের ফারায়িয এর আলোচন শুরু করছেন। সুতরাং নামাযের ফরয মোট সাতটি ঃ

১. তাহরিমা বাঁধা। আর তা আভিধানিকভাবে جَعْلُ الشَّيْءِ مُحَرَّمًا 'কোন বস্তুকে হারাম করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে উল্লেখিত স্থানে تَكْبِيْرٌ أُوْلٰى (তথা নামাযের সূচনালগ্নের প্রথম তাকবীর) উদ্দেশ্য। কেননা তাকবীরে তাহরিমা দ্বারা দুনিয়াবি সকল কাজকর্ম কথাবার্তা ইত্যাদি হারাম হয়ে যায়, যা শুধু এ তাকবীরের বৈশিষ্ট্য। আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, তাকবীরকে মাজাযী তথা রূপক অর্থে তাহরিমা বলা হয়। কারণ তাহরিমা মূলগতবাবে তাহরিমা নয়; বরং তার দ্বারা তাহরিমা প্রমাণিত হয়। আর হাদিস শরীফে এ অর্থের ইশারা করে হুযুর সা. বলেন- مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ اَلطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا اَلتَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا اَلتَّسْلِيْمُ 'নামাযের চাবি হল পবিত্রতা আর নামাযের তাহরিম হল তাকবীর এবং নামাযের তাহলীল হল তাসলীম। (আবু দাউদ,তিরমিযি)

তাকবিরে তাহরিমা নামাযে ফরয হওয়ার প্রমাণ : (১) রাসূলুল্লাহ্ সা. তাকবীরে তাহরিমা সম্পর্কে দায়েমীভাবে বলে গেছেন। রাসুল সা. এর এভাবে বলে যাওয়া ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ। (২) ইজমায়ে উম্মত। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তাকবীরে তাহরিমার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। (৩) আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ মুফাসসিরিনে কেরামের মতে فَكَبِّرْ দ্বারা তাকবীরে তাহরিমা উদ্দেশ্য।

৩. কিয়াম তথা দাঁড়ানো নামাযের একটি ফরয। ফরয, বিতর ও ফরযের সাথে সম্পর্কিত নামায দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরয। কিন্তু শর্ত হল দাঁড়ানোর এবং সিজদা করার সামর্থ্য থাকতে হবে। দাঁড়ানো নামাযের ফরযের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রমাণ : আল্লাহ তা'আলার বাণী— وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামের তথা নামাযে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আর أمر তথা আদেশ উজুবের জন্য আসে। সুতরাং বুঝা গেল নামাযের ভেতর দাঁড়ানো ফরয।

৪. কিরাত, অর্থাৎ নামাযের ভিতরে কিরাত পাঠ করা ফরয। প্রমাণ হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী— فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআন থেকে পড়ার নির্দেশ দিচ্ছেন امر এর صِيغَة দ্বারা। আর আমরের ছিগা দ্বারা নির্দেশ করা উজুবের প্রমাণ।

এদিকে নামাযের বাহিরে কুরআন পড়া ওয়াজিব নয় বিধায় বুঝা গেল নামাযের ভিতরে কিরাত পড়া ওয়াজিব।

৫. রুকু করা।

৬. সিজদা অর্থাৎ নামাযের ভিতর রুকু ও সিজদা করা ফরয। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।

উপরের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'য়ালা রুকু ও সিজদার হুকুম أمر এর صيغة দ্বারা করেছেন। আর যা আমরের ছিগা দ্বারা করা হয় তা উজুব এর প্রমাণ বহন করে।

৭. তাশাহুদ পরিমাণ শেষ বৈঠক। অর্থাৎ নামাযের শেষ পর্যায়ে এপরিমাণ বসা যে সময়ে اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ থেকে عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ পর্যন্ত পড়া সম্ভব হয়। প্রমাণ- হুযুর সা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কে তাশাহুদ শিক্ষা দানের শেষ পর্যায়ে বলেন,

إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلٰوتَكَ إِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ (ابوداود و الطحاوى)

যখন তুমি তা বলবে (অর্থাৎ তাশাহুদ বলবে) বা করলে তাতে তুমি তোমার নামায পূর্ণ করে ফেললে। এখন তুমি দাঁড়াতে চাইলে দাড়িয়ে যাও। আর বসতে চাইলে বসে যাও। (আবু দাউদ, তাহাবী)

দ্বিতীয় দলীল হল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. হুযুর সা. থেকে বর্ণনা করেন— اَنَّهٗ قَالَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ السُّجُوْدِ الْاَخِيْرَةِ وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُهٗ হুযুর সা. বলেন, যখন সে আখেরী সিজদা থেকে মাথা উঠাল এবং তাশাহুদ পরিমাণ বসল তারপর তার হাদাস হল এতে তার নামায পূর্ণ হয়ে গেল। উল্লেখিত হাদিস দ্বয় দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, তাশাহুদ পরিমাণ বসে থাকা ফরয। কেননা হুযুর সা. হাদিসে নামাযের সম্পূর্ণতা বসার সাথে متعلق করেছেন। এতে সে তাশাহুদ পড়ুক বা না পড়ুক সুতরাং বুঝা গেল তাশাহুদ পড়া পরিমাণ বসে থাকা ফরয।

قوله : وَ وَاجِبُهَا الخ : এখান থেকে গ্রন্থকার রহ. নামাযের ওয়াজিবসমূহের আলোচনা শুরু করছেন।

আর ওয়াজিব হল, নামাযের ভিতরকার শরীয়ত নির্ধারিত এমন বিধিমালা যা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামায ফাসিদ হয়ে যায় এবং কবীরাহ গুনা হয়। আর ভুলে ছুটে গেলে সাহুসিজদা ওয়াজিব হয়। তাই সাহুসিজদা করে নিলে নামায ফাসিদ হবে না।

নামাযের ওয়াজিব মোট এগারটি—

১. ফাতেহা শরীফ পাঠ করা। নামাযের ভিতর কতটুকু কিরাত পাঠ করা রুকন বা ফরয এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মতলাকান কুরআন পড়া ফরয। বিধায় যদি কেহ কোরআন থেকে একটি হলেও আয়াত পড়ে নেয় তবে কেরাতের রুকন আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সূরায়ে ফাতিহা ও তার সাথে অন্য একটি সূরা মিলানো ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী রহ. ইমাম মালিক রহ. ইমাম আহমাদ রহ. এর মতে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করা ফরয। তাদের দলীল হল, হুযুর সা. এর বাণী- لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مَعَهَا ফাতেহা ও তার সাথে অন্য কোন সূরা মিলানো ছাড়া নামায হবে না। সুনানে তিরমিযিতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত যে—

مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ ، وَلَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ وَسُوْرَةٍ فِىْ فَرِيْضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا -

পবিত্রতা অর্জন হল নামাযের চাবি, তাকবীর হল তার তাহরিম। তাসলীম হল তাহলীল, আর যে ব্যক্তি ফরয বা অন্য কোন নামাযে আলহাম্‌দু লিল্লাহ এবং অন্য কোন সূরা না পড়ে তার নামায হবে না। (তিরমিযি)

হানাফী মাযহাবের দলীল হল, আল্লাহর বাণী- فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ কুরআনের যে অংশটি সহজ হয় তা তোমরা পড়। উক্ত আয়াতে কারিমাতে من القرآن হল مطلق এদিকে اَلْمُطْلَقُ يَجْرِىْ عَلٰى اِطْلَاقِهٖ এমূলনীতির ভিত্তিতে - যা নিম্ন পরিমাণের কুরআন প্রমাণিত আছে তা পড়াই ফরয। কেননা এ পরিমাণই আদিষ্ট। আর নামাযের বাহিরে যেহেতু কুরআন শরীফ পড়া ফরয নয়। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে নামাযের ভেতর কুরআন পড়াই নির্ধারিত।

ইমাম মালিক ও শাফেয়ী রহ. এর দলীলের জবাব- তাদের উপস্থাপনকৃত প্রমাণগুলো خبر واحد আর তা ظني আর আমাদের প্রমাণ হল دليل قطعي

এদিকে أصول فقه এর মূলনীতি হল دليل قطعي দ্বারা রুকন তথা ফরয সাব্যস্ত হয় دليل ظني দ্বারা আমল ওয়াজিব হয়। তাই আমাদের উলামায়ে কেরামগণের মতে আয়াতটি دليل قطعي হিসাবে নামাযে সাধারণভাবে তিলাওয়াত করা ফরয। তবে হাদিসটি دليل ظني হিসাবে নামাযে সুরায়ে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব।

قوله : وَضَمُّ سُوْرَةٍ الخ : ২. সূরায়ে ফাতেহার সাথে অন্য কোন সুরা বা যেকোন সূরার কমপক্ষে তিনটি আয়াত মিলানো ওয়াজিব। প্রমাণ পূর্বোক্ত হাদীসে সূরা ফাতেহা এর সাথে অন্য সূরা মিলানোর নির্দেশ এসেছে যেমন- لَاصَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُوْرَةٍ مَعَهَا - সুতরাং প্রমাণিত হল সূরায়ে ফাতেহার সাথে অন্য কোন সূরা বা ছোট তিনটি আয়াত মিলানো ওয়াজিব।

(জ্ঞাতব্য বিষয় : বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী পূর্ণ সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব। যদি এক আয়াতও ছুটে যায় তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যাবে। সূরায়ে ফাতেহাকে অন্য সূরার উপর অগ্রবর্তী করা ওয়াজিব। সূরায়ে ফাতেহার পূর্বে অন্য সূরার এতটুকু অবগ্রবর্তী করে নেয়া যা ফরজ আদায়ের সমপর্যায়ের তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব।)

قوله : وَ تَعْيِيْنُ الْقِرَاءَةِ الخ : ৩. সূরায়ে ফাতেহার সাথে ফরজের প্রথম দু' রাকাতে অন্য সূরা মিলানো দলিল হল, হযরত আবূ কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত-

اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُوْرَتَيْنِ وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - متفق عليه

'রাসূলুল্লাহ্ সা. জোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকাতে সূরায়ে ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তেন আর শেষ দুই রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা পড়তেন।

قوله : وَ رِعَايَةُ التَّرْتِيْبِ : ৪. নামাজে যে কাজগুলো একাধিক বার এসেছে তার মধ্যে তারতীব তথা ধারাবাহিকতার খিয়াল করা ওয়াজিব।

قوله : وَ تَعْدِيْلُ الْاَرْكَانِ الخ : ৫. তা'দীলে আরকান। ইমাম আবূ হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে তাদীলে আরকান তথা রুকু সিজদা এভাবে প্রশান্তির সাথে পালন করা যে প্রতিটির মাঝে সুবহানাল্লাহ পড়া পরিমাণ নিস্তব্ধতা বিরাজমান করে এবং শরীরের প্রতিটি জুড়া নামাজে এক فعل থেকে অন্য فعل এ যেয়ে স্থীর হওয়া।

ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম আবূ ইউসুফ রহ., ইমাম আহমদ রহ. এর মতে তা'দীলে আরাকান ফরজ তাদের দলিল হল— এক ব্যক্তি তা'দীলে আরকান এর খেলাফ করলে হুজুর সা. বললেন— صَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ 'তুমি নামায পড় কেননা তুমি নামাজ পড় নাই, আমাদের দলিল হল—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

উক্ত আয়াতের اركعوا واسجدوا দ্বারা রুকূ এবং সিজদার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর রুকূ বলা হয় ঝুকা আর সিজদা বলা হয় বিনয়ের সাথে অর্থাৎ নিজেকে ছোট মনে করে জমিনের উপর নিজের ললাট রেখে দেয়া। সুতরাং এতটুকু দ্বারা ফরজ আদায় হয়ে যাবে এবং উক্ত রুকূ সিজদাকে ধীরস্থিরে আদায় করাকে তা'দিলে আরকান বলে। আর তা ওয়াজিব।

শাফেয়ীদের দলিলের জবাব হল : এখানে নামাজ না হওয়া দ্বারা নামাজ পূর্ণ না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত।

কেননা, উক্ত হাদীসের শেষাংশে হুজুর সা. বলেন— إِذَا انْتَقَصْتَ مِنْهَا انْتَقَصَ مِنْ صَلٰوتِكَ যা কিছু তুমি এ নামাজ থেকে কমালে তুমি তা তোমার নামাজ থেকে কমিয়ে দিলে।

মোটকথা, যে বিষয় فعل شرعی টি নাকিছ তা ওয়াজিব বা সুন্নাত হবে, তা কখনো ফরজ হবে না। কারণ, ফরজের অনুপস্থিতিতে فعل شرعی তথা নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

قوله : وَالْقُعُوْدِ الْأَوَّلِ الخ : ৬. প্রথম বৈঠক। জামহুর উলামায়ে কেরামগণের মতে প্রথম বৈঠক ওয়াজিব। মুহীত গ্রন্থে তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ হিসাবে ব্যক্ত করেছেন। ইমাম তাহাবী ও কারখী রহ. ইহাকে সুন্নাত বলেছেন। আমাদের দলিল হল : হুজুর সা. এর আমাল সর্বদা ইহার উপর ছিল। কোন কাজে হুজুর সা. এর সর্বক্ষণিক আমল হওয়া একাজ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ যখন তা ফরজ না হওয়ার দলিল বিদ্যমান থাকে।

আর এব্যাপারে সুনানে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার হুজুর সা. নামাজে দ্বিতীয় রাকাতের পর বৈঠক না করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবায়ে কেরামরা পিছন থেকে সুবহানাল্লাহ বললেন। কিন্তু হুজুর সা. বৈঠকের দিকে ফিরে আসেন নি। এবার যদি বৈঠকটি ফরজ হত তবে হুজুর সা. দাঁড়ানো থেকে বৈঠকের দিকে ফিরে আসতেন। সুতরাং প্রতিয়মান হল প্রথম বৈঠক ফরজ নয়; বরং ওয়াজিব।

قوله : وَتَشَهُّدِ الخ :৭. প্রথম বৈঠকে ও দ্বিতীয় বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব। কেননা, হুজুর সা. ইহাও সর্বদা করতেন। আর উভয় বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার কারণ হল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কে হুজুর সা. তাশাহুদ শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে প্রথম অথবা দ্বিতীয় বৈঠক কোনটিকে নির্ধারণ করেন নি বিধায় প্রতিয়মান হল যে, উভয় বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব।

قوله : لَفْظُ السَّلَامِ الخ : ৮. নামাজের শেষে সালাম পড়ে নামায শেষ করা। আর তা প্রথমে ডান দিকে পরে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে করতে হবে। ইহা জমহুর ওলামা, কিবারে সাহাবাদের মাযহাব, প্রমান হল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীস-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ
حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ

হুজুর সা. ডান দিকে সালাম ফিরাতেন যে, তার ডান গন্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেত এবং বাম দিকে ফিরাতেন যে, তার বাম গন্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেত।

قوله : وَ قُنُوْتُ الخ : ৯. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে বিতর নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পড়া ওয়াজিব। আর সাহাবাইন রহ. এর মতে দোয়ায়ে কুনুত পড়া সুন্নাত।

قوله : وَتَكْبِيْرَاتُ الْعِيْدَيْنِ الخ : ১০. উভয় ঈদের নামাযে তাকবীর বলা ওয়াজিব।

১১. মাগরিব, ইশার প্রথম দুই রাকাতে এবং ফজর, জুমুআ ও উভয় ঈদে কিরাত উচ্চ স্বরে পড়া ওয়াজিব। তা ছাড়া অন্যান্য নামাযের কিরাত অনুচ্চ স্বরে পড়া ওয়াজিব।

وَسُنَنُهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلتَّحْرِيمَةِ وَنَشْرُ أَصَابِعِهِ وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَالثَّنَاءُ وَالتَّعَوُّذُ وَالتَّسْمِيَةُ وَالتَّأْمِينُ سِرًّا وَوَضْعُ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ وَتَفْرِيحُ أَصَابِعِهِ وَتَكْبِيرُ السُّجُودِ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا وَوَضْعُ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَافْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصْبُ الْيُمْنَى وَالْقَوْمَةُ وَالْجَلْسَةُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدُّعَاءُ وَ أَدَابُهَا نَظَرُهُ إِلَى مَوْضَعِ سُجُودِهِ وَكَظْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ وَإِخْرَاجُ كَفَّيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ وَدَفْعُ السُّعَالِ مَا اسْتَطَاعَ وَالْقِيَامُ حِيْنَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَشُرُوعُ الْإِمَامِ مُذْ قِيلَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

অনুবাদ : নামাযের সুন্নতসমূহ ঃ তাকবীরে তাহরিমার জন্য উভয় হাত উঠানো। আঙ্গুল খোলা রাখা। ইমামের উচ্চস্বরে তাকবীর বলা। ছানা (সুবহানাকাল্লাহুম্মা... বলা) তা'আউয, তাসমিয়া এবং আমীন অনুচ্চ স্বরে বলা। ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভির নীচে রাখা। রুকুতে যেতে ও উঠতে তাকবীর বলা। রুকুতে তিনবার তাসবীহ বলা। উভয় হাতে হাঁটুতে ধরা (তথা উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখা) আঙ্গুলগুলো ব্যপ্ত রাখা। সিজদায় যেতে তাকবীর বলা এবং সিজদায় তিনবার তাসবীহ বলা। উভয় হাত ও উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা। বাম পা মাটিতে বিছিয়ে দেয়া এবং ডান পা খাড়া রাখা। রুকু থেকে দাঁড় হওয়া। উভয় সিজদার মাঝে বসা। হুযুর সা. এর উপর দরুদ পড়া এবং দোয়া করা। নামাযের আদব হল, সিজদার স্থলের দিকে দৃষ্টি রাখা। হাই তোলার সময় মুখ চেপে রাখা। তাকবীর বলার সময় জামার হাতা থেকে হাত বের করা। যতটুকু সম্ভব কাশি সংবরণ করা। ইকামতে حى على الفلاح বলার সময় দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং ইকামতে قد قامت الصلوة বলা হলে ইমাম নামায শুরু করে দেয়া।

শব্দার্থ : نَشْرٌ বিস্তৃতি, বিস্তার سُرَّةٌ (ج) سُرَّاتٌ নাভি, কেন্দ্রস্থল اِفْتِرَاشٌ ইহা افتعال থেকে অর্থ: বিছানো, ছড়ানো نَصْبٌ স্থাপন করা (খাড়া করা) كَظْمٌ চেপে রাখা, সংবরণ করা اَلتَّثَاؤُبُ হাই তোলা, মুখব্যাদান كُمٌّ তার দ্বিবচন كُمَّيْنِ ব. ব. أَكْمَامٌ জামার আস্তিন, হাতা (আস্তিনের) কপ اَلسُّعَالُ কাশি, কাশ سُعَالٌ دِيكِيٌّ হুপিং কাশি

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَسُنَنُهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ الخ : গ্রন্থকার রহ. এখান থেকে নামাযের সুন্নাতসমূহের আলোচনা শুরু করছেন। নিম্নে তা একটু ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হল।

১. তাকবীরে তাহরিমার সময় উভয় হাত এতটা উঠানো যাতে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী উভয় কানের লতিকা বরাবর হয়। তবে ইমাম শাফেয়ী ও মালিক রহ. এর মতে কাঁধ পর্যন্ত উঠানো হবে। ইমাম আহমাদ রহ. থেকে এরকম একটি বর্ণনা রয়েছে। আমাদের দলীল হল, হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. বারা ইবনে আযিব রাযি. এবং হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেছেন- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ "নবী করীম সা. যখন তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাত কান বরাবর উঠাতেন। (হাকীম) সুতরাং তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো প্রমাণিত হল।

২. উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো খোলা ও ব্যপ্ত করে রাখা।

৩. ইমামের জন্য তাকবীরসমূহ উচ্চ আওয়াজে বলা সুন্নাত।

৪. ছানা ৫. আ'উযু বিল্লাহ ৬. বিসমিল্লাহ অনুচ্চ আওয়াজে পড়া।

قوله : وَالتَّأْمِيْنَ الخ : ৭. আমাদের মাযহাব অনুযায়ী ইমাম মুক্তাদি সবার জন্য আমীন অনুচ্চ স্বরে পড়া সুন্নাত। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে উচ্চ স্বরে পড়া সুন্নাত। তিনি দলীল হিসাবে পেশ করেন আবু দাউদ শরীফের হাদিস—

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ -

ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন ولا الضالين বলতেন তখন আমীন বলতেন এবং উচ্চ স্বরে বলতেন। আমাদের মাযহাবের দলীল- হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর বর্ণিত হাদিস—

قَالَ أَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الْإِمَامُ اَلتَّعَوُّذُ وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَآمِيْنَ

তিনি বলেন, চারটি বাক্য ইমাম নীরবে পড়বে- اَعُوْذُ بِاللهِ , بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ , رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ এবং امين এরিওয়ায়েত দ্বারা বুঝা গেল আমীন অনুচ্চ স্বরে পড়া হবে। দ্বিতীয় দলীল হল- آمين শব্দটি استجاب এর অর্থে আসে, যা দোয়া বিশেষ। এদিকে দোয়া গোপনে হওয়াটা বাঞ্চনীয়। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন- اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً একারণে আমীন অনুচ্চ স্বরে বলা মাসনুন হবে। হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. কর্তৃক প্রদত্ত হাদিসের জবাব হল, আল্‌কামা ইবনে ওয়াইল তার পিতা ওয়াইল থেকে বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُএর উল্লেখ রয়েছে। অতএব উভয় রিওয়ায়েতের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় উভয় রিওয়ায়েত অগ্রহণযোগ্য। আর হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীস যা আমাদের দলীল তা গ্রহণযোগ্য হবে।

قوله : وَضْعُ يَمِيْنِه الخ : ৮. নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা সুন্নাত। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর আমল করেছেন এবং ইরশাদ করেন- إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِأَنْ نَأْخُذَ شِمَالَنَا بِأَيْمَانِنَا فِي الصَّلَاةِ আমরা নবীগণের জামাআত আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরে রাখব। মোটকথা উপরোক্ত রিওয়ায়েত দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা সুন্নাত।

قوله : وَتَكْبِيْرُ الرُّكُوْعِ الخ : ৯, রুকুতে যেতে তাকবীর বলা ও ১০. রুকু থেকে উঠতে তাকবীর বলা সুন্নাত।

১১. রুকুতে গিয়ে তিনবার তাসবীহ তথা سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলা। কেননা হুযুর সা. ইরশাদ করেন- إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِيْ رُكُوْعِه سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلَاثًا তোমাদের কেউ যখন রুকু করে তখন সে যেন তার রুকুতে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলে।

১২. রুকুতে গিয়ে উভয় হাত দ্বারা হাঁটুতে ধরা।

১৩. তখন হাতের আঙ্গুলগুলো ব্যপ্ত ও প্রশস্ত করে রাখবে।

১৪. সিজদায় যেতে তাকবীর বলা। কেননা হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন-

كَانَ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَ رَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَأَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرَ

রাসূল সা. প্রত্যেক উঠা নামার সময় এবং দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায়ও তাকবীর বলতেন এবং হযরত আবুবকর ও উমর রাযি. ও। অর্থাৎ তারা উভয়ে নবী কারীম সা. এর ন্যায় তাকবীর বলতেন।

قوله : وتسبيحه ثلثا الخ : ১৫. সিজদায় তিনবার তাসবীহ তথা سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلَى পাঠ করা। কেননা রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِى سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا

তোমাদের কেহ যখন সিজদা করবে তখন সে যেন তার সিজদায় তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلَى বলে। তবে হ্যাঁ রুকু ও সিজদাতে তিনবারের অধিক তাসবীহ পড়া মুস্তাহাব। তবে শর্ত হল বে-জোড় হতে হবে।

১৬. সিজদায় উভয় হাতকে এবং ১৭- উভয় পাকে মাটিতে রাখা।

১৮. বাম পা কে মাটিতে বিছিয়ে দেয়া এবং

১৯. ডান পা কে খাড়া রাখা সুন্নাত। পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখা। কেননা রাসূল সা. বলেছেন—

إِذَا سَجَدَ الْمُؤْمِنُ سَجَدَ كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُ ، فَلْيُوَجِّهْ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ

'মুমিন যখন সিজদা করে তখন তার প্রতিটি অঙ্গ সিজদা করে, সুতরাং সে যেন তার আঙ্গুগুলোকে যতটুকু সম্ভব কিবলামুখী করে রাখে।

২০. কাওমা ২১. জালসা, অর্থাৎ রুকু থেকে সোজা হয়ে খাড়া হওয়া এবং উভয় সিজদার মাঝে শান্তির সাথে বসা এবং ধীরে স্থীরে রুকুতে এবং সিজদায় যাওয়া।

قوله : والصلوة الخ : ২২. হুযুর সা. এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা। আমাদের মতে সুন্নাত। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে ফরয। আমাদের দলীল হল, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. কে তাশাহুদ শিক্ষা দানের পর হুযুর সা. বলেন— إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ فَعَلْتَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُكَ রাসূলুল্লাহ সা. নামায পূর্ণ হওয়াকে তাশাহুদ পড়া এবং শেষ বৈঠকের মধ্য থেকে যে কোন একটির সাথে متعلق করেছেন। বিধায় প্রতিয়মান হল যে, দরুদ শরীফ পড়া ফরয নয়। যদি হত তবে অবশ্যই দুরুদ শরীফের কথা উল্লেখ করতেন।

২৩. নামাযের শেষ পর্যায়ে তথা দরুদ শরীফের পর দোয়া করা সুন্নাত। কেননা হুযুর সা. হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. কে তাশাহুদ শিক্ষা দানের শেষ পর্যায়ে বলেন,— ثُمَّ اخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَطْيَبَهَا وَأَعْجَبَهَا إِلَيْكَ এরপর তুমি তোমার কাছে উত্তম ও পছন্দনীয় দোয়া স্থির করে নাও। সুতরাং দরুদ শরীফ পড়ার পর দোয়া পড়া সুন্নাত।

فَصْلٌ : وَإِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَلَوْ شَرَعَ بِالتَّسْبِيحِ أَوْ بِالتَّهْلِيلِ أَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ صَحَّ كَمَا لَوْ قَرَأَ بِهَا عَاجِزًا أَوْ ذَبَحَ وَسَمَّى بِهَا لَا بِاللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ السُّرَّتِهِ مُسْتَفْتِحًا وَتَعَوَّذَ سِرًّا لِلْقِرَاءَةِ فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ لَا الْمُقْتَدِي وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ وَسَمَّى سِرًّا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِيَ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ أُنْزِلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّوَرِ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَلَا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ -

---

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : যদি প্রবিষ্ট হওয়ার ইচ্ছা করে তবে তাকবীর দিবে। উভয় হাত কানের বরাবর উত্তোলন করবে। যদি তাসবীহ, তাহলীল অথবা ফারসী কিরাত দ্বারা শুরু করে তবে সহীহ হবে। যেমন, কেহ

অপারগতা বশতঃ ফারসী কিরাত পড়ল, অথবা জবেহের ক্ষেত্রে তাসমিয়া ফারসীতে পড়ল, তবে (ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে তা যথেষ্ট) কিন্তু যদি اللهم اغفر لى দ্বারা নামায শুরু করে তবে তা জায়েয হবে না। ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখবে নাভির নীচে ছানা পড়া অবস্থায়। (তথা الله اكبر বলার পর ছানা পড়া শুরু করে দিবে।) কিরাত পড়ার জন্য অনুচ্চ স্বরে أعوذ بالله পড়বে। মাসবুক তা পড়বে তবে মুক্তাদি তা পড়বে না। উভয় ঈদের তাকবীরসমূহের পরে أعوذ بالله পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে বিসমিল্লাহ অনুচ্চ স্বরে পড়বে। আর বিসমিল্লাহ হল কুরআনের একটি আয়াত যা দুটি সুরার মাঝে পার্থক্যের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। তা ফাতেহার অথবা অন্য কোন সুরার অংশবিশেষ নয়।

শব্দার্থ : حِذَاءَ মুখোমুখি, সমানসমান, বরাবর اَلْمَسْبُوْقُ পশ্চাদবর্তী (নামাযে) মাসবুক। নামাযে মাসবুক ঐ ব্যক্তি যিনি জামাত শুরু হবার পর জামাতে শরীক হয়েছেন। অর্থাৎ ইমাম সাহেব দু' এক রাকাত পড়ার পর যিনি জামাতে শরীক হন তাকে মাসবুক বলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَاِذَا اَرَادَ الدُّخُوْلَ الخ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতসহ যে কোন নামায শুরু করতে হলে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীর বলতে হবে। সুতরাং যদি কেহ বসে তাকবীর বলে অতঃপর দাঁড়িয়ে যায় তবে তার ঐ তাকবীর তথা নামায সূচনা করা সহীহ হবে না। এমনিভাবে যদি কেহ ইমামকে রুকুতে পেয়ে থাকে আর সে না দাঁড়িয়ে তথা পিঠ কুঁজো করে তাকবীর বলে তবুও তার এ তাকবীর বলা যথেষ্ট হবে না। তবে সামান্য ব্যাখ্যা এভাবে যে, যদি তার এ কুঁজো হওয়াটা দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয়ে থাকে তবে এ তাকবীর নামায শুরু করার জন্য যথেষ্ট হবে না। দলীল হল, আল্লাহর বাণী- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ দ্বিতীয়ত হুযুর সা. ইরশাদ করেন— تَحْرِيْمُهَا اَلتَّكْبِيْرُ তাকবীর হল নামাযের তাহরিমা।

তাকবীরে তাহরিমা নামাযের জন্য শর্ত নাকি রুকন, এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং আমাদের মতে তাকবীরে তাহরিমা শর্ত আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে তাকবীরে তাহরিমা রুকন।

উক্ত মতানৈক্যের ফলাফল হল এভাবে যে আমাদের মতে যেহেতু তাকবীরে তাহরিমা শর্ত তাই ফরজের তাহরিমা দ্বারা নফলও আদায় করা যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে ফরযের তাহরিমা দ্বারা নফল আদায় করা যাবে না।

উল্লেখিত মতপার্থক্যের কারণ হল এক শর্তের সাথে অনেক নামায আদায় করা যায় না। আমাদের দলীল হল, যেমন আল্লাহর বাণী- وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাকবীরের উপর সালাতকে عطف করেছেন। আর عطف এর দাবী হল مغايرت তথা বৈপরিত্ব থাকা। আর তা তখনই সম্ভব যখন তাকবীরকে শর্ত হিসাবে গণ্য করা হবে। কিন্তু যদি তা রুকন ধরা হয় তবে جزء কে كل এর উপর عطف করা লাযেম আসে, যা জায়েয নেই। কেননা জুয তো কুল এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়। সুতরাং এক্ষেত্রে عَطْفُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِه লাযেম হওয়ার দরুন তা জায়েয নেই। দ্বিতীয়ত তাকবীরে তাহরিমা অন্যান্য আরকানের ন্যায় বারবার আসে না। তাই বুঝা গেল যে তাকবীরে তাহরিমা রুকন নয়; বরং শর্ত। নতুবা অন্যান্য আরকানের ন্যায় তাও বারবার আসত।

قوله : وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ الخ তাকবীরে তাহরিমার সময় উভয় হাত এতটা ওঠানো হবে যাতে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বয় উভয় কানের লতিকা বরাবর হয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মালিক রহ. এর মতে কাঁধ পর্যন্ত উঠানো হবে। ইমাম আহমাদ রহ. থেকেও এমনই বর্ণনা রয়েছে।

আমাদের দলীল হল, হযরত আবু হুমাইদ সাইদি থেকে বর্ণিত হাদিস—

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ -

মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা থেকে বর্ণিত, তিনি মহানবী সা. এর সাহাবীদের এক জামাতের সাথে বসে ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন আবু হুমাইদ সাইদি রাযি. বললেন, আমি নবী কারীম সা. এর নামায দেখেছি, যখন তিনি তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন।

উক্ত হাদিস দ্বারা প্রতিভাত হল যে, হুযুর সা. তাকবীরে তাহরিমার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন।

আমাদের দলীল হল— أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাত কান বরাবর উঠাতেন। উক্ত হাদিসটি হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি., বারা ইবনে আযিব রাযি. এবং হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেছেন। যুক্তি নির্ভর কথা হল, তাকবীরে তাহরিমাতে হাত উঠানো দ্বারা মূলত বধিরদেরকে অবহিত করানো। আর তা এভাবে সম্ভব যেভাবে আমরা বলেছি।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর উপস্থাপিত হাদিসটি আমরা অপারগতার উপর আরোপ করব। সুতরাং ক্ষমতা থাকা অবস্থায় কান পর্যন্ত হাত উঠানো হবে।

قوله : وَلَوْ شَرَعَ بِالتَّسْبِيحِ الخ উক্ত ইবারত দ্বারা সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. নামায আরম্ভ করার তথা তাকবীরে তাহরিমার সময় যে সকল শব্দাবলি বলা যাবে তার আলোচনা করছেন। সুতরাং যদি কেহ আল্লাহু আকবার না বলে তাসবীহ-তাহলীল দ্বারা নামায শুরু করে তবুও তা আদায় হয়ে যাবে। অর্থাৎ তরফাইন রহ. এর মতে এমন শব্দ দ্বারা নামায আরম্ভ করা জায়েয, যা আল্লাহর তা'জীম বা মর্যাদা প্রকাশ করে। যেমন,

اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ ، اَللّٰهُ الْأَكْبَرُ ، اَللّٰهُ كَبِيْرٌ ، اَللّٰهُ أَجَلُّ ، اَللّٰهُ أَعْظَمُ ، اَلرَّحْمٰنُ أَكْبَرُ

কিংবা আল্লাহর অন্যান্য গুণবাচক কোন শব্দ দ্বারা। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে যদি নামাযী ব্যক্তি তাকবীরের বিশুদ্ধ উচ্চারণ করতে সক্ষম হয় তবে শুধু তিন শব্দ তথা اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ، اَللّٰهُ الْأَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ দ্বারা নামায শুরু করা জায়েয অন্য শব্দ দ্বারা জায়েয নয়।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে শুধু اَللّٰهُ الْأَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ দ্বারা আরম্ভ করা জায়েয। অন্য শব্দ দ্বারা জায়েয নয়। ইমাম মালিক রহ. এর মতে শুধু اَللّٰهُ أَكْبَرُ দ্বারা জায়েয, অন্য শব্দ দ্বারা জায়েয নয়। ইমাম মালিক রহ. বলেন, হুযুর (সঃ) থেকে শুধু اَللّٰهُ أَكْبَرُ ই বর্ণিত আছে। বিধায় তাই বলতে হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন যদিও রাসুলুল্লাহ সা. থেকে শুধু اَللّٰهُ أَكْبَرُ বর্ণিত আছে তবে উক্ত اكبر এর সাথে আলিফ ও লাম ব্যবহার করাতে প্রশংসার ক্ষেত্রে অধিক অর্থবহ হয়। তাই তা বলা জায়েয। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর দলীল হল, আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে أفعل এর ওযন এবং فعيل এর ওযন সমার্থ বোধক। কেননা আল্লাহর গুণাবলীতে বেশী প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা আসল বড়ত্বের মধ্যে আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই। তাই আল্লাহর প্রশংসার ক্ষেত্রে أفعل ও فعيل-এর ওযন সমার্থ বোধক। তবে হাঁ যদি সে ভালভাবে এশব্দাবলী আদায় করতে সক্ষম না হয় তবে যেভাবে পারে তা'জীমের মর্ম আদায় করে নেবে। তরফাইনের দলীল হল, তাকবীরের মূল অর্থ হল মর্যাদা প্রকাশ করা। আল্লাহর বাণী وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ তথা فعظم অন্যত্র রয়েছে فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ অর্থাৎ عظمنه এর

অর্থে এসেছে। সুতরাং আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপক শব্দাবলী দ্বারা নামায শুরু করা জায়েয।

قوله : أَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ الخ ফারসী ভাষায় নামায আরম্ভ করা নামাযের মাঝখানে ফারসীতে কিরাত পড়া, জবাই করার সময় ফারসীতে বিসমিল্লাহ পড়া ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে জায়েয। চাই সে শুদ্ধভাবে আরবী বলতে পারুক বা না পারুক। পক্ষান্তরে সাহেবাইন রহ. এর মতে যদি সে আরবী বলতে সক্ষম হয় তাহলে ফারসীতে পড়া জায়েয নয়। তবে জবাই করতে ফারসী নয় বরং যে কোন ভাষাতে বিসমিল্লাহ পড়া জায়েয আছে। আর যদি সে আরবীতে সক্ষম না হয় তবে সবকিছু জায়েয। সাহেবাইন রহ. এর দলীল হল, রাসুলুল্লাহ সা. এর বাণী—

تَفْضِيلُ لِسَانِ الْعَرَبِ عَلَى سَائِرِ الْأَلْسِنَةِ ، أَنَا عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ

আরবী ভাষার ফযীলত সকল ভাষার উপর রয়েছে। কেননা আমি আরবী, কোরআন আরবী এবং জান্নাতের ভাষাও আরবী। তাই বলা যায় যে সকল ভাষা থেকে আরবী ভাষা নির্দিষ্ট বিশেষত্ব রয়েছে। সুতরাং তাই পড়া জরুরী।

দ্বিতীয়তঃ নামাযে যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হল কিরাত পড়া। আর কেরাত হল আরবী শব্দ সমষ্টির নাম যা অর্থকে বুঝায়। যেমন আল্লাহর বাণী- إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا অন্যত্র ইরশাদ করেন, قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ মোটকথা مأموربه হল কোরআনের কেরাত পড়া। আর তা হল আরবী, এজন্য আরবী ভাষায় কেরাত পড়া ফরজ হবে। বিধায় যদি কেহ আপারগ থাকে তবে যেভাবে রুকু সিজদার বেলায় ও অপারগতা বশতঃ ইশারায় আদায় করা যথেষ্ট হয় অনুরূপ আরবীতে কেরাত পড়তে অক্ষম হলে তার অর্থ বলা যথেষ্ট।

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর দলীল হল, আল্লাহর বাণী- وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ নিঃসন্দেহে এ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বিদ্যমান ছিল। অথচ সর্বজন স্বীকৃত যে এ কুরআন ছিল না। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এ কুরআনের মর্ম বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয় দলীল হল, পারস্যবাসীদের চাওয়ার ভিত্তিতে হযরত সালমান ফারসী রাযি. সুরায়ে ফাতিহাকে ফারসী ভাষাতে লিপিবদ্ধ করে তাদেরকে দেন। আর তারা তা নামাযে পাঠ করত। এক পর্যায়ে তারা আরবী ভাষা শিখে নিল। রাসুলুল্লাহ সা. তা অবহিত হলে তার বিরোধিতা করেননি।

قوله : لَا بِأَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ الخ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ বলে নামায শুরু করলে তা জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে যে শব্দাবলীতে খাছভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও বড়ত্ব পাওয়া যাবে না। সেসব শব্দ দ্বারা নামায শুরু করলে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা এমন শব্দাবলীতে স্বার্থের মিশ্রণ রয়েছে।

قوله : وَ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلَى يَسَارِهِ الخ : আমাদের মাযহাব মতে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর বাঁধা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রহ এর মতে হাত ছেড়ে দেওয়া আজীমত আর বেঁধে রাখা রুখসাত।

আমাদের দলীল হল : রাসুল সা. এর উপর সর্বদা আমল করেছেন এবং ইরশাদ করেন, إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِأَنْ نَأْخُذَ شِمَالَنَا بِأَيْمَانِنَا فِي الصَّلَاةِ আমরা নবীগণের জামাত আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে, আমরা নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরে রাখব। হযরত আলী রাযি. বলেন, مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّيْ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ সুন্নাত হল যে মুসল্লী নামাযে তার ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নীচে বাঁধবে।

দ্বিতীয় মাসআলা হল : আমাদের মতে হাত নাভির নীচে বাঁধা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে বুকের উপর রাখা উত্তম। আমাদের দলীল হল, হযরত আলী রাযি. এর পূর্বোক্ত আছারটি যাতে تَحْتَ السُّرَّةِ কথার

উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় দলীল নাভির নীচে হাত বাঁধার দ্বারা তা'জীম পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। আর নামায দ্বারা তো তা'জীমই উদ্দেশ্য। কিফায়া গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, নাভির নীচে হাত বাঁধা দ্বারা কিতাবীদের সাথে তাশাব্বুহ থেকে দূরে থাকা যায়। এবং সতর ঢাকার নিকটবর্তী হয়। একারণে নাভির নীচে হাত বাঁধা উত্তম।

قوله : سَمَّى سِرًّا الخ : আমাদের ইমাম আযম রহ. আহমাদ রহ. ছাওরী রহ. প্রমুখদের মতে সুরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ অনুচ্চ স্বরে পড়া হবে। আর তা সুন্নাত। ইমাম মালিক রহ. এর মতে ফরয নামাযে সুরায়ে ফাতিহা বা অন্য সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া জায়েয নেই। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে কেরাত উচ্চ স্বরে পড়ার সময় বিসমিল্লাহকে উচ্চ স্বরে পড়া হবে। আর কিরাত অনুচ্চ স্বরে পড়ার বেলায় বিসমিল্লাহও অনুচ্চ স্বরে পড়া হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীল হল, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস রাসুলুল্লাহ সা. নামাযে উচ্চ স্বরে কিরাত পড়তেন। দ্বিতীয় দলীল হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের রাযি. থেকে বর্ণিত যা দারে কুতনী নামক গ্রন্থে রয়েছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ فِي الصَّلٰوةِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসুল সা. নামাযে বিসমিল্লাহ উচ্চ স্বরে পড়তেন।

আমাদের দলীল হল : হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, চারটি বাক্য এমন যা ইমাম নীরবে পড়বে। ঐ চারটি বাক্য হল, তা'আউয, তাসমিয়া, তাহমীদ এবং আমীন। **দ্বিতীয় দলীল হল :** হযরত আনাস রাযি. এর বর্ণিত হাদিস—

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত আনাস রাযি. বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সা. এর পিছনে এবং আবু বকর ও উমর, উসমান রাযি. এর পিছনে নামায পড়েছি। কিন্তু তাদের কাউকেও بسم الله উচ্চ স্বরে পড়তে শুনিনি।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীলের জবাব হল, রাসুল সা. সাহাবায়ে কেরামদেরকে শিক্ষা দানের জন্য কখনো কখন উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন। দ্বিতীয়ত ইসলামের প্রাথমিক যুগে হুযুর সা. উচ্চ স্বরে পড়তেন তবে পরবর্তীতে তা اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً দ্বারা মানসুখ হয়ে যায়। সুতরাং প্রমাণিত হল যে বিসমিল্লাহ অনুচ্চ স্বরে পড়া হবে; এবার বিসমিল্লাহ প্রত্যেক রাকাতে সুরায়ে ফাতিহার পূর্বে পড়া হবে নাকি একবার পড়া হবে এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহ থেকে দুটি মতামত রয়েছে। হযরত হাসান বিন যিয়াদের বর্ণনাতে বিসমিল্লাহ প্রত্যেক রাকাতে পড়া হবে না। বরং একবারই পড়া হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বর্ণনা করেন যে বিসমিল্লাহ প্রত্যেক রাকাতে পড়া হবে। আর ইহার মধ্যেই সতর্কতা রয়েছে। এবং সাহেবাইন রহ. এর মতামত ও তাই।

قوله : وَهِيَ آيَةُ الْقُرْآنِ الخ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সর্বসম্মতিক্রমে সুরায়ে নামলের আয়াত বিশেষ। কিন্তু দু সুরার মধ্যখানে যে বিসমিল্লাহ আছে তা কুরআনের جزء কিনা তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের মতে তা কুরআনের অংশ তবে তা সুরায়ে ফাতিহার অংশ নয়; বরং সুরার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টিকারী হিসাবে নাযিল করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে বিসমিল্লাহ সুরায়ে ফাতিহার অংশ তবে অন্য সুরার ক্ষেত্রে তার দুটি অভিমত রয়েছে। অর্থাৎ এক বর্ণনা মতে তা অংশ এবং অন্য বর্ণনা মতে তা অংশ নয়।

وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً أَوْ ثَلَاثَ آيَاتٍ وَأَمَّنَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ سِرًّا وَكَبَّرَ بِلَا مَدٍّ وَرَكَعَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَبَسَطَ ظَهْرَهُ وَسَوَّى رَأْسَهُ بِعَجُزِهِ وَسَبَّحَ فِيهِ ثَلَاثًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَاكْتَفَى الْإِمَامُ بِالتَّسْمِيعِ وَالْمُؤْتَمُّ بِالتَّحْمِيدِ وَالْمُنْفَرِدُ بِهِمَا -

অনুবাদঃ অতঃপর সুরা ফাতিহা এবং (তার সাথে) একটি সুরা বা তিন আয়াত পড়বে। ইমাম ও মুক্তাদী অনুচ্চ স্বরে আমীন বলবে। তাকবীর বলবে হামজা ও বা-কে না বাড়িয়ে। রুকু করবে এবং উভয় হাত উভয় হাটুর উপর রাখবে। আঙ্গুলি ফাঁক রাখবে এবং পিঠ সমতলভাবে রাখবে। মাথা ও নিতম্ব সমান রাখবে এবং রুকুতে তিনবার তাসবীহ পাঠ করবে। অতঃপর মাথা উঠাবে। ইমাম শুধু سمع الله لمن حمده ও মুক্তাদী ربنا لك الحمد এর উপর ইকতিফা করবে। মুনফারিদ উভয়টি বলবে।

শব্দার্থঃ فَرَّجَ - تفعيل থেকে تَفْرِيجًا ফাঁকা করা, বিদির্ণ করা, খালি করা। عَجُزٌ (ج) أَعْجَازٌ নিতম্ব, পাছা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ الخ : নামাযে কিরাতে কুরআনের কতটুকু রুকন তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। সুতরাং আমাদের মাযহাব মতে মুতলাকান তেলাওয়াত করা রুকন। তা কুরআনের যে কোন স্থান থেকেই হউক না কেন। তবে হাঁ সুরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে সুরায়ে ফাতিহা পাঠ করা রুকন। ইমাম মালিক রহ. এর মতে সুরায়ে ফাতিহা ও তার সাথে অন্য সুরা পাঠ করা রুকন। তার দলীল হল, রাসুল সা. এর বাণী- لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'সুরায়ে ফাতেহা ও অন্য কোন সুরা পড়া ছাড়া নামায হবে না। এখানে لاصلوة তথা নামায হবে না তা দ্বারা ফরযই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ফরযের লজ্ঘনে নামায ফাসিদ হয়। সুতরাং সুরায়ে ফাতিহা ও অন্য সুরা উভয়টি পড়া ফরয। ইমাম কাফের রহ. এর দলীল হল হুযুর স এর বাণী- لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ সুরায়ে ফাতিহা ব্যতীত সালাত সহীহ হবে না। কাজেই বুঝা গেল নামাযে সুরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয।

আমাদের দলীল হল, আল্লাহ তালার বাণী- فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ কুরআনের যে অংশ সহজ হয় তাই পাঠ কর। উক্ত আয়াতে ما تيسر এর ما শব্দটি عام বা ব্যাপকার্থ বোধক। ইহা সুরায়ে ফাতিহা বা অন্য যেকোন সুরাকে শামিল করে। যা মুসল্লি পাঠ করতে পারে। সুতরাং নির্দিষ্টভাবে সুরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয নয়। বরং যে কোন সুরা পাঠ করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। মালিকি ও শাওয়াফেদের পেশকৃত দলীলের জবাব হল, তাদের উপস্থাপিত দলীলগুলো خبر واحد যা দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে ظنى পক্ষান্তরে কুরআনের আয়াত হল قطعى এদিকে উসুলবীদদের দৃষ্টিতে ফরয দ্বারা دليل قطعى ধার্য হয় دليل ظنى দ্বারা হয় না। তবে হাঁ دليل ظنى দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হতে পারে। সুতরাং خبر واحد তথা دليل ظنى এর উপর আমল করতে গিয়ে আমরা বলি নামাযে সুরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব এবং যে কোন স্থান থেকে মুতলাকান তেলাওয়াত করা ফরয। অপরদিকে যেহেতু কিতাবুল্লাহর সাথে خبر واحد দ্বারা অতিরিক্ত করা জায়েয নয়। বিধায় আলোচিত যে কোন আয়াতের সাথে সুরায়ে ফাতিহা ফরয বলা বৈধ হবে না।

قوله : وَأَمَّنَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ سِرًّا الخ : এখানে দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা ব্যাপক। তা হল- (১) آمين ইমাম ও মুক্তাদি উভয় বলবে নাকি শুধু মুক্তাদি বলবে। (২) آمين উচ্চ স্বরে বলবে নাকি অনুচ্চ স্বরে বলবে। উভয় মাসআলা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল।

প্রথম মাসআলা : آمين উভয় বলবে নাকি শুধু মুক্তাদি বলবে। আমাদের মাযহাব মতে ইমাম মুক্তাদি উভয় آمين বলবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রহ. বলেন, آمين শুধু মুক্তাদি বলবে, ইমাম নয়। কেননা হুযুর সা. ইরশাদ করেন, إذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّيـنَ فَقُوْلُوْا آمين ইমাম যখন ولا الضالين বলবে তখন তোমরা آمين বল। হুযুর স. উক্ত হাদিসে ইমাম মুক্তাদির কাজকে বন্টন করে দিয়েছেন। সুতরাং বন্টনকৃত জিনিসে অংশিদারিত্ব হয় না। বিধায় ইমাম ولا الضالين বলবে। আর মুক্তাদি آمين বলবে।

আমাদের দলীল হল, হুযুর সা. এর হাদিস—

إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরা আমীন বলো। কেননা যার আমীন ফিরেশতার আমীনের সাথে মিলে যায় তার অতীতের পাপরাশি মার্জনা করে দেয়া হয়।

ইমাম মালিক রহ. এর দলীলের জবাব : রাসুলুল্লাহ সা. উক্ত হাদিসের শেষে বলেছেন, فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُوْلُهَا কেননা ইমামও আমীন বলবে। সুতরাং বুঝা গেল ঐ হাদিসের মধ্যে কর্ম বন্টন করা হয় নাই।

দ্বিতীয় মাসআলা : آمين উচ্চস্বরে বলা হবে না কি অনুচ্চস্বরে বলা হবে। আমাদের মতে ইমাম মুক্তাদি সকলেই অনুচ্চ স্বরে আমীন বলা সুন্নাত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ এর মতে উচ্চ স্বরে পড়া সুন্নাত।

তিনি দলীল পেশ করেন, হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. এর হাদিস দ্বারা-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَرَأَ وَلَاالضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

রাসুলুল্লাহ্ সা. যখন ولا الضالين বলতেন তখন উচ্চ স্বরে ও দীর্ঘ স্বরে آمين বলতেন।

আমাদের দলীল- হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদিস-

قَالَ أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ اَلتَّعَوُّذَ وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَآمِيْنَ

অন্য রিওয়ায়েতে রয়েছে, خمس يخفيهن الإمام এতে উপরোক্ত চারটির সাথে ছানারও উল্লেখ আছে। সুতরাং অনুচ্চ স্বরে آمين পড়া হবে।

দ্বিতীয় দলীল হল, آمين শব্দটি استجب এর অর্থে যা দোয়া বিশেষ। এদিকে দোয়া গোপনেই হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً সুতরাং আমীন অনুচ্চ স্বরে পড়া হবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীলের জবাব : আলকামা ইবনে ওয়াইল তার পিতা ওয়াইল থেকে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ এর উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং উভয় রিওয়ায়েত বিরোধ হওয়ার দরুন তা দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য হবে না।

قوله : وَكَبَّرَ بِلَا مَدِّ الخ ঃ তাকবীর তথা الله اكبر বলার ক্ষেত্রে الله এর الف বর্ণে فتح خفيف তথা مد (দীর্ঘ) করা ব্যতীত সামান্য যবর হবে। আর لام বর্ণকে مد করবে। ه বর্ণকে رفع দিবে। أكبر এর الف ও باء বর্ণে مد হবে না।

ثُمَّ كَبَّرَ وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ بِعَكْسِ النُّهُوضِ وَسَجَدَ بِأَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ وَكُرِهَ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِكَوْرِ عِمَامَتِهِ وَأَبْدَءَ ضَبْعَيْهِ وَجَافَى بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَوَجَّهَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَسَبَّحَ فِيهِ ثَلَاثًا وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ وَتُلْزِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا وَجَلَسَ مُطْمَئِنًّا وَكَبَّرَ وَسَجَدَ مُطْمَئِنًّا وَكَبَّرَ لِلنُّهُوضِ بِلَا اِعْتِمَادٍ وَقُعُودٍ وَالثَّانِيَةُ كَالْأُوْلَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يُثَنِّي وَلَا يَتَعَوَّذُ -

---

অনুবাদঃ অতঃপর তাকবীর বলে উভয় হাঁটু, অতঃপর উভয় হাত , তারপর চেহারা, উভয় কব্জির মাঝখানে যমিনে রাখবে। উঠার বিপরীতে। (অর্থাৎ উঠতে প্রথমে চেহারা তারপর হাত এবং সর্বশেষে হাঁটু তোলা হবে।) আর সিজদা করবে নাক ও ললাট দ্বারা। যে কোন একটি (তথা শুধু নাক অথবা ললাট) দ্বারা বা পাগড়ীর চুল্লিতে বা প্যাচের উপর সিজদা করা মাকরূহ। এবং বাহুদ্বয় খোলা রাখবে। পেট উভয় উরু থেকে পৃথক রাখবে। এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। (আর সিজদাতে) তিনবার তাসবীহ পাঠ করবে। স্ত্রীলোক নীচু ও জড়সড় হয়ে সিজদা করবে। তার পেট উরুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে রাখবে। অতঃপর তাকবীর বলে মাথা তুলবে এবং সুস্থির হয়ে বসবে। অতঃপর তাকবীর বলে সুস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর হেলান বা বসা ছাড়া দাঁড়ানোর জন্য তাকবীর বলবে।

দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের অনুরূপ। তবে ছানা ও তা'আউয পড়বে না।

শব্দার্থ : نُهُوضٌ জাগরণ, দণ্ডায়মানতা, উত্থান كَوْرٌ (ج) أَكْوَارٌ (পাগড়ির) প্যাঁচ, ভাঁজ। ضَبْعَيْنِ ضَبْعٌ ইহা এর দ্বিবচন, অর্থ: বাহু। جَافِي পৃথক রাখা। تَنْخَفِضُ - باب الانفعال থেকে اِنْخِفَاضًا নীচু হওয়া, নেমে যাওয়া। تَلْزَقُ (ن) لُزُوقًا লেগে থাকা, এঁটে থাকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : ثُمَّ كَبَّرَ وَ وَضَعَ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ এখান থেকে সিজদার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু করছেন। সুতরাং সিজদার তরীকা হল, তাকবীর বলে প্রথমে হাঁটু রাখবে। অতঃপর উভয় হাত মাটিতে রাখবে, চেহারা দুই হাতের তালুর মাঝখানে রাখবে। দলীল হল, হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. এর হাদিস তিনি একবার হুযুর সা. এর নামাযের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, فَسَجَدَ وَادَّعَمَ عَلَى رَاحَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ তিনি সিজদা করেছেন উভয় হাত মাটির উপর রেখেছেন এবং নিতম্ব উঁচু করে রেখেছেন।

অন্যত্র হযরত আবু সাইদ রাযি. বলেন, আমি বারা ইবনে আজিব রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে হুযুর সা. যখন সিজদা করতেন তখন নিজের কপাল কোথায় রাখতেন? তিনি বললেন, بين كفيه উভয় হাতের তালুর মাঝখানে।

সুতরাং বুঝা গেল যে সিজদার ক্ষেত্রে প্রথমে উভয় হাত পরে চেহারা বসানো হবে। পক্ষান্তরে উঠার বেলায় ঠিক এর বিপরীত (অর্থাৎ প্রথমে চেহারা পরে হাত তারপর হাঁটু আর এটাই হল বিশুদ্ধ।

قوله : وَسَجَدَ بِأَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ الخ : সিজদার ক্ষেত্রে নাক ও কপাল উভয়টি দ্বারা সিজদা করা হবে। কেননা রাসূল সা. সর্বদা এভাবে করেছেন। এখন যদি কেহ শুধু কপাল দ্বারা সিজদা করে নেয় তবে আমাদের উলামায়ে

কেরামের মতে তা জায়েয হবে। পক্ষান্তরে যদি শুধু নাক দ্বারা করে তবে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে কারাহাতের সাথে তা জায়েয। আর সাহেবাইন রহ. এর মতে ওযর ছাড়া এমনটি করা জায়েয নয়। তাদের **দলীল হল**, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদিস—

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ -

রাসুল সা. বলেন, আমাকে সাত অঙ্গের উপর সিজদা করার নির্দেশ করা হয়েছে। কপাল, উভয় হাত, উভয় হাটু, এবং পায়ের অগ্রভাগ। উক্ত হাদিসে সপ্তাঙ্গের মধ্যে নাকের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং শুধু নাকের উপর যথেষ্ট মনে করা ঠিক হবে না। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর দলীল হল, কুরআনুল কারীমে সিজদা সংক্রান্ত আয়াতসমূহে মুতলাকান সিজদা করার কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং সিজদা মুখমণ্ডলের অংশ বিশেষ দ্বারা আদায় হয়ে যায়। কারণ হল পুরা চেহারা দ্বারা সিজদা করা সম্ভব নয় কপালের ও নাকের হাড় ভাসমান থাকার দরুন। সুতরাং চেহারার অংশ বিশেষ জমিনে স্থাপন দ্বারা সিজদা আদায় হয়ে যাবে। এদিকে নাক ও কপাল হল সিজদা আদায়ের মহল বা স্থান। তাই শুধু কপাল দ্বারা আদায় করলে তাও আদায় হয়ে যাবে।

সাহেবাইন রহ. এর দলীলের জবাব হল, মশহুর রিওয়ায়েতে جبهة এর স্থলে وجه এসেছে। যেমন সুনানে আরবা'আতে হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযি. সূত্রে বর্ণিত-

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ سَبْعَةُ آرَابٍ ، وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ

সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, সিজদার ক্ষেত্রে নাক, কপাল উভয়টিই বরাবর।'

قوله : أَوْ بِكَوْرِ عَمَامَتِهِ الخ ঃ আমাদের মাযহাব মতে পাগড়ীর প্যাঁচের উপর সিজদা করা জায়েয তবে মাকরূহ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে পাগড়ীর প্যাঁচের উপর সিজদা করা জায়েয নেই। কেননা তার মতে সিজদার সময় কপাল খোলা রাখা ওয়াজিব। আমাদের দলীল হল, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি এর বর্ণিত হাদিস- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عَمَامَتِهِ রাসুলুল্লাহ স. তার পাগড়ীর প্যাঁচের উপর সিজদা করতেন। অনুরূপভাবে হযরত ইবনে আবী আওফা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিস- قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عَمَامَتِهِ। আমি দেখেছি রাসুল সা.কে তিনি তার পাগড়ীর প্যাঁচের উপর সিজদা করতেন।

قوله : وَأَبْدَا ضَبْعَيْهِ الخ : সিজদার সময় নামাযি ব্যক্তি তার বাহু খোলা রাখবে। হিংস্র প্রাণীর ন্যায় যমীনে বিছিয়ে রাখবে না। দলীল হল, আদম ইবনে আলী আল বকরীকে হযরত উমর রাযি. দেখলেন যে তিনি যমীন থেকে হাত উঠাচ্ছেন না। তাই তাকে লক্ষ্য করে বললেন—

يَا ابْنَ أَخِيْ لَا تَبْسُطْ بَسْطَ السَّبُعِ وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ وَابْدِ ضَبْعَيْكَ . فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ

'হে ভাতিজা! হিংস্র প্রাণীর ন্যায় যমীনে হাত বিছিয়ে দিয়ো না। হাতের তালুর উপর ভর করবে এবং নিজের বাহুকে খোলা রাখবে। কেননা যখন তুমি এমনটি করবে তখন তোমার প্রত্যেক অঙ্গ সিজদায় রত হয়ে যাবে। নামাযী ব্যক্তি সিজদার সময় উভয় উরু থেকে পেট পৃথক রাখবে। কেননা রাসুলুল্লাহ সা. যখন সিজদা করতেন তখন পেটকে উরু থেকে পৃথক রাখতেন।

قوله : وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ الخ ঃ গ্রন্থকার রহ. এখান থেকে মহিলার সিজদার কথা নিয়ে আলোচনা করছেন সুতরাং মহিলা নীচু হয়ে সিজদা করবে। এমনভাবে সিজদা করবে যেন সে যমীনের সাথে মিশে যায়। কেননা

মহিলাদের ক্ষেত্রে সতর হল মূল বিষয়। আর এভাবে সিজদা করাতে সতর ঢাকার অধিক নিকটবর্তী। তাই মহিলা পেট উরুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে আর হাত যমীনের সাথে মিলিয়ে সিজদা করবে।

قوله : ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا الخ ঃ দ্বিতীয় সিজদার তরীকা হল প্রথম সেজদা থেকে উঠার সময় মাথা উঠাতে তাকবীর বলবে। কেননা বর্ণিত আছে- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ রাসূল সা. প্রত্যেকবার উঠতে ও নিম্নগামিতে তাকবীর বলতেন। সুতরাং স্থির হয়ে বসে পুনরায় সিজদাতে যাবে। কেননা রাসুল সা. এক গ্রাম্য সাহাবীকে বলেছিলেন- ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتّٰى تَسْتَوِىَ جَالِسًا অতঃপর তুমি তোমার মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে বসে যাবে।

قوله : وَكَبَّرَ لِلنُّهُوْضِ بِلَا اِعْتِمَادٍ الخ : দ্বিতীয় রাকাত থেকে উঠতে তাকবীর বলবে তবে বসা যাবে না এবং উভয় হাত দ্বারা যমীনে ভর দেওয়া যাবে না। তবে ওযর হলে অন্য কথা। আর ওযর না থাকা অবস্থায় এটাই হল মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দ্বিতীয় রাকাত থেকে উঠার সময় সামান্য মাটিতে ভর দেওয়া যাবে এবং বসা যাবে। আমাদের দলীল হল, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিস—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ

রাসূলুল্লাহ্ সা. উভয় পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। দ্বিতীয়ত এ বৈঠকটি হল বিশ্রাম লাভের জন্য। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, দ্বিতীয় সিজদার পর হাত দ্বারা জমিনে ভর দেয়া বা বসা ছাড়া সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া মুস্তাহাব।

قوله : والثَّانِيَةُ كَالْأُوْلٰى الخ : প্রথম রাকাত শেষ হলে পরে দ্বিতীয় রাকাত শুরু করবে প্রথম রাকাতের অনুরূপ। তবে ছানা ও তাআউয়ায পড়া লাগবে না। কেননা, এগুলো একবার মাত্র পড়া শরীয়াতে প্রমাণিত। একারণে সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূলুল্লাহ্ সা. এর নামাযের বিবরণ দিতে গিয়ে এগুলোর বর্ণনা দেন নাই।

وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِيْ فَقْعَسٍ صَمْعَجٍ وإذا فَرَغَ مِنْ سَجْدَتِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ يُمْنَاهُ وَوَجَّهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَهِيَ تَتَوَرَّكُ وَقَرَأَ تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ فِيمَا بَعْدَ الْأُوْلَيَيْنِ اِكْتَفٰى بِالْفَاتِحَةِ وَالْقُعُودُ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ وَتَشَهَّدَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا بِمَا يُشْبِهُ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ لَا كَلَامَ النَّاسِ وَسَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ كَالتَّحْرِيمَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ نَاوِيًا الْقَوْمَ وَالْحَفَظَةَ وَالْإِمَامَ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَ الْأَيْسَرِ أَوْ فِيهِمَا لَوْ مُحَاذِيًا وَالْإِمَامُ يَنْوِي الْقَوْمَ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ -

---

অনুবাদ : فقعس صمعج ছাড়া হাত উঠাবে না। দ্বিতীয় রাকাতের উভয় সিজদা থেকে অবসর হলে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। ডান পা দাঁড় করে রাখবে। আর আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। উভয় হাত উরুদ্বয়ের উপর রাখবে। আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে রাখবে। আর মহিলা (তার বাম) নিতম্বের উপর বসবে তাশাহহুদ

পড়বে যা হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। প্রথম দু' রাকাতের পরের রাকাতে শুধু সূরায়ে ফাতেহার উপর নির্ভরশীল হবে। দ্বিতীয় বৈঠক প্রথম বৈঠকের ন্যায়। তাশাহুদ পড়বে এবং মহানবী সা. এর উপর দরূদ পড়বে। অতঃপর কুরআনের শব্দাবলী ও হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দোয়া করবে। তবে মানুষের কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কথা দ্বারা নয়। তাহরীমার ন্যায় ইমামের সাথে মুসল্লিদের ও ফেরেস্তাদের ও ইমামের ডান দিকের বা বাম দিকের (অর্থাৎ ইমাম সাহেব ডানে হলে বামের মুসল্লিরা ও ইমাম সাহেব বামে হলে ডানের মুসল্লিরা তার নিয়্যাত করবে) আর সরাসরি পিছনে হলে উভয় দিকে সালাম ফিরাতে ইমামের নিয়্যাত করবে। ইমাম তার উভয় সালামে মুসল্লিদের নিয়্যাত করবে।

শব্দার্থ : تَوَرُّكٌ - تفعل থেকে تَوَرُّكٌ নিতম্বে ভর করে বসা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ الخ : আট স্থান ছাড়া হাত উঠানো নেই। উক্ত আট স্থানকে গ্রন্থকার রহ. نقعس صمعج বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ উক্ত দুটি শব্দে মোট আটটি বর্ণ রয়েছে। যা দ্বারা আট যায়গায় হাত উঠানোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং ف দ্বারা افتتاح الصلوة তথা নামায শুরু করতে হাত উঠানো, ق দ্বারা قنوت তথা দোয়ায়ে কুনূত পড়ার পূর্বে তাকবীরের সময় হাত উঠানো, ع দ্বারা عيدين তথা উভয় ঈদের নামাজে তাকবীরের সময় হাত উঠানো, س দ্বারা استلام حجر তথা হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে হাত উঠানো, ص দ্বারা صفا এবং মরওয়া দ্বারা مروة সফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সায়ীর তাকবীরের সময় হাত উঠানো, ع দ্বারা عرفات এবং ج দ্বারা جمرات এ কংকর নিক্ষেপের সময় হাত উত্তোলন করা। উক্ত আট স্থান ছাড়া অন্যান্য স্থানে যেমন استسقاء এর নামায বা দোয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে হাত উত্তোলন করার বৈধতা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।

সুতরাং উক্ত আট স্থান উল্লেখ করা দ্বারা على الاطلاق নিষেধ উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো সুন্নাতে মুআক্কাদা হিসাবে উক্ত আটস্থানে হাত উঠানো প্রমাণিত। কিন্তু রুকুতে যেতে অথবা রুকু থেকে উঠতে কিংবা জানাযার নামাযে তাকবীর বলতে সময় হাত উঠানো আমাদের মাযহাবে সুন্নাত নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে রুকূতে যেতে এবং উঠতে হাত উত্তোলন করা বৈধ। তিনি দলিল হিসাবে পেশ করেন- হযরত ইবেন উমর রাযি. এর হাদীস—

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوْعِ

'রাসূলুল্লাহ্ সা. রুকূতে যেতে এবং রুকূ থেকে উঠতে হাত উঠাতেন।'

আমাদের দলিল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস- যে রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন, সাতটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও হাত উঠাতে নেই।

১। তাকবীরে তাহরীমার সময়, ২। কুনূতের তাকবীরে ৩। ঈদাইনের তাকবীরসমূহে ৪ ।আরাফাতের তাকবীরসমূহে ৫। উভয় জামারাহ এর তাকবীরসমূহে ৬। সাফা ও মারওয়ার তাকবীর সমূহে ৭। হজরে আসওয়াদে চুম্বনের সময়। উক্ত সাত স্থানে যেহেতু রুকূতে যেতে বা রুকু থেকে উঠতে হাত উঠানোর কথা বর্ণিত নেই বিধায় আমরা বলব রুকূতে যেতে উঠতে হাত উঠানো সুন্নাত নয়। দ্বিতীয়ত একবার হযরত ইবনে যুবায়ের রাযি. জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন মসজিদে হারামে নামায আদায় করছে। সে রুকূতে যেতে ও উঠতে হাত উঠাচ্ছে লোকটি নামায শেষ করলে পরে হযরত ইবনে যুবায়ের তাকে বললেন—

لَاتَفْعَلْ فَاِنَّ هٰذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَهُ

ইহা করো না, কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. প্রথমে ইহা করেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে তা বাদ দিয়েছেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিলের জবাব হল, ইহা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়। এছাড়াও ইবনে উমর রাযি. এর হাদীসখানা এ কারণে ও বাদ পড়ে যায় যে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মুজাহিদ রহ. বলেন—

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ فَلَمْ أَرَهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا لِافْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

'আমি দু' বছর ইবনে উমর রাযি. এর পিছনে নামায পড়েছি। কিন্তু আমি তাকে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর কোথাও হাত উঠাতে দেখিনি। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযের আর কোন স্থানে হাত উঠানো যাবে না।

قوله : تَشَهَّدَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ الخ : প্রথম বৈঠকে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব। এবার তাশাহুদের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। যেমন হযরত আলী রাযি. এর তাশাহুদ, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর তাশাহুদ। এছাড়াও আর অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকে বিভিন্ন ধরণের তাশাহুদ বর্ণিত রয়েছে। তবে উলামায়ে আহনাফ রহ.গণ হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর তাশাহুদকে গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর তাশাহুদকে গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর তাশাহুদটি হল—

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

আর ইবনে আব্বাস রাযি. এর তাশাহুদ—

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ -

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর তাশাহুদ গ্রহণ করার কারণ- (১) ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. আমাকে হাতে ধরে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন- قُلِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الخ উক্ত হাদীসে قل যা امر এর সীগাহ যার সর্বনিম্ন পর্যায় হলো ইসতিহবাব হওয়া। ২। এতে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ বাক্যে الف لام বর্ণদ্বয় استغراق এর জন্য যা ব্যাপকতা চায়। ৩। রাসূলুল্লাহ্ সা. ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাত ধরা এবং سوره এর ন্যায় শিক্ষা দেয়া যা অধিক গুরুত্ব বুঝায়।

উল্লেখিত কারণ ছাড়া ফিক্বহের বড় বড় কিতাবে আরও অনেক কারণের বর্ণনা রয়েছে। যা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ইবনে মাসউদ রাযি. এর তাশাহুদ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

قوله : وَفِيمَا بَعْدَ الْأَوَّلَيَيْنِ الخ : জোহর, আছর, ইশা এর শেষ দু রাকাতে আর মাগরিব এর শেষের এক রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলানো হবে না। অর্থাৎ শুধু সূরায়ে ফাতেহা পড়বে। দলিল হলো হযরত কাতাদাহ রাযি. এর হাদীস—

أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَتَيْنِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ -

রাসূলুল্লাহ্ সা. জোহর ও আসরের প্রথম দু রাকাতে সূরায়ে ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তেন। আর শেষ দু রাকাতে সূরায়ে ফাতিহা পড়তেন।

قوله : تَشَهَّدَ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ الخ : শেষ বৈঠকে তিনটি বিষয় : ১। তাশাহুদ পাঠ করা, ২। দরূদ শরীফ পাঠ করা ৩। দোয়া। সুতরাং তাশাহুদ পাঠ করা আমদের মাযহাব মতে ওয়াজিব। আর দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে তাশাহুদ ও দরূদ উভয়টি পাঠ করা ফরয।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীল হলো হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীস—

أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ التَّشَهُّدُ السَّلَامُ عَلَى اللهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَ مِيكَائِيلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الخ

উক্ত হাদীসের বিভিন্ন দিক থেকে ইমাম শাফেয়ী রহ. তাশাহুদের ফরজিয়াত প্রমাণিত করেছেন। যেমন উক্ত হাদীসে এসেছে قولوا যা امر এর সীগাহ যা وجوب কে কামনা করে। উক্ত হাদীসের শুরুতে রয়েছে ان يفترض অর্থাৎ তাশাহুদদের ক্ষেত্রে فرض শব্দ ধার্য করা হয়েছে।

আমরা তার সবকটি পদ্ধতির জবাব এভাবে দিতে পারি যে, উল্লেখিত স্থানে امر এর صيغه ব্যবহার হয়েছে যা تلقين ও تعليم এর জন্য এসেছে। এবং فرض শব্দটিকে আর অভিধানিক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় ফরজ প্রমাণিত হবে না।

ইমাম শাফেয়ী রহ. দরূদ শরীফের ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ الخ উক্ত আয়াতে صلوا শব্দটি امر এর صيغه এসেছে যা ওয়াজিব প্রমাণিত করে। আর নামাজের বাইরে দরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব নয় বিধায় নামাজের ভিতরেই দুরূদ শরীফ ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর এ উক্তিটি আমরা গ্রহন করি না। কেননা, ইমাম কারখী রহ. বলেন, জীবনে কমপক্ষে একবার দরূদ পড়া ওয়াজিব। কেননা, صلوا তা امر এর সীগাহ যা বারবারকে কামনা করে না। ইমাম তাহাবী রহ. এর মতে যখনই হুজুর সা. এর আলোচনা হবে তখনই একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব।

قوله : وَ دَعَا بِمَا يُشْبِهُ الخ : শেষ বৈঠকের তৃতীয় কাজ হলো দোয়া। তবে তা দোয়া আরবীতে হতে হবে। কারণ নামাযের ভেতর আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দোয়া করা মাকরূহে তাহরীমী। আর এদোয়া কুরআনের আয়াতের বা হাদীসের শব্দাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

قوله : وَيُسَلِّمُ مَعَ الْإِمَامِ الخ : সব শেষে নামায শেষ করবে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে আর সালাম ফিরানোর ক্ষেত্রে প্রথমে ডান দিকে পরে বাম দিকে ফিরাবে। সালাম এর বাক্য হলো- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ জমহুর উলামায়ে কেরাম, কিবারে সাহাবাদের এটাই মাযহাব। পক্ষান্তরে হযরত ইমাম মালিক রহ. এর মতে সামনের দিকে শুধু একবার সালাম বলা হবে।

আমাদের দলীল হলো : হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীস—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ -

'নবী করীম সা. ডান দিকে সালাম ফিরাতেন এমনকি তার ডান গালের শুভ্রতা দেখা যেত এবং বাম দিকে ফিরাতেন এমনকি তার বাম গালের শুভ্রতা দেখা যেত। সুতরাং সালাম ফিরাতে উভয় দিকে মুখ ফিরানো হবে।

وَجَهَرَ بِقِرَاءَةِ الْفَجْرِ وَأُولَى الْعِشَاءَيْنِ وَلَوْ قَضَاءً وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَيُسِرُّ فِي غَيْرِهَا كَمُتَنَفِّلٍ بِالنَّهَارِ وَخُيِّرَ الْمُنْفَرِدُ فِيمَا يُجْهَرُ كَمُتَنَفِّلٍ بِاللَّيْلِ وَلَوْ تَرَكَ السُّورَةَ فِي أُولَيَيِ الْعِشَاءِ قَرَأَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَا وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ وَسُنَّتُهَا فِي السَّفَرِ الْفَاتِحَةُ وَأَيُّ سُورَةٍ شَاءَ وَفِي الْحَضَرِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ لَوْ فَجْرًا أَوْ ظُهْرًا وَأَوْسَاطُهُ لَوْ عَصْرًا أَوْ عِشَاءً وَقِصَارُهُ لَوْ مَغْرِبًا وَيُطَالُ أُولَى الْفَجْرِ فَقَطْ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ لِصَلَاةٍ وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ بَلْ يَسْمَعُ وَيُنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ أَوْ خَطَبَ أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّائِي كَالْقَرِيبِ -

---

অনুবাদ : ফজরের (নামাজের) কেরাত, মাগরিব ও ইশার প্রথম দু রাকাতের কেরাত যদিও তা ক্বাযা হয় এবং জুমুআর (নামাজের) কেরাত ও উভয় ঈদের (নামাজের) কেরাত উচ্চস্বরে পড়বে। তাছাড়া অন্যান্য নামাজ দিনের নফল নামাজের ন্যায় অনুচ্চ কিরাতে পড়বে। জেহরী নামাজ মুনফারিদের (তথা একা নামাজ আদায়কারী) ইচ্ছাস্বাধীন রাতের নফল নামাজের ন্যায়। (অর্থাৎ যেভাবে রাতে নফল আদায়কারীর কেরাত উচ্চস্বরে বা অনুচ্চস্বরে পড়ার ইখতিয়ার রয়েছে তদ্রূপ একা নামাজ আদায়কারীর বেলায়ও উচ্চস্বরে কেরাত পড়ার স্থানে ইচ্ছাস্বাধীন চাইলে উচ্চস্বরে পড়বে নতুবা অনুচ্চস্বরে। যদি ইশার নামাজের প্রথম দু রাকাতে কিরাত ছেড়ে দেয় তবে দ্বিতীয় দু রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার সাথে উচ্চস্বরে পড়ে নেবে। আর যদি সূরায়ে ফাতিহা ছেড়ে দেয় তবে দ্বিতীয় দু রাকাতে তার কাযা করবে না। আর ফরজ কিরাত হলো এক আয়াত। সফরের ক্ষেত্রে মাসনূন কেরাআত সূরায়ে ফাতিহার সাথে অন্য যে কোন সূরা ইচছা করে তা পড়বে। আর মুকীম অবস্থায় যদি ফজর বা জুহর হয় তবে طوال مفصل (ত্বাওয়ালে মুফাচ্ছাল) আর আছর বা ইশা হলে أوساط مفصل (আওসাতে মুফাচ্ছাল) আর মাগরীব হলে قصار مفصل (কিসারে মুফাচ্ছাল)। আর ফজরের শুধু প্রথম রাকাতে লম্বা করা হবে (দ্বিতীয় রাকাত থেকে)। আর কুরআনের কোন সূরা কোন নামাজের জন্য নির্দিষ্ট নয়। মুক্তাদী কিরাত পড়বে না বরং শুনতে থাকবে এবং নিরব থাকবে, যদিও ইমাম আশা ও ভয়ের আয়াত তেলাওয়াত করেন। অথবা (খুতবা পাঠকারী) খুতবা দেন কিংবা নবী করীম সা. এর উপর দুরূদ প্রেরণ করে। দূরবর্তী নিকটবর্তীর ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ جَهَرَ بِقِرَاءَةِ الْفَجْرِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. বলেন, নামাজি ব্যক্তি যদি ইমাম হয় তবে ফজরের প্রথম দু রাকাতে মাগরীবের প্রথম দু রাকাতে ইশার প্রথম দু রাকাতে কিরাত উচ্চস্বরে পড়বে। যদিও তা ক্বাজা হিসাবে হয়। তাছাড়া জুমুআ ও ঈদাইন এর উভয় রাকাতে উচ্চস্বরে পড়বে। উহাই রাসূলুল্লাহ্ সা. থেকে এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য যে, জোরের নামাজে জোরে আর আস্তের নামাজে আস্তে পড়া ওয়াজিব। কেননা, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত—

اَنَّهُ قَالَ فِي كُلِّ صَلٰوةٍ يَقْرَأُ فِيْمَا اَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفٰى عَلَيْنَا اَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ -

তিনি বলেন, প্রত্যেক রাকাতে কুরআন পড়া হত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সা. যেখানে আমাদের শুনিয়েছেন

আমরাও তোমাদেরকে শুনিয়েছি আর যেখানে গোপন করেছেন আমরাও তোমাদের থেকে গোপন করেছি।

সুতরাং বুঝা গেল জেহরী নামাজে জেহরী আর সিররী নামাজে সিররীভাবে কেরাত পড়া হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

যুক্তির নিরিখে প্রমাণ হল : নামাজে কেরাত একটি রুকন অন্যান্য রুকনের ন্যায়। আর অন্যান্য রুকন যেভাবে স্পষ্ট করে উচ্চঃস্বরে বলা হয় অনুরূপ কিরাতও উচ্চস্বরে পড়া প্রয়োজন। তাই তো ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ্ সা. প্রতি নামাজের কেরাতেই ইযহার তথা স্পষ্ট করে উচ্চস্বরে পড়তেন। এদিকে কাফেররা তার তেলাওয়াত শুনে তাকে কষ্ট দিতে শুরু করে বিধায় রাসূলুল্লাহ্ সা. এর জন্য কেরাত উচ্চস্বরে পড়া কষ্টকর হয়ে দাড়াল। অতঃপর মহান প্রভু আয়াত অবতীর্ণ করলেন—

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

'আপনি সকল নামাজে জেহের করবেন না এবং ইখফাও করবেন না।' অর্থাৎ, কিছু নামাজের কেরাত উচ্চস্বরে আর কিছু নামাজের কেরাত অনুচ্চস্বরে পড়বেন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সা. দিনের নামাজে ইখফা আর রাতের নামাজে ইযহার অবলম্বন করতে লাগলেন। কেননা, দিনে কাফেরের কষ্ট পৌছানোর আশংকা প্রবল ছিল। আর মাগরিবে যেহেতু তারা খাবার খাওয়াতে আর ইশা ও ফজরে নিদ্রায় থাকার দরুন কষ্ট পৌছানোর আশংকা ছিল না বিধায় হুজুর সা. রাতের নামাজে ইযহার করতেন আর জুমা ও ঈদের নামাজ যেহেতু মদীনাতে প্রবর্তিত হয়। আর মদীনাতে কাফেরের পক্ষ থেকে কষ্ট পৌছানোর আশংকা ছিল না বিধায় এ দু নামাজেও ইযহার তথা কিরাত স্পষ্ট হবে। আর মুনফারিদ তথা একা একা নামায আদায়কারীর জন্য ইচ্ছা স্বাধীন রয়েছে যদি সে চায় তবে জেহরী নামাজে জেহের করতে পারবে। যাতে তার নামাজ জামাতের অনুরূপ হয়। কারণ, সে একা থাকার দরুন অন্যকে শুনানোর প্রয়োজন নেই। শুধু সে নিজে শুনলেই যথেষ্ট হবে। আর আল্লাহ তো আস্তে জোরে এমনকি মনের ভেতর কার গোপন কথাও শুনেন। গ্রন্থকার রহ. তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন রাতের নফল আদায় করার সাথে। অর্থাৎ রাতে চাইলে উচ্চস্বরে পড়তে পারবে আবার চাইলে আস্তেও পড়তে পারবে। উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হল যে, জোহর, আছর নামাজের কিরাত ইখফা তথা অনুচ্চস্বরে হবে। সুতরাং জামাত অবস্থায় যেহেতু ইখফা করা ওয়াজিব তাই মুনফারিদ অবস্থায়ও ইখফা ওয়াজিব। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— صَلٰوةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ দিনের নামাজে এমন কেরাত যা শুনা যায় না। গ্রন্থকার রহ. দিনের নামাজ তথা জোহর ও আসর নামাজের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন দিনের নফল নামাজের সাথে। কেননা, দিনের নফল নামাযে উচ্চঃস্বরে কিরাত পড়তে নাই।

قوله : وَلَوْ تَرَكَ السُّوْرَةَ الخ : যদি কেহ ইশার নামাজের প্রথম দুরাকাতে সূরায়ে ফাতিহা পড়ে কিন্তু সূরা মিলায়নি তবে তরফাইন রহ. এর মতে শেষ দুরাকাতে সূরায়ে ফাতিহার সাথে কিরাত মিলাবে এবং উভয়টি উচ্চস্বরে পড়বে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব হবে না। তার দলিল হল- সূরায়ে ফাতিহা ও তার সাথে অন্য কোন কিরাত মিলানো উভয়টিই ওয়াজিব। আর ওয়াজিব তরক করলে তার ক্বাজা ওয়াজিব হয় না, বরং শেষে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। সুতরাং এগুলোর ক্বাজা করার কোন প্রয়োজন নেই। তরফাইন রহ. এর দলিল হল, শরীয়তে সূরায়ে ফাতিহাকে এভাবে প্রবর্তন করেছে যে, তার সাথে অবশ্যই কোন সূরা মিলানো হবে। তাই যেহেতু প্রথম দুরাকাতে সূরায়ে ফাতিহা পড়ল কিন্তু অন্য কোন সূরা পড়ল না তখন শেষ দুরাকাতে সূরা পড়বে। কেননা, এসুরতে শরীয়ত প্রবর্তীত পদ্ধতি অনুযায়ী কাজা করা সম্ভব। কারণ, শরীয়ত বলে সূরায়ে ফাতিহার পরে সূরা মিলানো যা এখানেও পাওয়া গেল। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর দলিলের জবাব শেষ দু রাকাতে কেরাত প্রবর্তিত হয় নি, একথা গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা

ফখরুল ইসলাম শরহে জামে সগীর এর মধ্যে লিখেন যে, শেষ দুরাকাতে কিরাত পড়া মুস্তাহাব। তাই তো যদি কেহ ভুলক্রমে শেষ দুরাকাতেও কেরাত পড়ে নেয় তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না।

قوله : وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ الخ : এবার যদি কেহ প্রথম দুরাকাতে সূরায়ে ফাতিহা ছেড়ে দেয় তবে তার কাজা শেষ দুরাকাতে করতে পারবে না। কারণ, যদি শেষ দুরাকাতে সূরায়ে ফাতিহা পড়ে তবে তা অন্য সূরার পরে পড়তে হবে। আর তা খেলাফে শরাহ তথা নির্ধারিত অবস্থানের বিপরীত। কেননা, শরীয়ত প্রথমে সূরায়ে ফাতিহা তারপর অন্য সূরা প্রবর্তন করেছে। আর এখানে হচ্ছে তার বিপরীত। তাই তো এ পদ্ধতিতে সূরায়ে ফাতেহা পড়ার অনুমতি দেয়া হয় নি।

قوله : وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ اٰيَةٌ الخ : ইকামত অবস্থায় বা সফর অবস্থায় কেরাতের সর্বনিম্ন পরিমাণ তথা কতটুকু কেরাত পড়া দ্বারা ফরয আদায় হয় এ নিয়ে উলামায়ে কেরামগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এক আয়াত। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে ছোট তিন আয়াত অথবা দীর্ঘ এক আয়াত। কেননা, এর চেয়ে কম পাঠকারীকে পরিভাষাগতভাবে ক্বারী বলা হয় না। সুতরাং তা এক আয়াতের কম পাঠ করার সমতুল্য হয়ে গেল। আর এক আয়াতের কম পাঠ করার দ্বারা নামায জায়েয হয় না। তাই ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াতের কম পরিমাণ পাঠ করা যথেষ্ঠ হবে না। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল আল্লাহর বাণী فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ কুরআনের যতটুকু পরিমাণ সহজ তা তোমরা পড়। উক্ত আয়াতখানা মুতলাক। তাই এখানে এক আয়াত বা তার চেয়ে বেশি বা কম হওয়ার শর্তযুক্ত করা হয় নাই। সুতরাং আয়াত যেমনি মুতলাক তার হুকুমও মুতলাক হবে। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, উক্ত আয়াতে তাফসীল দেয়া হয়নি যার দরুন বুঝা যায় যে, এক আয়াত হউক বা তার চেয়ে কম হউক সর্ব অবস্থায় নামায জায়েয হওয়া অথচ مادون الاية তথা এক আয়াতের কমে নামাজ সহীহ হয় না। তার উত্তরে বলা যায় যে, উক্ত আয়াতের ইতলাকের মধ্যে مادون الاية প্রবিষ্ট নয়। কারণ, মুতলাক যখন বলা হয় তখন তা দ্বারা فرد كامل উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর কোরআনের فردكامل হল যা হাকীকাতান ও হুকমান কুরআন। সুতরাং مادون الاية যদি হাকীকাতান কুরআন তথাপি হুকমান কুরআনের অন্তর্ভূক্ত নয়। যার দরুন জুনুবী ব্যক্তি مادون الاية পাঠ করা জায়েয আছ। সুতরাং প্রতিয়মান হল আলোচ্য আয়াতের من القرآن এর অন্তর্ভুক্ত এক আয়াত। সুতরাং নামাজে এক আয়াত পড়াই ফরয।

قوله : وَسُنَّتُهَا فِى السَّفَرِ الخ : সফর অবস্থায় সকল ওয়াক্তের মাসনূন কেরাত হল সূরায়ে ফাতিহা এবং তার সাথে যে কোন একটি সূরা। তা ছোট হউক বা বড়। কেননা, হযরত উকবা ইবনে আমীর রাযি. থেকে বর্ণিত যে. রাসূল সা. সফর অবস্থায় ফজরের নামাজে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়েছেন। আকলী দলিল হল, সফর অবস্থায় মূল নামাজের অর্ধেক রহিত করার দ্বারা নামাজে তাখফিফ করেছেন। সুতরাং নামাজের صفت তথা কিরাতেও অবশ্যই তাখফিফ হবে।

قوله : وَفِى الْحَضَرِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ الخ : মুকীম অবস্থায় ফজরের উভয় রাকাতে মাসনুন কিরাত হল طوال مفصل অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা ছাড়া চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ আয়াত পড়া। অন্য এক রিওয়ায়েতে চল্লিশ থেকে ষাট আয়াতেরও উল্লেখ আছে। অন্য এক রিওয়ায়েতে ষাট থেকে একশত আয়াতের কথাও উল্লেখ আছে। যোহরের নামাজেও অনুরূপ, তথা طوال مفصل পড়বে। কেননা, সময় হিসাবে উভয় নামাজের সময়ে প্রশস্ততা রয়েছে আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সা. যোহরের নামাজে الم السجدة পড়তেন। আর আসর ও ইশার নামাজে মাসনূন কেরাত হল أوساط مفصل (আউসাতে মুফাসসাল) পড়া। কেননা, সময় হিসাবে উভয় নামাজের ওয়াক্তের প্রশস্ততা একই। দলিল হল, হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সা. আসরের প্রথম রাকাতে وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ এবং وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ পড়তেন। আর মাগরিবের নামাজে মাসনূন

কেরাত হল قصار مفصل (কিসারে মুফাসসল) পড়া। কারণ, মাগরিবের নামাজের ভিত্তি হল দ্রুততার উপর আর দ্রুততার উপযোগী হল হালকা কিরাত। তাই তো রাসূলুল্লাহ্ সা. মাগরিবের নামাজে মুআওওয়াজাতাইন পড়তেন। উল্লেখিত মাসনূন কেরাত সমূহের ক্ষেত্রে দলিল হল হযরত উমর ফারুক রাযি.এর ঐ ফরমান যা তিনি আবু মুছা আশআরী রাযি. এর নামে প্রেরণ করেছিলেন। তা হল—

اَنِ اقْرَأْ فِى الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَ فِىْ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ وَفِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ -

তুমি ফজর ও জোহরে তেওয়ালে মুফাসসাল পড়বে। আসর ও ইশাতে আওসাতে মুফাসসাল পড়বে এবং মাগরিবের নামাজে কিসারে মুফাসসাল পড়বে।

قوله : وَلَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ الخ : কোন নামাজের ক্ষেত্রে কোন কেরাতকে নির্দিষ্ট করে নেয়া অর্থাৎ এমনভাবে মনে করা যে এ সূরা না পড়লে নামায হবে না, তবে তা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ উক্ত আয়াতটি মুতলাক। আর মুতলাকের চাহিদা হল কোন সূরাকে কোন নামাজের জন্য নির্দিষ্ট না করা।

قوله : وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ بَلْ يَسْمَعُ الخ : ইমামের পিছনে মুক্তাদী কোন কেরাত পড়বে না। সূরায়ে ফাতিহাও নয় এবং অন্য কোন সূরাও নয়। উক্ত নামায জেহরী হউক বা সিররী হউক, ইহা হল আমাদের মাযহাব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ: থেকে এব্যাপারে দুটি মতামত রয়েছে। ১। মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব। ২। তার قول قديم তো হল মুক্তাদির উপর সিররী নামাজ ও যেসকল রাকাতে কেরাত নেই অর্থাৎ জেহরী কিরাত নেই সেগুলোতে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। ইহা ইমাম মালিক রহ. এর মতামত। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর قول جديد হল মুক্তাদীর উপর প্রত্যেক নামাজে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নামাজ জেহরী হউক বা সিররী।

তিনি দলিল পেশ করেন : হযরত আবু উবাদা রাযি. এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা।

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاْءَةُ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ اِنِّىْ لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُوْنَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ قُلْنَا اَجَلْ قَالَ لَاتَفْعَلُوْ ذٰلِكَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَاِنَّهٗ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَايَقْرَأُهَا -

'রাসূলুল্লাহ্ সা. আমদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়লেন, কিন্তু কিরাত পড়তে তার কষ্ট হচ্ছিল। যখন সালাম ফিরালেন, বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে দেখলাম তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে পড়তেছ। আমরা বললাম, হা। তিনি বললেন, এরকম করো না, তবে ফাতিহা, (অর্থাৎ ফাতিহা পড়িও) কেননা, ফাতেহা ছাড়া নামায হয় না। দ্বিতীয় দলিল হল : কেরাত হল রুকন অন্যান্য রুকুনের ন্যায় সুতরাং যেভাবে অন্যান্য রুকনে ইমাম মুক্তাদী সবাই বরাবর, তদ্রূপ কেরাতেও ইমামের সাথে বরাবর থাকবে। তাই ইমামের সাথে মুক্তাদী কেরাত পড়বে।

আমাদের দলীল : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

اِذَا قُرِأَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا -

যখন কুরআন পাঠ করা হয় তোমরা মনোযোগ সহকারে শোন এবং চুপ থাক। উক্ত আয়াতখানা নামাজের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। কেননা, হযরত ইবিনে আববাস রাযি. থেকে বর্ণিত—'রাসূলুল্লাহ্ সা. এর সাহাবীগণ তার পিছনে কিরাত পড়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. এর কিরাত খলত-মলত হয়ে যায়। তখন উল্লেখিত

আয়াত নাযিল হয়। সুতরাং উক্ত আয়াত থেকে প্রতিয়মান হল- জেহরী নামাজে استماع হবে আর সিররী নামাজে انصت হবে। দ্বিতীয় দলীল- রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন—

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইমামের কিরাত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। এবার যদি মুক্তাদী দ্বিতীয়বার কিরাত পড়া শুরু করে দেয় তবে তাকরার আবশ্যক হয়।

তৃতীয় দলীল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. সূত্রে বর্ণিত—

أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قُرِئَ فَانْصِتُوْا -

রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন, (নামাজে) ইমাম নিযুক্ত করা হয় যে, তার ইকতিদা করা হবে। যখন সে তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বলো। আর যখন কিরাত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাকবে। উক্ত হাদীসে অন্যান্য আরকানে ইমামের অনুসরণের কথা ব্যক্ত হলেও কিরাতের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে মুক্তাদী চুপ থাকবে।

আমাদের যুক্তি নির্ভর দলিল হল : যদি কাহাকেও একটি প্রতিনিধি দলের প্রধান বানিয়ে কোন মহান ব্যক্তির সামনে পেশ করা হয় তখন সকল একসাথে কথা বলা পছন্দনীয় নয় তদ্রূপ আল্লাহর সামনে সবাই একত্র হয়ে একসাথে কথা বলা পছন্দনীয় নয় তাই আল্লাহর সামনে সবাই একত্র হয়ে একজনকে নেতা বানিয়ে তথা ইমাম নিযুক্ত করে রাখা হলে সেই শুধু আল্লাহর সাথে কথা বলবে আর মুক্তাদীরা চুপ থাকবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর পেশকৃত দলীলের জবাব : হাদীসে উবাদা রাযি. এর ব্যাপারে বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, ইহা ضعيف ও معلول سند এবং متنامضطرب রয়েছে। সুতরাং তা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যায় না। والله اعلم

بَابُ الْإِمَامَةِ

পরিচ্ছেদ : ইমামতের বিবরণ

اَلْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُوَكَّدَةٌ وَالْأَعْلَمُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ ثُمَّ الْأَقْرَاءُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَسَنُّ -

অনুবাদ : জামাআত সুন্নাতে মওয়াক্কাদাহ। অধিক বিজ্ঞ ব্যক্তি ইমামতের সর্বাধিক যোগ্য। অতঃপর সর্বোত্তম তিলাওয়াতকারী। অতঃপর অধিক পরহেজগার ব্যক্তি, অতঃপর যিনি বয়োজেষ্ঠ, তিনিই ইমামতের সর্বাধিক যোগ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الْإِمَامَةِ হযরত গ্রন্থকার রহ. এতক্ষণ ইমাম ও মুক্তাদির কাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদ থেকে مشروعيت امامة এর صفت তথা গুন এর আলোচনায় মনোনিবেশ করেছেন। গ্রন্থকার রহ. এ অনুচ্ছেদে প্রথমে مستحق امامت অতঃপর خواص امامت এর আলোচনা করেছেন।

قوله : وَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ الخ : নামাজে জামাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। হুজুর সা. ইরশাদ ফরমান—

وَالْجَمَاعَةُ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى لَايَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا الْمُنَافِقُ -

'জামাত সুন্নাতে হুদা' এ থেকে মুননাফিক ছাড়া কেহ পিছিয়ে থাকে না'।

সুন্নাত দুই প্রকার : (১) সুন্নাতে হুদা, (২) সুন্নাতে যায়েদা।

সুন্নাতে হুদা হল যা রাসূল সা. ইবাদত হিসাবে নিয়মিত করেছেন। আবার কাদাচিৎ ছেড়ে দিয়েছেন, সুন্নাতে যায়েদা হল যা রাসূল সা. অভ্যাস হিসাবে করেছেন। তা তরক করলে কোন অসুবিধা নেই। জামাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ হওয়ার সমর্থন শুধু উপরোক্ত হাদীসটি নয় বরং ঐ সকল হাদীস যেগুলোতে জামাতের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন হুজুর সা. ইরশাদ করেন—

صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ اَحَدِكُمْ وَحْدَهٗ بِخَمْسَةٍ وَّ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً -

জামাতে নামাজ পড়া তোমাদের একাকী নামাজ পড়ার তুলনায় পচিশগুণ বেশী ফজিলত রয়েছে। সুতরাং জামাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, যা গ্রন্থকার রহ. এখতিয়ার করেছেন। আর সাধারণ মাশায়িখে আহনাফদের মতে জামাত ওয়াজিব। কেননা, তার সুবুত সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। এজন্য এ ওয়াজিবকে সুন্নাত বলা হয়। ইমাম আহমদ রহ. এর মতে জামাত ফরজে আইন। তবে নামাজ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে জামাত ফরজে কেফায়া।

قوله : وَالْاَعْلَمُ اَحَقُّ الخ : জামাতের ইমামতির জন্য সর্বাধিক অগ্রগণ্য ঐ ব্যক্তি যে সুন্নাতের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী, সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল শরয়ী আহকাম যা নামাজের সাথে সম্পৃক্ত। তবে শর্ত হল- مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ পরিমাণ কিরাতে পারদর্শী হতে হবে। ইহা জমহুর উলামায়ে কেরামগণের অভিমত। তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর এক রিওয়ায়েত হল, ইমামতের অধিক যোগ্য ঐ ব্যক্তি যিনি কুরআন পাঠে সর্বোত্তম। তবে শর্ত হল প্রয়োজনীয় ইলিম থাকা আবশ্যক। তিনি দলিল দেন যে, কিরাত নামাযের এমন একটি রুকন যা ছাড়ার কোন উপায় নেই। আমাদের পক্ষ থেকে জবাব : কিরাতের প্রয়োজন শুধু একটি রুকুনের ক্ষেত্রে আর ইলমের প্রয়োজন সকল রুকুনের ক্ষেত্রে। বিধায় বুঝা গেল ইলমের প্রয়োজন কিরাতের তুলনায় বেশী। এ কারণে اَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ কে اقرأ এর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

قوله : ثُمَّ الْاَقْرَأُ الخ : ইলমের দিক দিয়ে যদি উপস্থিত সবাই সমান হয় তবে তাদের মধ্যে কিরাআতের জ্ঞান যার সর্বোত্তম। তিনি ইমামতের জন্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবেন। হুজুর সা. বলেন—

يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَاِنْ كَانُوْا سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ

'আল্লাহ পাকের কিতাব পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তি কাওমের ইমামতি করবে। যদি এতে সকল সমান সমান হয় তবে সুন্নাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তি (ইমাম হবে।)' এদিকে সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে যিনি কারী হতেন তিনি عالم بالسنة তথা সুন্নাতের জ্ঞানী ও হতেন এজন্য তারা সবাই ইলমে বরাবর হতেন। তাই হাদীসে ক্বারীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু আজকাল সচরাচর অধিকাংশ ক্বারী বিশুদ্ধ কিরাতে বিজ্ঞ। অথচ ইলমে দ্বীনে অজ্ঞ তাই বর্তমান যামানায় সুন্নাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া হবে ক্বারীর উপর।

قوله : ثُمَّ الْوَرَعُ الخ : যদি উপস্থিত সবাই ইলম ও কিরাতের ব্যাপারে সমান সমান হয়ে থাকে তবে যিনি অধিক পরহেজগার, তিনি ইমামতের বেশী যোগ্য। কেননা হুজুর সা. বলেছেন—

مَنْ صَلّٰى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ فَكَاَنَّمَا صَلّٰى خَلْفَ نَبِيٍّ

'যে ব্যক্তি একজন পরহেজগার আলিমের পিছনে নামায আদায় করল, সে যেন একজন নবীর পেছনে নামায আদায় করল।'

قوله : ثُمَّ الْاَسَنُّ الخ : উপস্থিত সবাই যদি ইলম, কিরাত ও পরহেজগারীতে সমান হন তবে তাদের মধ্যে যিনি অধিকতর বয়োজেষ্ঠ তিনিই ইমামতের সর্বাধিক যোগ্য হিসাব বিবেচিত হবেন। কেননা, হুজুর সা. অন্য

মুলাইকার পুত্রদ্বয়কে বলেছিলেন- وَلِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا سِنًّا 'তোমাদের মধ্যে যে বয়োজেষ্ঠ সেই যেন ইমামতি করে। দ্বিতীয় দলীল : বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করা হলে জামাতে মানুষের সমাগম অধিক হয়। অপর দিকে হাদীসে এসেছে- مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا যে বড়দেরকে সম্মান দেখায় না সে আমাদের মধ্য থেকে নয়। তাই বয়সে বড় ব্যক্তিকে ইমাম বানানোর মাধ্যমে সম্মান করা হল।

وَكُرِهَ إِمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَالْأَعْمَى وَوَلَدِ الزِّنَا وَتَطْوِيلُ الصَّلَاةِ وَجَمَاعَةُ النِّسَاءِ فَإِنْ فَعَلْنَ يَقِفُ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَّ كَالْعُرَاةِ وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَن يَمِينِهِ وَالاثْنَانِ خَلْفَهُ -

অনুবাদ ঃ গোলাম, বেদুইন (গ্রাম্য ব্যক্তি), ফাসিক, বেদআতী, অন্ধ এবং জারজ সন্তানের ইমামতি মাকরূহ। নামাজকে লম্বা করা ও মহিলাদের ইমামতি মাকরূহ। যদি মহিলারা জামাত করে নেয় তবে উলঙ্গদের ন্যায় ইমাম তাদের মাঝে দাড়াবে। আর মুক্তাদী একজন হলে ইমামের ডানে দাঁড়াবে, আর দুজন হলে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে।

শব্দার্থ : اَلْاَعْرَابِيُّ (ج) اَلْاَعْرَابُ গ্রাম্য, বেদুইন। اَلْمُبْتَدِعُ নতুনত্বকারী, আবিস্কারক, ইসলাম ধর্মে নতুন কিছু আবিস্কারক। اَلْعُرَاةُ - উলঙ্গ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَكُرِهَ اِمَامَةُ الخ : গোলামের ইমামতি মাকরূহ। যদিও সে আযাদ কৃত গোলাম হয় না কেন। অর্থাৎ যদি প্রকৃত স্বাধিন ব্যক্তি ও গোলাম অথবা আযাদকৃত গোলাম একত্র হয় তবে এমতাবস্থায় গোলাম অথবা আযাদকৃত গোলামের ইমামতি করা মাকরূহে তানযীহী। **দলিল হল** : ব্যক্তি গোলাম থাকার দরুন শরীয়াতের বিধি-বিধান পুরুপুরিভাবে শিখার অবকাশ পায় নাই। দ্বিতীয়তঃ গোলামকে সামনে বাড়ানোর মাধ্যমে জামাতে লোক সমাগম কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, মানুষ তার অনুসরণ করার ক্ষেত্রে অনিহা ভাব থাকে। তেমনি বেদুইন তথা গ্রাম্য ব্যক্তির ইমামতি করা মাকরূহ। কারণ, তাদের মাঝে মুর্খতা প্রবল হয়ে থাকে। তাছাড়া রাসূল সা. ইরশাদ করেন— اَلَا لَايَؤُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا اَعْرَابِيٌّ - সাবধান কোন মহিলা যেন পুরুষের ইমামতি না করে, তেমনি কোন গ্রাম্য ব্যক্তিও যেন ইমামতি না করে।

ফাসিক ব্যক্তিও ইমামতি করা মাকরূহ। কেননা, সে দ্বীনি বিষয়ে যত্নবান নয়। ইমাম মালিক রহ. এর মতে ফাসিকের ইমামতি না জায়েয। কারণ যেহেতু সে দ্বীনী বিষয়ে খিয়ানতকারী হিসাবে চিহ্নিত হল বিধায় নামাজের ন্যায় মহান কাজের দায়িত্বশীল হওয়া তার জন্য জায়েয হবে না। আমাদের পক্ষ হতে এর জবাব হল যে, যেহেতু ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, হযরত ইবনে উমর রাযি., হযরত আনাস রাযি. প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামগণ رئيس الفساق তথা ফাসিকদের নেতা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পিছনে নামাজ পড়েছেন বলে পাওয়া যায়, যা দ্বারা বুঝা গেল যে, ফাসিকের ইমামতি জায়েয। কিন্তু যেহেতু তার মধ্যে ত্রুটি পাওয়া যায় বিধায় তার ইমামতি মাকরূহ।

বিদআতীর ইমামতি মাকরূহ। কেননা সে ইসলাম ধর্মে নিজ আবিস্কৃত বিষয়াদি সংযোগ করার কারণে সে খিয়ানতকারীর অন্তর্ভুক্ত বিধায় তার ইমামতি মাকরূহ। অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি মাকরূহ। কেননা, সে অন্ধ হওয়ার কারণে অপবিত্রতা থেকে পূর্ণরূপে বেচে থাকতে অক্ষম। তবে হা যদি উক্ত অন্ধ ব্যক্তি অন্য কোন মাধ্যমে

নাজাসত থেকে পূর্ণরূপে বেচে থাকতে সক্ষম হোন তবে তার ইমামতি মাকরূহ হবে না। তেমনি জারজ সন্তানের ইমামতিও মাকরূহ। কারণ তার যেহেতু পিতা নেই বিধায় তার শিক্ষা-দিক্ষা করার সুযোগ হয় নি। অপর দিকে যেহেতু জারজ সন্তান সমাজে হীন, বিধায় তার ইমামতির দ্বারা জামাতে লোকসমাগম অধিক হবে না।[১]

قوله : وَجَمَاعَةُ النِّسَاءِ الخ : মহিলাদের জন্য একাকী তথা পুরুষ ব্যতিত শুধু মহিলাগণ একাকী জামাত পড়া মাকরূহে তাহরীমী। হউক এ নামাজ নফল বা ফরয। কেননা, মহিলাদের জামাত নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। এজন্য তাদের জামাত করা মাকরূহে তাহরীমী। আর স্ত্রী লোকদের অবস্থা উলঙ্গদের অবস্থার ন্যায়। অর্থাৎ যেমনিভাবে উলঙ্গদের জামাত করে নামায পড়া মাকরূহ, তেমনি স্ত্রীলোকদের জামাত করে নামাজ পড়াও মাকরূহ। একান্ত যদি মহিলারা জামাত করে তবে ইমামকে মহিলাদের মাঝে দাড়াতে হবে।

قوله : وَيَقِفُ الوَاحِدُ الخ : যদি ইমাম একজন মুক্তাদি নিয়ে জামাত করে তবে ঐ মুক্তাদিকে তার ডানে দাঁড় করাবে। প্রমাণ হল : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর দীর্ঘ হাদীসটির এক পর্যায়ে রয়েছে—

وَوَقَفْتُ عَلَى يَسَارِهِ وَ اَخَذَ بِاُذُنِي وَ اَدَارَنِي خَلْفَهُ حَتَّى اَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ -

এবং আমি বাম দিকে দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি আমার কর্ণ ধরে পিছনের দিক থেকে ঘুরালেন এবং আমাকে তার ডান দিকে দাঁড় করালেন। সুতরাং বুঝা গেল মুক্তাদী একজন হলে ইমামের ডাক দিকে দাঁড়াবে। আর যদি এক মুক্তাদী ইমামের বাম দিকে দাঁড়িয়ে যায়, তবুও নামাজ হয়ে যাবে। কিন্তু তা সুন্নাতের বরখেলাফ।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, মুক্তাদী একজন হলে তার পায়ের আঙ্গুলীগুলোকে ইমামের পায়ের গোঁড়ালী বরাবর রাখবে। আর যদি মুক্তাদী দু'জন হন তবে ইমাম সাহেব তাদের সামনে দাঁড়াবেন। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, ইমাম সাহেব মাঝে দাঁড়াবেন। কারণ, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. আলকামা রাযি. এবং আসওয়াদ রাযি. এর মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের দলিল হল : স্বয়ং রাসূল সা. হযরত আনাস রাযি. এবং এতীম নামক ব্যক্তিদ্বয়ের নামাজ পড়িয়েছিলেন এবং তাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। সুতরাং হুজুর সা. এর সামনে দাঁড়ানো উত্তম হওয়ার দলিল আর ইবনে মাসউদ রাযি. এর উভয়ের মাঝে দাঁড়ানো মুবাহ এর দলিল।

وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخِنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ وَإِنْ حَاذَتْهُ مُشْتَهَاةٌ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ تَحْرِيمَةً وَأَدَاءً فِي مَكَانٍ مُتَّحِدٍ بِلَا حَائِلٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ إِنْ نَوَى إِمَامَتَهَا وَلَا يَحْضُرْنَ الْجَمَاعَاتِ -

অনুবাদ : প্রথমে পুরুষেরা, অতঃপর নাবালেগ বালকেরা, তারপর হিজড়া, অতঃপর মহিলারা কাতার করবে। যদি প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা পুরুষের পার্শ্বে এমন মুতলাক নামাজে যা তাহরীমা এবং আদায় হিসাবে এক তাতে কোন আঁড় ছাড়া একই স্থানে দাড়ায় তবে পুরুষের নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। যদিও ইমাম তার ইমামতির নিয়্যাত করে থাকেন। আর মহিলারা জামাতে উপস্থিত হবে না। (অর্থাৎ মহিলারা জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ। কেননা, তাতে ফিৎনার আশংকা বিদ্যমান।)

---

[১] উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের ইমামতি তখন মাকরূহ যখন তাদের মধ্যে মূর্খতা প্রাধান্য হয়ে থাকে। আর মানুষ তাদেরকে অপছন্দ করে। আর তাদের চেয়ে ভাল কেহ উপস্থিত থাকে। পক্ষান্তরে যদি তারা আলেম হয়ে থাকে আর মানুষ তাদেরকে পছন্দ করে তবে তাদের ইমামতি মাকরূহ হবে না। তবে হাঁ, ফাসিককে কোনক্রমে ইমাম বানানো উচিত নয়। একান্ত যদি তাকে ইমাম নিযুক্ত করা হয়, তবে তা জায়েয হবে। কেননা, হুজুর সা. ইরশাদ করেন- صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ তোমরা নেককার বদকার সকল ইমামের পিছনে নামাজ পড়।

শব্দার্থ : صَفًّا (ن) يَصُفُّ- সারিবদ্ধ করা। কাতারবন্দি করা। صِبْيَانُ ইহা صَبِيٌّ এর ব.ব.। অর্থ- বালক, ছেলে। خِنَاثَى - ইহা خُنْثَى এর ব.ব.। উভয় লিঙ্গ (প্রাণী) হিজড়া, حَاذَتْ - مفاعلة থেকে مُحَاذَاةٌ সমান্তরাল হওয়া। সম্মুখীন হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَيَصُفُّ الرِّجَالُ الخ : গ্রন্থকার রহ. এখান থেকে ইমামের পেছনে দাঁড়াবার তারতীব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ইমামের পিছনে তথা প্রথম সারীতে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ দাঁড়াবে। তাদের পিছনে নাবালেগরা দাঁড়াবে। তাদের পিছনে হিজড়া দাঁড়াবে। সর্বশেষ কাতারে মহিলারা দাঁড়াবে। দলিল হল রাসূলুল্লাহ্ সা. এর বাণী—

لِيَلِيَنِيْ مِنْكُمْ أُولُوالْأَرْحَامِ وَالنُّهٰى

'তোমাদের প্রাপ্ত বয়স্ক এবং জ্ঞানবানরা যেন আমার কাছাকাছি থাকে।'

দ্বিতীয়তঃ ইমাম আহমদ রহ. তার মুসনাদে, আবু মালিক আশআরী রাযি. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন :

اَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اجْتَمِعُوْا نِسَائَكُمْ وَابْنَائَكُمْ حَتّٰى اُرِيَكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعُوْا وَجَمَعُوْا اَبْنَائَهُمْ وَ نِسَائَهُمْ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ اَرٰهُمْ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفَّ الرِّجَالَ فِيْ اَدْنَى الصَّفِّ الْوِلْدَانَ خَلْفَهُمْ وَصَفَّ النِّسَاءِ خَلْفَ الصِّبْيَانِ -

'আবু মালিক আশআরী বলেন, ওহে আশআরী গোত্রের লোকেরা! তোমরা এবং তোমাদের মহিলারা ও সন্তানেরা একত্রিত হও। আমি তোমাদেরকে রাসূল সা. এর নামাজ দেখাব। সুতরাং তারা নিজেরা একত্রিত হল এবং তাদের সন্তানদেরকে এবং মহিলাদেরকে একত্রিত করলো। অতঃপর (আবু মালিক) অজু করলেন। এবং তাদেরকে দেখালেন যে, রাসূল সা. কিভাবে অজু করতেন। অতঃপর আবু মালিক আগে গেলেন এবং প্রথমে পুরুষের কাতার করলেন, তাদের পিছনে ছোট সন্তানদের কাতার করলেন এবং সন্তানদের পিছনে স্ত্রীলোকদের কাতার করলেন।

যুক্তিনির্ভর প্রমাণ হল : যেহেতু নারী পুরুষ এক সমানে দাঁড়ানো দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়, তাই তাদেরকে সর্ব পিছনে দাঁড় করতে হবে।

قوله : وَاِنْ حَاذَتْهُ مُشْتَهَاةٌ الخ : যদি কোন মহিলা নামাজে পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়ায় এবং উভয়ে একই নামাজে শরীক থাকে, আর ইমাম যদি মহিলার নিয়্যাত না করে তবে মহিলার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি মহিলার নিয়্যাত করে নেয় তবে পুরুষের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে কিয়াসের চাহিদা হল পুরুষের নামাজ ফাসিদ না হওয়া। আর ইহা ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী রহ. মহিলার নামাজের উপর পুরুষের নামাজকে কিয়াস করেন। আমাদের দলিল হল : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীস—

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَخَّرَهُنَّ اللهُ

উক্ত হাদীসে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা স্ত্রীলোকদেরকে নামাজের মধ্যে পিছনে রাখতে। সুতরাং স্ত্রীলোক যেহেতু তার محاذى হয়ে গেল তখন যেন পুরুষ লোকটি তার স্থানগত ফরজ বর্জন করল। কারণ উভয় শরীক এমন নামাজে মহিলাকে পিছনে দাঁড় করানো পুরুষের জন্য ফরয। এদিকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে ব্যক্তি ফরয তরক করেছে তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। এদিকে যেহেতু উক্ত হাদিসটি খবরে মাশহুরের

অন্তর্ভুক্ত, তাই তা দ্বারা ফারযিয়্যত সাব্যস্ত হবে। এজন্য আমরা বলি যে, محاذات এর কারণে পুরুষের নামাজ ফাসেদ হবে।

قوله : وَلَايَحْضُرْنَ الْجَمَاعَاتِ الخ : যুবতী মহিলাদের জামাতের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া না হওয়া এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী মাজহাবে যুবতী মহিলারা জামাতের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, যুবতী মহিলারা জামাতের জন্য মসজিদে যাওয়া মুবাহ। তিনি দলিল পেশ করেন রাসূলুল্লাহ্ সা.এর বাণী—

لَاتَمْنَعُوا اَمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ

'আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদসমূহ থেকে বারণ কর না।'

অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে—

اِذَا اسْتَأْذَنَتْ اَحَدَكُمْ اِمْرَأَتُهٗ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا

'যখন তোমাদের মধ্য থেকে কারো স্ত্রী মসজিদে যাবার জন্য অনুমতি চায় তখন তাকে নিষেধ করো না।'

আমাদের দলিল : যুবতী রমনীদের লোক সমাগমে তথা মসজিদে উপস্থিতি দ্বারা ফিতনার আশংকা রয়েছে। তাই তাদেরকে মসজিদে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত করা হবে।

দ্বিতীয় দলিল : যখন হযরত উমর রাযি. স্ত্রীলোকদেরকে মসজিদে যেতে বারন করলেন, তখন মহিলারা হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করলেন। তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ সা. বর্তমান সময়ের নামাজীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন, তবে তোমাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন। যেমনিভাবে বনী ইসরায়ীলের স্ত্রীদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

وَفَسَدَ اقْتِدَاءُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ وَطَاهِرٍ بِمَعْذُورٍ وَقَارِئٍ بِأُمِّيٍّ وَمُكْتَسٍ بِعَارٍ وَغَيْرِ مُومِئٍ بِمُومِئٍ وَمُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ وَبِمُفْتَرِضٍ آخَرَ لَا اقْتِدَاءُ مُتَوَضِّئٍ بِمُتَيَمِّمٍ وَغَاسِلٍ بِمَاسِحٍ وَقَائِمٍ بِقَاعِدٍ وَبِأَحْدَبَ وَمُومِئٍ بِمِثْلِهِ وَمُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعَادَ وَإِنِ اقْتَدٰى أُمِّيٌّ وَقَارِئٌ بِأُمِّيٍّ أَوْ اسْتَخْلَفَ أُمِّيًّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ -

---

অনুবাদ : এবং পুরুষ মহিলার অথবা নাবালেগ ছেলের (ইকতিদা করা ফাসিদ) পবিত্র ব্যক্তি উজরগ্রস্ত ব্যক্তির (ইকতিদা করা ফাসিদ) ক্বারী উম্মীর (ইকতিদা করা ফাসিদ), বস্ত্রধারী ব্যাক্তি উলঙ্গ ব্যক্তির (ইকতিদা করা ফাসিদ) ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া (অর্থাৎ রুকু সেজদা করতে সক্ষম) ব্যক্তি ইশারাকারীর (ইকতিদা করা ফাসিদ) ফরজ আদায়কারী ব্যক্তি নফল আদায়কারী বা অন্য ফরয নামাজ আদায়কারীর ইকতিদা করা ফাসিদ। তবে অজুকারী তায়াম্মুমকারীর (ইকতিদা করা সহীহ), দন্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তির অথবা কুঁজো ব্যক্তির (ইকতিদা করা সহীহ)। ইশারাকারী তারমত ইশারাকারীর (ইকতিদা করা সহীহ)। নফল আদায়কারী ফরয আদায়কারী

ব্যক্তির (ইকতিদা করা সহীহ)। আর যদি প্রকাশ হয় যে, ইমাম সাহেব অজুহীন তবে নামাজ পুণরায় পড়তে হবে। যদি উম্মী এবং ক্বারী এক উম্মীর পিছনে ইকতিদা করে অথবা শেষ দু রাকাতে উম্মীকে স্থলাভিষিক্ত করে, তবে তাদের সবার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

শব্দার্থ : مُكْتَسٍ - বস্ত্রধারী। مُؤْمِيٌّ - ইশারাকারী। اَحْدَبُ (م) حُدَبَاءُ (ج) حُدْبٌ কুঁজো, বক্রপৃষ্ঠ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ فَسَدَ اِقْتِدَاءُ رَجُلٍ الخ : পুরুষের জন্য মহিলার পিছনে ইকতিদা করা সহীহ নয়। কেননা, ইমাম হওয়ার জন্য শর্ত হল পুরুষ হওয়া, তেমনি নাবালিগ ছেলের পিছনে ইকতিদা করা সহীহ নয়। কেননা, না বালিগ ছেলের নামাজ নফল হয়ে থাকে। আর নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর নামাজ সহীহ হবে না। মাজুরের পিছনে সুস্থ ব্যক্তির ইকতিদা সহীহ নয়।

তবে ইমাম শাফেয়ী রহ.এর সহীহ কওল অনুযায়ী মাজুরের পিছনে সুস্থ ব্যক্তির ইকতিদা জায়েয। ইমাম যুফার রহ.ও এরকম মত ব্যক্ত করেছেন। ক্বারী উম্মীর পিছনে ইকতিদা করা সহীহ নয়, তেমনি বস্ত্রধারী ব্যক্তি উলঙ্গ ব্যক্তির পিছনে ইকতিদা করা সহীহ নয়। উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ও সামনে আগত ব্যক্তি বর্গ ইমামতির যোগ্য নয়। এর মূল হল রাসূল সা. এর হাদীস- اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ। ইমামের নামাজ মুক্তাদির নামজের জন্য متضمن। সুতরাং ইমাম মুক্তাদির দায়িত্ব বহন করতে হলে ইমাম মুক্তাদির চেয়ে উন্নত বা সমান সমান হওয়া প্রয়োজন। কারণ কোন কিছু তার চেয়ে অনুন্নত বা তার সমপর্যায়ের কোন কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে উন্নত কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না। বিধায় যেহেতু উক্ত ব্যক্তিবর্গ মুক্তাদীর চেয়ে অনুন্নত বিধায় তাদের ইমামতিতে তাদের চেয়ে উন্নতদের নামাজ সহীহ হবে না।

قوله : وَغَيْرُ مُؤْمِيٍّ بِمُؤْمِيٍّ الخ : রুকু সিজদাকারী ইশারায় নামাজ আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা সহীহ নয়, ইমাম যুফার রহ. এর মতে সহীহ। তিনি দলিল হিসাবে বলেন, ইশারাকারীর রুকু সিজদা ইশারার বিনিময়ে রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তার বদলা তথা ইশারা বিদ্যমান। আর তা যেমন আসলের সাথে আদায় করা, একারণে তায়াম্মুমকারীর পিছনে অজুকারীর নামাজ সহীহ। আমাদের দলিল হল : যেহেতু মুক্তাদীর অবস্থা ইমামের অবস্থার চেয়ে উন্নত বিধায় তার নামাজ সহীহ হবে না। অপর দিকে ইশারা রুকু ও সিজদার بعض বা অংশ বিশেষ। আর بعض الشئ অন্য شئ এর বদলা হতে পারে না। সুতরাং ইশারাকারীর পিছনে সুস্থ ব্যক্তির ইকতিদা সহীহ নয়।

قوله : وَمُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ الخ : ফরজ আদায়কারীর জন্য নফল আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করা জায়েয নেই। ইহা সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, ইব্রাহীম নাখয়ী, যুহরী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. প্রমুখদের মতামত। ইমাম মালিক রহ. থেকেও এমন বর্ণনা রয়েছে। কেননা, ইকতিদা হল ভিত্তি এবং তাহল وجودى আর وجودى কে عدمى এর উপর ভিত্তি করা সহীহ নয়। সুতরাং ফরজের মধ্যে ইকতিদা হল যে, মুক্তাদি তার ফরজ নামাজকে ইমামের ফরজ নামাজের উপর ভিত্তি করে ইকতিদা করা। অথচ আলোচিত অবস্থায় ইমামের وصف فرضيت পাওয়া যায় নাই। কারণ, সে নফল আদায় করতেছে। সুতরাং তার ইকতিদা সহীহ হবে না। এমনিভাবে এক ফরজ আদায়কারীর পিছনে অন্য ফরজ আদায়কারীর ইকতিদা সহীহ হবে না। দলিল ইকতিদা বলা হয় একই তাহরিমায় শামিল হওয়া এবং শারীরিক কার্যাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। আর এ অন্তর্ভূক্ত হওয়া তখনই হবে যখন উভয়ের তাহরীমা ও আফয়াল এক ও অভিন্ন হবে। কিন্তু উক্ত সুরতে এক ও অভিন্নতা পাওয়া গেল না বিধায় ইকতিদা করা সহীহ হবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে উপরোক্ত মাসআলাত্রয়ে ইমামতি করা জায়েয এবং তাদের পিছনে আলোচিত ব্যক্তিবৃন্দ ইকতিদা করা জায়েয।

قوله : لَا اقْتِدَاءَ مُتَوَضٍّ الخ : অজুকারী ব্যক্তি তায়াম্মুমকারী ব্যক্তির পিছনে ইকতিদা করতে পারে কি না এ নিয়ে উলামায়ে কিরামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। শায়খাইন রহ. এর মতে ইকতিদা করা জায়েয। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে ইকতিদা করা জায়েয নেই। কারণ, তায়াম্মুত হল জরুরী অবস্থায় তাহারাত, আর পানি দ্বারা তাহারাত অর্জন করা হল আসলিয়া। আর তাহারাতে আসলিয়া হল তাহারাতে জরুরীয়াহ থেকে শক্তিশালী, সুতরাং বুঝা গেল মুক্তাদীর অবস্থার চেয়ে ইমামের অবস্থা অনুন্নত বিধায় শক্তিশালী মুক্তাদীর ইমামতি অনুন্নত ইমাম করতে পারবে না।

শায়খাইন রহ. এর দলিল হল : তায়াম্মুম হল সাধারণ তাহারাত। এজন্য তায়াম্মুম প্রয়োজনের সাথে সীমিত থাকে না। বরং দীর্ঘ দিন যাবত পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে অক্ষম থাকলে তায়াম্মুম বহাল থাকবে। সুতরাং তায়াম্মুম যেহেতু তাহারাতে মুতলাকাহ তাই তায়াম্মুমকারী ও অজুকরী উভয়ের সমান অবস্থা পাওয়া গেল। আর উভয়ের অবস্থা সমান হওয়া ইমামতির জন্য বাধার কারণ হতে পারে না।

قوله : وَقَائِمٍ بِقَاعِدٍ الخ : দাড়িয়ে নামাজ আদায়কারীদের ইকতিদা বসে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে সহীহ। ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, সহীহ নয়। কারণ, ইমামের অবস্থার চেয়ে মুক্তাদীর অবস্থা উন্নত। আর কিয়াসের চাহিদা ও তাই। জবাবে আমরা বলব যে, উক্ত কিয়াসকে ছেড়ে দেয়ার পিছনে নস রয়েছে। আর তা হল— أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اٰخِرَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَالْقَوْمُ خَلْفَهُ قِيَامٌ 'মহানবী সা. তার শেষ নামাজ বসে আদায় করেছেন আর লোকজন তার পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন।' সুতরাং এহাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারী ব্যক্তি বসে নামাজ আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করতে পারবে।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দলীলের জবাব হল, যেখানে নস বিদ্যমান সেখানে কিয়াসের কোন স্থান নেই। والله اعلم।

قوله : وَاِنْ ظَهَرَ اَنَّ اِمَامَهُ الخ : যদি নামাজ পড়ার পর জানতে পারে যে, তার ইমাম হাদাসগ্রস্ত। তবে মুক্তাদী তার নামাজ পুণরায় পড়তে হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, মুক্তাদী পুণরায় পড়তে হবে না। তিনি দলিল দেন : ইকতিদা হল সমষ্টিগতভাবে কিছু আফআল আদায় করার নাম। অর্থাৎ তিনির মতে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকের নামাজ আলাদা আলাদা, ইমামের নামায মুক্তাদীর নামাজকে অন্তর্ভূক্ত করে না, তাই ইমামের নামায ফাসিদ হওয়ার দরুন মুক্তাদীর নামাজ ফাসিদ হবে না।

আমাদের দলিল হল : নিম্নোক্ত হাদীস—

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ جَنَابَةً فَاَعَادَهَا وَقَالَ مَنْ اَمَّ قَوْمًا ثُمَّ ظَهَرَ اَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا اَوْ جُنُبًا اَعَادَ صَلَاتَهُ وَ اَعَادُوْا -

রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়ছিলেন। অতঃপর জুনুবী থাকার কথা স্মরণ হল। তাই নামাজ পুনরায় পড়লেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করল অতঃপর প্রকাশ হল যে, সে হদসগ্রস্ত বা জুনুবী তবে সে তার নামাজ পুনরায় পড়বে এবং তারাও (মুক্তাদীরাও) পুনরায় পড়বে। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়ার দরুন মুক্তাদীর নামাজও ফাসিদ হয়ে যাবে।

হযরত আলী রাযি. থেকেও এমন ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার অজুহীন অথবা জুনুবী অবস্থায় নামাজ পড়ালেন। অতঃপর তিনি নিজেও দোহরালেন এবং মুক্তাদীদেরকেও দোহরাতে হুকুম দিলেন।

হযরত শাফেয়ী রহ. এর দলিলের জবাব হল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর বর্ণনায় রাসূল সা. বলেন- اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ উক্ত হাদীসের অর্থ দু অবস্থার একটি হবে। (১) হয়ত ইমাম তার নামাজের জামীন। (২) অথবা ইমাম মুক্তাদির নামাজের জামিন।

প্রথম অবস্থা নয়, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় নামাজের জামিন হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অবস্থা হলে তাতেও দু অবস্থার একটি হবে— (১) ইমাম হয়ত মুক্তাদির ওয়াজিব ও আদায় হিসাবে জামিন হবে। (২) ইমাম মুক্তাদীর সহিহ ও ফাসাদের জামিন হবে। প্রথম অবস্থা তথা মুক্তাদির ওয়াজিব ও আদায় হিসাবে জামিন নয় ইহার উপর সর্বসম্মতি রয়েছে। সুতরাং নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, শেষোক্ত অবস্থা তথা মুক্তাদীর সহীহ ও ফাসাদ হিসাবে ইমাম জামিন হবে। তাই ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়ার দ্বারা মুক্তাদীদের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

قوله : وَاِنِ اقْتَدٰى اُمِّيٌّ وَ قَارِئٌ الخ : যদি কোন উম্মী ব্যক্তি ইমামতি করে আর তার মুক্তাদী কিছু উম্মী আর কিছু ক্বারী। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তাদের সবার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। আর সাহাবাইন রহ. এর মতে উম্মী ইমাম ও উম্মী মুক্তাদীদের নামাজ হয়ে যাবে শুধু ক্বারীর নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

তাদের দলিল হল : উম্মী মা'জুরের অন্তর্ভুক্ত আর এক মা'জুরের পিছনে অন্য মাজুরের নামায হয়ে যায়। কিন্তু কারী মাজুরের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। **ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল :** কোন ব্যক্তি যদি কিরাত পড়তে সক্ষম হয় আর নামাজে কিরাত পড়ে না তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। উক্ত মাসআলায় ইমাম কিরাতে সক্ষম থাকা অবস্থায় কিরাত ছেড়ে দিয়েছে বিধায় ইমামের নামাজ বাতিল হয়ে গেছে। আর যখন ইমামের নামাজ বাতিল হয়ে গেলো তাই তার পিছনে যারাই আছে সকলের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, উম্মী ইমাম কিভাবে কিরাতের উপর সক্ষম হল। উত্তর হচ্ছে যে, যদি এমতাবস্থায় উক্ত উম্মী ব্যক্তি কোন ক্বারী মুক্তাদির ইকতিদা করত তবে ঐ ক্বারীর ক্বিরাত পড়া তার জন্য যথেষ্ট হত এবং তারও কিরাত পড়া হয়েছে বলে ধরে নেয়া হত। কারণ, হুজুর সা. ইরশাদ করেন—

مَنْ كَانَ لَهٗ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ

'যার ইমাম রয়েছে সুতরাং ইমামের কিরাত তারই কিরাত।' (অর্থাৎ, ইমামের কিরাত যথেষ্ট। মুক্তাদীকে কিরাত পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।)। আর উম্মীর এ ইকতিদা করাটা তার ইচ্ছাস্বাধীন ছিল। অথচ সে তার এ ইখতিয়ারকে ছেড়ে দিয়েছে।

قوله : أَوِ اسْتَخْلَفَ اُمِّيًّا الخ : ক্বারী ইমাম নামায শুরু করল ইত্যবসরে তার হাদাস হওয়াতে শেষ দু রাকাতে অথবা মাগরিবের শেষ এক রাকাতে উম্মীকে তার স্থলাভিষিক্ত করে গেল এমতাবস্থায় মুক্তাদীদের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে ইমাম যুফার রহ. এর মতে মুক্তাদীর নামায ফাসিদ হবে না। তিনি বলেন, যেহেতু প্রথম দুরাকাতে ফরজ কিরাত পড়া হয়ে গেছে বিধায় নামাজ হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল হল : প্রত্যেক রাকাতই স্বতন্ত্র নামাজ। আর প্রত্যেক রাকাতে কিরাত রয়েছে। হা প্রথম দুরাকাতে কিরাত হাক্বীকী আর শেষ দু' রাকাতে কিরাত হল তাকদীরী। এদিকে উম্মীর মাঝে হাক্বীকী কিরাত নেই তা তো প্রকাশ্য। আর তাকদীরী নেই কারণ, তার মধ্যে কিরাতের যোগ্যতাই নেই। সুতরাং উল্লেখিত মাসআলায় মুক্তাদীদের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

بَابُ الْحَدَثِ فِى الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে হাদাস হওয়ার বিবরণ

مَنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ تَوَضَّأَ وَبَنٰى وَاسْتَخْلَفَ لَوْ إِمَامًا كَمَا لَوْ حَصِرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بِظَنِّ الْحَدَثِ أَوْ جُنَّ أَوِ احْتَلَمَ أَوْ أُغْمِىَ عَلَيْهِ اِسْتَقْبَلَ -

অনুবাদ : যে ব্যক্তির হাদাস ঘটে যায় (নামজের মধ্যে) সে অজু করে বিনা করবে। যদি ইমাম হয় স্থলবর্তী নিযুক্ত করবে, যেভাবে কিরাত পড়া থেকে অক্ষম অবস্থায় (স্থলবর্তী নিযুক্ত করা উচিৎ) যদি মসজিদ থেকে হাদাস হওয়ার ধারণা বশতঃ বের হয়ে যায় অথবা পাগল হয়ে যায়, কিংবা স্বপ্নদোষ হয়ে যায় বা অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে নতুন করে নামাজ শুরু করবে।

শব্দার্থ : حَصِرَ (س) حَصْرًا - আটকে যাওয়া, বাকরুদ্ধ হওয়া। جُنَّ - পাগল হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الْحَدَثِ الخ : হাদাসের অবস্থায় প্রথম থেকে পুনরায় নামাজ পড়ার প্রয়োজন নেই। বরং নামাজের যে স্থানে অজু ভঙ্গ হবে অজু করার পর সে স্থান থেকে শুরু করলে চলবে। যাকে শরীয়াতের পরিভাষায় বিনা বালা হয়। কিন্তু তা সহীহ হওয়ার জন্য তেরটি শর্ত রয়েছে।

(১) হাদাসটি সেমাবী হওয়া অর্থাৎ হাদাস এবং হাদাসের কারণের মধ্যে ব্যক্তির কোন এখতিয়ার না থাকা। (২) নামাজির শরীর থেকে বের হওয়া। (৩) হাদাসটি গোসল ওয়াজিব হওয়ার পর্যায়ের না হওয়া। (৪) আকস্মীকভাবে না হওয়া। (৫) হাদাস অবস্থায় পূর্ণ একটি রুকন চলে না যাওয়া, (৬) যাওয়া আসার সময় কোন রুকন আদায় না হওয়া। (৭) নামাজের প্রতিবন্ধক কোন কিছু না ঘটা, যেমন খাওয়া, পান করা। (৯) বিনা প্রয়োজনে বিলম্ব না করা। (১০) পূর্বের হাদাস প্রকাশ না হওয়া, যেমন মুজার উপর মাসেহের দিনকাল চলে না যাওয়া। (১১) সাহেবে তারতীবের কাজা নামাজের স্মরণ না হওয়া। (১২) মুক্তাদী তার স্বস্থান ছেড়ে অন্যত্র নামায আদায় না করা। (১৩) ইমাম এমন ব্যক্তিকে স্থলবর্তী না বানানো যে ইমামতের যোগ্য নয়। সুতরাং উপর উল্লেখিত ১৩টি শর্ত থেকে কোন একটি ব্যতিক্রম হলে নামায পুণরায় পড়তে হবে বিনা করলে চলবে না।

قوله : مَنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ الخ : যদি কারো নামাজের ভিতর হাদাস ঘটে যায়, আর এহাদাস বেলা ইখতিয়ার হয় যাকে হাদাসে সেমায়ী (حدث سماعى) বলে তবে তাৎক্ষণিকভাবে নামাজ ছেড়ে অজু করে পুণরায় বিনা করবে। যদি সে ইমাম হয় তবে মুক্তাদী থেকে উপযুক্ত একজনকে তার স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করে নেবে। কিন্তু যদি হদস অবস্থায় নামাজে বিলম্ব করে তবে তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে হদসগ্রস্ত ব্যক্তি নতুন করে নামাজ পড়বে। আর তা কিয়াসেরও চাহিদা। কারণ, হাদাস নামাজের বিপরীত। কেননা, নামাজের জন্য তাহারাত জরুরী। আর হাদাস তাহারাতের বিপরীত। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, হাদাস তা তাহারাতের মাধ্যমে নামাজের অন্তরায়। এদিকে কায়দা হল কোন জিনিস তার বিপরীতের সাথে বাকি থাকে না। তাই হাদাসের সাথে নামাজও বাকী থাকবে না। নতুন করে নামাজ পড়তে হবে। দ্বিতীয় দলিল দেন যে, হাদাসের পর চলাফেরা পাওয়া গেছে যা নামাজ সহীহ হওয়ার প্রতিবন্ধক। বিধায় নতুন করে নামাজ পড়তে হবে।

আমাদের দলিল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর বর্ণিত হাদীস—

مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْذَى فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ -

'যে ব্যক্তি তার নামাজে বমি করল, অথবা নাক থেকে রক্ত ক্ষরণ হয় কিংবা মজি বের হল সে যেন ফিরে যায় ও অজু করে অতঃপর তার নামাজে বিনা করে যতক্ষণ পর্যন্ত কথা না বলবে।'

দ্বিতীয় দলিল : হুজুর সা. এর ইরশাদ :

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَلْيُقَدِّمْ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ -

'যখন তোমাদের মধ্যে কেহ নামাজ শুরু করে অতঃপর সে বমি করে কিংবা নাক থেকে রক্তক্ষরণ হয় তবে সে তার মুখে হাত রাখবে এবং কাউকে আগে বাড়িয়ে দিবে যার কোন রাকাত ছোটে যায় নি।' উক্ত হাদীস দ্বারা বিনা জায়েয হওয়ার সুরত এভাবে যে হাদীসে বর্ণিত وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ এর ليبن শব্দটি হল امر এর সর্বনিম্ন اباحت তথা মুবাহ হওয়ার পর্যায়। তাই বিনা মুবাহ হওয়া সাবিত হল। তাছাড়া বিনা সাবিত হওয়ার উপর ইজমায়ে ফুকাহায়ে সাহাবা যথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ইবনে আব্বাস রাযি. ইবনে আমর রাযি. আনাস ইবনে মালিক রাযি. সালমান ফারসী রাযি. ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিলের জবাব :

১। ইজমায়ে সাহাবার কারণে কিয়াসকে তরক করা যায়।

২। অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে যাওয়া হাদাসকে ইচ্ছাকৃত হাদাসের উপর কিয়াস করা সহীহ নয়। কেননা, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যকারী বিদ্যমান। অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া হাদাসের মধ্যে ইবতিলা রয়েছে। এজন্য তাকে মা'জুর ধরে নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত হাদাসের বেলায় তা পাওয়া যায় না। সুতরাং এহেন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা সহীহ নয়।

قوله : وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الخ : যদি কার নামাজ অবস্থায় মনে পড়ে যে, সে হাদাসগ্রস্ত তাই সে নামাজ থেকে ফিরে গেল। অতঃপর সে বুঝতে পারল যে, তার হাদাস হয়নি। এখন তার এ ফিরে যাওয়াটা যদি নামাজ ভঙ্গ করার জন্য হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে মসজিদের ভিতরে রয়েছে নাকি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেছে। যদি মসজিদের ভেতরে থেকে যায় তবে বিনা করা জায়েয হবে। আর যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় তবে তার বিনা করা জায়েয হবে না।

قوله : أَوْ جُنَّ أَوِ احْتَلَمَ الخ : যদি কেহ নামাজান্তে পাগল হয়ে যায় অথবা ঘুম আসার পর ইহতিলাম হয়ে যায় কিংবা অজ্ঞান হয়ে যায়, চাই সে ইমাম হউক বা মুক্তাদী হউক অথবা মুনফারিদ হউক তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। তাতে বিনা করা জায়েয হবে না। কেননা, নামাযে এধরণের ঘটনা ঘটা বিরল। সুতরাং উক্ত ঘটনাসমূহ এমন নয় যে এগুলোর ব্যাপারে نص এসেছে। আর এধরণের ঘটনা কথা বলার পর্যায়ের। আর কথা হলো নামাজ ভঙ্গকারী।

وَإِنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ وَإِنْ تَعَمَّدَهُ أَوْ تَكَلَّمَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَبَطَلَتْ إِنْ رَأَى مُتَيَمِّمٌ مَاءً أَوْ تَمَّتْ مُدَّةُ مَسْحِهِ أَوْ نَزَعَ خُفَّيْهِ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ أَوْ تَعَلَّمَ أُمِّيٌّ سُورَةً أَوْ وَجَدَ عَارٍ ثَوْبًا أَوْ قَدَرَ مُومِئٌ أَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً أَوْ اسْتَخْلَفَ أُمِّيًّا أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِي الْفَجْرِ أَوْ دخل وَقْتُ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ عن بُرْءٍ أَوْ زَالَ عُذْرُ الْمَعْذُورِ

অনুবাদ : যদি তাশাহুদের পরে সে হাদাসগ্রস্ত হয়, তাহলে অজু করবে এবং সালাম ফিরাবে। আর যদি

ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটায় অথবা কথা বলে তবে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। যদি তায়াম্মুমকারী পানি দেখে, (নামাজের মধ্যে) কিংবা মুসেহের মুদ্দাত শেষ হয়ে যায় (নামাজের মধ্যে) কিংবা অতি সামান্য কাজ দ্বারা উভয় মুজা খুলে ফেলে, কিংবা উম্মী কোন সূরা শিখে ফেলে কিংবা উলঙ্গ ব্যক্তি কাপড় পেয়ে যায়, কিংবা ইশারাকারী (রুকু সিজদায়) সক্ষম হয়ে যায় কিংবা (এই নামাজের পূর্ববর্তী নামাজের ক্বাজা স্মরণ হয়ে যায় কিংবা কোন উম্মীকে খলিফা বানালো, কিংবা ফজরের নামাজে সূর্যোদয় হয়ে গেলে কিংবা জুমুআর নামাজে আছরের ওয়াক্ত প্রবেশ হয়ে গেল, কিংবা জখম ভাল হয়ে যাওয়াতে পট্টি পড়ে গেল, কিংবা মাজুরের ওজর চলে গেল (এসকল অবস্থায়) নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

শব্দার্থ : تَعَمَّدَ - تفعل থেকে। تَعَمُّدًا ইচ্ছা করা, মনস্থ করা। مُتَيَمِّم তায়াম্মুমকারী। جَبِيْرَةٌ - জখমের পট্টি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَاِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ الخ : কোন ব্যক্তির তাশাহুদ পড়ার পর হদস হল তবে হুকুম হল সে অজু করবে তারপর সালাম ফিরাবে। কেননা, তার জিম্মায় কোন রুকন নেই। তবে একটি ওয়াজিব তথা সালাম রয়েছে এদিকে তাহারাত ছাড়া تحليل তথা সালাম ফিরানো সম্ভব নয় বিধায় অজু করবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ তাশাহুদ পড়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটায় অথবা কথা বলে কিংবা এমন কোন কাজ করে যা নামাজের বিপরীত তবে তার নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে।

দলিল হল : যেহেতু নামাজির মধ্যে এমন কাজ পাওয়া গেছে যা দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায় আর বিনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার উপর নামাজের পুনরাবৃত্তি জরুরী নয়। কারণ, তার জিম্মায় নামাজের আর কোন রুকন অবশিষ্ট নেই। তবে তাহলিল ইচ্ছাকৃত ফেইল করার দ্বারা আদায় হয়ে গেছে। যদিও সালাম শব্দ দ্বারা تحليل ওয়াজিব ছিল। তবে হা তা না করার দ্বারা অন্য কোন রুকুনের ক্ষতি হয় নি।

قوله : وَبَطَلَتْ الخ : এখান থেকে গ্রন্থকার রহ. বারটি মাসআলার বর্ণনা শুরু করেছেন। যা নামাজির তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর পেশ হয়। নিম্নে আলোচনা করা হল : (১) তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর পানি দেখতে পেল। (২) মুজার উপর মাসেহকারী তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর মুজার মাসেহের মুদ্দাত শেষ হয়ে গেল। (৩) কেহ আমলে কালিল ততা অতি সামান্য কাজ দ্বারা তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর উভয় মুজা খুলে ফেলল। (৪) নামাজী উম্মী ছিল তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর কুরআনের কোন সূরা শিখে নিল। (৫) নামাজী ব্যক্তি উলঙ্গ ছিল, তবে তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর কাপড় পেয়ে গেল। (৬) ইশারাকারী তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর রুকু সিজদা করতে সক্ষম হয়ে গেল। (৭) সাহেবে তারতীবের তাশাহুদ পরিমান বসার পর ক্বাযা নামাজের কথা স্মরণ হয়ে গেল। (৮) ক্বারী ইমাম তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর হদস হওয়ায় কোন উম্মীকে ইমাম নিযুক্ত করল। (৯) তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর ফজরের নামাজে সূর্যোদয় হয়ে গেলে। (১০) জুমুআর নামাজ আদায়াত্তে তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর আছরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়া। (১১) জখমের পট্টির উপর মাসেহকারী তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর জখম ভাল হয়ে পট্টি পড়ে গেল। (১২) মাজুর ব্যক্তি তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর তার উজর চলে গেলে। উল্লেখিত বারটি মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহাবাইন রহ. এর মতে আলোচিত সকল অবস্থায় তাদের নামাজ হয়ে যাবে। তাদের দলিল হল : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, হুজুর সা. ইবনে মাসউদ রাযি. কে বলেছিলেন—

اِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ اِنْ شِئْتَ اِنْ تَقُوْمَ فَقُمْ -

'যখন তুমি এটা (অর্থাৎ তাশাহুদ) বললে অথবা এটা করলে (তাশাহুদ পরিমাণ বসলে) তবে তোমার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন দাঁড়াতে চাইলে দাড়িয়ে যাও।' উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল এভাবে যে রাসূল সা. নামাজের পূর্ণতা তাশাহুদ পড়া বা তাশাহুদ পরিমাণ বসার সাথে যুক্ত করেছেন। মোটকথা তাশাহুদ পরিমাণ বসার কারণে

নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর নামাজ বাতিল হওয়ার কোন অবকাশ নেই। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর **দলিল :** উক্ত ঘটনাবলী যেহেতু নামাজ থাকা অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে আর তা এভাবে যে এখনও একটি ওয়াজিব তথা সালাম বাকী রয়েছে যা শেষ নামাজ। একারণে মুসাফির দু রাকাতের পর ক্বা'দায়ে আখেরার পর ইকামতের তথা অবস্থানের নিয়্যাত করে নেয় তবে ফরজ পরিবর্তন হয়ে যায়। অর্থাৎ আর দু রাকাত ফরজ হয়ে যায়। ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীসের জবাব : উক্ত হাদীসে تَمَّتْ صَلَاتُكَ এর অর্থ হল قَارَبَتِ التَّمَامَ অর্থাৎ যখন তুমি এটা করলে বা বললে তখন তোমার নামাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এসে গেছে। ইহা যেমন হুজুর সা. এর বাণী- مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ 'যে আরাফায় অবস্থান করেছে তার হজ্ব সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ উকুফে আরাফার পর এখনও যিয়ারত যা ফরজ তা বাকী রয়ে গেছে। সুতরাং এখানেও এ অর্থ হবে যে, তার হজ্ব সম্পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এসে গেছে।

وَصَحَّ اسْتِخْلَافُ الْمَسْبُوقِ فَلَوْ أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ تَفْسُدُ بِالْمُنَافِي صَلَاتُهُ دُونَ الْقَوْمِ كما تَفْسُدُ بِقَهْقَهَةِ إِمَامِهِ لَدَى اخْتِتَامِهِ لَا بِخُرُوجِهِ من الْمَسْجِدِ وَكَلَامِهِ وَلَوْ أَحْدَثَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ تَوَضَّأَ وَبَنَى وَأَعَادَهُمَا وَلَوْ ذَكَرَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا سَجْدَةً فَسَجَدَهَا لَمْ يُعِدْهُمَا وَتَعَيَّنَ الْمَأْمُومُ الْوَاحِدُ لِلِاسْتِخْلَافِ بِلَا نِيَّةٍ -

---

অনুবাদ : এবং মাসবুককে স্থলবর্তী নিযুক্ত করা সহীহ। (অর্থাৎ ইমামের হাদাস হলে তার স্থলবর্তী মাসবুককেও নিযুক্ত করা সহীহ) যদি সে ইমামের নামাযকে পূর্ণ করে তবে তার নামাজ প্রতিবন্ধকতার কারণে ফাসিদ হয়ে যাবে। মুক্তাদীদের নামাজ নয়। (অর্থাৎ মুক্তাদীদের থেকে যারা মুদরীক তাদের নামাজ ফাসিদ হবে না।) যেমনি মাসবুকের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে তার ইমামের অট্ট হাসিতে নামাজের শেষ পর্যায়ে। তবে মাসবুকের নামাজ ফাসিদ হবে না ইমামের মসজিদ থেকে বের হওয়ার দ্বারা বা কথা বলার দ্বারা। যদি রুকু বা সিজদাতে হাদাস হয়ে যায় তবে অজু করে বিনা করবে এবং রুকু সিজদা পুণরায় আদায় করবে। যদি রুকু করা অবস্থায় অথবা সিজদা করা অবস্থায় সিজদার কথা স্মরণ হয়, আর সিজদা আদায় করে তবে উভটি (থেকে কোনটি) পুণরাবৃত্তি করা লাগবে না। (যে ব্যক্তি মাত্র একজন মুক্তাদীর ইমামতি করছে এমতাবস্থায় তার হাদাস ঘটল আর সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল তবে) একজন মুক্তাদী তার স্থলবর্তী হিসাবে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে তার (স্থলবর্তী করায়) নিয়্যাত ছাড়াই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَصَحَّ اِسْتِخْلَافُ الخ : ইমামের হাদাস হলে সে যদি কোন মাসবুককে তার স্থলবর্ত নিযুক্ত করে তবে তা সহীহ। কারণ স্থলবর্তী নিযুক্ত করার জন্য শর্ত হল উভয়ে এক তাহরীমায় শরীক থাকা। মাসবুকের ক্ষেত্রেও তা পাওয়া যায়। তবে উত্তম হল মুদরিককে স্থলবর্তী নিযুক্ত করা। কারণ সে ইমামের নামাজকে পূর্ণ করতে মাসবুকের তুলনায় অধিকতর সক্ষম। যেমন কেহ মাসবুককে স্থলবর্তী নিযুক্ত করল, তবে মাসবুক ব্যক্তি সালাম ফিরানোর পূর্ব মুহূর্তে অন্য কোন মুদরীককে তার স্থলবর্তী নিযুক্ত করতে হবে। আর সে সালাম ফিরাবে। সুতরাং দেখা যায় যে, এসুরতে দুবার খলিফা নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে মুদরিককে স্থলবর্তী নিযুক্ত করার দ্বারা শুধু একবার খলিফা বানানোর প্রয়োজন পড়ে। বিধায় মুদরিক ব্যক্তিকে স্থলবর্তী নিযুক্ত করা উত্তম।

قوله : فَلَوْ اَتَمَّ الخ : মাসবুক স্থলবর্তী হলে কায়দা হল সে সালাম ফিরানোর আগে কোন মুদরিক ব্যক্তিকে স্থলবর্তী নিযুক্ত করবে আর সে মুক্তাদীদেরকে নিয়ে নামাজ শেষ করবে। কারণ, মাসবুকের এখনও দু এক রাকাত রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি স্থলবর্তী মাসবুক ব্যক্তি প্রথম ইমামের নামাজ পূর্ণ করার পর এমন কোন অবস্থা করে যা নামাজের খিলাফ তবে তার নামাজ ও মুক্তাদী থেকে যারা মাসবুক ছিল তাদের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ, এখনও তাদের নামাজের রুকন বাকী রয়েছে। আর মুক্তাদী থেকে যারা মুদরীক তাদের নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ তাদের আর কোন রুকন বাকী নেই। তার উপমা এমন যে কোন ইমাম প্রথম থেকে ক্বায়দায়ে আখেরা পর্যন্ত নামাজ পড়ল। অতঃপর মসজিদ থেকে বের হওয়া অথবা কথা বলা ছাড়া অট্ট হাসি দিল তবে তার ও মুক্তাদীদের থেকে যারা প্রথম থেকে নামাজে শরীক তাদের নামাজ হয়ে যাবে। কিন্তু মুক্তাদী থেকে যারা মাসবুক তাদের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

قوله : وَلَوْ حَدَثَ فِي رُكُوْعِه الخ : যদি কারো রুকু বা সিজদায় হাদাস হয়ে যায় তবে তার জন্য উচিত কালবিলম্ব না করে সাথে সাথে অজু করে বিনা করা। আর যে রুকুনে হাদাস হয়েছে তা আদায় করা। উল্লেখ্য যে, যে রুকুনে হাদাস হল তা গ্রহণীয় নয়। কারণ একটি রুকন তখনই পূর্ণ হয় যখন এ রুকন শেষ করে অন্য রুকনে যাওয়া হয়। আর এ প্রস্থান করাটা ফরজ। যেমন যদি রুকুতে হাদাস হয় তবে অজু করে পুণরায় রুকু আদায় করতে হবে।

قوله : وَلَوْ ذَكَرَ رَاكِعًا الخ : যদি কারো রুকুতে অথবা সিজদাতে স্মরণ হয় যে তার জিম্মায় একটি সিজদা রয়েছে এই সিজদাটি হউক তিলাওয়াতী সিজদা বা নামাজী সিজদা যা তার ক্বাযা হয়েছিল। এখন যদি তার এই স্মরণ হওয়া রুকুতে হয় আর সে রুকু থেকে না দাঁড়িয়ে সিজদায় চলে যায় অথবা তার এই স্মরণ হওয়া সিজদায় হয় আর সে শুধু মাথা তুলে পুণরায় সিজদায় চলে যায় তবে সে যে রুকু বা সিজদা থেকে চলে গেল সিজদায় সেই রুকু পুণরায় আদায় করতে হবে না, কিন্তু পুণরায় আদায় করে নেয়া উত্তম এবং মুস্তাহাব। যাতে যথাসম্ভব রুকনগুলো তারতীব মোতাবিক আদায় হয়। পুণরায় আদায় করতে হবে না একারণে যে, রুকনগুলোতে তারতীব শর্ত নয়। আর তারতীব শর্ত না হওয়ার দলিল এভাবে যে মাসবুক ইমামকে যে স্থানে পেল সেস্থান থেকে নামাজ শুরু করল। অতঃপর ইমামের সালাম ফিরানোর পর সে দাঁড়িয়ে থেকে যাওয়া নামাজ আদায় করে। সুতরাং স্পষ্ট হল যে, মাসবুক পরের নামাজকে প্রথমে আর প্রথমের নামাজকে শেষে আদায় করল। যদি তারতীব শর্ত হত তবে মাসবুক এমনটি করতে পারত না।

قوله : وَتَعَيَّنَ الْمَاْمُوْمُ الخ : এক ব্যক্তি ইমাম হল মাত্র একজন মুক্তাদীর। ঘটনাক্রমে উক্ত ইমামের হাদাস হয়ে গেল, তাই সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। তখন ঐ মুক্তাদী আপনা আপনি ইমাম হয়ে যাবে। ইমাম তাকে স্থলবর্তী নিযুক্ত করার নিয়্যাত করুক বা না করুক। **দলিল হল :** মুক্তাদী ইমাম নিযুক্ত হওয়া দ্বারা তার নামাজের হিফাজত হয়। কারণ যদি সে ইমাম নিযুক্ত না হয় তবে ইমামতের স্থান শুন্য হয়ে যাবে। যার দরুন তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল উক্ত মুক্তাদী ইমামতের যোগ্য হতে হবে।

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلٰوةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا

পরিচ্ছেদ : নামাজকে যা ভঙ্গ করে এবং তাকে যা মাকরূহ করে-এর বিবরণ

يُفْسِدُ الصَّلَاةَ التَّكَلُّمُ وَالدُّعَاءُ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَنَا وَالْأَنِينُ وَالتَّأَوُّهُ وَارْتِفَاعُ بُكَائِهِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ لَا مِنْ ذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ وَالتَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ وَجَوَابُ عَاطِسٍ بِيَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَفَتْحُهُ عَلٰى غَيْرِ إِمَامِهِ وَالْجَوَابُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَرَدُّهُ -

অনুবাদ : নামাজে কথা বলা, আমাদের কথার সাদৃশ্য দোয়া, কাতরানো উহ্ আহ্ শব্দ ব্যথা বা বিপদের কারণে শব্দ করে কাঁদা নামাযকে ফাসিদ করে দেবে । তবে জান্নাত জাহান্নামের স্মরণে কাঁদা দ্বারা নামায ফাসিদ হবে না । বিনা ওজরে কাশি (নামায ফাসিদ হয়ে যাবে) এবং হাঁচি দাতার জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলা (নামাজকে ফাসিদ করে দেবে) নিজ ইমাম ছাড়া অন্যকে লোকমা দেয়া (নামাজকে ফাসিদ করে দেবে) জবাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা দ্বারা (নামাজকে ফাসিদ করে দেবে) অথবা তার জবাব দেয়া নামাজকে ফাসিদ করে দেবে ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

গ্রন্থকার রহ. চলে যাওয়া অনুচ্ছেদ সমূহে ঐসকল পরিস্থিতির আলোচনা করেছেন যা নামাজের মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে এসে যায় । এখান থেকে ঐসকল পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন যা নামাজীর ইচ্ছায় হয় ।

قوله : وَيُفْسِدُ الصَّلٰوةَ الخ : যদি কোন নামাজী তার নামাজান্তে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, ইচ্ছা স্বাধীন বা জোর পূর্বক প্রয়োজনে বা প্রয়োজন ছাড়া দুনিয়াবী কথা বলে তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে । ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে خطا ও نسيان তথা বিচ্যুতি ও ভুলবশত কথা বলার দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না । তবে যদি কথা দীর্ঘ হয় তবে ভঙ্গ হয়ে যাবে । তিনি দলিল দেন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস দ্বারা । হুজুর সা. ইরশাদ করেন— رُفِعَ عَنْ أُمَّتِىْ الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ - 'আমার উম্মত থেকে ভুল ও বিস্মৃতি রহিত করা হয়েছে ।' তিনি বলেন, এখানে রহিত করা দ্বারা দুনিয়াবী (নামাজ বিনষ্টকারী) এবং উখরাবী (গুনাহগার হওয়া) থেকে রহিত করা হয়েছে । অর্থাৎ خطا ও نسيان দ্বারা কোন জিনিস ফাসিদও হবে না এবং আখেরাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গুনাহগার হিসাবে ধার্য করা হবে না । সুতরাং ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভুলবশত কথা বলা দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না । আমাদের দলিল হল : হযরত মু'আবিয়া ইবনে আল হাকাম আসসালামী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস—

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَ اَثْكَلَ اُمَّاهُ مَالِىْ اَرَاكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ شَرًّا فَضَرَبُوْا بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَعَلِمْتُ اَنَّهُمْ يُسَكِّتُوْنَنِىْ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِىْ فَوَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ مَا كَهَرَنِىْ وَلَا زَجَرَنِىْ وَلٰكِنْ قَالَ اِنَّ صَلٰوتَنَا هٰذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَىْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَ اِنَّمَا هِىَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّهْلِيْلُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ -

'তিনি বলেন, আমি মহানবী সা. এর পিছনে নামায পড়েছি । ইত্যবসরে কেহ হাঁচি দিলে আমি বললাম يرحمك الله । তাই লোকেরা আমাকে খুব ক্ষীপ্রদৃষ্টিতে দেখতে লাগল । আমি বললাম তার মাতা তাকে হারিয়ে

ফেলুক। আমার কি হলো আমি দেখছি যে তোমরা আমাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখছ। তারা তাদের রানের উপর হাত মারল। আমি বুঝলাম তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে। অতঃপর রাসূল সা. নামায হতে ফারেগ হয়ে আমাকে ডাকলেন। আল্লাহর কছম আমি তার চাইতে উত্তম শিক্ষক আর কখনও দেখি নাই। তিনি আমাকে ধমকালেন না, ডাটলেনও না, বরং তিনি বললেন, আমাদের এ নামাজ কোন মানুষের কথাবার্তার উপযোগী নয় আর নামায তো তাসবীহ তাহলীল এবং কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া কিছুই নয়।

সুতরাং এ হাদীস থেকে বুঝা গেল নামাযের হক্ব হলো কথা না বলা যেভাবে নামাজের হক হলো পবিত্র হওয়া। তাই যেভাবে তাহারাত ছাড়া নামায হয় না ঠিক তেমনিভাবে নামাযের মধ্যে কথা বললে নামায হয় না দ্বিতীয়তঃ হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম রাযি. ও ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত ইসলামের প্রথম দিকে লোকেরা নামাযে কথা বলত। অতঃপর তা থেকে নিষেধ করা হয়।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিলের জবাব হলো হাদীসটি উখরুয়ীভাবে রহিত হওয়ার উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গুনাহ রহিত হওয়ার উপর প্রযোজ্য। আর যদি দুনিয়াবী হুকুম তথা ফাসিদ না হওয়া উদ্দেশ্য হয় তবে عموم مشترك আবশ্যক হয়। অথচ তা জায়েয নেই। অপর দিকে বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনে কেরাম উক্ত হাদীস সম্পর্কে কথা বলেছেন। যেমন ইবনে মাজা, তিবরানী, আবু নাঈম বলেন, উক্ত হাদীসটি غريب এর পর্যায়ে। আবু হাতেম বলেন, ইহা موضوع। সুতরাং যে হাদীস নিয়ে বিভিন্ন উক্তি উঠল তা দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক নয়।

قوله : وَالْأَنِيْنَ الخ : যদি কেহ নামাজে কাতরায় বা উহ্ আহ্ শব্দ করে, অথবা উচ্চস্বরে কাঁদে তাহলে তা দুই কারণে হতে পারে। (১) জান্নাত অথবা জাহান্নামের স্মরণে হবে অথবা অন্য কারণে হবে। অর্থাৎ কোন দুঃখ বা মুসীবতে হবে। যদি তার এ কাতরানো বা উহ্ আহ্ শব্দ বা কাঁদা জান্নাত বা জাহান্নামের স্মরণে হয়ে থাকে তবে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা, এতে অধিক খুশু-খুজু রয়েছে। এদিকে নামাযের উদ্দেশ্য হইল খুশু-খুজু দ্বিতীয়ত যদি কেহ স্পষ্টভাবে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ বলে ফেলে তবুও নামাজ ফাসেদ হয় না। তাই كناية বা ইশারা ইঙ্গিতের কারণে নামাজ ফাসেদ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর যদি কেহ উহ্ আহ্ শব্দ করে বা উচ্চ আওয়াজে কাঁদে কোন মুসিবতে পড়ে বা দুঃখ বেদনায় তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে আর তাই ইমাম মালিক রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ. এর অভিমত। কারণ তা মানুষের সাধারণ কথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আলোচিত উভয় সুরতের দলিল নিম্নোক্ত اثر টি।

سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ الْاَنِيْنَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَتْ اِنْ كَانَ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَاتَفْسُدُ صَلَاتَهٗ وَ اِنْ كَانَ مِنْ اَلَمٍ تَفْسُدُ وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طُوْبٰى لِلْبُكَّائِيْنَ فِى الصَّلٰوةِ -

হযরত আয়েশা রাযি. কে নামাজের মধ্যে উহ আহ শব্দ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, যদি তা আল্লাহর ভয়ের কারণে হয় তবে নামাজ ফাসিদ হবে না। আর যদি দুঃখ মুসীবতের কারণে হয় তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, নামাজের মধ্যে ক্রন্দনকারীদের সুসংবাদ রয়েছে।

قوله : وَ فَتْحُهٗ عَلٰى غَيْرِ اِمَامِهٖ الخ : নিজ ইমাম ছাড়া অন্যকে লোকমা দেয়া নামাজ ফাসিদের কারণ হয় কেননা, তাতে শিক্ষা দেওয়া পাওয়া গেল। কারণ যিনি লোকমা দিলেন তিনি শিক্ষা দিলেন আর যে লোকমা গ্রহণ করলেন তিনি শিক্ষা গ্রহণ করলেন। আর শিক্ষা দেয়া বা গ্রহণ করা উভয়টি মানুষের কথার মাঝে শামিল আর মানুষের কথা দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়।

ফায়েদা : লোকমা দেওয়া যেহেতু মানুষের কথার অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা নিজ ইমামকে দিলেও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাওয়ার কথা। আর কিয়াস তাই চায়। নিজ ইমামকে লোকমা দেয়া استحسان এর ভিত্তিতে মানুষের কথার অন্তর্ভুক্ত হিসাবে ধরে নেওয়া যায় না। কারণ, এহেন পরিস্থিতিতে লোকমা দেয়া মানে মুক্তাদী স্বীয় নামাজকে

সংশোধন করার নামান্তর। সুতরাং তার লোকমা দেয়াকে তার নামাজের অফতরাল থেকে ধরে নেয়া হবে অর তা মুফসিদে নামাজ নয়। কেননা হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, একবার রাসূল সা. নামাজে কিরাত পড়তে পেছ খেয়ে গেলেন। অতঃপর নামাজ শেষে হযরত কাব রাযি. কে বললেন, তুমি আমাদের সাথে ছিলে? তিনি বললেন, হা। হুজুর সা. বললেন, তবে কেন তুমি লোকমা দাও নি। উক্ত হাদীস দ্বারা নিজ ইমামকে লোকমা দেয়া প্রমাণিত হল। হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সা. এর সময়ে ইমামদেরকে লোকমা দিতাম সুতরাং নিজ ইমামকে লোকমা দেওয়ার কারণে নামায ফাসিদ হবে না।

قوله : وَالْجَوَابُ بِلَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ : যদি নামাজ রত ব্যক্তির সামনে কেহ বলে أإله مع الله আল্লাহর সাথে কি কোন মা'বূদ আছে। প্রতি উত্তরে নামাজী ব্যক্তি বলল, لا إله إلا الله - তখন তার এ বলা দ্বারা যদি আল্লাহর হামদ উদ্দেশ্য হয় অথবা সে যে নামাজে রয়েছে এ সংবাদ দেয়া হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। আর যদি তার এ বলা দ্বারা উক্ত ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দেয় উদ্দেশ্য থাকে, তবে তা মুফসিদ কি না এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং মুহাম্মদ রহ. এর মতে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে নামাজ ফাসিদ হবে না। তাদের দলিল : যেহেতু لا إله إلا الله তা গঠনগত দিক থেকে حمد ও ثناء। সুতরাং তা তার মূলের উপর থাকবে। বক্তার ইচ্ছা দ্বারা তা পরিবর্তন হবে না। যেমন নামাজী যদি তার এ বাক্য দ্বারা নিজের নামাজে থাকার ইচ্ছা করে তবে এর দ্বারা معنى موضوع له এর পরিবর্তন হবে না। এমনিভাবে জবাব দেয়ার অবস্থায়ও معنى موضوع له পরিবর্তন হবে না। আর তা যেহেতু গঠনগতভাবে حمد ও ثناء। আর حمد ও ثناء দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না।

ইমাম আবু হানিফরা রহ. ও মুহাম্মদ রহ. এর দলিল হল : لا إله إلا الله বাক্যটি حمد ও ثناء এবং জবাব উভয়টির সম্ভাবনা রাখে। তাই তা كلام مشترك তথা যৌথ বাক্যের সাদৃশ্য। আর مشترك বাক্যকে কোন قرينه এর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা জরুরী। বিধায় এখানে ইরাদা একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করা জায়েয। সুতরাং মুসল্লী যখন জবাবের ইচ্ছা করেছে তখন এ বাক্যকে জবাবই ধরা হবে। কেননা يرحمك الله যেহেতু হাচির জবাব হওয়ার কারণে তা নামাজ ভঙ্গের কারণ হল তেমনি উক্ত বাক্য জবাব হয়ে নামাজ ভঙ্গের কারণ হল। (উপরোক্ত আলোচনা থেকেই বিপরীত মতের দলিলের জবাব স্পষ্ট হয়ে গেল বিধায় নতুন করে লিখার প্রয়োজন মনে করি না।)

وَافْتِتَاحُ الْعَصْرِ أَوِ التَّطَوُّعِ لَا الظُّهْرِ بَعْدَ رَكْعَةِ الظُّهْرِ وَقِرَاءَتُهُ مِنْ مُصْحَفٍ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكْتُوبٍ وَفَهِمَهُ أَوْ أَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ أَوْ مَرَّ مَارٌّ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ لَا تَفْسُدُ وَإِنْ أَثِمَ -

অনুবাদ : এবং জুহরের এক রাকাত পড়ার পর জুহর ভিন্ন আছর বা নফল শুরু করা দ্বারা (জুহরের নামাজকে ফাসেদ করে দিবে) নামাজী কুরআন দেখে পড়া (নামাজ ফাসেদ করে দেবে) খাওয়া বা পান করা মুসল্লি কুরআন ব্যতীত) অন্য কোন কিছুর দিকে দৃষ্টি দেয় আর বিষয় বস্তু (মুখে না পড়ে) বুঝে ফেলে, তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে নামাজ ফাসেদ হবে না।) কিংবা দাতের মাঝে আটকে যাওয়া কোন খাদ্য দ্রব্য খেয়ে ফেলে, (তবে নামাজ ফাসেদ হবে না) কিংবা কেহ তার সিজদার স্থান দিয়ে অতিক্রম করে তবে নামাজ ফাসেদ হবে না। যদিও অতিক্রমকারী গুনাহগার হয়। (অর্থাৎ নামাজীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা গুনাহ, তথাপি নামাজীর নামাজ ফাসেদ হবে না।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ افْتِتَاحُ الْعَصْرِ الخ : যদি কেহ কোন নামাজের এক রাকাত পড়ে অন্য নামাজের নিয়্যাত করে যথা নিয়মে তা আদায় করতে লাগে তবে প্রথম নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। যদিও এ নিয়্যাত মনে মনে হয়ে থাকে মুখ দ্বারা উচ্চারণ না করে এবং কান পর্যন্ত হাতও না ওঠায়, যেমন কেহ জোহরের নামাজ শুরু করল অতঃপর এক রাকাত পড়ার পর সে আছর বা নফল নামাজের নিয়্যাত করল। তাহলে এ সুরতে তার প্রথম নামাজ তথা জোহরের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। দলিল হল : এভাবে দ্বিতীয় নামাজ শুরু করা শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে সহীহ হয়েছে। আর দ্বিতীয় নামাজ শুরু করার দ্বারা প্রথম নামাজ থেকে বের হওয়া প্রয়োজন। একারণে প্রথম নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

قوله : وَ قِرَاءَتُهُ مِنْ مُصْحَفٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তি নামাজে কুরআন শরীফ দেখে পড়ে তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। তার এ পড়াটা কম হউক বা বেশী। ইহা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতামত। আর সাহাবাইন রহ. এর মতে তার নামাজ মাকরূহের সাথে আদায় হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এর মতে মাকরূহ ছাড়াই নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। সাহাবাইন রহ. এর দলিল : কুরআন শরীফ পাঠ করা একটা ইবাদত। আর কুরআন শরীফ দেখে পড়াও একটি ইবাদত। সুতরাং দু' ইবাদত যুক্ত হওয়া দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। দ্বিতীয় দলিল : হযরত যাকওয়ান রাযি. এর হাদীস, (হযরত যাকওয়ান রাযি. হলেন হযরত আয়েশা রাযি. এর আজাদকৃত গোলাম।)

أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ عَائِشَةَ فِيْ رَمَضَانَ وَ كَانَ يَقْرَأُ مِنَ الْمُصْحَفِ

'তিনি রমজান মাসে হযরত আয়েশা রাযি. এর ইমামতি করতেন এবং মাছহাফ থেকে পড়তেন। আর মাকরূহ হওয়ার কারণ হল আহলে কিতাবীরা দেখে দেখে পড়ে। সুতরাং তাদের সাদৃশ্য হয়ে গেল, এদিকে আমাদের আহলে কিতাবীদের সাদৃশ্য করা থেকে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা নিষেধ করা হয়েছে। তাই যে অবস্থায় আহলে কিতাদীদের সাদৃশ্যতা ছাড়াটা সম্ভবপর হয়, তা ছেড়ে দিতে হবে, তাদের মত করা মাকরূহ। **ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল :** কুরআন শরীফ বহন করা, দেখা, পাতা উল্টানো সব মিলিয়ে আমলে কাছিরের পর্যায়ে, আর আমলে কাছির দ্বারা নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। সুতরাং এ অবস্থায়ও নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত কুরআন দেখে পড়া কুরআন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার নামান্তর। আর নামাজের অভ্যন্তরে শিক্ষাগ্রহন করা বা শিক্ষা দেয়া উভয়টি দ্বারা নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। বিধায় নামাজে কুরআন দেখে পড়া দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে

قوله : وَلَوْ نَظَرَ اِلٰى مَكْتُوْبٍ الخ : নামাজান্তে কোন ব্যক্তি কুরআন ছাড়া অন্য কোন কিছু লেখা দেখল এবং তা মুখ দ্বারা উচ্চারণ ছাড়া তার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলল তবে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা, তাতে আমলে কাছির পাওয়া যায় নাই, বিধায় তার নামায ফাসিদ হয় নাই।

قوله : أَوْ مَرَّ مَارٌّ فِيْ مَوْضَعِ الخ : নামাজীর সামনে দিয়ে কোন কিছুর অতিক্রম করা দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না। তবে আহলে যাওয়াহীর বলেন, নামাজীর সামনে দিয়ে মহিলা, গাধা, কুকুর অতিক্রম দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর একটি রিওয়ায়াত হল কাল রং এর কুকুর অতিক্রম দ্বারা নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। তার থেকে স্ত্রীলোক ও গাধার ব্যাপারে এমন একটি রিওয়ায়াত রয়েছে। অর্থাৎ নামাজীর সামনে দিয়ে স্ত্রীলোক, গাধা অতিক্রম দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। আহলে জাওয়াহীরদের দলিল হল, হযরত আবু জার গীফারী রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রাসূলুল্লাহ্ সা. এর বাণী—

تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ الصَّلٰوةَ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ

'স্ত্রীলোক, কুকুর ও গাধা নামাজ বিচ্ছিন্নকারী।'

জমহুর উলামায়ে কেরামগণের দলিল : রাসূলুল্লাহ্ সা. এর বাণী—

لَايَقْطَعُ الصَّلٰوةَ مُرُوْرُ شَيْءٍ فَادْرَؤُا مَااسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّهُ الشَّيْطَانُ

'কোন কিছুর অতিক্রমে নামাজ ভঙ্গ করে না যতটুকু সম্ভব তা প্রতিহত কর, কেননা, তা শয়তান।' জমহুরের পক্ষ থেকে আহলে জাওয়াহীরদে উপস্থাপিত হযরত আবু যর গিফারী রাযি. এর হাদীসের জবাব : যখন হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট উক্ত হাদীসটি পৌছল তখন তিনি তা অস্বীকার করলেন এবং হযরত উরওয়াকে বললেন—

يَا عُرْوَةُ مَاذَا يَقُوْلُ اَهْلُ الْعِرَاقِ قَالَ يَقُوْلُوْنَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ مُرُوْرُ الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ فَقَالَتْ يَااَهْلَ الْعِرَاقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ قَرَنْتُمُوْنَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمُرِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَ اَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ فَاِذَا سَجَدَ حَبَسْتُ رِجْلِيْ وَاِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا -

'হে উরওয়া! ইরাকবাসী কি বলে? উরওয়া বললেন, ইরাকবাসী বলে মহিলা, গাধা এবং কুকুরের চলাচল দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা রাযি. (তা শ্রবণ করে) বললেন, ওহে আহলে ইরাক— الشاق، النفاق তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার সাথে মিলিয়ে দিয়েছ। রাসূল সা. রাতে নামাজ পড়তেন আর আমি তার সামনে জানাযার ন্যায় পড়ে থাকতাম। যখন তিনি সিজদায় ঝুঁকতেন আমি পাগুলো টেনে নিতাম, আবার যখন তিনি দাঁড়াতেন আমি পাগুলো ছড়িয়ে দিতাম।'

সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, হযরত আয়েশা রাযি. হযরত আবু যর রাযি. এর হাদীসখানা কঠোরভাবে বর্জন করেছেন। তাই উক্ত হাদীসটি দলিল হতে পারে না।

قوله : وَاِنْ اَثِمَ الخ : নামাজীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা গুনাহের কাজ। এখন প্রশ্ন জাগে সামনে বলতে কতটুকু? এর জবাব হল নামাজীর পা থেকে নিয়ে তার সিজদার স্থান পর্যন্ত। এটুকুর ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। আর এ মতকেই শামছুল আইম্মা আসসারাখসী, শায়খুল ইসলাম, কাজীখান প্রমুখ গ্রহণ করেছেন।

وَكُرِهَ عَبَثُهُ بِثَوْبِهِ وَ بَدَنِهِ وَ قَلْبُ الْحَصٰى اِلَّا لِلسُّجُوْدِ مَرَّةً وَ فَرْقَعَةُ الْاَصَابِعِ وَالتَّخَصُّرُ وَالْاِلْتِفَاتُ وَالْاِقْعَاءُ وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ وَ رَدُّ السَّلَامِ بِيَدِهِ وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذْرٍ وَ عَقْصُ شَعْرِهِ وَ كَفُّ ثَوْبِهِ وَ سَدْلُهُ وَالتَّثَاؤُبُ وَ تَغْمِيْضُ عَيْنَيْهِ وَ قِيَامُ الْاِمَامِ لَا سُجُوْدُهُ فِي الطَّاقِ وَ اِنْفِرَادُ الْاِمَامِ عَلَى الدُّكَّانِ وَ عَكْسُهُ -

অনুবাদ : নামাজী তার কাপড় অথবা শরীর দ্বারা খেলা করা (মাকরূহ), নুড়ী পাথর সরানো (মাকরূহ) তবে সিজদার জন্য একবার সরাতে পারবে, আঙ্গুল মটকানো (মাকরূহ), কোমরে হাত রাখা (মাকরূহ) এদিকে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা (মাকরূহ), হাঁটু তুলে বসা (মাকরূহ), (সিজদার সময়) ডানা ভূমিতে বিছিয়ে রাখা (মাকরূহ), হাত দ্বারা সালামের জবাব দেয়া (মাকরূহ), উজর ছাড়া আসন করে বসা (মাকরূহ), চুল ঝুটি করা (মাকরূহ), নামাজীর কাপড় গুটিয়ে রাখা (মাকরূহ), কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া (মাকরূহ), হাই তোলা (মাকরূহ), চোখ বন্ধ করা (মাকরূহ), ইমাম মেহরাবে দাঁড়ানো (মাকরূহ) তবে মিহরাবে সিজদা করতে অসুবিধা নেই। ইমাম একা উঁচু স্থানে দাঁড়ানো (মাকরূহ) এবং তার বিপরীত অবস্থাটাও (মাকরূহ) (অর্থাৎ শুধু মুক্তাদীবৃন্দ উঁচু স্থানে দাঁড়ানো) মাকরূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ كُرِهَ عَبْثُهُ الخ : নামাজরত অবস্থায় নিজ কাপড় নিয়ে বা শরীরের কোন অংশ নিয়ে খেলা করা মাকরূহ। কেননা, রাসূল সা. বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস মাকরূহ করেছেন তন্মধ্যে একটি হল নামাজে খেলা করা, দ্বিতীয়টি হল রোযা অবস্থায় খারাপ কথা বলা আর তৃতীয়টি হল কবরস্থানে গিয়ে অট্টহাসি দেয়া। দ্বিতীয়তঃ فعل عبث যা নামাজের বাইরে হারাম। সুতরাং তা নামাজ অবস্থায় নিষিদ্ধ না হয়ে কি হবে।

قوله : وَقَلْبُ الْحَصَى الخ : নামাজরত অবস্থায় পাথরকণা সরানো যাবে না। কেননা, তা অনর্থক কাজের মধ্যে গণ্য। তবে সিজদার স্থান থেকে একবার সরানোর অনুমতি আছে। দলিল : হযরত আবু যর রাযি. এর বর্ণিত হাদীস—

سَئَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصٰى فَقَالَ وَاحِدَةً أَوْدَعْ

(হযরত আবু যর রাযি. বলেন,) আমি রাসূল সা. কে প্রত্যেক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি। এমনকি আমি পাথর কণা সরানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। হুজুর সা. বলেছেন, একবার নতুবা বাদ দাও।

দ্বিতীয় দলিল : হযরত মুআইকীব রাযি. থেকে বর্ণিত—

اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْسَحِ الْحَصٰى وَاَنْتَ تُصَلِّيْ فَاِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلُهُ فَوَاحِدَةً

'রাসূল সা. বলেন, পাথর কণা সরাবে না, তবে যদি জরুরত হয়েই পড়ে তবে একবার সরাবে।' কিয়াসের চাহিদাও তাই। কারণ পাথর কণা সরানোর মাধ্যমে নিজের নামাজ সংশোধন করা হয়। তাই তা সরানো মাকরূহ হবে না। তবে বার বার সরানো মাকরূহ।

قوله : وَالتَّخَصُّرُ الخ : تخصر এর ব্যাখ্যা হল কোমরে হাত রাখা। কেহ কেহ বলেন, تخصر হল লাঠির উপর ভর করা। আবার কেহ কেহ বলেন, تخصر হল তিলাওয়াতের মধ্যে সিজদার আয়াত বাদ দিয়ে পড়া। মোটকথা নামাজরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখা মাকরূহ। কেননা, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত : اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ اِخْتِصَارِ الصَّلٰوةِ 'হুজুর সা. নামাজ রত অবস্থায় কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন।' যুক্তিনির্ভর কথা হল কোমরে হাত রাখা দ্বারা সুন্নত তরিকা ছাড়া আবশ্যক আসে। বিধায় তা মাকরূহের অন্তর্ভুক্ত।

قوله : وَالْاِلْتِفَاتُ الخ : নামাজে এদিক সেদিন দৃষ্টি ফিরানো ঘাড় বাঁকা করে, তা মাকরূহ। দলিল হল, রাসূল সা. ইরশাদ করেন- যদি নামাজী জানত যে সে কার সাথে কথোপকথন করছে তবে সে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করত না। অন্যত্র ইরশাদ করেন—

اِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجِهُ الْعَبْدَ مَادَامَ فِيْ صَلَاتِهِ فَاِذَا الْتَفَتَ اَعْرَضَ عَنْهُ

'আল্লাহর রহমত বান্দার দিকে নিবদ্ধ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজে থাকে। অতঃপর যখন সে অন্যদিকে তাকায় তখন আল্লাহ তার দিক থেকে (রহমতের নজর) ফিরিয়ে নেন।'

আকলী দলিল হল, ঘাড় ফিরানো দ্বারা শরীরের একটি অংশ ক্বিবলা থেকে ফিরে যায় আর এ ফিরে যাওয়াটা মাকরূহ। কেননা, যদি শরীর ক্বিবলা থেকে ফিরে যায় তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

قوله : وَالْاِقْعَاءُ وَاِفْتِرَاشُ الخ : الاقعاء এর ব্যাখ্যা দু ধরণের। ইমাম তাহাবী রহ. এর বর্ণনা মতে اقعاء হল নিজের নিতম্বের উপর বসা। উভয় রাণ দাড় করে রাখা, উভয় হাটু সিনার সাথে মিলিয়ে রাখা। আর উভয় হাত মাটিতে রাখা। এ ব্যাখ্যাটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ, হেদায়া গ্রন্থকার এটাই গ্রহন করেছেন। দ্বিতীয় মতটি হল ইমাম কারখী রহ. এর। তিনি বলেন اقعاء হল নিজের উভয় পা দাঁড় করে রাখা। নিতম্বের উপর বসা এবং উভয় হাত

মাটিতে রাখা। গ্রন্থকার বলেন, হাটু তুলে বসা এবং সিজদায় উভয় হাত মাটিতে বিছিয়ে রাখা মাকরূহ। দলিল নিম্নরূপ। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর বর্ণিত হাদীস—

نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ نَقْرَةٍ كَنُقْرَةِ الدِّيْكِ وَاقْعَاءٍ كَاقْعَاءِ الكَلْبِ وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ -

'রাসূল সা. আমাকে তিনটি জিনিস হতে নিষেধ করেছেন। মুরগের ন্যায় ঠোকর মারা থেকে, অর্থাৎ সিজদা এমনভাবে করা যেন মোরগ ঠোকর মারে, দুই- কুকরের মত বসা থেকে। তিন- শিয়ালের ন্যায় এদিক সেদিক তাকানো থেকে।'

قوله : وَرَدَّ السَّلَامَ الخ : সরাসরি সালামের জবাব দেয়া নামাজ ফাসিদ হওয়ার কারণ। আর হাত দ্বারা সালামের জবাব দেয়া মাকরূহ। কেননা, এটাও পরোক্ষভাবে সালাম।

قوله : وَتَرَبُّعٌ بِلَا عُذْرٍ الخ : নামাজান্তে চার জানু হয়ে বসা মাকরূহ। কেননা, এ ধরণের বসার মাধ্যমে বসার সঠিক সুন্নাত তরিকা আদায় হয় না। অপর দিকে এ ধরণের বসা অহঙ্কারীদের চিহ্ন। এরকম বসা তায়াজু ও নম্রতা প্রকাশ পায় না। সুতরাং নামাজে আসন ধরে বসা মাকরূহ।

قوله : وَ عَقْصُ شَعْرِهِ الخ : নামাজে পুরুষেরা চুলে ঝুটি বাধা মাকরূহ। দলিল : হযরত আবু রাফে রাযি. সূত্রে বর্ণিত হাদীস—

قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ رَأْسُهُ مَعْقُوْصٌ

'রাসূলুল্লাহ্ সা. পুরুষদেরকে চুলের ঝুটি করা অবস্থায় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।' অন্যত্র রাসূল সা. বলেন—

أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَ اِنْ لَا اَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا -

'আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে এবং নিষেধ করা হয়েছে চুল ঝুটি করতে ও কাপড় গুটাতে।'

قوله : وَ كَفُّ ثَوْبِهِ الخ : নামাজে কাপড়গুটিয়ে রাখা মাকরূহ এদিকে কাপড় যদি মাটিতে পড়ে থাকে তবে তা বাধা দান না করা, আর কাপড় অযথা ঝুলিয়ে রাখা মাকরূহ। কেননা, উভয় অবস্থাতেই অহঙ্কার প্রকাশ পায়। দলিলে নকলী হল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. সূত্রে বর্ণিত হাদীস—

اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلٰوةِ وَ اَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ

'রাসূল সা. নামাজে সদল করতে নিষেধ করেছেন এবং পুরুষদেরকে মুখ ঢাকতে নিষেধ করেছেন।'

قوله : وَ قِيَامُ الْاِمَامِ الخ : ইমাম মেহরাবে দাড়ালে নামাজ মাকরূহ হবে। অর্থাৎ যদি ইমামের পাদ্বয় মেহরাবের ভেতরে হয় তবে তা মাকরূহ। কেননা এতে আহলে কিতাবীদের সাদৃশ্যতা হয়ে যায়। আহলে কিতাবীরা ইমামের জন্য পৃথক স্থানের ব্যবস্থা করে। আর যদি ইমামের পা মসজিদে থাকে আর তার সিজদা মেহরাবে হয় তবে তা মাকরূহ হবে না। কেননা, ইমামের পা মেহরাবের বাহিরে থাকায় ইমাম ও মুক্তাদি সমান সমান পাওয়া গেল এবং আহলে কিতাবীদের সাদৃশ্যতা পাওয়া গেল না বিধায় মাকরূহ হবে না।

قوله : وَانْفِرَادُ الْاِمَامِ الخ : ইমাম একা উঁচু স্থানে দাঁড়ানো বা মুক্তাদীগণ কোন উঁচু স্থানে দাঁড়ানো। আর ইমাম একা নিম্নভূমিতে থাকা মাকরূহ। কারণ, ইহা দ্বারাও ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর যদি ইমামের সাথে (নিম্নে হউক বা উর্ধ্বে হউক) কিছু মুক্তাদী থাকে তবে তা মাকরূহ হবে না। কারণ এতে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য হয় না।

وَلُبْسُ ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ وَأَنْ يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِحِذَائِهِ صُورَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً أَوْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ أَوْ لِغَيْرِ ذِي رُوحٍ وَعَدُّ الْآيِ وَالتَّسْبِيحُ لَا قَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالصَّلَاةُ إِلَى ظَهْرِ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ وَإِلَى مُصْحَفٍ أَوْ سَيْفٍ مُعَلَّقٍ أَوْ شَمْعٍ أَوْ سِرَاجٍ وَعَلَى بِسَاطٍ فيه تَصَاوِيرُ إِنْ لم يَسْجُدْ عليها -

অনুবাদ : (নামাজের মধ্যে) এমন কাপড় পরিধান করা যাতে প্রাণীর ছবি রয়েছে, আর তা হওয়া (তথা ছবি) মাথার উপরে কিংবা সামনে অথবা বরাবর (সর্বাবস্থায় নামাজ মাকরূহ) আর যদি ছবি অতি ছোট হয় অথবা মাথা কাটা হয় বা অপ্রাণীর ছবি হয় তবে নামাজ মাকরূহ হবে না। আর (নামাজের মধ্যে) আয়াত ও তাসবীহ গণনা করা (মাকরূহ) এবং (নামাজে) সাপ ও বিচ্ছু হত্যা করা (মাকরূহ নয়)। আলাপরত ব্যক্তির পিঠ সামনে রেখে নামাজ আদায় করা (মাকরূহ নয়) এবং ঝুলন্ত কুরআন শরীফ বা তলোয়ার কিংবা মোমবাতি, অথবা প্রদিপ সামনে রেখে (নামাজ আদায় করা মাকরূহ নয়) কিংবা এমন বিছানায় যাতে ছবি রয়েছে তাতে (নামাজ আদায় করা) মাকরূহ নয়। যদি তাতে সিজদা না করা হয় (অর্থাৎ ছবির উপর যদি সিজদা না করা হয়।)

শব্দার্থ : تَصَاوِيرُ ইহা تَصْوِيرٌ এর বহুবচন, অর্থ- ছবি, মূর্তি। حِذَاء - সামনে, সম্মুখে। مَقْطُوعَةُ الرَّأْسِ মাথা কাটা। الْآيِ ইহা اية এর বহুবচন, অর্থ- কুরআনের আয়াত। اَلْحَيَّةُ - সাপ। اَلْعَقْرَبُ - বিচ্ছু। مُصْحَفٌ (ج) مَصَاحِفُ - গ্রন্থ, বই, কোরআনের কপি। سَيْفٌ (ج) سُيُوفٌ - তরবারী। شَمْعٌ (ج) شُمُوعٌ - মোমবাতি। سِرَاجٌ (ج) سُرُجٌ - প্রদিপ, চেরাগ। بِسَاطٌ (ج) بُسُطٌ - বিছানা, শয্যা, কার্পেট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা মাকরূহ। কারণ এর দ্বারা সে ছবি বহনকারীর সাদৃশ্য হয়ে যায়। এমনিভাবে নামাজির মাথার উপর, সামনে অথবা বরাবর ছবি থাকে তবুও নামাজ মাকরূহ। দলিল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদীস—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ جِبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اُدْخُلْ فَقَالَ كَيْفَ اَدْخُلُ وَفِىْ بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ اِمَّا اَنْ تَقْلَعَ رَأْسَهَا اَوْ تَجْعَلَ بِسَاطًا يُوْطَا فَاِنَّ مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَايَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ -

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, জিব্রায়ীল আ. আল্লাহর নবীর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নবীজী সা. বললেন, প্রবেশ করুন। জিব্রাইল আ. বললেন, কিভাবে প্রবেশ করব। আপনার ঘরে পর্দা রয়েছে, যাতে ছবি রয়েছে। সুতরাং তার মাথা কাটা হউক বা তাকে পদদলিত করা হউক। কেননা, আমরা ফিরিস্তারা এমন ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে ছবি রয়েছে। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হল, যে স্থানে ছবি থাকে সে স্থানে ফিরিস্তা প্রবেশ করেন না। আর যেখানে ফিরিস্তা প্রবেশ করেন না সে স্থান নিকৃষ্টতম। আর এ ধরণের নিকৃষ্টতম স্থানে নামাজ পড়া মাকরূহ। ছবি যদি এত ছোট হয় যে সচরাচর তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি পড়ে না, তাহলে নামাজ মাকরূহ হবে না। কেননা, এত ছোট ছবি যে, তার পুজা করা হয় না। সুতরাং একারণে এ ধরণের ছবি মূর্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যদি ছবির মাথা কর্তিত হয়, অর্থাৎ মাথা সম্পূর্ণভাবে কেটে ফেলা হয়। তবে এরকম ছবি নিয়ে নামায পড়া মাকরূহ নয়, কারণ ইহা ছবি নয়, বরং جمادات তথা প্রাণহীন বস্তুর সাদৃশ্য।

قوله : لَاقَتْلَ الْحَيَّةِ الخ : নামাজান্তে সাপ, বিচ্ছু হত্যা করা জায়েয আছে। কেননা রাসূল সা. ইরশাদ করেন— اُقْتُلُوا الاَسْوَدَيْنِ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِى الصَّلٰوةِ 'তোমরা দুই কাল (সাপ বিচ্ছু) মেরে ফেল যদিও নামাজে হও।'

আক্বলী দলিল হল : নামাজীর দৃষ্টি যতক্ষণ পর্যন্ত তার দিকে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তর দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। তাই তাকে মেরে ফেলার দ্বারা নামাজে হুজুরে ক্বালব সৃষ্টি হয়। সুতরাং তাকে মেরে ফেলার নির্দেশ করা হয়েছে।

قوله : والصَّلٰوةُ عَلٰى ظَهْرِ قَاعِدٍ الخ : কোন ব্যক্তির পিঠের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করা মাকরূহ নয় যদিও সে কথাবার্তা বলছে।

প্রমাণ হল : হযরত উমর রাযি. সফর ইত্যাদিতে সুতরার জন্য কিছু না পেলে স্বীয় আযাদকৃত গোলাম নাফে রাযি. কে বলতেন স্বীয় পিঠ ফিরিয়ে দাও। হা যদি অন্য কারো চেহারার দিকে ফিরে নামাজ পড়া হয় তবে নামাজ মাকরূহ হবে। দলিল হিসাবে হযরত উমর রাযি. বর্ণিত আছারটি উপস্থাপন করা যায় যে—

اَنَّ عُمَرَ رض رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى اِلٰى وَجْهِ غَيْرِهٖ فَعَزَّرَهُمَا بِالدُّرَّةِ وَ قَالَ لِلْمُصَلِّى اَتَسْتَقْبِلُ صُوْرَةً فِى صَلَاتِكَ وَ قَالَ لِلْقَاعِدِ اَتَسْتَقْبِلُ الْمُصَلِّى بِوَجْهِكَ -

হযরত ওমর রাযি. এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে অন্য এক ব্যক্তির চেহারার দিকে ফিরে নামাজ পড়ছে। তিনি উভয়কে দুররা মারলেন। অতঃপর নামাজী ব্যক্তিকে বললেন, তুমি স্বীয় নামাজে ছবির ইস্তিকবার করো। আর বসা ব্যক্তিকে বললেন, তুমি তোমার চেহারা দ্বারা মুসল্লির ইস্তিকবাল করতেছ। উক্ত ঘটনা থেকে বুঝা গেল অন্যের চেহারার দিকে নিজের মুখ করে নামাজ পড়া মাকরূহ। তা না হলে হযরত উমর রাযি. এত কঠোরতা করতেন না।

فَصْلٌ : كُرِهَ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ فِى الْخَلَاءِ وَ اِسْتِدْبَارُهَا وَ غَلْقُ بَابِ الْمَسْجِدِ وَالْوَطْئُ فَوْقَهُ وَالْبَوْلُ وَالتَّخَلِّى لَا فَوْقَ بَيْتٍ فِيْهِ مَسْجِدٌ وَلَا نَقْشُهُ بِالْجَصِّ وَمَاءِ الذَّهَبِ

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : টয়লেটে লজ্জাস্থান ক্বিবলামুখী করে বসা ও ক্বিবলার দিককে পিছন দিয়ে বসা. (মাকরূহ) মসজিদের দরজা তালাবদ্ধ রাখা, (মাকরূহ) মসজিদের উপর স্ত্রী সহবাস করা (মাকরূহ) পেশাব করা ও পায়খানা করা মাকরূহ। তবে ঐ ঘরের ছাদে এসব করা মাকরূহ নয় যার নিচে মসজিদ রয়েছে। (তেমনি) মসজিদ চুনকাম করা বা স্বর্ণের পানি দ্বারা কারুকার্য করা মাকরূহ নয়।

শব্দার্থ : اَلْخَلَاءُ - শূন্যতা, খোলা জায়গা, টয়লেট (Toilet)। اِسْتِدْبَارٌ - পিছনে রাখা, পৃষ্টপ্রদর্শন করা। غَلْقٌ (ج) اَغْلَاقٌ - তালা, তালাবদ্ধ। نَقْشٌ - কারুকার্য। جَصٌّ - চুন, প্লাষ্টার, (Plaster) ذَهَبٌ - স্বর্ণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

মলমূত্র ত্যাগের সময় নিজ লজ্জাস্থান কিবলামুখী করা মাকরূহে তাহরীমি। আর এ ত্যাগ করা খোলা মাঠে হউক বা ঘরে হউক। সামনে পর্দা থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় ক্বিবলাকে সামনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহে তাহরিমী। দলিল : হযরত সালমান ফারসী রাযি. এর বর্ণিত হাদীসখানা—

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لَهٗ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى الْخَرَاءَةَ قَالَ اَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ -

হযরত সালমান ফারেসী রাযি. বলেন, কেহ তাকে বলল, তোমাদের নবী তোমাদেরকে সব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন কি পেশাব-পায়খানা করারও? হযরত সালমান ফারেসী রাযি. বললেন, জী হাঁ! আমাদের নবী

আমাদেরকে পেশাব-পায়খানা করতে ক্বিবলামুখী হতে নিষেধ করেছেন। অন্যত্র হুজুর সা. ইরশাদ করেন—

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَّلَا بَوْلٍ وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا وَ غَرِّبُوْا - (ابوداود)

'যখন তোমরা পেশাব পায়খানায় যাবে তখন তোমরা পায়খানায় বা পেশাবে ক্বিবলাকে সামনে রাখবে না তবে পূর্ব-পশ্চিম দিকে ফিরতে পার।' উক্ত হাদীসে شرقوا و غربوا এ হুকুম মদীনাবাসীদের জন্য নিদৃষ্ট। কারণ মদীনা থেকে ক্বাবা শরীফ দক্ষিনে। আর আমরা যারা ক্বাবা শরীফের পূর্বে রয়েছি তাদের ক্ষেত্রে হুকুম হল وَلٰكِن شَمِّلُوْا وَ جَنِّبُوْا - অর্থাৎ উত্তর দিকে ফিরবে নতুবা দক্ষিন দিকে ফিরবে। সুতরাং উপরোক্ত দলিল দ্বারা প্রমাণিত হল ক্বিবলাকে সামনে রেখে قضاء حاجت অর্থাৎ মলমুত্র ত্যাগের সময় নিজ লজ্জাস্থান ক্বিবলামুখী করা মাকরূহে তাহরীমী। পায়খানা পেশাবের সময় ক্বাবাকে পিছনে রাখার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। (১) استدبار قبلة মাকরূহ। একারণে যে যেভাবে استقبال قبلة দ্বারা ক্বাবার অসম্মান প্রদর্শন হয় তেমনি استدبار দ্বারাও সম্মান তরক করা হয়। (২) দ্বিতীয় মতানুযায়ী استدبار قبلة মাকরূহ নয়। কারণ ক্বিবলাকে পিছন দিয়ে বসাতে লজ্জাস্থান ক্বিবলামুখী হল না বিধায় মাকরূহ হবে না।

قوله : وَ غَلْقُ بَابِ الْمَسْجِدِ الخ : মসজিদ তালাবদ্ধ করা মাকরূহ। কারণ তালাবদ্ধ করার দরুন তা নামাজ থেকে নিষেধ করার মতই। আর নামাজ থেকে নিষেধ করা হারাম। কোন কোন ফক্বীহ বলেন, মসজিদের আসবাবপত্র চুরি হওয়ার ভয় থাকলে নামাজের ওয়াক্ত ছাড়া মসজিদ তালাবদ্ধ করা মাকরূহ নয়। কেননা, কালের পরিবর্তনে মানুষের অবস্থারও পরিবর্তন হয়ে গেছে। বর্তমান যামানার মানুষ মসজিদ তালাবদ্ধ থাকলেও তার তালা ভেঙ্গে মসজিদের আসবাবপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে যদি মসজিদ খোলা রাখা হয় তবে মসজিদের সকল আসবাবপত্র চুরি হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বিধায় নামাজের ওয়াক্ত ছাড়া অন্য সময় মসজিদ তালাবদ্ধ রাখা মাকরূহ হবে না। যেমন, ইসলামের প্রথম যোগে মহিলারা মসজিদে যাবার অনুমতি ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করা জায়েয আছে ফিৎনার আশংকায়। অদ্রূপ বর্তমান জামানায় নামাজের ওয়াক্ত ছাড়া মসজিদ তালাবদ্ধ করা জায়েয।

قوله : وَالْوَطْئُ الخ : মসজিদের ছাদে স্ত্রী সহবাস করা, পেশাব করা, পায়খানা করা সবই মাকরূহে তাহরীমী। কারণ, মসজিদের ছাদ মসজিদের হুকুমভুক্ত। একারণেই যুনুবী ব্যক্তি যেভাবে মসজিদের ভেতর যাওয়া যায়েজ নেই, তেমনি ছাদে যাওয়া জায়েয নেই। মুতাক্বিফ যদি মসজিদের ছাদে যায় তবে তার ইতিক্বাফ বাতিল হবে না। সুতরাং বুঝা গেল মসজিদের ছাদ মসজিদের হুকুম ভুক্ত।

قوله : وَلَا نَقْشُهُ الخ : **মসজিদ কারুকার্য করার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেহ কেহ বলেন,** মসজিদ কারুকার্য করা মাকরূহ। দলিল : একবার হযরত আলী রাযি. এক সুসজ্জিত মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তা দেখে তিনি বললেন, لمن هذه البيعة 'এ গির্জাটি কার'। হযরত আলী রাযি. এর এরকম বলা দ্বারা মাকরূহ প্রতিয়মান হয়। এমনিভাবে হুজুর সা. মসজিদকে সুসজ্জিত করাকে কিয়ামতের আলামত বলে অভিহিত করেছেন। ফুক্বাহায়ে আহনাফের মতে মসজিদ সুসজ্জিত করা মাকরূহ নয়। কারণ ফারূকে আযম হযরত উমর রাযি.তার খিলাফত কালে মসজিদে নববী সম্প্রসারণ করেছেন এবং সুসজ্জিত করেছেন।

দলিলে আক্বলী হল : মসজিদ মনোরম ও সুসজ্জিত থাকলে মানুষের চাহিদা মসজিদের দিকে থাকবে অধিক। তাই জামাতে লোকের সমাগম থাকবে বেশী। মানুষ এতেকাফও করবে অধিক হারে। বিধায় মসজিদ সুসজ্জিত করা উত্তম কাজ।

بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ

পরিচ্ছেদ : বিতর ও নফল নামাযসমূহের বিবরণ

الْوِتْرُ وَاجِبٌ وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَقَنَتَ فِي ثَالِثَتِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَبَدًا بَعْدَ أَنْ كَبَّرَ -

---

অনুবাদ : বিতর নামাজ ওয়াজিব, আর তা হলো তিন রাকাত এক সালামে। আর বিতরের তৃতীয় রাকাতে তাকবীর বলার পর রুকুর পূর্বে সর্বদা কুনুত পড়বে।

শব্দার্থ : اَلْوِتْرُ - বেজোড় (সংখ্যা)। وَتَرَ (ض) وِتْرٌ - বেজোড় করা, সঙ্গীহীন করা, যেহেতু বিতির নামায বেজোড়, তথা তিন রাকাত বিধায় এ নামাযের নাম وِتْرٌ করে নামকরণ করা হয়েছে। نَوَافِلُ (ج) نَفْلٌ অতিরিক্ত, নফল নামায পড়া। قَنَتَ (ن) قُنُوْتًا - (আল্লাহর) আনুগত্য করা, এবাদত করা, (দুয়ায়ে কুনূত পড়া)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

গ্রন্থকার রহ. এতক্ষণ পর্যন্ত ফরয নামাযের এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির আলোচনা করেছেন। এখান থেকে ওয়াজিব ও নফল নামাযের আলোচনা শুরু করেছেন।

قوله : اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ الخ : বিতর নামাযের হুকুম : বিতর নামাযের হুকুম সম্পর্কে ইমামে আ'যম আবু হানিফা রহ. থেকে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। (১) বিতর ওয়াজিব। (২) বিতর সুন্নাতে মুআক্কাদা। আর ইহার প্রবক্তা সাহাবাইন ও ইমাম শাফেয়ী রহ.। (৩) বিতর ফরয। আর ইহা ইমাম যুফার রহ. গ্রহণ করেছেন।

সাহাবাইন ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিল : বিতর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা। কারণ, তাতে সুন্নাতের সাদৃশ্যতা রয়েছে। যেমন বিতর নামাজের ক্ষেত্রে আযান একামতের প্রয়োজন পড়ে না। বিতর নামাজের অস্বীকার কারীকে কাফের বলা যায় না।

দলীলে নকলী হলো : হুজুর সা. এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে বললেন-

خَمْسُ صَلٰوةٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ

'আল্লাহ তাআলা তোমার উপর পাঁচটি নামায ফরয করেছেন। লোকটি বলল, আমার উপর আর কিছু আছে কি? হুজুর সা. বললেন, না; বরং তুমি নফল পড়বে।' সুতরাং উক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া বাকী নামায নফল। দ্বিতীয়ত হযরত উমর রাযি. হতে বর্ণিত-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيْرِ

'নবী করীম সা. উটের উপর বিতির নামায আদায় করেছেন।' স্মার্তব্য হলো যে, বাহনের উপর নফল আদায় করা যায়। ফরয ওয়াজিব আদায় করা যায় না।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল : হুজুর সা.এর ইরশাদ—

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى زَادَكُمْ صَلٰوةً اَلَا هِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর বাড়িয়েছেন একটি নামায। আর তা হল বিতর। তোমরা তা পড় ইশার পর থেকে ফজর উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত। উক্ত হাদীস দ্বারা দলিলের বিভিন্ন দিক রয়েছে। এক, উক্ত হাদীসে زاد এর فاعل হলেন আল্লাহ তাআলা। অর্থাৎ زيادت এর সম্বন্ধ আল্লার দিকে হয়েছে। বিধায় তা ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে সুন্নাতের সম্বন্ধ হুজুর সা. এর দিকে হয়ে থাকে। দুই, কোন জিনিসে অতিরিক্ত তখনই হয় যখন তা নির্ধারিত পরিমাণের হয়। আর এ দিকে নফল হলো অনির্ধারিত, যার কোন সীমা নেই। সুতরাং প্রতিয়মান হলো যে, অতিরিক্তটা ফরজের উপর হয়ে থাকে। কারণ, তা নির্ধারিত। আর যেহেতু مزيد আর مزيد عليه এক জাতীয় থাকা প্রয়োজন। তাই বিতর ফরজ হওয়াটা চাহিদা, কিন্তু যেহেতু এ অতিরিক্তটা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত বিধায় তা دليل غير قطعى আর دليل غير قطعى দ্বারা ফরজ ছাবিত হয় না। তবে ওয়াজিব ছাবিত হয়। বিধায় আমরা বিতর নামাজকে ওয়াজিব বলি। তৃতীয়, উক্ত হাদীসে فَصَلُّوْهَا এখানে امر এর সীগাহ এসেছে যা ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। কারণ, امر উজুবের জন্য এসে থাকে।

দ্বিতীয় দলিল : রাসূল সা. ইরশাদ করেন- (ابوداؤد) - اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا বিতর হচ্ছে ওয়াজিব, যে ব্যক্তি বিতির আদায় করে না সে আমাদের থেকে নয়। (আবু দাউদ)

তৃতীয় দলিল : - اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا হুজুর সা. ইরশাদ করেন, 'সকাল হওয়ার আগেই বিতর পড়ে নাও।' উক্ত হাদীসে أَوْتِرُوا শব্দটি امر যা দ্বারা বিতর নামায ওয়াজিব প্রমাণিত হল। কারণ, امر উজুবের জন্য আসে। সাহাবাইন রহ. এর দলিলের জবাব হলো : বিতর অস্বীকারকারী এজন্য কাফের হয়না যে ইহা سنت غير متواتر। আর হাদীসে আরাবী এর জবাব হল যে উক্ত হাদীসটি বিতর ওয়াজিব হওয়ার পূর্বের। আর ইবনে উমর রাযি. এর হাদীসের জবাব হলো, ইমাম তাহাবী রহ. বলেন, ইহা حديث حنظلة ابن ابى سفيان এর সাথে বিরোধপূর্ণ। حديث حنظلة হলো ইবনে উমার রাযি. তার বাহনের উপর নামাজ পড়তেন। আর বিতর জমিনে পড়তেন। ইবনে উমার রাযি. বলেন, মহানবী সা. এমনটি করতেন। সুতরাং উক্ত হাদীসে تعارض সৃষ্টি হয়েছ। আর কায়দা হলো اذا تعارضا تساقطا দুটি জিনিসে تعارض সৃষ্টি হলে উভয়টি ساقط হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য : কোন কোন মাশাইখ রহ. বলেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর তিনটি উক্তি যথার্থ। তা হল ১। বিতর নামায ফরয আর তা হলো আমলী ফরয। ২। বিতর ওয়াজিব। আর তা হলো আদায়ী ওয়াজিব। ৩। বিতির সুন্নাত আর তা হল সুন্নাতান সুন্নাত।

قوله : وَهُوَ ثَلٰثُ رَكَعَاتٍ الخ : আমাদের মাযহাব মতে বিতর এক সালামে তিন রাকাত। ইমাম শাফেয়ী রহ থেকে এ ব্যাপারে দুটি মতামত পাওয়া যায়। এক রিওয়ায়াত আমাদের মাজহাবের মত। আর এক রিওয়ায়াত হলো বিতর তিন রাকাত তিন সালামে আদায় করবে। আর ইমাম মালিক রহ. এর মতে বিতর নামায এক রাকাত। ইমাম মালিক রহ. এর দলিল :

اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ -

'এক ব্যক্তি হুজুর সা. কে রাত্রের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। হুজুর সা. বললেন, দুই দুই রাকাত। যদি তোমার সকাল হওয়ার আশংকা থাকে তবে এক রাকাত আদায় করে নেবে। যা তোমার আদায়কৃত নামাজকে বিতর করে দেবে।'

আমাদের দলিল : অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে বিতর তিন রাকাত এক সালামে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো :

১। হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ - নবী করীম সা. তিন রাকাতে বিতর আদায় করতেন।

২। হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন- أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلٰثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي أٰخِرِهِنَّ মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে বিতর তিন রাকাত। শুধু শেষ রাকাতে সালাম ফিরাবে।

৩। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন- كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ রাসূল সা. বিতরের প্রথম দু রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।

৪। ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত- وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلٰثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ 'রাতের বিতর তিন রাকাত দিনের বিতরের ন্যায়। (অর্থাৎ দিনের বিতর হলো মাগরিবের নামায)। এক রাকাত ওয়ালাদের পেশকৃত হাদীসের জবাবে ইমাম তাহাবী রহ. বলেন- রাসূল সা. এর বাণী فصل ركعة এর অর্থ হলো- صَلِّ رَكْعَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ قَبْلَهَا এর পূর্বের দুই রাকাতের সাথে মিলিয়ে এক রাকাত পড়বে।

সুতরাং প্রমাণিত হল, বিতর নামাজ তিন রাকাত এক সালামে।

قوله : وَقَنَتَ الخ : আমাদের মতে দুয়ায়ে কুনূত পড়া হবে তৃতীয় রাকাতের রুকুর পূর্বে। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে দুয়ায়ে কুনূত পড়া হবে রুকুর পরে। তিনি দলিল হিসাবে পেশ করেন—

أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَنَتَ فِي أٰخِرِ الْوِتْرِ

'রাসূলুল্লাহ্ সা. বিতরের শেষে কুনূত পড়তেন। আর বিতরের শেষ হলো রুকূর পর। বিধায় রুকূর পর কুনূত পড়া আবশ্যক।'

আমাদের দলিল হল : হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. বলেন—

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ

'রাসূলুল্লাহ্ সা. বিতর পড়তেন এবং রুকূর পূর্বে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন।'

দ্বিতীয় দলিল :

عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوْتِ فِي الصَّلٰوةِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَكَانَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قُلْتُ فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِيْ عَنْكَ إِنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ قَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا -

'হযরত আছীম আহওয়াল রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি আনাস রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম নামাযে কুনূত সম্পর্কে। তিনি বললেন হাঁ, আমি বললাম তা রুকূর পূর্ব না কি পরে। তিনি বললেন, রুকূর পূর্বে। আমি বললাম, অমুক আমাকে বলল, আপনার থেকে যে তা রুকূর পরে। হযরত আনাস রাযি. বলেন, সে মিথ্যাবাদী। রাসূল সা. রুকূর পরে মাত্র একমাস কুনূত পড়েছেন। সুতরাং প্রতিয়মান হলো যে, দুয়ায়ে কুনূত রুকূর পূর্বে রুকুর পরে নয়। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর পেশকৃত হাদীসের জবাব হলো :

قنت في اخر الوتر এটা আমাদের বিরোধি নয়। কারণ, কোন জিনিসের অর্ধেকের বেশী যা হয় তার উপর اخر শব্দটি প্রজোয্য হয়ে থাকে। সুতরাং তৃতীয় রাকাতের রুকুর পূর্বের অবস্থার উপর প্রয়োগ করা সহীহ।

আমাদের মতে সারা বৎসর দোয়ায়ে কুনূত পড়া ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে শুধু রমজান মাসের শেষার্ধে দোয়ায়ে কুনূত পড়া মুস্তাহাব। আমাদের দলিল হল, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সা. হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি. কে দোয়ায়ে কুনূতের তালিম দিয়েছেন, পরে বলেছেন— اِجْعَلْ هٰذَا فِي وِتْرِكَ এ দোয়াকে তোমার বিতরের মধ্যে পড়বে। এখানে রমজান বা অন্য কোন মাসের সাথে নির্দিষ্ট করেন নাই। বিধায় প্রতিয়মান হল যে, দোয়ায়ে কুনূত সারা বৎসরই পড়তে হবে।

وَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً وَلَا يَقْنُتُ لِغَيْرِهِ وَيَتْبَعُ الْمُؤْتَمُّ قَانِتَ الْوِتْرِ لَا الْفَجْرِ -

অনুবাদ : এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফতেহা ও অন্য সূরা পড়বে। আর অন্য নামাযে দোয়ায়ে কুনূত পড়বে না। আর মুক্তাদি বিতরে কুনূত পাঠকারীর অনুসরণ করবে। তবে ফজরে দোয়ায়ে কুনূত পাঠকারীর অনুসরণ করতে হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ قَرَأَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ الخ : বিতরের প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা মিলানো ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে একারণে পড়া ওয়াজিব যে যদিও বিতর নামায ওয়াজিব তথাপি যেহেতু তা خبر واحد দ্বারা প্রমাণিত তাই يقين এর ফায়দা দেয় না। সুতরাং সতর্কতা বশত ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে প্রত্যেক রাকাতে কেরাত পড়া ওয়াজিব। আর সাহাবাইন রহ. এর মতে প্রত্যেক রাকাতে এজন্য কিরাত পড়া ওয়াজিব যে, ইহা সুন্নাত নামায। এদিকে সুন্নাত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাকাতে কিরাত পড়া ওয়াজিব তাই বিতর নামাজের প্রত্যেক রাকাতে কিরাত পড়া অত্যাবশ্যকীয়।

قوله : وَلَايَقْنُتُ فِى غَيْرِهِ الخ : আহনাফের মতে বিতর ব্যতীত অন্য নামাযে দোআয়ে কুনূত পড়া নেই। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে ফজরের নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পড়া সুন্নাত। ইমাম শফেয়ী রহ. এর দলিল হযরত আনাস রাযি. এর হাদীস-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِى صَلٰوةِ الْفَجْرِ اِلٰى اَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا -

'রাসূলুল্লাহ্ সা. ফজরের নামাজে দুআয়ে কুনূত পড়তেন এমতাবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করেন।'

আহনাফ উলামা কেরামগণের দলিল :

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى صَلٰوةِ الْفَجْرِ شَهْرًا يَدْعُوا عَلٰى حَيٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ

'রাসূলুল্লাহ্ সা. একমাস পর্যন্ত ফজরের নামাজে দুআয়ে কুনূত পড়েছেন। এতে তিনি আরবের জনৈক গোত্রের জন্য বদদুআ করতেন।'

হযরত আনাছ রাযি. হতে তদ্রূপ মর্মার্থে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। যাতে মাত্র একমাস বা চল্লিশ দিনের কথা উল্লেখ আছে।

হযরত আবু উসমান নাহদী রাযি. হতে বর্ণিত-

صَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ رضى الله عنه سَنَتَيْنِ وَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ رضى الله عنه كَذَالِكَ فَلَمْ اَرَ وَاحِدًا مِنْهُمَا يَقْنُتُ فِى صَلٰوةِ الْفَجْرِ

'আমি হযরত আবু বকর রাযি. এর পিছনে দু বৎসর নামাজ পড়েছি। তেমনি হযরত উমর রাযি. এর পিছনে পড়েছি। তাদের কাউকে ফজরের নামাজে কুনূত পড়তে দেখি নি। উপরোল্লেখিত দলিল সমূহের ভিত্তিতে প্রমাণিত হলো যে, ফজর নামাজে দোয়ায়ে কুনূত নেই।

وَالسُّنَّةُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ رَكْعَتَانِ وَقَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا أَرْبَعٌ وَنُدِبَ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَبَعْدَهُ وَالسِّتُّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَةٍ فِي نَفْلِ النَّهَارِ وَعَلَى ثَمَانٍ لَيْلًا وَالْأَفْضَلُ فِيهِمَا رُبَاعُ وَطُوْلُ الْقِيَامِ أَحَبُّ مِنْ كَثْرَةِ السُّجُودِ وَالْقِرَاءَةُ فَرْضٌ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَرْضِ وَكُلِّ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ -

অনুবাদ : আর সুন্নাত হলো ফজরের পূর্বে ও যোহর, মাগরিব, ইশা এর পরে দু রাকাত এবং যোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং জুমার পূর্বে ও পরে চার রাকাত (নামাজ)। আর মুস্তাহাব ইশা ও আছরের পূর্বে চার রাকাত এবং ইশার পরে চার রাকাত এবং মাগরিবের পরে ছয় রাকাত। এবং দিনের নফল চার রাকাত থেকে বেশি আর রাতের নফল আট রাকাত থেকে বেশি এক সালামে পড়া মাকরূহ। আর উভয়টিতে (তথা দিনের নফলে ও রাতের নফলে) চার রাকাত করে পড়া (উত্তম) এবং বেশি সিজদা থেকে দাড়ানোতে বিলম্ব করা উত্তম (অর্থাৎ কিরাত লম্বা পড়া উত্তম) আর কিরাআত ফরজ প্রথম দু রাকাতে এবং নফল ও বিতিরের সকল রাকাতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : والسُّنَّةُ الخ : এখান থেকে গ্রন্থকার রহ. সুন্নাত ও নফল নামাজের আলোচনা শুরু করেছেন। সুন্নাত দু প্রকার। (১) সুন্নাতে মুআক্কাদা (২) সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা।

সুন্নাতে মুআক্কাদা : ঐ সুন্নাতকে বলে যা মহানবী সা. সর্বদা পালন করেছেন। তবে কখনও কখনো ছেড়ে দিয়েছেন।

সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা : ঐ সুন্নাতকে বলে যা মহানবী সা. সর্বদা পড়েন নি। সুতরাং সুন্নাতে মুআক্কাদা সর্বমোট বার রাকাত। ফজরের পূর্বে দু' রাকাত, যোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং যোহরের পরে দু' রাকাত। মাগরিবের পরে দু রাকাত, ইশার পরে দু' রাকাত। এছাড়া বাকী সুন্নাত নামায গায়রে মুআক্কাদা। উল্লেখিত বার রাকাত নামাজ সুন্নাতে মুআক্কাদা হওয়ার ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি ও দলিল হলো হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদীস—

عَنْ عَائِشَةَ رَض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ثَابَرَ عَلَى اِثْنَتَيْ عَشَرَ رَكْعَةٍ مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اَرْبَعُ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ -

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সর্বদা বার রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (আর বার রাকাত হলো) চার রাকাত যোহরের পূর্বে ও তার পরে দু' রাকাত। এবং মাগরিবের পরে দু' রাকাত ও ইশার পর দু' রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দু' রাকাত।

قوله : وَنُدِبَ الْأَرْبَعُ الخ : আছরের পূর্বে চার রাকাত ইশার পূর্বে চার রাকাত ও ইশার পরে চার রাকাত নামাজ মুস্তাহাব। ইমাম মুহাম্মদ রাযি. মাসবুত গ্রন্থে আছরের পূর্বের চার রাকাতকে মুস্তাহাব বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং এখতিয়ারও দিয়েছেন যে যদি কেহ চায় তবে দু রাকাত পড়তে পারবে। কারণ আসরের নামাজের

পূর্বের নামাজের রাকাতের ক্ষেত্রে রিওয়ায়াতের ইখতিলাফ রয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত—

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللهُ اِمْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا ـ

'হুজুর সা. ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে রহম করেন যে আছরের নামাজের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়ে থাকে।'

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত :

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

রাসূলুল্লাহ্ সা. আছরের পূর্বে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন।

হিদায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, আছরের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়া উত্তম। কারণ, চার রাকাত সংখ্যায় অধিক এবং তাহরীমা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত থাকবে। তিনি আরও বলেন যে, রাসূল সা. বার রাকাতের ব্যাখ্যায় এশার পূর্বের চার রাকাতের কথা উল্লেখ করেন নাই বিধায় এ চার রাকাত মুস্তাহাবের পর্যায়ভুক্ত। কেননা তিনি এ চার রাকাত নিয়মিত আদায় করেন।

قوله : وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَى اَرْبَعٍ الخ : ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে দিনের নফলে এক সালামে দু রাকাত অথবা চার রাকাত উভয়টিই পড়া জায়েয। এর থেকে অধিক এক সালামে আদায় করা মাকরূহ। আর রাত্রে নফলে এক সালামে আট রাকাত পড়া জায়েয। এর অধিক এক সালামে পড়া মাকরূহ। দলিল হল রাসূল সা. রাত্রে এক সালামে আট রাকাতের অধিক পড়েন নি। যদি তিনি এর অধিক পড়তেন তাহলে মাকরূহ হতো না এদিকে বৈধতা শিক্ষা দানের জন্য একবারও না হয় এক সালামে আট রাকাতের অধিক পড়ে দেখাতেন। যেহেতু নবী কারীম সা. তখন এক সালামে আট রাকাতের চেয়ে অধিক নামাজ পড়েন নি বিধায় এক সালামে আট রাকাতের চেয়ে অধিক পড়া মাকরূহ।

قوله : وَالْاَفْضَلُ فِيْهِمَا الخ : ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে রাত্রে ও দিনে চার রাকাত করে পড়া উত্তম সাহাবাইন রহ. এর মতে রাতে দু রাকাত করে আর দিনে চার রাকাত করে নফল নামায আদায় করা افضل তথা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে রাতে ও দিনে দু রাকাত করে পড়া উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীল : হযরত ইবনে উমর রাযি. এর হাদীস- صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى রাতের ও দিনের নামায দু রাকাত দু রাকাত। অর্থাৎ দু রাকাত করে পড়া উত্তম। সাহাবাইন রহ. এর দলিল : তারা নফল নামাজকে তারাবীহ এর নামাজের উপর কিয়াস করেছেন। তারাবীহ এর নামাজ যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে দু রাকাত করে পড়া উত্তম। তাই রাত্রের অন্যান্য নফল নামাজও দু রাকাত করে পড়া উত্তম। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল : হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদীস- 'হুজুর সা. ইশার পর চার রাকাত নামাজ পড়তেন এক সালামে এবং সর্বদা চাশতের নামাজ চার রাকাত করে পড়তেন।' উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে রাতে ও দিনে চার রাকাত করে নফল নামায পড়া উত্তম।

আকলী দলীল হলো : এক সালামে চার রাকাত পড়া দ্বারা তাহরীমা বিলম্ব ও দীর্ঘ হয়। বিধায় তুলনামূলক কষ্ট বেশী হয়। অতএব এটাই উত্তম হবে। আর দু' রাকাত করে পড়তে কষ্ট কমহয় বিধায় চার রাকাত পড়া উত্তম হবে।

قوله : وَالْقِرَاءَةُ فَرْضٌ الخ : হানাফী মাযহাব মতে ফরজের দুরাকাতে কেরাত পড়া ফরজ। আর তা প্রথম দু রাকাতে পড়া ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে প্রতি রাকাতে কেরাত পড়া ওয়াজিব। ইমাম মালিক রহ. এর মতে তিন রাকাতে কেরাত পড়া ওয়াজিব। হাসান বসরী রহ. এর মতে এক রাকাতে কেরাত পড়া ওয়াজিব

আবু বকর আসাম রহ. এর মতে নামাজে কেরাত পড়া সুন্নাত। তিনি দলিল হিসাবে বলেন, কেরাত অন্যান্য জিকিরের ন্যায়। সুতরাং যেহেতু অন্যান্য জিকির নামাজে সুন্নাত, তেমনি কেরাতও নামাজে সুন্নাত হাসান বসরী রহ. দলিল হিসাবে কুরআনের আয়াত পেশ করেন- فَاقْرَأُوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 'কুরআন থেকে যা সহজ তা তোমরা পড়।' উক্ত আয়াতে اقرؤا শব্দটি আমর এর সীগাহ। এদিকে امر কোন কাজের পুনরাবৃত্তির দাবী রাখে না। তাই এক রাকাতে কিরাত পড়া ফরজ হবে। ইমাম মালিক রহ. এর দলিল : রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন- لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِقِرَاءَةٍ 'কিরাত ছাড়া নামাজ হবে না।' এদিকে প্রত্যেক রাকাতই পৃথকভাবে নামাজ তাই কোন রাকাতই কিরাত ছাড়া শুদ্ধ হবার কথা নয়। আর চার রাকাত নামাজের তিন রাকাত যেহেতু অধিকাংশ বিধায় সহজকরণার্থে তিন রাকাতে কিরাত পড়া ফরজ করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীল : হুজুর সা. এর ইরশাদ- لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِقِرَاءَةٍ 'কেরাত ছাড়া নামাজ হয় না।' এদিকে প্রত্যেক রাকাতই পৃথকার্থে নামাজ, তাই প্রতি রাকাতে কিরাত পড়া ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল : আল্লাহর বাণী- فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 'কুরআন থেকে যা সহজ তা তোমরা পড়'।

উক্ত আয়াতে اقرؤا শব্দটি امر যা পুণরাবৃত্তির দাবী রাখে না। এক রাকাতে পড়ে নেয়াটা عبارة النص এর দাবী। এদিকে দ্বিতীয় রাকাত যেহেতু সম্পূর্ণভাবে প্রথম রাকাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এজন্য دلالة النص দ্বারা দ্বিতীয় রাকাতে কিরাত পড়াও ফরজ করা হয়েছে।

قوله : وَكُلِّ النَّفْلِ الخ : নফল ও বিতরের প্রতি রাকাতে কেরাত পড়া ওয়াজিব। নফলের সকল রাকাতে কেরাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল নফল নামাযের প্রতি দু রাকাত পৃথক নামাজের পর্যায়ে। এজন্য নফলের তাহরীমা দ্বারা দু রাকাত ওয়াজিব হয়। যদিও দু রাকাতের অধিক নিয়ত করে। সুতরাং যদি কেহ চার রাকাতের নিয়ত করে অতঃপর দু রাকাতের ভিতর নামায ফাসিদ হয়ে যায়। তবে তার উপর ক্বাযা শুধু দু রাকাতই ওয়াজিব হবে। এ কারণে হানাফী উলামায়ে কিরামগণ বলেন- তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ালে তাহরীমার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং নফলের প্রতি রাকাতে কিরাত পড়া ওয়াজিব। আর বিতর নামাজ যদিও ওয়াজিব তথাপি তা যেহেতু خبر واحد দ্বারা প্রমাণিত তাই তা সুন্নাতের ন্যায় বিধায় তারও প্রতি রাকাতে কেরাত পড়া ওয়াজিব। অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে বিতরের নামাজ যদিও ওয়াজিব তাতে নফলের চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ার কারণে সতর্কতা বশত আমরা সুন্নাত এবং নফলের ন্যায় বিতরের প্রত্যেক রাকাতে কিরাত পড়া ওয়াজিব করেছি।

وَلَزِمَ النَّفَلُ بِالشُّرُوعِ وَلَوْ عِنْدَ الْغُرُوبِ وَالطُّلُوعِ وَقَضٰى رَكْعَتَيْنِ لَوْ نَوٰى أَرْبَعًا وَأَفْسَدَهُ بَعْدَ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا أَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ أَوْ الْأُخْرَيَيْنِ وَأَرْبَعًا لَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ وَلَا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا -

---

অনুবাদ : নফল শুরু করাতে তা ওয়াজিব হয়ে যায় যদিও তা সূর্যোদয়ের সময় হয় বা সূর্যাস্তের সময় হয়। (অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় বা সূর্যোদয়ের সময় তা আরম্ভ করলে ওয়াজিব হয়ে যায়) যদি চার রাকাতের নিয়্যাত করে প্রথম বৈঠকের পরে অথবা পূর্বে নামাজ ফাসিদ করে বসে (তবে দু রাকাত কাজা করবে)। অথবা উক্ত রাকাত সমূহে কিছুই পড়ে নাই (তবে দু রাকাতের কাজা করবে।) অথবা শুধু প্রথম দু রাকাতে কেরাআত পড়ে অথবা

শেষোক্ত দু রাকাতে কেরাত পড়ে (তবে দু রাকাত কাজা করবে) আর যদি প্রথম দু রাকাতের এক রাকাত এবং শেষোক্ত দু রাকাতের এক রাকাতে কেরাত পড়ে তবে চার রাকাত কাজা করবে। আর কোন নামাজের পর অনুরূপ নামাজ পড়বে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَزِمَ النَّفْلُ الخ : নফল নামাজ ও নফল রোযা আরম্ভ করলে তা ওয়াজিব হয়ে যায় কি না এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী আলেমদের নিকট নফল নামায ও রোজা আরম্ভ করার দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায় সুতরাং শুরু করার পর ফাসিদ করলে তার কাজা ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে নফল শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয় না। সুতরাং যদি তা শুরু করার পর ফাসিদ হয়ে যায় তবে তার কাজা ওয়াজিব হবে না। **আমাদের দলিল হল :** শুরু করার পর আদায়কৃত অংশ ইবাদতে শামিল হয়ে যায়। সুতরাং তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। কারণ, আমল নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা জরুরী আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 'তোমরা স্বীয় আমল নষ্ট করো না।' সুতরাং তা মাঝে নষ্ট করার দ্বারা পুণরায় আদায় করা ওয়াজিব হবে।

قوله : وَقَضَى رَكْعَتَيْنِ الخ : চার রাকাত বিশিষ্ট নফল নামাজে কিরাত পড়া হিসাবে ষোল অবস্থা। ১। চার রাকাতে কিরাত পড়া হয়েছে। ২। চার রাকাতেই কিরাত ছাড়া হয়েছে। ৩। প্রথম দু রাকাতে কিরাত ছাড়া হয়েছে। ৪। দ্বিতীয় দু রাকাতে কিরাত ছাড়া হয়েছে। ৫। শুধু প্রথম রাকাতে কেরাত ছাড়া হয়েছে। ৬। শুধু দ্বিতীয় রাকাতে কেরাত ছাড়া হয়েছে। ৭। শুধু তৃতীয় রাকাতে কেরাত ছাড়া হয়েছে। ৮। শুধু চতুর্থ রাকাতে কেরাত ছাড়া হয়েছে। ৯। প্রথম তিন রাকাতে কিরাত ছাড়া হয়েছে। ১০। প্রথম দু রাকাতে এবং চতুর্থ রাকাতে কিরাত ছাড়া হয়েছে। ১১। প্রথম তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে কিরাত ছাড়া হয়েছে। ১২। দ্বিতীয় তৃতীয় রাকাতে এবং চতুর্থ রাকতে কিরাত ছাড়া হয়েছে। ১৩। প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে কিরাত ছাড়া হয়েছে। ১৪। প্রথম ও চতুর্থ রাকাতে কিরাত ছাড়া হয়েছে। ১৫। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকাতে কিরত ছাড়া হয়েছে। ১৬। দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতে কিরাত ছাড়া হয়েছে। উপরোক্ত প্রকারগুলো থেকে শুধু প্রথম প্রকারে সকল রাকাতে কিরাত পাওয়া গেল। বাকি পনের প্রকারে কিরাত তরক পাওয়া গেল। সুতরাং দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রকারে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে শুধু দু রাকাতের কাজা ওয়াজিব। কেননা, প্রথম দু রাকাত কেরাত ছাড়ার দরুন তরফাইন রহ. এর মতানুযায়ী তাহরীমা বাতিল হয়ে যায়। এ জন্য দ্বিতীয় দু রাকাত শুরু করা সহীহ হয় নাই সুতরাং শুধু প্রথম দু রাকাতের কাজা আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে চারি রাকাতের কাজা ওয়াজিব। কারণ, তার মতে তাহরীমা বাতিল হয় নাই। এজন্য দ্বিতীয় দু রাকাত শুরু করা সহীহ। আর যেহেতু কেরাত ছাড়ার দরুন নামায ফাসিদ হয়ে গেল বিধায় চারি রাকাতের কাজা আদায় করা ওয়াজিব। পঞ্চম প্রকারে সর্ব সম্মতিক্রমে শেষের দু' রাকাতের কাযা ওয়াজিব। ষষ্ট, সপ্তম ও অষ্টম প্রকারে সর্ব সম্মতিক্রমে শেষের দু রাকাতের কাজা পড়া ওয়াজিব। নবম ও দশম প্রকারে সর্ব সম্মতিক্রমে শেষের দু' রাকাতের কাযা পড়া ওয়াজিব। এগারতম, বারতম, তেরতম, চৌদ্দতম, পনেরতম, ষোলতম প্রকারে ইমাম শায়খাইন রহ. এর মতে শুধু দু' রাকাতের কাযা ওয়াজিব।

তাদের উক্ত ইখতেলাফের মূল কারণ হল মাসআলার মূল ভিত্তিতে ইখতিলাফ থাকার কারণে। আর তা হল ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে প্রথম এক অথবা উভয় রাকাতে কিরাত ছাড়ার দরুন তাহরীমা বাতিল হিসাবে গণ্য করা হবে। আর যেহেতু প্রাথমিক তাহরীমা বাতিল হয়ে গেল তাই শেষ দু' রাকাতের ভিত্তিই রয়নি। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে দুনো রাকাতেই কেরাত ছাড়ার দরুনও তাহরীমা বাতিল হবে না। তবে হ্যাঁ আদায় করাটা ফাসিদ হয়ে হবে। আর যেহেতু প্রথম দু রাকাতের তাহরীমা বাতিল হয় নাই বিধায় পরবর্তী দু রাকাতের

ভিত্তি তার উপর রাখা সহীহ। তার কথানুযায়ী চারি রাকাতের তাহরীমা সহীহ থাকবে। তবে কিরাত ছাড়া নামায আদায় হিসাবে ফাসিদ যাবে। তাই তার মতে চার রাকাতেই কাযা আদায় করতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে প্রথম দু' রাকাতে কিরাত ছেড়ে দিলে তাহরীমা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি প্রথম দু রাকাতের এক রাকাতে কিরাত পড়ে এবং এক রাকাতে ছেড়ে দেয় তবে তাতে তাহরীমা বাতিল হবে না। কেননা, নফলের প্রতি দু' রাকাত পৃথক নামাজ। সুতরাং উভয় রাকাতে কিরাত ছেড়ে দেয়া সর্বসম্মতিক্রমে নামায ফাসিদ। আর এক রাকাতে কিরাত ছেড়ে দেয়াতে কারও নিকট নামায ফাসিদ আর কারও নিকট ফাসিদ নয়। বিধায় আমরা সতর্কতা বশত বলি যে, কাযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হল নামায ফাসিদ হওয়া অার দ্বিতীয় দু' রাকাত আবশ্যক হওয়ার জন্য শর্ত হল তাহরীমা বাকী থাকা।

নিম্নে ষোল প্রকারের নকশাকে তুলে ধরা হলো

নং	১ম রাকাত	২য় রাকাত	৩য় রাকাত	৪র্থ রাকাত	কাযা হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মতামত
১	ক	ক	ক	ক	সর্বসম্মতিক্রমে কাযা ওয়াজিব নয়।
২	খ	খ	খ	খ	তারফাইন রহ. এর মতে প্রথম দু' রাকাতের কাযা আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে চার রাকাতের কাযা ওয়াজিব।
৩	খ	খ	ক	খ	ঐ
৪	খ	খ	খ	ক	ঐ
৫	ক	ক	খ	খ	শেষ দু' রাকাতের কাযা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব।
৬	খ	খ	ক	ক	দু' রাকাতের কাযা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব।
৭	খ	ক	ক	ক	ঐ
৮	ক	খ	ক	ক	ঐ
৯	ক	ক	খ	ক	শেষ দু রাকাতের কাযা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব।
১০	ক	ক	ক	খ	ঐ
১১	ক	খ	খ	খ	শায়খাইন রহ. এর মতে চার রাকাতের কাযা ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে প্রথম দু' রাকাতের কাযা ওয়াজিব।
১২	খ	ক	খ	খ	ঐ
১৩	ক	খ	ক	খ	ঐ
১৪	খ	ক	খ	ক	ঐ
১৫	ক	খ	খ	ক	ঐ
১৬	খ	ক	ক	খ	ঐ

বিঃ দ্রঃ 'ক' দ্বারা কিরাত পড়া হয়েছে এবং 'খ' দ্বারা খালি তথা কিরাত ছাড়া হয়েছে বুঝানো হয়েছে।

قوله : وَلَايُصَلِّي بَعْدَ صَلٰوةِ الخ : আলোচ্য ইবারতের ব্যাপকতায় বুঝা যায় যে, কোন নামাযের পর অনুরূপ নামায পড়া যাবে না। অথচ দেখা যায় জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত রয়েছে। যা জোহরের ফরজের অনুরূপ। ফজরের পূর্বে দু' রাকাত সুন্নাত রয়েছে। যা ফজরের ফরযের অনুরূপ। সুতরাং উক্ত ইবারত তার ব্যাপকতার নয় বরং কোন নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপক। ইমাম মুহাম্মদ রহ. উক্ত اثر এর ব্যাখ্যায় বলেন : উক্ত ইবারতের উদ্দেশ্য হল ফরজ আদায়ের পর ফরজের অনুরূপ চার রাকাত পড়বে না। অর্থাৎ দু' রাকাত কিরাতের সাথে আর

দু' রাকাত কিরাত ছাড়া। এবং চার রাকাতের প্রতি রাকাতে কিরাত পড়বে।

কাযীখানে অন্য আরেকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। যে প্রথম জামাতের পর তার মত একই সময়ে একই মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত না করা। অথবা ফরয নামায শুধু ওয়াসওয়াসার কারণে ফাসিদ হয়ে গেছে ভেবে দ্বিতীয়বার পড়া বুঝানো হয়েছে।

وَيَتَنَفَّلُ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَةٍ عَلَى الْقِيَامِ ابْتِدَاءً وَبِنَاءً وَرَاكِبًا خَارِجَ الْمِصْرِ مُومِيًا إِلَى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ دَابَّتُهُ وَبَنَى بِنُزُولِهِ لَا بِعَكْسِهِ -

অনুবাদ : দাঁড়ানোর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বসে শুরু অবস্থায় ও বিনা অবস্থায় (নফল নামাজ পড়া যাবে, এবং আরোহী অবস্থায় (আরোহণের) জন্তু যে দিকে মুখ করে সেদিকে শহরের বাহিরে ইশারা করে নফল নামাজ পড়তে পারবে। আরোহণ থেকে অবতরণ করে বিনা করতে পারবে। পক্ষান্তরে জমি থেকে আরোহণ করে বিনা করতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَيَتَنَفَّلُ قَاعِدًا الخ : দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বসে নফল নামায আদায় করা জায়েয। দলিল, রাসূল সা. ইরশাদ করেন : صَلٰوةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلٰوةِ الْقَائِمِ 'বসা অবস্থায় নামায পড়ার সওয়াব দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজের অর্ধেক।' এদিকে বসে নামায পড়া দুই কারণে হতে পারে। অক্ষমতার দরুন বসে পড়া বা অক্ষমতা ছাড়া বসে পড়া। তবে উক্ত হাদীসে প্রথম প্রকারটি হতে পারে না। কেননা অক্ষমতার দরুন বসে পড়া এবং দাঁড়িয়ে পড়া ছওয়াবের ক্ষেত্রে সমান। অতএব, এ হাদীসের উদ্দেশ্য অক্ষমতা ছাড়া বসে নামায পড়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হলো।

قوله : خَارِجَ الْمِصْرِ مُومِيًا الخ : শহরের বাইরে সওয়ারীর উপর নফল নামায পড়া জায়েয আছে। অক্ষম থাক, বা না থাক। এমনি নামায শুরু করতে কিবলামুখী হউক বা না হউক। এবং সওয়ারী যে দিকে মুখ করে সেদিকে ফিরে নামায আদায় করবে। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে নামায শুরু করতে কিবলামুখী হওয়া আবশ্যক। অতঃপর অন্যান্য দিকে সওয়ারী ফিরাতে আরোহী ও ফিরতে পারবে।

আমাদের দলিল : হযরত ইবনে উমর রাযি. এর হাদীস-

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلٰى خَيْبَرَ يُوْمِي إِيْمَاءً -

'আমি রাসূল সা. কে গাধার উপর খায়বার অভিমুখী হয়ে ইশারা করে নামায আদায় করতে দেখেছি।'

যুক্তিনির্ভর প্রমাণ : যদি বলা হয় যে নফল নামাজ পড়তে সওয়ারী থেকে নেমে কিবলামুখী হতে হবে, তবে সে সওয়ার থাকা অবস্থায় নফল পড়তে পারছে না। অথচ নফল নামাজ হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদত। অথবা নফল পড়ার জন্য অবতরণ করলে কাফেলার পিছনে পড়ে যাওয়ার ভয় হয়। সুতরাং যে আমল দ্বারা সব সময় নেকী হাসিল করা যায় তা বিভিন্ন শর্তের সাথে যুক্ত করা উচিত নয়। তাই সওয়ারির উপর নফল নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

قوله : وَبَنٰى بِنُزُوْلِهِ الخ : সওয়ারীর উপর নফল নামায শুরুকারী মাটিতে নেমে বিনা করতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি মাটিতে নফল নামায শুরু করে তবে সওয়ারীর উপর তার বিনা করা জায়েয হবে না। কেননা সওয়ারীর উপর আরোহণ করে যে তাহরীমা বাধা হয়েছে এতে রুকূ সিজদা ইশারায় আদায় না করে রুকূ সিজদা সহকারেও আদায় করাও জায়েয। অতএব, সে যে সওয়ারীতে ইশারায় পড়েছে এবং যে নামায সওয়ারী থেকে

নেমে রুকু সিজদার সাথে পড়েছে উভয়কে একই তাহরীমা শামিল করে বিধায় এ অবস্থা জায়েয । তবে জমিনে শুরু করার দ্বারা যে তাহরীমা বাঁধা হয়েছে তা রুকূ জিসদা ওয়াজিবকারীরূপে সংঘটিত হয়েছে । সুতরাং তা তার উপর বাধ্যতা মূলক হয়ে গিয়েছে । এখন বিনা ওজরে তা তরক করতে পারবে না । এজন্য জমিনে শুরুকারী সওয়ারীতে 'বিনা' করতে পারবে না ।

فَصْلٌ : فِي التَّرَاوِيحِ

অনুচ্ছেদ : তারাবীহ

وَسُنَّ فِي رَمَضَانَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَعْدَهُ بِجَمَاعَةٍ وَالْخَتْمُ مَرَّةً وَبِجِلْسَةٍ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعٍ بِقَدْرِهَا وَيُوتَرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ -

অনুবাদ : এবং সুন্নাত হলো রমজান মাসে বিশ রাকাত নামায দশ সালামে ইশার পরে বিতরের পূর্বে অথবা পরে জামাতের সাথে পড়া । এবং (একবার কোরআন খতম করা) প্রত্যেক চার রাকাতের পর তার সমপরিমাণ বৈঠক করার সাথে । আর বিতর শুধু রমজান মাসে জামাতের সাথে পড়বে ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ سُنَّ فِىْ رَمَضَانَ الخ : রমযান মাসে ইশার পর ফরজ আদায়ের পর তারাবীহ নামায পড়ার জন্য মানুষের একত্র হওয়া সুন্নাতে মুআক্কাদা । ইহা ইমাম আবূ হানিফা রহ. সহ অধিকাংশ ফকীহ রহ. দের মতামত । দলিল হল : খুলাফায়ে রাশেদীন তথা হযরত উমর রাযি. হযরত উসমান রাযি. হযরত আলী রাযি. সর্বদা নিয়ম তান্ত্রিকভাবে তারাবীহ এর নামায পড়েছেন । রাসূল সা. বলেছেন- عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ 'তোমরা আমার সুন্নাত ধর এবং আমার পর খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত ধর । এ হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হলো যে রূপ রাসূলুল্লাহ্ সা. এর আমল ও স্বীকৃত পথকে সুন্নাত বলে তেমনি খুলাফায়ে রাশিদীনের আমল ও স্বীকৃত পথকে সুন্নাত বলা হয় । নিয়মিতভাবে বিশ রাকাত তারাবীহ জামাআতের সাথে হযরত উমর রাযি. এর খিলাফতকালে হয়েছে । হযরত ওমর রাযি. বলেন—

إِنِّىْ أَرَى أَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ فَصَلَّى بِهِمْ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً -

'আমি মানুষদেরকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করা সমীচীন মনে করলাম । অতঃপর উমর রাযি. তাদেরকে উবাই ইবনে কা'ব রাযি. এর পিছনে সমবেত করলেন । হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. তাদের পাঁচ তারাবীতে বিশ রাকাত নামায পড়ালেন ।

উক্ত হাদীস দ্বারা তারাবীহ জামাতে পড়া ও পাঁচ তারাবীহ বিশ রাকাত হওয়াটা প্রমাণিত হলো । তবে ইমাম আহমদ রহ. এর মতে তারাবীতে জামাত মুস্তাহাব ও উত্তম । আমাদের মাযহাব ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ. এর মতে তারাবীহ বিশ রাকাত ।

দলিল : উপরোক্ত হাদীসটিতে বিশ রাকাত প্রমাণিত হলো । দ্বিতীয় দলিল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস—

أنه كان يصلي رمضان عشرين ركعة سوى الوتر (فتح القدير)

রাসূল স. রামযানে বিশ রাকাত পড়তেন বিতর ব্যতীত।'

তৃতীয় দলীল : হযরত ইবনে কুদামা (হাম্বলী) রহ. বলেন, হযরত আলী রাযি. এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং সে রমজানে বিশ রাকাত পড়াল। অতঃপর তিনি বললেন, ইহা ইজমা এর স্তরে। উপরোক্ত দলিলসমূহ দ্বারা তারাবীহ বিশ রাকাত প্রমাণিত হল।

قوله : ويوتر بجماعة فيه : বিতির যেহেতু খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত তাই তা নফলের সাদৃশ্য। আর নফল নামায রমজান ছাড়া জামাতে পড়া মাকরূহ। আর রমজান মাসে নফল নামায জামাতে পড়া মাকরূহ নয় তাই রমজান মাসে বিতর নামাজ জামাতে পড়া যাবে। তবে জামাতে পড়া উত্তম হওয়া না হওয়া নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। হযরত ইবনে হুমাম রহ. বলেন, রমজানে বিতর জামাতে পড়া উত্তম। কারণ হযরত উমর তা জামাতের সাথে আদায় করতেন। আর আবু আলী নাসাফী রহ. উল্লেখ করেছেন যে আমাদের আলিমদের নিকট বিতির জামাতের সাথে না পড়া উত্তম। কারণ হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. বিতির জামাতের সাথে পড়তেন না।

والله اعلم

بَابُ إِدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ

পরিচ্ছেদ : জামাতে মিলিত হওয়ার বিবরণ

صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ فَأُقِيمَ يُتِمُّ شَفْعًا وَيَقْتَدِي فَلَوْ صَلَّى ثَلَاثًا يُتِمُّ وَيَقْتَدِي مُتَطَوِّعًا فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ أَوِ الْمَغْرِبِ فَأُقِيمَ يَقْطَعُ وَيَقْتَدِي وَكُرِهَ خُرُوجُهُ مِنْ مَسْجِدٍ أُذِّنَ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ وَإِنْ صَلَّى لَا إِلَّا فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ إِنْ شَرَعَ فِي الْإِقَامَةِ -

অনুবাদ : জুহরের এক রাকাত পড়ল তারপর ইকামাত হল তাহলে সে দু রাকাত পূর্ণ করে ইকতিদা করবে। আর যদি তিন রাকাত পড়ে তবে পূর্ণ করে নফলের ইকতিদা করবে। আর যদি মাগরিবের অথবা ফজরের এক রাকাত পড়ে নে তারপর ইকামত হল তাহলে (যা পড়েছে) তা ছেড়ে দিয়ে (ফরজের) ইকতিদা করবে। যদি মসজিদে থাকাকালীন সময়ে আযান দেওয়া হয় তবে নামাজ না পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ। আর যদি আযানের পূর্বে নামায পড়ে নেয় তবে বের হওয়া মাকরূহ নয়। তবে যোহর ও ইশার নামায পড়ার পর যদি ইকামত শুরু হয় তবে বের হওয়া মাকরূহ।

শব্দার্থ : إدراك - পাওয়া, লাভ করা। أقيم ইহা إقامة মাসদার থেকে فعل مجهول অর্থ- ইকামত হল। شفعًا - দ্বিগুণ করা, যোগ করা। متطوعون (ব) متطوع - স্বেচ্ছাসেবক (নফল নামাজ আদায়কারী)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : باب إدراك : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. এতক্ষণ ফরয, ওয়াজিব ও নফল নামাযের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখন থেকে তিনি জামাতে শামিল হওয়ার মাসাইলের আলোচনায় হস্ত প্রসারিত করবেন

قوله : صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি জোহরের নামায একাকী পড়ার ইচ্ছায় শুরু করে নেয় এবং এক রাকাত আদায় করে ফেলে এমনি সময় ইমাম সাহেব জামাতে নামায পড়া শুরু করে দেন, তবে সে এক রাকাতের সাথে আর এক রাকাত মিলিয়ে সালাম ফিরিয়ে জামাতে শরীক হয়ে যাবে। এক রাকাতের সাথে আরেক রাকাত মিলানোর হুকুম এজন্য দেওয়া হয়েছে যেন তার শুরুকৃত নামায বাতিল না হয় কেননা, হুজুর সা. صلاة بتيراء তথা এক রাকাত নামাজ থেকে নিষেধ করেছেন। আর দু রাকাত পড়ে এজন্য সালাম ফিরিয়ে জামাতে শরীক হবে যেন জামাতের ফজিলত হাসিল করতে পারে। আর যদি কোন ব্যক্তি তিন রাকাত পড়ে নেয়, তারপর জামাত শুরু হয় তবে চার রাকাত পুর্ণ করবে। কারণ সে বেশির ভাগ নামায পড়ে ফেলেছে। আর অধিকাংশের উপর সমষ্টির হুকুম প্রজোয্য হয়ে থাকে। বিধায় সে তার নামাজকে পূর্ণ করে জামাতে শরীক হবে নফলের নিয়্যাতে। নফলের নিয়্যাত এজন্য যে কোন ফরজ নামাজ এক ওয়াক্তে দু বার পড়া যায় না। আর যদি তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে তবে নামাজ ভেঙ্গে জামাতে শরীক হবে।

قوله : فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ الخ : যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকাত ফরজ আদায় করল অতঃপর ইমাম সাহেব জামাত শুরু করে দিলেন। তবে উক্ত একাকী নামাজ আদায়কারী তার নামাজ ভেঙ্গে জামাতে শামিল হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি সে দ্বিতীয় রাকাতে হয় আর এখনও দ্বিতীয় রাকাতের সিজদা করে না তবে নামাজ ভেঙ্গে জামাতে শামিল হবে। আর যদি না ভাঙ্গে তবে একাকী নামাজ আদায় হলো আর জামাত যা সুন্নাতে মুআক্কাদা তা ফউত হলো। বিধায় জামাতের ফজিলত পাওয়ার জন্য নিজের একাকী নামায ভেঙ্গে জামাতে শামিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কেউ ফজরের ফরজের উভয় রাকাত যদি পড়ে নেয় অতঃপর ইমাম সাহেব জামাত শুরু করলেন তবে সে জামাতে শামিল হতে পারবে না। কেননা, ফজরের ফরয আদায়ের পর সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত কোন নফল নামায নেই। বিধায় নফলের নিয়্যাতে জামাতে শামিল হতে পারবে না। তদ্রূপ আসরের নামায একাকী আদায় করে নিলে পুনরায় জামাতে নফলের নিয়্যাতে শামিল হতে পারবে না। কারণ, আছরের নামাজের পর থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত আর নফল নামাজ নেই। এজন্য আমরা বলি যদি কেহ মাগরিবের নামায আদায় করে নেয় তবে পুনরায় জামাতে শামিল হবে না।

قوله : وَكُرِهَ خُرُوجُهُ الخ : আযান হওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন :

لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ يُرِيْدُ الرُّجُوْعَ -

'আযানের পর মসজিদ থেকে বের হবে না ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে মুনাফিক অথবা ঐ ব্যক্তি যে ফিরে আসার ইচ্ছা নিয়ে কোন প্রয়োজনে বের হয়। তবে যদি আযানের পূর্বে ঐ ওয়াক্তের নামায পড়ে নেয় তবে বের হওয়া মাকরূহ নয়। কিন্তু যদি জোহর কিংবা ইশার নামাজ পড়ে নেয় আর ইকামাত হয়ে যায় তবে বের হওয়া মাকরূহ। এমনি নিজ মহল্লার মসজিদে যদি লোকেরা নামাজ না পড়ে তবে তার জন্য নিজ মহল্লার মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। তাই এমতাবস্থায় মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ নয়। অনুরূপ যদি উক্ত ব্যক্তির অন্য মসজিদে জামাতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে যেমন সে ব্যক্তি অন্য এক মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিন, তবে তার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ নয়।

وَمَنْ خَافَ فَوَاتَ الْفَجْرِ إِنْ أَدَّى سُنَّتَهُ ائْتَمَّ وَتَرَكَهَا وَإِلَّا لَا وَلَمْ تُقْضَ إِلَّا تَبَعًا وَقَضَى الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ قَبْلَ شَفْعِهِ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ جَمَاعَةً بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ بَلْ أَدْرَكَ فَضْلَهَا وَ يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ إِنْ أَمِنَ فَوْتَ الْوَقْتِ وَإِلَّا لَا وَإِنْ أَدْرَكَ إِمَامَهُ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَوَقَفَ حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ وَلَوْ رَكَعَ مُقْتَدٍ فَأَدْرَكَهُ إِمَامُهُ فِيهِ صَحَّ -

অনুবাদ : যার আশংকা হয় ফজরের জামাত ছুটে যাবার যদি সে ফজরের সুন্নাত পড়ে তবে সে সুন্নাত ছেড়ে দিবে। নতুবা নয় (অর্থাৎ যদি সুন্নাত পড়ে জামাত ছুটে যাওয়ার ভয় না হয়, তবে সুন্নাত পড়ে জামাতের ইক্তিদা করবে) এবং উক্ত সুন্নাতের কাযা করা যাবে না। তবে ফরজের অনুসরণে তা পড়া যাবে। (অর্থাৎ ফজরের ফরজ কাযা হয় তবে ফরজের সঙ্গে সুন্নাতের কাযা করতে পারবে।) এবং জোহরের ফরজের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত ফরজের পরের দু রাকাত সুন্নাত এর পূর্বে ওয়াক্তের ভিতর কাযা করা যাবে। কেউ যোহরের এক রাকাত পেল (কিন্তু বাকি তিন রাকাত পেল না) সে জোহরের নামায জামাতে পড়ল না বরং সে জামাতের ফজিলত পেল। আর ফরজের পূর্বে নফল নামাজ পড়তে পারবে যদি ওয়াক্তি নামাজ ফউত না হওয়ার আশংকা হয়। আর যদি ওয়াক্তিয়া নামায ফউত হওয়ার আশংকা থাকে তবে নফল পড়তে পারবে না। কেউ যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পেয়ে তাকবির বলে দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় ইমাম সাহেব মাথা তুলে ফেলেন তবে সে রাকাত পেল না। আর যদি মুক্তাদী ইমামের পূর্বে রুকু করে নেয় অতঃপর ইমাম তাকে রুকুতে গিয়ে পান তবে সহীহ (তার নামাজ জায়েয হবে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَمَنْ خَافَ فَوْتَ الْفَجْرِ الخ : কেহ এমন সময় মসজিদে গিয়ে পৌছে যে ইমাম সাহেব জামাতরত। এদিকে উক্ত ব্যক্তি এখনও ফজরের সুন্নাত পড়েনি, তাহলে তার দু অবস্থা। (১) হয়ত সে সুন্নাত আদায় করে নিবে যদিও তার এক রাকাত চলে যায়। (২) সুন্নাত পড়লে জামাত ফউত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। প্রথম অবস্থায় সুন্নাত পড়ে নিবে, অতঃপর জামাতে শরীক হবে।

দলিল : ফজরের সুন্নাত সমস্ত সুন্নাত থেকে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী। যেমন, রাসূল সা. ফজরের সুন্নাতের ব্যাপারে এরশাদ করেন- صَلُّوْهُمَا وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ 'তোমরা ফজরের সুন্নাত পড়বে যদিও ঘোড়া তোমাদের পদদলিত করে।' অন্যত্র আল্লাহর রাসূল সা. এরশাদ করেন- مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلٰوةَ 'যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকাত পেল সে পূর্ণ নামায পেল'। অতএব এভাবে পড়ার দ্বারা অর্থাৎ প্রথমে সুন্নাত এবং পরে ইমামের সাথে ফরজ পড়ার দ্বারা সুন্নাতেরও ফজিলত পাবে ও ফজরের জামাতের ফজিলতও পাবে।

দ্বিতীয় অবস্থায় সুন্নাত পড়লে পূর্ণ জামাত ফউত হওয়ার আশংকা থাকলে সুন্নাত না পড়ে জামাতে শামিল হয়ে যাবে। কেননা, সুন্নাতের ফজিলত থেকে জামাতের ফজিলত অনেক বেশী। রাসূল সা. এরশাদ করেন-

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

'জামাতের নামাজ একাকী নামাযের চেয়ে সাতাশগুণ বেশি ফজিলত।' অপর দিকে জামাত তরক করা সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী বর্ণিত আছে। যেমন রাসূল সা. ইরশাদ করেন- تَارِكُ الْجَمَاعَةِ مَلْعُوْنٌ 'জামাত তরককারী অভিশপ্ত।' সুতরাং উক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকায় সুন্নাত না পড়ে জামাতে শরিক হবে।

قوله : وَلَمْ تَقْضِ اِلَّا تَبَعًا الخ : ফজরের সুন্নাত ছুটে গেলে সর্ব সম্মতিক্রমে সূর্যোদয়ের আগে কাযা করা যাবে না। কারণ, ফজরের ফরযের পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কোন নফল নামাজ নেই। আর সূর্যোদয়ের পরে কাযা করা যাবে কি না এনিয়ে উলামায়ে কেরামদের মতানৈক্য রয়েছে।

শায়খাইন রহ. এর মতে তা সূর্যোদয়ের পরও কাযা করা আবশ্যক নয়। ইমাম মুহাম্মদ রহ.এর মতে কাযা করা ওয়াজিব নয়। তবে পছন্দনীয় হলো তা কাযা করে নেয়া। তিনি দলিল হিসাবে لَيْلَةُ التَّعْرِيْسِ এর ঘটনা উল্লেখ পূর্বক বলেন, হুজুর সা. সেদিন সূর্যোদয়ের পর তা পড়েছেন। সুতরাং এ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে সূর্যোদয়ের পর ফজরের সুন্নাতের কাযা করা যায়। শায়খাইন রহ. এর দলিল হলো মূলত সুন্নাতের কাজ্বা নেই। কারণ কাযা হলো ওয়াজিবের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ওয়াজিব তরক হলে তার কাযা ওয়াজিব হয় কিন্তু সুন্নাতের কোন কাযা নেই। বিধায় সূর্যোদয়ের পর ছোটে যাওয়া ফজরের সুন্নাতের কাযা নেই। তবে যদি ফজরের ফরজ নামায কাযা হয়ে যায় তবে সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফরজের অনুসরণে সুন্নাতও পড়া যায়। এর দলিল হল- لَيْلَةُ التَّعْرِيْسِ এ হুজুর সা. এর ফজরের ফরজ কাযা হয়ে যাওয়াতে হুজুর সা. ফজরের ফরযের সাথে সুন্নাতের কাযা আদায় করেছেন। উক্ত আলোচনা দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দলিলের জবাবও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

قوله : وَ قَضَى الَّتِيْ قَبْلَ الظُّهْرِ الخ : জোহরের প্রথম চার রাকাত সুন্নাত ফউত হয়ে গেলে তা (জোহরের ওয়াক্তের ভিতর ফরজের সুন্নাত দু' রাকাতের পূর্বে অথবা পরে আদায় করতে পারবে। ওয়াক্ত চলে গেলে আর আদায় করা যাবে না।

قوله : وَاِنْ اَدْرَكَ اِمَامَهُ رَاكِعًا الخ : যদি কেহ ইমামকে রুকু অবস্থায় পায়, অতঃপর উক্ত ব্যক্তি তাকবীরে তাহরীমা বলে নামাযে প্রবেশ করতঃ দাঁড়িয়ে থাকে এমতাবস্থায় ইমাম রুকু থেকে মাথা তুলে ফেলেন তবে আমাদের মাযহাব মতে সে উক্ত রাকাত পেল না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার রহ. এর মতে সে উক্ত রাকাত পেয়েছে। সুফিয়ান সাওরী রহ. ইবনে আবি লায়লা রহ. এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর মতামতও অনুরূপ। ইমাম যুফার ও তার মতাদর্শিদের দলিল : উক্ত ব্যক্তি ইমামকে কিয়াম অবস্থায় পেয়েছে। আর কিয়াম রুকু এর হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং দাড়ানো অবস্থায় পাওয়ার অর্থ হলো রাকাত পাওয়া। সুতরাং আলোচিত অবস্থায় সে উক্ত রাকাত পেয়েছে হিসাবে গণ্য হবে। আমাদের দলিল : اقتداء হল নামাজের কর্মে অংশ নেয়া। আর এখানে নামাযের কর্মে অংশ গ্রহণ করা পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ সে ইমামকে যদিও রুকুতে পেয়েছে কিন্তু সে উক্ত রাকাতের অন্তর্ভূক্ত হয়নি আর যেহেতু ইমাম কিয়াম ছেড়ে সিজদায় চলে গেছেন। সুতরাং কিয়ামও পায়নি বিধায় সে উক্ত রাকাত প্রাপ্ত হয়েছে বলে গণ্য করা যাবে না। ইমাম যুফার রহ. এর দলিলের জবাব : আমরা কিয়ামকে রুকুর অন্তর্ভূক্ত হিসাবে গ্রহণ করি না। কারণ হযরত উমর রাযি. সূত্রে বর্ণিত আছে-

اِذَا اَدْرَكْتَ الْاِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ اَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ اَدْرَكْتَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَاِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ اَنْ تَرْكَعَ فَاتَتْكَ تِلْكَ الرَّكْعَةُ -

যখন তুমি ইমামকে রুকুতে পাবে। আর যদি তুমি ইমামের মাথা উঠানোর পূর্বে রুকু করে নাও, তবে তুমি ঐ রাকাত পেয়েছ। আর যদি ইমাম তোমার রুকু করার পূর্ব মাথা তুলে নেয় তবে ঐ রাকাত ফউত করেছ। সুতরাং প্রমাণিত হল যে কিয়াম রুকুর অন্তর্ভূক্ত নয়। আর রুকু না পেলে রাকাত পাওয়া অসম্ভব।

قوله : وَلَوْ رَكَعَ مُقْتَدِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি ইমামের পূর্বে রুকুতে অথবা সেজদাতে চলে যায়, আর ইমাম তাকে রুকুতে গিয়ে পান তবে মুক্তাদির রুকু সিজদা আদায় হবে, তবে মুক্তাদির নামাজ মাকরূহ হবে। মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, রাসূল সা. ইরশাদ করেন—

اَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْكَعُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يُحَوِّلَ رَأْسَهُ رَأْسَ الْحِمَارِ -

তার ভয় করা উচিত যে ইমামের পূর্ব রুকুতে যায় যে, তার মাথা রূপান্তর করা হবে গাধার মাথায়। অর্থ যদি ইমামের পূর্বে রুকুতে বা সিজদাতে যায় এবং রুকু বা সিজদার পূর্বে সে মাথা উঠিয়ে নেয়, তাহলে নামায জায়েয হবে না। কেননা, এই অবস্থায় কোন অংশে ইমামের সাথে শরীক পাওয়া যায় নাই। অথচ কোন অংশে শরীক থাকা শর্ত।

بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

পরিচ্ছেদ : কাযা নামাজের আদায়ের বিবরণ

اَلتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَائِتَةِ وَالْوَقْتِيَّةِ وَبَيْنَ الْفَوَائِتِ مُسْتَحَقٌّ وَيَسْقُطُ بِضَيْقِ الْوَقْتِ وَالنِّسْيَانِ وَصَيْرُورَتِهَا سِتًّا وَلَمْ يَعُدْ بِعَوْدِهَا اِلَى الْقِلَّةِ فَلَوْ صَلّٰى فَرْضًا ذَاكِرًا فَائِتَةً وَلَوْ وِتْرًا فَسَدَ فَرْضُهُ مَوْقُوفًا -

অনুবাদ : ওয়াক্তিয়া কাযা এবং কয়েক কাযা নামাজের মধ্যে তারতীব আবশ্যক এবং তারতীব সময়ের সংকীর্ণতার দরুন ও ভুলে যাওয়ার দরুন এবং কাযা নামায ছয়ের কৌটায় চলে যাওয়াতে রহিত হয়ে যাবে। অনেক কাজা কম হওয়ার দরুন তারতীব ফিরে আসে না। যদি কেহ কাযা নামাজের কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় ফরজ পড়ে তবে ঐ কাযা যদি বিতিরও হয় তবে তার ফরজ ফাসিদ হবে স্থগিতাবস্থায়।

শব্দার্থ : فَوَائِتُ ইহা فَائِتٌ এর ব.ব., অর্থ- হারিয়ে গিয়েছে এমন, হাতছাড়া, কাযা নামাজকে ফাইতা নামায বলে। مُسْتَحَقٌّ -দাবিদার, আবশ্যক। ضَيِّقٌ (م) ضَيِّقَةٌ সংকীর্ণ, সংকটময়। نِسْيَانٌ - ভুল, বিস্মৃতি। صَيْرُورَةٌ - হওন, ঘটন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ قَضَاءِ الخ : বিজ্ঞ গ্রন্থকার রহ. এতক্ষন পর্যন্ত আদা (اداء) নামাজের আলোচনা করেছেন এখান থেকে তিনি কাযা (قضاء) নামাজের আলোচন শুরু করতেছেন। কারণ কাযা (قضاء) নামায আদা (اداء) নামাজের খলিফা আর (قضاء) হলো মূল।

قوله : اَلتَّرْتِيبُ الخ : কাযা নামায ও ওয়াক্তিয়া নামায এবং কয়েকটি কাযা নামায (পাঁচ ওয়াক্ত বা তার কমে) তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আমাদের মতে ওয়াজিব। যেমন কারও যোহর, আছর, মাগরিবের নামায কাযা হয়ে গেল। অতঃপর ইশার নামাযের পরে মাগরিব আদায় করে ইশার নামায আদায় করবে। ইমাম নখয়ী, লইছ ইমাম মালিক, আহমদ রাবিয়া রহ. প্রমুখ ফকীহদেরও অনুরূপ অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা মুস্তাহাব। হযরত তাউস ও আবু ছাউর রহ. এরও অনুরূপ মতামত। শাফেয়ী রহ. এর দলীল : প্রতিটি ফরজ নামায নিজস্বভাবে সাব্যস্ত। সুতরাং তা অন্য ফরজের জন্য শর্ত হতে পারে না। আমাদের দলীল : রাসূল সা. ইরশাদ করেন—

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ فَلْيُصَلِّ الَّتِى وَ هُوَ فِيهَا ثُمَّ لِيُصَلِّ الَّتِى ذَكَرَهَا ثُمَّ لِيُعِدِ الَّتِى مَعَ الإِمَامِ -

'যে ব্যক্তি নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে অথবা নামাজের কথা ভুলে যায়। আর তা ইমামের সাথে নামাজে শরীক হওয়ার পরই মনে পড়ে, তবে সে যে নামাজ আরম্ভ করেছে তা পড়ে নেবে। তারপর সাথে সাথেই যে নামাজের কথা স্মরণ হয়েছে তা পড়ে নেবে। তারপর ইমামের সাথে যে নামাজ আদায় করেছে তা পুণরায় আদায় করবে।' উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে ইমাম সাহেবের সাথে আদায়কৃত নামাজের পর কাযা নামাজ আদায়ের পর ইমাম সাহেবের সাথে আদায়কৃত নামাজের পুনরাবৃত্তি ওয়াজিব। সুতরাং ধারাবাহিকতা ওয়াজিব না হলে উক্ত নামাজের পুণরাবৃত্তির কোন প্রশ্নই উঠে না।'

قوله : وَيَسْقُطُ بِضَيْقِ الخ : তারতীব রহিত হয়ে যায় কয়েকটি অবস্থায়। (১) ওয়াক্তের সংকীর্ণতার দরুন তারতীব রহিত হয়ে যায়। যেমন, কারো এশার নামাজ কাযা হলো। এখন ফজরের ওয়াক্তের সময় এ পরিমাণ বাকী অর্থাৎ সূর্যোদয়ের এ পরিমাণ বাকী যে, শুধু ফজর পড়াই সম্ভব। তবে শুধু ফজরই পড়বে। (২) ওয়াক্তি নামাজ পড়তে সময় কাযা নামাজের কথা ভুলে গেলে তারতীব রহিত হয়ে যায়। (৩) কাযা নামাজের সংখ্যার আধিক্যের জন্যও তারতীব রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ কাযা নামাজের সংখ্যা যদি ছয় ওয়াক্তের চেয়ে বেশী হয়ে যায় তবে তারতীব রক্ষা করা প্রয়োজন নয়। উপরোক্ত প্রকারে তারতীব রহিত হওয়ার কারণ হল যে ওয়াক্তিয়া নামাজকে ওয়াক্তে আদায় করা হল فرض قطعى আর কাযা নামাজকে ওয়াক্তিয়া নামাযের পূর্বে পড়া হল فرض عملى। সুতরাং যদি ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়, অথবা কাযা নামাজের সংখ্যা এত অধিক্য হয় যে, ওয়াক্তিয়া নামাজকে কাযা করা আবশ্যক হয়। তবে فرض قطعى তথা ওয়াক্তিয়া নামাজকে পূর্বে পড়া হবে।

আর যদি কাযা নামাজ ছয় ওয়াক্ত থেকে কম হয় তবে যত ওয়াক্ত কাযা নামাজ ওয়াক্তিয়া নামাজের পূর্বে পড়া সম্ভব হবে তা পড়ে নেয়া হবে।

قوله : وَلَمْ يَعُدْ بِعَوْدِهَا الخ : যদি কারও অনেক দিনের নামায অর্থাৎ একমাসের অধিক দিনের নামাজ কাযা হয়ে যায়। অতঃপর সে অনুতপ্ত হয়ে কাযা নামাযগুলো পড়তে আরম্ভ করল। তারপর তা ছয় ওয়াক্তের চেয়ে কম রয়ে গেল। তবে তারতীব ফিরে আসবে কিনা এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে তারতীব ফিরে আসে। অন্য বর্ণনা মতে তারতীব ফিরে আসে না। ইহা আবু হাফস কবীর রহ., আল্লামা ফখরুল ইসলাম, শামসুল আইম্মা সারখসী রহ. এবং কাযীখান প্রমুখ ফকীহগণের মতামত। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর উক্ত দ্বিতীয় মতের দলিল হল : ঐ ব্যক্তির জিম্মায় অনেক দিনের নামায তথা এক মাসের অধিক দিনের কাযা নামাজ ছিল যা আধিক্যের গন্ডীভুক্ত। আর অধিকের পরিমাণে পৌছলে তারতীব রহিত হয়ে যায়। বিধায় এখানে তারতীব রহিত হয়ে গেছে। যা পূণরায় ফিরে আসবে না। কারণ السَّاقِطُ لاَيَعُوْدُ। 'যা একবার রহিত হয়ে যায় তা আর পুণরায় ফিরে আসে না।

قوله : فَلَوْ صَلَّى فَرْضًا ذَاكِرًا فَائِتَةً الخ : যদি কেহ ফরজ নামাজ পড়ে এমতাবস্থায় যে তার স্মরণ আছে পূর্বের ফরজ নামায কাযা হওয়ার কথা, তবে তারতীবের খেলাফ করার দরুন তার উক্ত নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। যেমন, কেহ আছরের নামাজ পড়া অবস্থায় স্মরণ হলো যে তার জিম্মায় জোহরের নামাজ রয়েছে, তবে তার উক্ত আসরের নামাজ তারতীবের খিলাফ করার দরুন ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে মতানৈক্য আছে যে, উক্ত আদায়কৃত স্থগিতাবস্থায় ফাসিদ হবে না চুড়ান্তভাবে ফাসিদ হবে। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তা স্থগিতাবস্থায় ফাসিদ হবে। তবে যদি উক্ত আদায়কৃত নামাজ থেকে পরবর্তী ছয় ওয়াক্তের ভেতর উক্ত কাযা নামায না পড়ে তবে এসব নামায জায়েয হয়ে যাবে।

بَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ

পরিচ্ছেদ : সিজদায়ে সাহুর বিবরণ

يَجِبُ بَعْدَ السَّلَامِ سَجْدَتَانِ بِتَشَهُّدٍ وَتَسْلِيمٍ بِتَرْكِ وَاجِبٍ وَإِنْ تَكَرَّرَ وَبِسَهْوِ إِمَامِهِ لَا بِسَهْوِهِ وَإِنْ سَهَى عَنِ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ وَهُوَ إِلَيْهِ أَقْرَبُ عَادَ وَإِلَّا لَا وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِنْ سَهَى عن الْأَخِيرِ عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ فَإِنْ سَجَدَ بَطَلَ فَرْضُهُ بِرَفْعِهِ وَصَارَتْ نَفْلًا فَيَضُمُّ إِلَيْهَا سَادِسَةً وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ عَادَ وَ سَلَّمَ وَإِنْ سَجَدَ لِلْخَامِسَةِ تَمَّ فَرْضُهُ وَضَمَّ إِلَيْهَا سَادِسَةً لِتَصِيرَ الرَّكْعَتَانِ نَفْلًا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ -

অনুবাদ : নামাজে ওয়াজিব তরক করার কারণে সালামের পর দুটি সিজদা তাশাহুদ ও সালামের সাথে ওয়াজিব হয়। যদি ও ইমামের ভুলে পুনরাবৃত্তি হয় (তবে দুটি সিজদাই আবশ্যক হবে) কিন্তু মুক্তাদির স্বীয় ভুলে সিজদায়ে সাহু লাযিম হবে না। আর যদি প্রথম বৈঠক না করে ভুলে উঠে যায় এবং এখনও বসার নিকটবর্তী তবে ফিরে আসবে। তথা (প্রথম বৈঠকে ফিরে আসবে) নতুবা নয়। (অর্থাৎ যদি প্রথম বৈঠক না করে উঠে যায় আর তার উঠা দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয়, তবে আর ফিরে আসবে না, বরং দাঁড়িয়ে যাবে।) এবং ঐ ভুলের জন্য সিজদায়ে সহু করবে। আর যদি শেষ বৈঠক না করে দাড়িয়ে যায় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সিজদা করবে না, ফিরে আসবে এবং সিজদায়ে সাহু করবে। আর যদি সিজদা করে ফেলে তবে সিজদা থেকে মাথা উঠাতে ফরয বাতিল হয়ে যাবে (অর্থাৎ ফরজ নামাজে শেষ বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে যায় এবং যথারীতি একরাকাত পূর্ণ করে তথা সিজদা করে, তবে ফরজ বাতিল হয়ে যাবে) এবং তা নফল হয়ে যাবে। সুতরাং তার সাথে ষষ্ঠ এক রাকাত মিলাবে। (কেননা, বেজোড় রাকাতের নফল নেই) আর যদি চতুর্থ রাকাতে বসে দাঁড়িয়ে যায় তবে ফিরে আসবে এবং সালাম ফিরাবে। আর যদি (চতুর্থ রাকাতে বসার পর দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর) পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে ফেলে তবে ফরজ পূর্ণ হয়ে যাবে এবং ষষ্ঠ আরো এক রাকাত মিলিয়ে নিবে যাতে দু' রাকাত নফল হয়ে যায় এবং সিজদায়ে সাহু করবে

শব্দার্থ : سُجُوْدٌ সিজদা, মাথা নত করণ سَهْوٌ ভুলে, বেখেয়ালে ضَمَّ (ن) ضَمًّا যোগ করা, একত্র করা

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : بَابُ سُجُوْدِ الخ গ্রন্থকার রহ. ফরজ, নফল, আদা, কাযা, নামাজ সমূহ আলোচনা করে উক্ত নামাজসমূহে সংঘটিত ভুলত্রুটির ক্ষতি পূরণের আলোচনা করতেছেন আর তা হচ্ছে সিজদায়ে সাহু

قوله : يَجِبُ بَعْدَ السَّلَامِ الخ : সিজদায়ে সাহু সালামের পূর্বেও জায়েয এবং পরেও জায়েয। কিন্তু কোনটি উত্তম এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে সালামের পর সিজদায়ে সাহু উত্তম এবং ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহু উত্তম। ইমাম মালিক রহ. এর মতে যদি নামাজের মধ্যে কোন কিছু কম করার দ্বারা হয়, তবে সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহু করা উত্তম আর যদি কোন কিছু বাড়ানো হয়, তবে সালামের পরে সিজদায়ে সাহু করা উত্তম ইমাম আহমদ ইবনে

হাম্বল রহ. এর মতে রাসূল সা. থেকে যেসব স্থানে সিজদা সালামের পূর্বে সাবিত যে স্থানে সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহু করা। আর যেসব স্থানে সিজদা সালামের পরে সাবিত সেস্থানে সালামের পরে সিজদা করা উত্তম।

আমাদের দলিল হল : রাসূল সা. এর বাণী- لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ 'প্রতিটি ভুলের জন্য সালামের পর দুটি সিজদা। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)। আকলী দলিল হল : আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে সিজদায়ে সাহুর দ্বিত্ব হয় না। সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহু করার দ্বারা বারংবার করার সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং সালামের পর সিজদায়ে সাহু করার দ্বারা সেই সম্ভাবনা থাকে না, বিধায় আমরা বলব যে, সালামের পর সিজদায়ে সাহু করা উত্তম।

জ্ঞাতব্য বিষয় : নামাজে কম বেশী করলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। এ কমবেশী নামাজ জাতীয় হবে, কিন্তু যে নামাজ আদায় করছে তার অন্তর্ভুক্ত নয়। এমন ভুল হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। যেমন কেহ এক রাকাতে দুটি রুকু করল বা এক রাকাতে তিনটি সিজদা করল, সুতরাং যদিও এ দুটো নামাজ জাতীয় কিন্তু এ নামাজের অংশ নয়। তাই অতিরিক্তের কারণে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে এক বেশী যদি নামাজ জাতীয় না হয় তবে নামাজই হবে না।

قوله : وَاِنْ تَكَرَّرَ بِسَهْوٍ الخ : নামাজে একাধিক ওয়াজিব তরক করার দরুন শুধু দুটি সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। এবং মুক্তাদির উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে ইমামের সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার সাথে, কিন্তু ইমামের ভুল হল না আর মুক্তাদির ভুল হল, তাহলে উভয়ের উপরই সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। কারণ, মুক্তাদি ইমামের تابع বা অনুবর্তী হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আর যদি ইমামের উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় আর সে তা আদায় করে না তবে আমাদের মাযহাব মতে মুক্তাদির উপর তা আদায় করা ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও ইমাম তা আদায় না করে তবে মুক্তাদির উপর তা আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এর অনুরূপ মতামত।

আমাদের দলিল হল : ইমাম সিজদায়ে সাহু না করা অবস্থায় যদি মুক্তাদি সিজদা করে তবে ইমামের বিরুদ্ধাচরণ হলো। অথচ সে ইমামের অনুসারী হয়ে নামায আদায়ের দায়িত্ব নিয়েছে। আর অনুসরণ ও বিরুদ্ধাচারের মধ্যে অনেক বৈপরীত্ব রয়েছে বিধায় মুক্তাদি সিজদায়ে সাহু দিতে পারবে।

قوله : وَاِنْ سَهٰى عَنِ الْقُعُوْدِ الخ : যদি কেহ তিন রাকাতী বা চার রাকাতী নামাজের প্রথম বৈঠক ভুলে যায় অতঃপর স্মরণ হয় তবে তার দু' অবস্থা : (১) প্রথম সুরত- সে এখনও বসার নিকটবর্তী আর তা বুঝার পদ্ধতি হলো সে এখনও জমি থেকে হাটু উঠায়নি। তাহলে বসে পড়বে। এবার প্রশ্ন আসে এখন সিজদায়ে সাহু আসবে কি না, উত্তর কারো কারো মতে সিজদা সাহু ওয়াজিব। কারণ হলো প্রথম বৈঠক ওয়াজিব। আর এতে বিলম্ব হয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। কেননা, যা কোন বস্তুর নিকটবর্তী হয় তা ঐ বস্তুর হুকুমে গণ্য করা হয়। (২) দ্বিতীয় সুরত : দাঁড়ানো অবস্থার বেশী নিকবর্তী হবে। আর তা পরিচয়ের পদ্ধতি হলো সে হাটু জমি থেকে উঠিয়ে নিয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় সুরতে সে বৈঠকের দিকে ফিরে আসবে না, বরং তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। কারণ, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোন জিনিসের নিকটবর্তী হওয়া সে জিনিসের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ ব্যক্তি যেহেতু দাঁড়ানোর নিকটবর্তী তাই তাকে কিয়ামের হুকুমে গণ্য করা হবে। আর দাঁড়ানো থেকে প্রথম বৈঠকের দিকে ফিরে যাওয়া জায়েয নেই। কারণ, দাঁড়ানো ফরয আর প্রথম বৈঠক ওয়াজিব। সুতরাং ফরজ ছেড়ে ওয়াজিবের দিকে যাওয়া জায়েয নেই। তবে হাঁ, এ সূরতে প্রথম বৈঠক ছেড়ে দেওয়ার দরুন সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

قوله : وَاِنْ سَهٰى عَنِ الْاٰخِرِ الخ : যদি কেহ শেষ বৈঠকের কথা ভুলে যায় এবং দাঁড়িয়ে অন্য এক রাকাত শুরু করে দেয় তাহলে মাসআলা হল অতিরিক্ত রাকাতের সিজদা না করা পর্যন্ত ফিরে আসবে এবং যথারীতি শেষ বৈঠক করে সিজদায়ে সাহু করে নামাজ শেষ করবে। আর উক্ত ফিরে আসার দ্বারা তার নামাজের সংশোধনী

রয়েছে। আর তার জন্য ইহা সম্ভব। কেননা, এক রাকাতের কম তা ছেড়ে দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ এক রাকাতের কম প্রকৃত অর্থে নামাজ নয় এবং হুকুম এর দিক থেকেও তা নামাজ নয়।

قوله : فَاِنْ سَجَدَ بَطَلَ الخ : যদি শেষ বৈঠক না করে ভুলে দাঁড়িয়ে যায় এবং পরবর্তী এক রাকাত পড়ে নেয়, অর্থাৎ সিজদা করে ফেলে তবে তার ফরজ ফাসিদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে তার ফরজ ফাসিদ হবে না। বরং সে বসার দিকে ফিরে আসবে ও তাশাহুদ পড়বে এবং সিজদায়ে সাহু করে সালাম ফিরাবে। আর এ হুকুম ঐ সময় যখন ভুল বশত পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়ায় তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আমাদের মাযহাব মত যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দাঁড়ায় তবে পরবর্তী সিজদা করার আগ পর্যন্ত ফিরে আসতে পারবে। **ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতের দলিল হল :** أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا - হুজুর সা. জোহরের নামাজ পাঁচ রাকাত পড়েছেন একথা বর্ণিত নেই যে, হুজুর সা. চার রাকাতের পর বৈঠক করেছেন। আর ইহাও বর্ণিত নেই যে, তিনি এই নামাজ পুণরায় আদায় করেছেন। দ্বিতীয় দলিল : ঐ ব্যক্তি ভুলের কারণে নামাজে এমন বস্তু বৃদ্ধি করেছে যা নামাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তার নামাজ ফাসিদ হবে না। **আমাদের দলিল হল :** ঐ ব্যক্তি সিজদাসহ পঞ্চম রাকাত আদায় করার কারণে উক্ত নামায নফলে রূপান্তর হয়ে গেছে। অথচ এখন তার ফরজ নামাজের আরকান আদায় হয়নি। এতে প্রতিয়মান হল যে, ফরজ নামাজের আরকান পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যে নফল নামাজ আরম্ভ করে দৃঢ় করে ফেলেছে। তাই তার ফরজ ফাসিদ হয়ে গেছে। ইমাম শাফেয়ীয়ী রহ. এর দলিলের জবাব : রাসূলুল্লাহ সা চতুর্থ রাকাতের শেষে বসেছেন। আর একথার দলিল হল, হাদীসে صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا এসেছে। আর যোহর বলা হয় তার সকল আরকান পালন করার পর। আর বৈঠক সকল আরকানের অন্তর্ভুক্ত। এদিকে রাসূলুল্লাহ সা. পঞ্চম রাকাতে এ ধারণায় দাঁড়িয়েছেন যে, ইহা তৃতীয় রাকাত। সুতরাং হাদীসের এ ব্যাখ্যার পর এ হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিল হিসাবে গণ্য হতে পারে না। তাই আমাদের কথা অনুযায়ী যেহেতু তার ফরজ বাতিল হয়ে গেল বিধায় পঞ্চম রাকাতের সাথে আর এক রাকাত যোগ করে মোট ছয় রাকাত পড়বে। এবং তার এ মোট ছয় রাকাত নফল হয়ে যাবে। আর পঞ্চম রাকাতের সাথে আর এক রাকাত এ জন্য মিলাবে যে নফল বেজোড় নেই।

قوله : وَاِنْ قَعَدَ فِى الرَّابِعَةِ الخ : যদি কেহ চতুর্থ রাকাতে বৈঠকের পর দাঁড়িয়ে যায় ভুল বশত, তবে পঞ্চম রাকাতের সিজদা করা পর্যন্ত ফিরে আসতে পারবে। আর ফিরে আসলে তাশাহুদ পড়তে হবে না বরং সালাম ফিরিয়ে সিজদায়ে সাহু করে তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে নেবে। দলিল : একবার রাসূল সা. চতুর্থ রাকাতের বৈঠকের পর দাঁড়িয়ে গেলে পিছন থেকে তাসবীহ দ্বারা তাকে অবগত করালে তিনি ফিরে আসলেন এবং সালাম ফিরিয়ে সিজদায়ে সাহু করলেন। যুক্তি নির্ভর দলিল : চতুর্থ রাকাতের পর বৈঠকের পর মুসল্লির উপর ওয়াজিব হল সালাম ফিরানো, আর তা বসা অবস্থায়। সুতরাং যেহেতু সে দাঁড়িয়ে গেল বিধায় দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম ফিরাতে পারবে না। কারণ এখানে সালাম ফিরানোর মহল নেই। তাই বসে সালাম ফিরাবে। আর যদি পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে নেয় তবে তার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেল। তবে উক্ত পাঁচ রাকাতের সাথে আর এক রাকাত মিলাবে, যাতে পরবর্তী দু' রাকাত তার নফল হয়ে যায় এবং সব শেষে সিজদায়ে সাহু করা হবে, যাতে তার ফরজ পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে যদি ষষ্ঠ রাকাত যোগ করে নেয় তবে তার ফরজ নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, সে ফরজ ছেড়ে নফলের দিকে চলে গেছে। অথচ সালাম শব্দ এখনও বাকী আছে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে সালাম শব্দ দ্বারা নামায থেকে বের হওয়া ফরয। তাই ফরজ নামাজ তরক করার দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে গেল। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিলের জবাব : আমাদের মতে যেহেতু সালাম শব্দ দ্বারা নামাজ থেকে বের হওয়া ওয়াজিব। আর ওয়াজিবের তরক দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না। বরং সাহু সিজদা করার মাধ্যমে নামাজ পূর্ণ হয়ে যায়। আর ষষ্ঠ রাকাত যোগ করার হুকুম এজন্য দেয়া হয়েছে

যে, যাতে দুই রাকাত নফল হয়। কেননা, রাসূল সা. বিচ্ছিন্ন এক রাকাত নামায পড়তে নিষেধ করেছে। তাই এক রাকাত নামাজ পড়া জায়েয নেই।

وَلَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ فِي شَفْعِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَبْنِ شَفْعًا آخَرَ عليه وَلَوْ سَلَّمَ السَّاهِي فَاقْتَدَى بِهِ غَيْرُهُ فَإِنْ سَجَدَ صَحَّ وَإِلَّا لَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ سَلَّمَ لِلْقَطْعِ وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى أَوَّلَ مَرَّةٍ اسْتَأْنَفَ وَإِنْ كَثُرَ تَحَرَّى وَإِلَّا أَخَذَ بِالْأَقَلِّ تَوَهَّمَ مُصَلِّي الظُّهْرِ أَنَّهُ أَتَمَّهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ -

অনুবাদ : যদি কেহ নফলের দু রাকাতের মাথায় সিজদায়ে সহু করে তবে তার উপর অন্য দুরাকাতের বিনা করতে পারবে না। যদি ভুলকারী সালাম ফিরায় অতঃপর অন্য একজন (নতুনভাবে) ইকতেদা করে তবে যদি ইমাম (সাহু) সিজদা করে তাহলে তার ইকতিদা করা সহীহ। অন্যথায় সহীহ হবে না। যে ব্যক্তি নামাজ শেষ করার নিয়্যাতে সালাম ফিরায় অথচ তার জিম্মায় সিজাদায়ে সাহু রয়ে যায় তাহলে সিজদায়ে সাহু করবে যদিও সালাম ফিরায় নামাজ পূর্ণ করার নিয়্যাতে। যদি নামাজির সন্দেহ হয় যে, সে কত রাকাত পড়ছে আর তা প্রথমাবস্থায় হয় তবে পুনরায় নামাজ আদায় করবে। আর যদি (এরকম) সন্দেহ বেশী হয়ে থাকে তবে চিন্তা ভাবনা করবে (এবং একটিকে ঠিক করে নিবে) নতুবা সর্ব নিম্নটি গ্রহন করবে। জোহর আদায়কারীর ধারণা হয় যে সে তার নামাজ পূর্ণ করেছ। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে নেয় তার পর জানতে পারল যে সে দু'রাকাত পড়েছে তবে তা পূর্ণ করবে (অর্থাৎ বাকী দু রাকাত পূর্ণ করবে) এবং সিজদায়ে সাহু করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ فِىْ شَفْعِ الخ : কেহ দুরাকাত নফল নামাজ পড়ল অতঃপর কোন কারণ বশতঃ সিজদায়ে সাহু করল। তবে এ তাহরীমা দ্বারা সিজদায়ে সাহু নামাজের মাঝে পাওয়া গেল। আর নামাজের মাঝে সিজদায়ে সাহুর অনুমোদন নেই। বিধায় পরবর্তী নামাজের বিনা করা উক্ত সিজদায়ে সাহুওয়ালা নামাজের উপর বৈধ নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় সে নতুন করে তাহরীমা বাধার মাধ্যমে নতুন করে নফল পড়বে।

قوله : وَلَوْ سَلَّمَ السَّاهِىْ الخ : যদি কেহ সালাম ফিরিয়ে নেয় এমতাবস্থায় যে তার জিম্মায় এখনো সিজদায়ে সাহু বাকী রয়েছে। আর এমন সময় অন্য কোন ব্যক্তি তার ইকতিদা করে নেয়। তাহলে শায়খাইন রহ. এর মতে যদি ইমাম সাহেব তার সাহু সিজদা আদায় করে তবে উক্ত ব্যক্তির ইকতেদা করা সহীহ হবে। আর যদি সাহু সিজদা করে না, তবে মুক্তাদীর ইকতিদা করা সহীহ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার রহ. এর মতে ইমাম সাহু সিজদা করুক বা না করুক সর্ব অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির ইকতিদা সহীহ হবে। তাদের দলিল হল : সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় আদায়কৃত নামাজের ক্রটি দূর করার জন্য। আর নামাযের অস্তিত্ব তাহরীমা বাকী থাকার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বুঝা গেল যার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব তার সালাম তাকে নামাজ থেকে বের করে দেয় না। বরং সালাম ফিরানো সত্ত্বেও তাহরীমা বিদ্যমান থাকে। আর যেহেতু তার তাহরীমা বাকী রয়েছে তাই অন্য ব্যক্তির জন্য তার ইকতিদা করা সহীহ হবে। শাইখাইন রহ. এর দলিল : সালাম প্রত্যক্ষভাবে মুসল্লিকে নামাজ থেকে বের করে দেয়। যেমন রাসূল সা. ইরশাদ করেন- تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ সালাম নামাযীর সব কিছুকে হালাল করে দেয়। তবে হা যদি কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয় তাহলে সালামের কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না। আর উক্ত মাসআলার প্রতিবন্ধক হল সিজদায়ে সাহু। যদি উক্ত মুসল্লী সিজদায়ে সাহু আদায় না করে তাহলে নামাজ থেকে প্রতিবন্ধকতা না থাকার কারণে সালামের কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে। তথা নামাজীকে প্রকৃত ভাবে

নামাজ থেকে বের করে দিবে। সুতরাং বুঝা গেল, যে ব্যক্তির উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় তার সালাম তাকে দৃষ্টিভঙ্গির নামাজ থেকে বের করে দিবে।

قوله : وَاِنْ شَكَّ اَنَّهُ كَمْ صَلّٰى الخ : যদি কার নিজ নামাজে সন্দেহ হয় যে সে কত রাকাত পড়েছে। আর তবে এ অবস্থা প্রথম ঘটেছে তবে সে নতুন করে নামাজ পড়ে নিবে। দলিল হুজুর সা. ইরশাদ করেন-

اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهٖ اَنَّهُ كَمْ صَلّٰى فَلْيَسْتَقْبِلِ الصَّلٰوةَ

'যে ব্যক্তি নিজ নামাজে সন্দিহান হয়ে পড়ে যে সে কত রাকাত পড়েছে তাহলে সে যেন নতুন করে নামায আদায় করে নেয়।'

উক্ত মাসআলায় اول مرة তথা 'প্রথম অবস্থা' দ্বারা উদ্দেশ্য হল ভুল হওয়া তার অভ্যাস নয়, বরং মাঝে মধ্যে এমন ভুল হয়। এ মর্ম নয় যে জীবনে তার কখনও ভুল হয়নি। আর ইহা শামছুল আয়িম্মা সারাখসী রহ. এর অভিমত। আর যদি আদায়কৃত নামাজের পরিমাণ নিয়ে বেশী সন্দিহান হয়ে পড়ে তবে দু অবস্থা হতে পারে। প্রথমতঃ কোন এক দিকে প্রবল হবে। দ্বিতীয়তঃ কোন দিকে প্রবল ধারণা হবে না। প্রথম অবস্থা তথা কোন এক দিকে প্রবল ধারণা হলে সে অনুযায়ী আমল করবে। রাসূল সা. এরশাদ করেন-

اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

'যদি তোমাদের মধ্যে কেহ নামাজে সন্দিহান হয় তাহলে সঠিক তথ্যের জন্য চিন্তা ভাবনা করবে। এবং প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে এবং দুটি সিজদায়ে সাহু দিবে।' যুক্তির কথা হল যদি প্রতিবার নামাজ পুণরায় পড়ার হুকুম দেয়া হয় তবে জটিলতা দেখা দিবে। সুতরাং এ জটিলতা থেকে বেচে থাকার জন্য প্রবল ধারণার উপর আমল করা হবে। আর যদি কোন এক দিকে প্রবল ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না তবে কম সংখ্যার উপর নির্ভর করে নামাজ পূর্ণ করবে। দলিল : রাসূল সা. এরশাদ করেন-

مَنْ شَكَّ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلٰثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا بَنٰى عَلَى الْاَقَلِّ -

'যদি কার নামাজে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং সে জানে না তিন রাকাত পড়েছে, নাকি চার রাকাত পড়েছে, তবে কম সংখ্যার উপর বিনা করবে।'

بَابُ صَلٰوةِ الْمَرِيْضِ

পরিচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তির নামাজের বিবরণ

مَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ اَوْ خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ صَلّٰى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ اَوْ مُوْمِيًا اِنْ تَعَذَّرَ وَجَعَلَ سُجُوْدَهٗ اَخْفَضَ وَلَا يَرْفَعُ اِلٰى وَجْهِهٖ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَاِنْ فَعَلَ وَهُوَ يَخْفِضُ رَأْسَهٗ صَحَّ وَاِلَّا لَا وَاِنْ تَعَذَّرَ الْقُعُوْدُ اَوْمَأَ مُسْتَلْقِيًا اَوْ عَلٰى جَنْبِهٖ وَاِلَّا اُخِّرَتْ وَلَا يُوْمِئُ بِعَيْنَيْهِ وَقَلْبِهٖ وَحَاجِبَيْهِ -

অনুবাদ : যার উপর কষ্টসাধ্য হয় দাড়াতে অথবা ভয় করে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার। তবে বসে নামাজ

পড়বে রুকু করবে এবং সিজদাও করবে। কিংবা রুকু সিজদা কষ্টকর হলে ইশারায় পড়বে এবং সিজদার ইশারাকে রুকুর ইশারার তুলনায় অধিক অবনমিত করবে। সিজদা করার জন্য কোন কিছু কপালের সামনে উঁচু করে ধরা হবে না। আর যদি কোন কিছু তুলে ধরা হয় এবং সেই সাথে আপন মাথাও কিঞ্চিত অবনত করে তাহলে তা সহীহ হবে। আর যদি মাথা অবনত না করে তবে সহীহ হবে না। আর যদি বসতে কষ্টকর হয় তবে চিত হয়ে শুয়ে অথবা পার্শ্বের উপর কাত হয়ে ইশারা করবে। নতুবা নামাজকে বিলম্ব করবে। তবে উভয় চোখ দ্বারা অথবা অন্তর দ্বারা কিংবা ভ্রুদ্বয় দ্বারা ইশারা করা যাবে না।

শব্দার্থ : تَعَذَّرَ ইহা تفعل থেকে অর্থ- অসম্ভব হওয়া, কঠিন হওয়া। مُسْتَلْقِيًا ইহা استفعال থেকে, অর্থ- গা এলিয়ে দেয়া, শয়ন করা। حَاجِبَيْنِ ইহা حاجب এর দ্বিবচন। جمع হল حَوَاجِبُ (চোখের) ভ্রু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ صَلٰوةِ الْمَرِيْضِ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. صلوة المريض কে سجود السهو এর পরে আনার কারণ হল مريض ও سهو উভয়টি عَوَارِض سَمَاوِيَّة আর যেহেতু سهو ব্যাপক যা সুস্থ অসুস্থ সবাইকে শামিল করে এজন্য سجود السهو কে পূর্বে উল্লেখ করেছেন। আর এখান থেকে صلوة المريض এর আলোচনায় মনোনিবেশ করেছেন।

قوله : وَمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الخ : যদি কেউ অসুস্থতার দরুন দাঁড়াতে অক্ষম হয়, অথবা দাড়ালে ব্যধি বেড়ে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে এ ধরনের অসুস্থ ব্যক্তির জন্য কিয়াম তরক করা জায়েয আছে। দলিল : আল্লাহ তা'আলার বাণী— يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ -উক্ত আয়াতের ব্যাপারে ইবনে মাসউদ রাযি., ইবনে উমর রাযি. ও হযরত জাবির রাযি. বলেন, ইহা নামাজ সম্পর্কীয় অর্থাৎ দাঁড়াতে যদি সক্ষম হয় তবে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। আর যদি সক্ষম না হয় তবে পার্শ্বে শয়ন করে নামায আদায় করবে। অন্যত্র হযরত হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত আছে—

قَالَتْ كَانَتْ بِىْ بَوَاسِرَ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ -

'তিনি বলেন, আমার বাওয়াছির রোগ ছিল। (বাওয়াছির বলা হয় অর্শ্ব রোগকে) রাসূল সা. কে এ অবস্থায় নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে। যদি তা না পার তবে বসে নামায আদায় কর। আর যদি তাও না পার তবে পার্শ্বে শয়ন করে আদায় কর।'

যুক্তি নির্ভর দলিল হল : ইবাদত সামর্থ্যানুযায়ী হয়ে থাকে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যের বাহিরে কষ্ট দেন না।' সুতরাং যার যতটুকু সম্ভব এবং যখন সম্ভব তা সে তখন ঐ পরিমাণ আদায় করবে।

قوله : أَوْمُوْمِيًا اِنْ تَعَذَّرَ الخ : যদি কোন নামাযী রুকু সিজদা করতে অক্ষম হয় তবে বসে বসে ইশারায় তা আদায় করবে। কারণ, ঐ সময় তার এতটুকুই শক্তি আছে। আর পূর্বেও উল্লেখ আছে যে, ইবাদত শক্তি অনুযায়ী হয়ে থাকে। লক্ষণীয় যে সিজদার ইশারা রুকুর ইশারার তুলনায় বেশী নিচু হবে। কেননা. ইশারা রুকু সিজদার স্থলাভিষিক্ত, তাই তাতেও রুকু সিজদার হুকুম হবে। আর যেহেতু প্রকৃত সিজদার হুকুম রুকুর তুলনায় বেশী নিচু হওয়া তাই তাতে বেশি নিচু হবে। এমতাবস্থায় সিজদার জন্য কোন বস্তুকে মাথার দিকে নিবে না। কেননা এ ব্যাপারে হযরত জাবির রাযি. বর্ণনা করেন—

عَنْ جَابِرٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيْضًا فَرَاٰهُ يُصَلِّى عَلٰى وِسَادَةٍ فَأَخَذَهَا فَرَمٰى بِهَا فَاَخَذَ عُوْدًا يُصَلِّى عَلَيْهِ فَاَخَذَهٗ فَرَمٰى بِهَا وَقَالَ صَلِّ عَلَى الْاَرْضِ اِنِ اسْتَطَعْتَ وَ اِلَّا فَاَوْمِ اِيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ اَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ

হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সা. এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার জন্য তাশরিফ নিলেন। তিনি দেখলেন, সে বালিশের উপর নামাজ আদায় করছে। তিনি বালিশটি ছুড়ে ফেলে দিলেন। অতঃপর সে একটি কাঠি নিল তাতে নামাজ আদায় করার জন্য। রাসূল সা. তাও ছুড়ে ফেললেন এবং বললেন, যদি সক্ষম হও তবে জমিনের উপর নামাজ পড়। আর যদি সক্ষম না হও তবে ইশারা কর এবং রুকুর তুলনায় সিজদাতে অবনমিত একটু বেশী হবে। সুতরাং কিছুকে উঠিয়ে তাতে সিজদা করা যাবে না। তেমনি ইশারাকারী সিজদার ইশারাকে রুকুর ইশারা থেকে একটু বেশী অবনমিত করবে, একান্ত যদি কেহ কোন কিছু উঠিয়ে তাতে সিজদা করে এবং তার ইশারাকে রুকুর ইশারা থেকে বেশী নিচু করে, তবে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। কিন্তু তা মাকরূহ হবে। আর যদি বালিশ বা অন্য কিছু মাথার সাথে লাগায় আর মাথা একদম নত না করে তবে এর দ্বারা রুকু সিজদা আদায় হবে না। কেননা, এ সুরতে ইশারা পাওয়া যায়নি। অথচ ইশারা তার উপর ফরজ ছিল।

قوله : وَاِنْ تَعَذَّرَ الْقُعُوْدُ اَوْمَأَ : যদি অসুস্থতা এ পর্যায়ের হয় যে সে বসতেও সক্ষম নয়, তবে পিঠের উপর চিৎ শুইয়ে এবং মাথার নিচে উঁচু করে একটি বালিশ রাখবে। যাতে বসার সাদৃশ্য হয়ে যায় এবং ইশারায় রুকু সিজদা করবে। আর দু'পা কিবলামুখী করবে। দলিল : রাসূল সা. এর বাণী-

يُصَلِّى الْمَرِيْضُ قَائِمًا فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلٰى قَفَاهُ يُوْمِىْ اِيْمَاءً فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاللّٰهُ تَعَالٰى اَحَقُّ بِقَبُوْلِ الْعُذْرِ مِنْهُ ـ

অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। যদি সম্ভব না হয় তবে বসে পড়বে। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তবে চিৎ শুইয়ে ইশারা করে নামাজ পড়বে। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার উজর কবুল করার অধিক হকদার। উল্লেখ্য যে, অসুস্থ ব্যক্তি পার্শ্বের উপর কাৎ হয়ে শয়ন করার চেয়ে চিৎ শুইয়ে নামাজ আদায় করা উত্তম। কেননা, এভাবে শয়নকারীর ইশারা কাবা শরীফের দিকে হয়। পক্ষান্তরে পার্শ্বের উপর কাৎ হয়ে শয়নকারীর ইশারা পায়ের দিকে হয়ে থাকে। তবে পার্শ্বে কাৎ হয়ে শয়ন করে নামাজ আদায় করাও জায়েয। কেননা, ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি.এর হাদীসে উল্লেখ আছে-

فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجَنْبِ تُوْمِىْ اِيْمَاءً

আর যদি তা সম্ভব না হয় (অর্থাৎ বসে পড়া সম্ভব না হয়) তবে পার্শ্বের উপর শয়ন করে ইঙ্গিতের মাধ্যমে পড়বে।

আর ইহা ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মালিক রহ. এর মতে উত্তম।

قوله : وَاِلَّا اُخِّرَتْ وَلَمْ يُوْمِ : আর যদি এমন অসুস্থতা হয় যে শয়ন করেও ইশারা করতে পারে না তবে নামাজ বিলম্ব করে দিবে। অর্থাৎ পরে সুস্থ হলে আদায় করবে। কিন্তু চক্ষুদ্বয়, অন্তর এবং চোখের ভ্রূ দ্বারা ইশারা করে নামাজ আদায় করবে না বরং সুস্থ হওয়ার পর তা পুণরায় আদায় করবে। আমাদের দলিল হল রাসূল সা. এর বর্ণিত হাদীস-

اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْاَرْضِ فَاسْجُدْ وَاِلَّا فَاَوْمِ بِرَاْسِكَ

উক্ত হাদীসে ইশারা করা মাথার উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। মাথা ব্যতিত অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা ইশারা করা জায়েয হলে তবে রাসূল সা. তা অবশ্যই বর্ণনা করতেন। যুক্তি নির্ভর দলিল হল : ইশারা হলো মূলত রুকু সিজদার বদল। আর বদলকে রায় দ্বারা নির্ধারণ করা জায়েয নেই। হাদীসে শুধু মাথা দিয়ে ইশারা করার বর্ণনা রয়েছে। চোখ ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করার কথা বর্ণিত নেই। সুতরাং তা নির্ধারণ করা রায় দ্বারা নির্ধারণ করা লাযিম আসে যা জায়েয নেই।

وَإِنْ تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لَا الْقِيَامُ أَوْمَأَ قَاعِدًا وَلَوْ مَرِضَ فِي صَلَاتِهِ يُتِمُّ بِمَا قَدَرَ وَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَصَحَّ بَنَى وَلَوْ كَانَ مُومِيًا لَا وَلِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يَتَّكِئَ عَلَى شَيْءٍ إِنْ أَعْيَا وَلَوْ صَلَّى فِي فُلْكٍ قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ صَحَّ وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ جُنَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَضَى وَلَوْ أَكْثَرَ لَا -

অনুবাদ : যদি রুকু সিজদা করতে সক্ষম না হয় আর দাঁড়াতে সক্ষম হয়। তবে বসে ইশারা ইঙ্গিতে পড়বে। যদি নামাজান্তে অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে যেভাবে সক্ষম হয় নামাজ পূর্ণ করবে। যদি বসে রুকু সিজদা করে নামাজ পড়ে অতঃপর সুস্থ হয়ে যায় তবে তার উপর বিনা করবে। আর যদি ইশারা ইঙ্গিতে রুকু সিজদা আদায়কারী হয় (অতঃপর সুস্থ হয়ে যায়) তবে বিনা করতে পারবে না। আর নফল আদায়কারী ক্লান্ত হয়ে যাওয়াতে কোন কিছুর উপর হেলান দিতে পারবে। আর নৌকায় কেহ যদি উজর ছাড়া বসে নামাজ পড়ে তবে তা সহীহ। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সঙ্গাহীন থাকে অথবা পাগল থাকে তবে তা ক্বাযা করবে। কিন্তু যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশী ওয়াক্তে সঙ্গাহীন বা পাগল থাকে তবে তা কাযা করতে হবে না।

শব্দার্থ : يَتَّكِى ভর দিবে, হেলান দিবে। اَعْيَا ক্লান্ত হয়ে যায়। فُلْكٌ নৌকা, নৌযান। اُغْمِى ইহা اِغْمَاءٌ থেকে অর্থ সংজ্ঞাহীন হওয়া جُنَّ পাগল হল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : যদি কেহ এমন রোগাক্রান্ত হয় যে, দাঁড়াতে পারে কিন্তু রুকু সিজদা করতে সক্ষম নয়, তবে সে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা আবশ্যক নয়। বরং বসে ইশারায় নামাজ আদায় করা উত্তম। ইমাম যুফার ও শাফেয়ী রহ. এর মতে যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় আর রুকু সিজদা করতে সক্ষম না হয় তবুও তার জিম্মায় কিয়াম থেকে যায় তা রহিত হয় না। তারা বলেন কিয়াম হল রুকন। আর অসুস্থ ব্যক্তি তা থেকে অক্ষম নয় বরং অন্যান্য রুকন তথা রুকু সিজদা থেকে অক্ষম। তাই রুকু সিজদা থেকে অক্ষম হওয়ার দরুন কিয়াম রহিত হতে পারে না।

আমাদের দলিল হল : কিয়াম রুকুন হয়েছে রুকু সিজদা পরিপূর্ণরূপে আদায়ের মাধ্যম হিসাবে। কেননা, কিয়ামের পর সিজদা করার দ্বারা অধিক তাজীম প্রকাশ পায়। সুতরাং কিয়ামের পর সিজদা না হলে কিয়াম রুকুনই থাকবে না। আর এ অবস্থায় যখন কিয়াম রুকুন থাকল না তখন অসুস্থ ব্যক্তির কিয়াম করা না করার ইখতিয়ার রয়েছে। আর উত্তম হল বসে রুকু সিজদা ইশারায় আদায় করা। কারণ বসে সিজদা ইশারায় করা প্রকৃত সিজদার অধিক নিকটবর্তী। পক্ষান্তরে দাঁড়িয়ে ইশারায় করার দ্বারা এমনটি হয় না।

قوله : وَلَوْ مَرِضَ فِى صَلٰوتِه الخ : কোন সুস্থ ব্যক্তি নামাজ আদায়ান্তে অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং তার দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকে না, তবে বসে নামাজ পূর্ণ করবে। যদি রুকু সিজদা করতে সক্ষম হয় তবে রুকু সিজদা করবে। আর যদি রুকু সিজদা করতে সক্ষম না হয় তবে ইশারায় তা আদায় করবে। আর যদি বসতেও না পারে তবে চিৎ শয়ন করে নামাজ আদায় করবে। কেননা, উপরোক্ত সুরতগুলোতে নিম্নস্তরকে উচ্চ স্তরের উপর বিনা করা হয়েছে। আর এমনটি করা জায়েয।

قوله : وَلَوْ صَلّٰى قَاعِدًا يَرْكَعُ الخ : অসুস্থতার দরুন বসে রুকু সিজদা আদায় করা অবস্থায় সুস্থ হয়ে গেল এবং দাঁড়ানোর শক্তি ফিরে পেল। তবে শায়খাইন রহ. এর মতে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার নামাজের বিনা করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে নতুন করে নামাজ আদায় করবে। যেহেতু দাঁড়ানো ব্যক্তি বসা ব্যক্তির পিছনে একতেদা করা জায়েয নেই। তেমনি দাঁড়ানো অবস্থার বিনা ও বসা অবস্থার উপর জায়িয নেই। শায়খাইন রহ.

বলেন, যেহেতু দাঁড়ানো ব্যক্তির একতেদা বসা ব্যক্তির পিছনে জায়েয। সুতরাং দাঁড়ানোর অবস্থার বিনাও ক অবস্থার উপর জায়িয। আর যদি অসুস্থতার দরুন ইশারায় রুকু সিজদা করে আর নামাজান্তে সুস্থ হয়ে যায় তখ বসতে ও দাঁড়াতে সক্ষম হয়ে যায় তবে দাঁড়িয়ে বিনা করতে পারবে না।

قوله : وَلِلْمُتَطَوِّعِ اَنْ يَتَّكِئَ الخ : যদি কেহ নফল নামায আদায় করতে কোন উজরের কারণে হেলান দেয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার নামাজে কোন সমস্যা হবে না। আর যদি উজর ছাড়াই হেলান দেয় তাহলে কোন কোন মাশাইখ বলেন আহনাফের মতে তা মাকরূহ। কেননা, বিনা উজরে হেলান দেওয়া আদবের পরিপন্থী। অন্য কোন কোন মাশাইখ রহ. বলেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে বিনা উজরে নামাজান্তে হেলান দেয়া জায়েয তা মাকরূহ নয়। কেননা, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে যেভাবে নফল নামাজের মাঝে উজর ব্যতিত বসা মাকরূহ নয় তেমনি নফল নামাজের মাঝে হেলান দেওয়াও মাকরূহ নয়। তবে সাহেবাইন রহ. এর মতে বিনা উজরে হেলান দেয়া মাকরূহ। যেভাবে নফল নামাজের মাঝে বিনা উজরে বসা মাকরূহ।

قوله : وَلَوْ فِىْ فَلَكٍ قَاعِدًا الخ : চলন্ত জাহাজে বা নৌকাতে বসে নামাজ পড়া জায়েয যদিও কোন উজর না থাকে। তবে দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম। ইহা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন রহ. এর মতামত হল যে, কোন উজর ছাড়া চলন্ত নৌকাতে বসে নামাজ পড়া জায়েয নয়। আর ইহা ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ. এর অভিমত। তাদের দলিল হল যেহেতু তার দাঁড়াবার সামর্থ রয়েছে বিধায় কিয়াম নামক রুকন তরক করার দ্বারা নামাজ সহিহ হবে না।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল : সাধারণত চলন্ত নৌকাতে দাঁড়ানো দ্বারা মাথা ঘুরার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। আর প্রবল সম্ভাবনা বাস্তবতুল্য। যেমন পার্শ্বে শয়নকে হাদাস বলা হয়েছে। কারণ, সাধারণত এ অবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢিলা হয়ে যায় এবং বায়ু নিঃসরণ হয়। তাই প্রবলকে বাস্তব তুল্য মনে করে ওজু ভেঙ্গে যাবার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে এখানে প্রবল ধারণাকে বাস্তবতুল্য মনে করে বলা হয়েছে যে, যেন এ ব্যক্তি কিয়াম থেকে অক্ষম। আর যেহতু সে কিয়াম থেকে অপারগের অন্তর্ভুক্ত তাই বসে নামাজ পড়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া উত্তম।

قوله : وَمَنْ اُغْمِىَ عَلَيْهِ اَوْ جُنَّ الخ : কোন ব্যক্তি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় বা তার চেয়ে কম সময় সজ্ঞাহীন থাকে তবে তার কাজা করা ওয়াজিব হবে। আর যদি পাঁচ ওয়াক্তের অধিক সময় চলে যায় তবে কাযা ওয়াজিব হবে না। ইহা হল ইসতিহসানের সিদ্ধান্ত। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মালিক রহ. এর মতে সজ্ঞাহীনতা এক নামাজের পূর্ণ সময় থাকে আর ইহাতে একটি মাত্র নামাজ ফউত হয় তবুও কাযা ওয়াজিব হবে না। ইমাম আহমদ রহ. এর মতে সজ্ঞাহীনতার দরুন কম বা বেশী নামাজ ফউত হউক সর্বাবস্থায় কাযা ওয়াজিব। তিনি দলিল দিতে গিয়ে বলেন, সজ্ঞাহীনতা এক ধরনের ব্যাধি। আর ব্যাধির কারণে যতই নামাজ ফউত হবে সবগুলোর কাযা করা ওয়াজিব। সুতরাং এ অবস্থায়ও কাযা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মালিক রহ. এর দলিল : যদি বেহুশী এক নামাজের পূর্ণ ওয়াক্ত স্থায়ী হয় তবে এতে অক্ষমতা পাওয়া যায়। আর তা কিয়াসেরও চাহিদা বিধায় পূর্ণ এক ওয়াক্ত বেহুঁশী স্থায়ী হলে কাযা ওয়াজিব হবে না।

আহনাফের দলীল : সজ্ঞাহীনতার সময় যত বেশী হবে ফায়িতা নামাজেরও সংখ্যা ততো বাড়তে থাকবে এখন যদি ফায়িতা নামাজের কাযা তার উপর ধার্য্য করে দেয়া হয় তবে তার জন্য কষ্টকর হবে। এদিকে ইসলামী শরীয়াত মানুষের দুঃখ-কষ্টকে দূরানোর জন্যই তো, বিধায় অনেক ফায়িতা নামাজের কাজা ওয়াজিব হবে না পক্ষান্তরে যদি ফায়িতা নামাজের কাযা কম হয় তবে তা কাযা করতে তেমন কষ্টের সম্মুখিন হতে হবে না। তাই তার কাযা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে বেশীর পরিমাণ হল ফউত হওয়া নামাজের সংখ্যা একদিন এক রাতের চেয়ে বেশী হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ ষষ্ঠ ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়া। কেননা, ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্ত অতিক্রম করার দ্বারা নামাজের মধ্যে তাকরার শুরু হয়ে যায়। আর এতে তাকরার বেশী হওয়াটা দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ্য।

بَابُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

পরিচ্ছেদ : তেলাওয়াতে সিজদার বিবরণ

يَجِبُ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً مِنْهَا أُوْلَى الْحَجِّ وَص عَلَى مَنْ تَلَا وَلَوْ إِمَامًا أَوْ سَمِعَ وَلَوْ غَيْرَ قَاصِدٍ أَوْ مُؤْتَمًّا لَا بِتِلَاوَتِهِ وَلَوْ سَمِعَهَا الْمُصَلِّي مِنْ غَيْرِهِ سَجَدَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَلَو سَجَدَ فِيهَا أَعَادَهَا لَا الصَّلٰوةَ وَلَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَامٍ فَأْتَمَّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ سَجَدَ مَعَهُ وَبَعْدَهُ لَا وَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ سَجَدَهَا وَلَمْ تُقْضَ الصَّلَاتِيَّةُ خَارِجَهَا -

অনুবাদ : সিজদা ওয়াজিব চৌদ্দটি আয়াতে। তা থেকে একটি সূরা হাজ্জ এর প্রথম আয়াত এবং সূরা ছোয়াদের আয়াত পড়ার কারণে তেলাওয়াতকারীর উপর যদিও তিনি ইমাম হোন অথবা অনিচ্ছায় শুনেন কিংবা মুক্তাদী হোন তবে সিজদা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে মুক্তাদীর তেলাওয়াতে (সিজদায় কারো উপর) ওয়াজিব হবে না। আর যদি নামাজি ব্যক্তি সিজদার আয়াত শুনে অন্যের কাছ থেকে, তবে নামাজের পর সিজদা করবে। আর যদি নামাজের ভিতর আদায় করে তবে সিজদা পুণরায় আদায় করবে। কিন্তু নামাজ পুণরায় আদায় করতে হবে না। আর যদি ইমামের কাছ থেকে (সিজদার আয়াত) শুনে অতঃপর সিজদা করার পূর্বে তার ইকতিদা করে নেয় তবে সে ইমামের সাথে সিজদা করবে। আর ইমামের তেলাওয়াতে সিজদা আদায়ের পর ইকতেদা করলে (নামাজের ভিতর) সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করতে হবে না। আর যদি ইকতেদাই না করে তবে তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করবে। নামাজের ভিতরের ওয়াজিব সিজদা নামাজের বাহিরে করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : يَجِبُ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ الخ : কুরআনুল কারীমে মোট চৌদ্দটি আয়াত রয়েছে যা তিলাওয়াত করলে বা শুনলে তেলাওয়াতকারীর উপর বা শ্রবণকারীর উপর সিজদা ওয়াজিব হবে। সিজদার আয়াতগুলো হল :

১। সূরায়ে আরাফের শেষে : إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

২। সূরায়ে রা'দের মধ্যে : وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

৩। সূরায়ে নাহলের মধ্যে : يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

৪। সূরায়ে বনী ইসরাইলের মধ্যে : وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

৫। সূরায়ে মারয়ামের মধ্যে : إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

৬। সূরায়ে হজ্জের মধ্যে : وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

৭। সূরায়ে ফুরকানের মধ্যে : وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

৮। সূরায়ে নামলের মধ্যে : أَلَّا يَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

৯। সূরায়ে সাজদার মধ্যে : إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

১০ সূরায়ে ছোয়াদ এর মধ্যে : فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ

১১ সূরায়ে হামীম সিজদার মধ্যে : يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ

১২ সূরায়ে নজমের মধ্যে : فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوا

১৩ সূরায়ে ইনশিকাকের মধ্যে : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

১৪ সূরায়ে আলাকের মধ্যে : وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

قوله : منها أولى الحج : উক্ত ইবারত দ্বারা গ্রন্থকার রহ. একটি ইখতিলাফি মাসআলার নিরসন করতে চান। কেননা, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে সমগ্র কুরআন শরীফে সর্বমোট চৌদ্দটি সিজদার আয়াত রয়েছে। কিন্তু তিনি বলেন, সূরায়ে হজ্জের উভয় সিজদাই হল (সিজদার আয়াত) তিলাওয়াতে সিজদা। অপর দিকে তার মতে সূরায়ে ছোয়াদে কোন সিজদার আয়াত নেই। আমাদের মাযহাব অনুযায়ী চৌদ্দটি সিজদা। তবে সূরায়ে হজ্জ এর প্রথম দিকের আয়াতটি হল সিজদার আর শেষের দিকের আয়াতটি দ্বারা নামাজের সিজদা উদ্দেশ্য। আর সূরায়ে ছোয়াদ এর আয়াতটি হল তিলাওয়াতে সিজদার আয়াত। ইমাম শাফেয়ী রহ. দলিল পেশ করেন। হযরত উকবা ইবনে আমির রাযি. এর হাদীস দ্বারা—

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُضِّلَتِ الْحَجُّ بِسَجْدَتَيْنِ مَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا لَمْ يَقْرَأْهَا -

হুজুর সা. এরশাদ করেন, সূরায়ে হাজ্জকে ফযিলত দেওয়া হয়েছে দু' সিজদা দ্বারা। সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত দু' সিজদা আদায় করেনি সে যেন সুরাই পড়েনি। সূরায়ে ছোয়াদে তিলাওয়াতে সিজদা না হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিল :

تَلَا فِي خُطْبَةٍ سُوْرَةَ ص فَتَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ عَلَامَ تَشَزَّنْتُمْ إِنَّهَا تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا -

রাসূল সা. একবার খুতবার মধ্যে সূরায়ে ছোয়াদ তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর (সিজদার আয়াত তিলাওয়াতের পর) সাহাবারা সিজদার জন্য তৈরী হলেন। রাসূল সা. বললেন, তোমরা সিজদার জন্য কেন তৈরী হচ্ছ এটি তো হল নবীর তওবা। রাসূল সা. বললেন, এখানে দাউদ আ. সিজদা করেছিলেন তাওবা হিসাবে। আর আমরা সিজদা করি শুকরিয়া হিসাবে।

আমাদের দলিল হল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ও হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে-

قَالَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فِي الْحَجِّ هِيَ الْأُوْلَى وَالثَّانِيَةُ سَجْدَةُ الصَّلٰوةِ -

উভয় হযরত বলেন, সূরায়ে হাজ্জে সিজদায়ে তিলাওয়াত হল প্রথমটি আর দ্বিতীয়টি হল নামাজের সিজদা। সূরায়ে হাজ্জের দ্বিতীয় আয়াতটি নামাজের সিজদা উদ্দেশ্য। এর সমর্থন এভাবে হয় যে, দ্বিতীয় সিজদাকে রুকুর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا আর নিয়ম হল যদি সিজদা রুকুর সাথে মিলিত হয়ে আসে তবে তা দ্বারা নামাজের সিজদা উদ্দেশ্য। ইমাম শাফেয়ী রহ. কর্তৃক পেশকৃত হযরত উকবা ইবনে আমির রাযি. এর হাদীসের জবাব : রাসূলুল্লাহ সা. এর উক্তি فُضِّلَتِ الْحَجُّ سَجْدَتَيْنِ এর ব্যাখ্যা হলো প্রথম আয়াত তেলাওয়াতে সিজদার আর দ্বিতীয় আয়াত নামাজের সিজদার। আর দ্বিতীয় দলিলের জবাব হল সিজদায়ে শুকর সিজদায়ে তেলাওয়াতের মুনাফী বা বিরোধী নয়। কারণ কোন ইবাদত এমন নেই যার মধ্যে শুকরের অর্থ নেই। তাছাড়া

এও প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. খুতবার মাঝখানে তেলাওয়াতে সিজদা আদায় করেছেন। অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, এক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! এ ব্যাপারে আপনার কি ধারণা একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছে যে সে সূরায়ে ص লিখতেছে। যখন সিজদার স্থান পর্যন্ত আসল তখন দেখল যে দোয়াত ও কলম সিজদা করা আরম্ভ করল। ইহা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, দোয়াত ও কলমের তুলনায় আমরা সিজদা করার অধিক হক্বদার। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, ص এর আয়াতটি তিলাওয়াতে সিজদার অন্তর্ভুক্ত।

তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব নাকি সুন্নাত : আমাদের মতে তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব। ইমাম মালিক রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. ও হানাবালাদের নিকট তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা সুন্নাত। তাদের দলিল হল : হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত রাযি. রাসূল সা. এর সামনে সূরায়ে নাজম তিলাওয়াত করেছিলেন, কিন্তু তারা কেউই সিজদা করেন নি। সুতরাং বুঝা গেল তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাত। আমাদের দলিল : হুজুর সা. এর হাদীস : اَلسَّجْدَةُ عَلٰى مَنْ سَمِعَهَا وَ عَلٰى مَنْ تَلَاهَا দলিল এভাবে যে উক্ত হাদীসে على অব্যয়টি ওয়াজিব নির্দেশক। আর যেহেতু হাদীসটি ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত নয় এজন্য প্রত্যেক শ্রবণকারীর উপর সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব। ইমাম মালিক রহ., শাফেয়ী রহ. ও হানাবালাদের উত্থাপিত দলিলের জবাব : রাসূলুল্লা সা. তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা করেন নি। আর আমাদের মতেও তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা না করা জায়েয। আর তাৎক্ষণিকভাবে আদায় না করার দ্বারা عَلَى الْاِطْلَاقِ সিজদা না করা বুঝে আসে না। সুতরাং হতে পারে রাসূলুল্লাহ্ সা. পরে আদায় করেছেন। সুতরাং যে দলিলের মাঝে এতসব সম্ভাবনা রয়েছে তা দ্বারা দলিল পেশ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

قوله : أَوْمُؤْتَمًّا لَا بِتِلَاوَتِهِ الخ : ইমাম যদি নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করেন তবে ইমাম ও মুক্তাদী সাথে সাথে সিজদা আদায় করবেন। এখানে মুক্তাদীর ইমামের সাথে সিজদা করা এজন্য লাযিম যে ইকতিদার নিয়ত দ্বারা ইমামের অনুসরণ করাকে তার উপর লাযেম করে নিয়েছেন। আর যদি মুক্তাদী ইমামের সাথে সিজদা আদায় না করে তবে ইমামের বৈপরিত্য করা লাযিম আসে। আর যদি মুক্তাদী নামাজের ভিতর সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে তবে শায়খাইন রহ. এর মতে ইমাম মুক্তাদী কারো উপর সিজদা লাযিম নয়। সুতরাং কেহ তা আদায় করবে না। আর নামাজের পরেও তা আদায় করা লাযেম নয়। ইহা সাধারণ উলামায়ে কেরামগণের মাযহাব। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, যখন উভয় নামাজ থেকে ফারিগ হবে তখন সকলে পৃথকভাবে নিজ নিজ সিজদা আদায় করবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দলিল হল : এখানে সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ পাওয়া গেছে আর তাহল মুক্তাদীর তেলাওয়াত আর অন্যান্যদের শ্রবণ। এদিকে নামাজ শেষ হওয়ার দ্বারা প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেছে। কায়দা হল কোন জিনিসের সবব পাওয়া যাওয়া আর তার প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া দ্বারা ঐ জিনিস সাব্যস্ত করে দেয়। তাই নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর ইমাম মুক্তাদী উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

শায়খাইন রহ. এর দলিল : ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ক্বিরাত পড়া শরীয়াত কর্তৃক নিষিদ্ধ। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সা. এরশাদ করেন— مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ যার ইমাম রয়েছে, ইমামের কিরাতই তার কিরাতরূপে গণ্য। সুতরাং মুক্তাদী কিরাত পড়া থেকে বাধা প্রাপ্ত। তাই তার কোন কর্মকান্ডের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। তাই তার উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে না।

قوله : وَلَوْ سَمِعَهَا الْمُصَلِّيْ الخ : যদি কেহ নামাজরত অবস্থায় নিজ ইমাম ছাড়া অন্য কাঁরো থেকে তিলাওয়াতে সিজদা শুনে তবে নামাজের ভিতর তা আদায় করা যাবে না। কারণ এ সিজদা নামাজের ভেতরকার তিলাওয়াতে সিজদা নয়। কেননা, তা নামাজের কোন আমল নয়। নামাজের আমল হয়ত ফরজ কিংবা ওয়াজিব

বা সুন্নাত হবে, কিন্তু তা শুনা কোনটিই নয়। মোটকথা উক্ত সিজদা নামাজের কোন আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যা নামাজের আমল নয় তা নামাজের ভিতরে আদায় করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে যদি কেহ নামাজের ভেতরই সিজদা দিয়ে দেয়, তবে তা আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে না। কিন্তু নামাজও ফাসিদ হবে না। নামাজ শেষে পুণরায় তা আদায় করতে হবে।

قوله : وَلَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَامٍ فَائْتَمَّ الخ : ইমাম সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন আর তা এমন ব্যক্তি শুনতে পেল যে নামাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর সে উক্ত নামাজের ইকতেদা করল তবে তার দু' সুরত। এক : যে ইমামের তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করার পূর্বে শরীক হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ইমামের তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করার পরে শরীক হয়েছে। প্রথম সূরতে সে যেহেতু ইমামের সাথে সিজদা করেছে বিধায় নামাজের পরে তা আদায় করার প্রয়োজন নেই। কেননা, প্রথম রাকাতে শরীক হওয়ার দ্বারা সেও উক্ত সিজদাতে শরীক হয়েছে। দ্বিতীয় সূরতে নামাজ শেষ করার পর তা আদায় করতে হবে। কেননা, সে দ্বিতীয় রাকাতে পেয়েছে। অথচ প্রথম রাকাতে সিজদা চলে গেছে আর সে তা পায়নি। সুতরাং প্রথম রাকাতের কিরাতও পায়নি। এবং তার متعلقات তথা সিজদা পায়নি। সুতরাং নামাজ শেষে তা তার জন্য আদায় করা ওয়াজিব। কেননা, সিজদা ওয়াজিব হওয়ার সবব তথা 'শুনা' পাওয়া গেছে।

قوله : وَلَمْ تُقْضَ الصَّلٰوتِيَّةُ الخ : উক্ত ইবারতে মহামান্য গ্রন্থকার একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। তা হল প্রত্যেক ঐ সিজদা যা নামাজে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করার দ্বারা ওয়াজিব হয়। তা যদি নামাজের ভিতর আদায় করা হয় না তবে নামাজের বাহিরে সিজদা করার দ্বারা তা আদায় হবে না।

দলিল : এ সিজদাটি হলো নামাজের সিজদা। নামাজের সিজদা হওয়ার অর্থ হল সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ আয়াতে সিজদার তিলাওয়াত আর তা নামাজের আফআল তথা কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত। আর নামাজের সিজদার মধ্যে নামাজের ফযীলত রয়েছে। তাই নামাজের মধ্যে সিজদার তিলাওয়াতের উজুব কামিল তথা পরিপূর্ণ হলো। আর যা وجوب كامل হয় তা নাকিস তথা অসম্পূর্ণতার সাথে আদায় করার দ্বারা আদায় হয় না। এদিকে দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল যে নামাজের বাহিরে নামাজের ফযীলত নেই। একারণে নামাজের বাহিরে যে সিজদা আদায় করা হবে তা নাকিস তথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে-

---

وَلَوْ تَلَا خَارِجَ الصَّلٰوةِ فَسَجَدَ لَهُ وَ اَعَادَهَا فِيْهَا سَجَدَ اُخْرٰى وَ اِنْ لَمْ يَسْجُدْ اَوَّلًا كَفَتْهُ وَاحِدَةٌ كَمَنْ كَرَّرَهَا فِىْ مَجْلِسٍ لَا فِىْ مَجْلِسَيْنِ وَ كَيْفِيَّتُهٗ اَنْ يَسْجُدَ بِشَرَائِطِ الصَّلٰوةِ بَيْنَ تَكْبِيْرَتَيْنِ بِلَا رَفْعِ يَدٍ وَ تَشَهُّدٍ وَ تَسْلِيْمٍ وَ كُرِهَ اَنْ يَقْرَأَ سُوْرَةً وَ يَدَعَ اٰيَةَ السَّجْدَةِ لَا عَكْسُهٗ -

---

অনুবাদ : আর যদি নামাজের বাহিরে সিজদার আয়াত পড়ে এবং সিজদা করে অতঃপর নামাজে তা পড়ে তবে দ্বিতীয় বার সিজদা করবে। আর যদি প্রথমে (তথা নামাজ শুরুর পূর্বে) সিজদা না করে তবে একটিই তার জন্য যথেষ্ট হবে। (অর্থাৎ নামাজের ভিতর করা সিজদাটিই যথেষ্ট হবে)। যেমন কেহ এক বৈঠকে বার বার এক সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করল (তবে একটি সিজদাই তার উপর ওয়াজিব হবে)। পক্ষান্তরে দু বৈঠকে পড়লে দুটি সিজদাহ দিতে হবে। সিজদার পদ্ধতি হলো : সিজদা করা নামাজের শর্তের সাথে দু তাকবীরের মধ্যে হাত

উত্তোলন ও তাশাহুদ এবং সালাম ছাড়া। কোন সূরা তিলাওয়াত করা এবং সিজদার আয়াত ছেড়ে দেয়া মাকরূহ। তবে তার উল্টোটা মাকরূহ নয় (অর্থাৎ, শুধু সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করা মাকরূহ নয়।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَوْ تَلَا خَارِجَ الصَّلٰوةِ الخ : যদি কেহ সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সিজদা আদায় করে অতঃপর নামাজে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে তবে সিজদা করবে। আর যদি কেহ সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে কিন্তু সিজদা না করে অতঃপর নফল বা ফরজ নামাজ শুরু করে এবং নামাজে উক্ত সিজদার আয়াত দ্বিতীয়বার পাঠ করে এবং সিজদা করে তবে এ সেজদা উভয় তেলাওয়াতের জন্য যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ নামাজের বাহিরের তেলাওয়াতকৃত সিজদার আয়াতের এবং নামাজে পাঠ করা ঐ সিজদার আয়াতের জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা, সিজদাটি নামাজের ভেতরকার হওয়ার দরুন অধিক শক্তিশালী, তাই তা প্রথম ওয়াজিব হওয়া সিজদাটিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। দ্বিতীয় সিজদা প্রথম সিজদাকে অন্তর্ভুক্ত করার দরুন অতিরিক্ত আরও একটি শক্তি হলো যে, তিলাওয়াত আদায়ের সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ দ্বিতীয় বার যখন নামাযের মধ্যে আয়াতে সিজদাটি তিলাওয়াত করল, তখন তো তার সাথে সাথে সিজদা আদায় করছে। পক্ষান্তরে প্রথমবার তিলাওয়াত করার পর সাথে সাথেই সিজদা আদায় করা হয় নি, এতে প্রতিয়মান হলো যে, প্রথম সিজদার তুলনায় দ্বিতীয় সিজদাটি অধিকতর শক্তিশালী। একারণে দ্বিতীয় সেজদাটিই অগ্রগণ্য হবে। এবং দ্বিতীয় সিজদাটি আদায় করার দ্বারা প্রথমটি আদায় হয়ে যাবে।

قوله : كَمَنْ كَرَّرَهَا فِيْ مَجْلِسٍ الخ : যদি কেহ একই বৈঠকে বার বার একটি সিজদার আয়াত পড়ে তবে তার উপর একটি সিজদাই ওয়াজিব হবে। আর তা استحسان এর ভিত্তিতে। নতুবা কিয়াসের চাহিদা হলো প্রত্যেক তেলাওয়াতের কারণে এক একটি সিজদা ওয়াজিব হওয়া। বার বার তিলাওয়াত একই মজলিসে হউক বা বিভিন্ন মজলিসে হউক। استحسان এর কারণ হলো মানুষের কষ্টকে লাঘব করা। কারণ মুসলমান কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দেয়া অধিক মুখাপেক্ষী। আর تعليم ও تعلم বারংবার ছাড়া অর্জিত হয় না। সুতরাং একই বৈঠকে একই সিজদার আয়াতকে বার বার পড়ার দরুন বারংবার সিজদা ওয়াজিব হওয়াটা মানুষের জন্য কষ্টকর। অথচ শরীয়ত কষ্টকে দূরীভূত করেছে। যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী— لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না। আর হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, হযরত জিব্রাইল আ. রাসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট সিজদার একটি আয়াত নিয়ে আসতেন আর তা বার বার দোহরাতেন। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ সা. একটি সিজদা দিতেন। তা ছাড়া হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, তিনি কুফার মসজিদে বসে লোকদেরকে কুরআনের তা'লীম দিতেন। যদি সিজদার আয়াত আসতো তাও বারবার পড়তেন। কিন্তু যেহেতু একই বৈঠকে পড়তেন তাই একটি সিজদাই আদায় করতেন। সুতরাং উপরোল্লেখিত দলীলের ভিত্তিতে কিয়াসকে ছেড়ে استحسان এর উপর আমল করা হয়েছে। আর এজন্যই বলা হয়েছে যে, একই স্থানে একাধিক বার এক সিজদার আয়াত পড়ার দরুন একবার সিজদা ওয়াজিব হবে।

قوله : وَكَيْفِيَّتُهُ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. উক্ত ইবারতে সিজদার পদ্ধতির উপর আলোকপাত করেছেন। তা হল যখন সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার ইচ্ছা করবে তখন উভয় হাত উঠানো ছাড়া তাকবীর বলে সিজদা করবে এবং মাথা জমিন থেকে তুলে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। এরকমই হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.এর হাদীসে বর্ণিত আছে আর তা আদায়ের শর্ত হলো, নামাজের শর্ত যেমন, অজু করা, সতর ঢাকা, কিবলামুখী হওয়া, শরীর, কাপড়, স্থান পবিত্র হওয়া ইত্যাদি। গ্রন্থকার রহ. বলেছেন যে তিলাওয়াতে সিজদাতে তাশাহুদ নেই এবং সালামও নেই। কেননা, তাশাহুদ ও সালাম নামাজ থেকে বের হওয়ার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। আর নামাজ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কখন হবে যখন তাহরীমা নেই। আর সিজদাতে কি পড়া হবে। এর

জবাবে কেহ কেহ বলেন, নামাজের সিজদাতে যা পড়া হয় তাই পড়া হবে। কেহ কেহ বলেন, তিলাওয়াতে সিজদাতে سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا এ দোয়া পড়বে।

قوله : وَكُرِهَ أَنْ يَقْرَأَ سُوْرَةً الخ : নামাজে বা নামাজের বাহিরে পূরো সূরা পড়া অথবা সিজদার আয়াত ছেড়ে দেয়া মাকরূহ। কেননা, এতে আয়াতে সিজদার প্রতি অবজ্ঞা বুঝা যায়। আর কুরআনুল কারীমের কোন আয়াতকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হারাম। সুতরাং যা মৌলিকভাবে অবজ্ঞা করা হারাম, তাহলে যা অবজ্ঞা সাদৃশ তা অবশ্যই মাকরূহ। তবে শুধু সিজদার আয়াত পড়া মাকরূহ নয়। কেননা, এর দ্বারা সিজদার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায়। তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, পছন্দনীয় কথা হলো সিজদার আয়াতের আগে এক বা দুই আয়াত পড়ে নেওয়া শ্রোতাদের যেন কষ্ট না হয়। এজন্য ফুকাহায়ে কেরামগণের মতে চুপিসারে পড়া উত্তম।

بَابُ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ

পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের নামাযের বিবরণ

مَنْ جَاوَزَ بُيُوتَ مِصْرِهِ مُرِيدًا سَيْرًا وَسَطًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ جَبَلٍ قَصَّرَ الْفَرْضَ الرُّبَاعِيَّ فَلَوْ أَتَمَّ وَقَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ صَحَّ وَإِلَّا لَا حَتّٰى يَدْخُلَ مِصْرَهُ أَوْ يَنْوِيَ إِقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ لَا بِمَكَّةَ وَمِنًى وَقَصَّرَ إِنْ نَوَى أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ وَبَقِيَ سِنِينَ أَوْ نَوَى عَسْكَرٌ ذٰلِكَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ وَإِنْ حَاصَرُوا مِصْرًا أَوْ حَاصَرُوا أَهْلَ الْبَغْيِ فِي دَارِنَا فِي غَيْرِهِ بِخِلَافِ أَهْلِ الْأَخْبِيَةِ -

অনুবাদ : যে ব্যক্তি নিজ শহরের ঘর থেকে সফরের ইচ্ছায় মাঝারি তিন দিন তিন রাতের পথ অতিক্রম করে স্থলে, জলে বা পাহাড়ে তবে সে চার রাকাআতি ফরজ নামাজকে কছর করবে। অর্থাৎ চার রাকাতী ফরজ নামাজ দু রাকাত পড়বে) আর যদি চার রাকাত পূর্ণ করে ফেলে এবং দ্বিতীয় রাকাতে বসে তবে তা সহীহ হবে। নতুবা নামাজ সহীহ হবে না (সফর অবস্থায় চার রাকাতী নামাজের প্রথম বৈঠক না করলে।) যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ শহরে প্রবেশের অথবা কোন শহর বা গ্রামে অর্ধমাস অবস্থানের নিয়ত না করবে। তবে মক্কা ও মদীনায় (পনের দিনের) অবস্থানের নিয়্যত করলে মুসাফির হবে না। (কেননা, যদি দু স্থানের নিয়তকে এক সাথে গ্রহণ করে তবে বিভিন্ন স্থানের ইকামতকেও মিলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে।) আর কছর করবে যদি অর্ধ মাসের কমের নিয়্যত করে অথবা কোন কিছুর নিয়্যাত না করেও দু বৎসরকাল বাকী থাকে। কিংবা সৈন্যবাহিনী শত্রু এলাকায় তার (তথা পনের দিনের) নিয়্যত করে যদিও তারা কোন (শত্রু কবলিত) শহর অবরোধ করে অথবা বিদ্রোহীদেরকে দারুল ইসলামের শহর বহির্ভূত কোন এলাকায় অবরোধ করে। (তবুও কছর করবে) পক্ষান্তরে তাবুবাসীদের বিধান ভিন্ন।

শব্দার্থ : جَاوَزَ ইহা مفاعلة থেকে مُجَاوَزَةٌ অর্থ অতিক্রম করা, ছড়িয়ে যাওয়া। سَيْرًا - ভ্রমণ, গমন। مصر শহর, وسطا - মাঝারি, মধ্যম। بَرٌّ (ج) بُرُوْرٌ স্থল, স্থলভাগ। بَحْرٌ (ج) بِحَارٌ সাগর, সমুদ্র। قَصْرٌ ইহা تفعيل থেকে

تَقْصِيرًا অর্থ খাটো করা, ছোট করা, কছর করা। حُرُوْبٌ সমর, যুদ্ধ। حَاصَرُوْا ইহা مفاعلة থেকে مُحَاصَرَةٌ অবরোধ করা, বেষ্টন করা। البغى অন্যায়, বিদ্রোহ। اَخْبِيَةٌ ইহা خَابِيَةٌ এর ব.ব., তাবু, শিবির।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : صَلٰوةُ الْمُسَافِرِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. তেলাওয়াতে সিজদার পর উক্ত অনুচ্ছেদকে উল্লেখ করেছেন। কারণ উভয়টির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আর তাহলো উভয়টি امر عارض তবে তিলাওয়াতে সিজদাকে অগ্রে আনার কারণ হলো তেলাওয়াতে মূল হলো ইবাদত। আর সফর এর মূল হলো ইবাহাত। হা হজ্ব ইত্যাদির দিকে সফর ইবাদত। সুতরাং তিলাওয়াত ইবাদাত হওয়ার কারণে ইবাহাতের উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। **সফর এর সংজ্ঞা :** سَفَرٌ এর আভিধানিক অর্থ-দূরত্ব অতিক্রম করা, শরীয়াতের পরিভাষায় সফর বলা হয় এমন ভ্রমণকে যার কারণে আহকাম পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন নামাযে কছর হওয়া, রমজানে রোজা ভঙ্গের অনুমতি ইত্যাদি।

قوله : مَنْ جَاوَزَ بُيُوْتَ مِصْرِهٖ الخ : উক্ত ইবারত দ্বারা মুছান্নিফ রহ. একথা বুঝাচ্ছেন যে, সফর দ্বারা শরীয়তের হুকুম আহকামে পরিবর্তন দেখা দেয়। তা এমন যার জন্য মানুষ ইচ্ছা করে তিন দিন তিন রাত্র ভ্রমণের। পক্ষান্তরে ইচ্ছা ছাড়া হাজারো মাইল ভ্রমণ করলেও মুসাফির বলা যাবে না। স্মার্তব্য যে চলার ক্ষেত্রে মাঝারি ধরণের চলা ধর্তব্য। আর এক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের সবচেয়ে ছোট দিনকেই মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, রাতদিন দ্বারা সারা ঘন্টার চলাকে বোঝানো হয়নি। বরং প্রতিদিন সকাল হতে সূর্য হেলার সময় পর্যন্ত চলাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, একাধারে তিন দিন তিন রাত পায়ে চলা কারো সাধ্যের ভেতর নেই।

উপরোক্ত আলোচনা আমাদের মাযহাব মতে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ পূর্ণ দুই দিন ও তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়। তার প্রমাণ ইমাম শাফেয়ী রহ. এর এক বর্ণনা মতে সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ একদিন এক রাত্র। আর ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এর মতে সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ চার ফরসখ। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর থেকেও এরকম এক বর্ণনা রয়েছে। হানাফি মাযহাব অনুযায়ী সফরের পরিমাণ তিনদিন তিন রাত্র হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসটি উপস্থাপন করা যায়—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ كَمَالَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَ لَيَالِيْهَا -

'মুকীম ব্যক্তি পূর্ণ একদিন এক রাত মাসহ করবে। আর মুসাফির তিন দিন ও তার রাতসমূহ মাসহ করবে। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ এভাবে যে এখানে المسافر কথাটির মধ্যে الف ও لام হলো استغراقى - তাই তার মাঝে সকল মুসাফিরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ পত্যেক মুসাফিরই তিন দিন তিন রাত্র মাসেহ করতে পারবে। আর প্রত্যেক মুসাফির তখনই তিনদিন তিন রাত্র মাসেহ করার যোগ্যতা রাখবে যখন তার সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিন দিন তিন রাত্র হবে। আর যদি সফরের মেয়াদ এরচেয়ে কম হয় তবে প্রত্যেক মুসাফির মাসহ করতে পারবে না। অথচ হাদীস দ্বারা প্রত্যেক মুসাফিরই তিন দিন তিন রাত্র মাসেহ করার কথা প্রমাণিত। সুতরাং প্রমাণিত হলো সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিন দিন তিন রাত।

قوله : قَصَرَ الْفَرْضَ الرُّبَاعِيَّ الخ : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী চার রাকাতী ফরজ নামাজে মুসাফিরের জন্য দু রাকাত ফরজ এর চেয়ে অতিরিক্ত আদায় করা জায়েয নেই। সুতরাং মুসাফিরের জন্য কসর হচ্ছে رخصت اسقاط তথা এমন যা চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামজের দুঃ রাকাত মুসাফিরের জিম্মাদারি থেকে রহিত করে দেয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, মুসাফিরের জন্য কছর হচ্ছে رخصت ترفيه অর্থাৎ মুসাফিরের

সুবিধার্থে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজে দু রাকাত আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে হাঁ, চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজে চার রাকাতই ফরজ, তাই চার রাকাতই আদায় করা উত্তম। ইমাম আহমদ রহ. ও ইমাম মালিক রহ. এর এক রিওয়ায়তে ইহার সমর্থন রয়েছে। তিনি দলিল দেন রোজার উপর কিয়াস করে। অর্থাৎ যেমনিভাবে রমজান মাসে মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে, তবে রেখে নেয়াটা উত্তম। দ্বিতীয় দলিল পেশ করেন, কুরআনের আয়াত দ্বারা। আর তা হলো— فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ নামাজ কসর করতে তোমাদের কোন অসুবিধা নেই। উক্ত আয়াতে لاجناح ব্যবহার করা হয়েছে। এরকম শব্দ সেখানেই ব্যবহার করা হয় যেখানে مباح হওয়াটা উদ্দেশ্য। ওয়াজিব প্রমাণ করার জন্য নয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো, কসর করা ওয়াজিব নয় বরং মুবাহ। হানাফিদের দলিল হলো, সফর অবস্থায় মুসাফির চার রাকাতি নামাজ দু রাকাত আদায় করে অতঃপর মুকিম হওয়ার পর দু রাকাত পুণরায় আদায় করতে হয়না। আর এভাবে পুণরায় আদায় না করাতে সে গুনাহগার হয় না। সুতরাং পুণরায় আদায় ফরজ না হওয়া এবং গুনাহ না হওয়া দ্বারা বুঝা গেল অবশিষ্ট দু' রাকাত তা নফল। এজন্য মুসাফিরের উপর চার রাকাতে দু রাকাত আদায় করা ফরজ। দ্বিতীয় দলিল : হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস—

قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَ زِيْدَتْ فِي الْحَضَرِ (بخاری)

তিনি বলেন, নামাজ দু' রাকাত দু রাকাতই করে ফরজ করা হয়েছে। সফরে তা নিজ হালতে থাকে। আর মুকীমের বেলায় আরও দু রাকাত বাড়ানো হয়েছে।

অন্যত্র হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত আছে—

قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ صَلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ـ

তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর মুখ দিয়ে মুকীমের অবস্থার জন্য চার রাকাত ও সফর অবস্থার জন্য দু' রাকাত ফরজ করেছেন।

এ ব্যাপারে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি হল—

اِفْتَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ كَمَا افْتَرَضَ فِي الْحَضَرِ اَرْبَعًا ـ

রাসূল সা. সফর অবস্থার জন্য দু রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন যেমনভাবে মুকীমের জন্য চার রাকাত ফরজ করেছেন।

উপরোক্ত দলিলসমূহ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হলো যে, সফর অবস্থায় চার রাকাতে দু রাকাতই ফরজ। অন্যথায় যদি চার রাকাতই ফরজ হতো তবে খোদ রাসূলুল্লাহ্ সা. ও অপরাপর সাহাবিরা তা পরিত্যাগ করতেন না। আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী রহ. কর্তৃক দলিলের জবাব : মুসাফিরের নামাজকে রোযার সঙ্গে কিয়াস করা আদৌ ঠিক নয়। কেননা, মুসাফিরের ক্ষেত্রে যদিও সফর অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে, তথাপি পরবর্তীতে তথা মুকীম হওয়ার পর তা কাযা আদায় করার জিম্মাদারী তার উপর থেকে যায়। পক্ষান্তরে নামায চার রাকাতে দু রাকাত পড়া ওয়াজিব, কিন্তু বাকী দু রাকাত পরবর্তীতে কাযা আদায় করা তার জিম্মায় থাকে না। সুতরাং মুসাফিরের নামাজকে রোযার সাথে তুলনা করা যাবে না। আয়াতের জবাব হল, উক্ত আয়াতে নামাজের وصف তথা গুণাগুণের কসরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ দুশমন বা অন্য কোন কিছুর ভয়ে কিয়াম ছেড়ে দেয়া, অথবা রুকু সিজদা ছেড়ে ইশারায় তা আদায় করা ইত্যাদি অবকাশকে বুঝানো হয়েছে। হানাফী মাযহাব মতে ভয়ের সময় কসর করা বৈধ। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা যেহেতু اوصاف এর কসর বুঝানো হয়েছে বিধায় ইহাকে

রাকাতের কসর এর পক্ষে দলিল পেশ করা সমিচিন নয়।

قوله : فَلَوْ اَتَمَّ وَ قَعَدَ فِى الثَّانِيَةِ الخ : মুসাফির চার রাকাতে দু রাকাত পড়বে এটাই হল নিয়ম। কিন্তু যদি কেহ চার রাকাতে চার রাকাতই পড়ে নেয় আর প্রথম বৈঠক করে তাহলে তার নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু সালাম বিলম্বে আদায়ের জন্য গুনাহগার হবে। আর প্রথম বৈঠকের পরবর্তী দু' রাকাতকে নফল হিসেব ধরে নেয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রথম বৈঠক না করে চার রাকাত পড়ে নেয় তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, ফরজের রুকনগুলো পূর্ণ হওয়ার আগে তার সাথে নফলকে সংযুক্ত করেছে। আর রুকনগুলো পূর্ণ না হওয়ার কারণ হল ফরজের শেষ বৈঠক যা রুকন তা পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ তা বর্জন করা হয়েছে।

মুসাফিরের সফরের হুকুম কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে : হানাফী মাযহাব মতে মুসাফির কোন শহর বা গ্রামে পনের দিন অবস্থান করার নিয়্যাত করা পর্যন্ত সে মুসাফির বলে গণ্য হবে। আর যদি পনের দিনের অবস্থানের নিয়্যাত করে ফেলে তবে সে মুকীম হয়ে যাবে। অর্থাৎ পনের দিনের কমের নিয়্যাত করলে মুসাফির। তাই সে কসর করবে।

ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে চারদিনের নিয়্যাত করলেই মুকীম হয়ে যাবে। অর্থাৎ চার দিনের কম সময় অবস্থানের নিয়াত করলে সে মুসাফির বলে গণ্য হবে। আর চারদিনের বা তার চেয়ে বেশী দিনের নিয়াত করলে সে মুকীম হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে এমনও একটি মত রয়েছে যে, চারদিনের অতিরিক্ত অবস্থান করলে সে মুকীম হয়ে যাবে। ইকামতের নিয়্যাত করুক বা নাই করুক। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিল, কুরআনের আয়াত—

اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

'যখন তোমরা জমিনে ভ্রমণ করবে তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। (সূরা নিসা-১০১)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পথ চলা অবস্থায় কসর করাকে মুবাহ করেছেন। সুতরাং তার مفهوم مخالف (বিপরীত অর্থ) হচ্ছে যদি পথ চলা না পাওয়া যায় তবে কসরের অনুমতি নেই। আর মুসাফির যখন কসর এর নিয়্যাত করে তখন সে পথ চলা ত্যাগ করে নেয়। আর যখন পথ চলা ত্যাগ করে নেয় তখন তার কসর করা মুবাহ হওয়াটা থাকে না।

দ্বিতীয় দলীল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস— مَنْ اَقَامَ اَرْبَعًا اَتَمَّ 'যে ব্যক্তি চারদিন অবস্থান করবে সে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে'। অতএব বুঝা গেল যে, মুকীম হওয়ার জন্য নিয়্যাত করা শর্ত নয়। সাথে সাথে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, চার দিন অবস্থান করলেই মুকীম হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল : একজন মুসাফিরের জন্য ইহা জরুরী নয় যে, পূর্ণ দিনই চলা বরং কখনও চলবে আবার কখনও অবস্থান করবে কখন বা এ অবস্থান লম্বা সময় পর্যন্ত হতে পারে। মোটকথা, পথ চলা আর অবস্থান করা উভয় মিলেই সফর। আর ইহাও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে কোথাও অবস্থানের নামই হচ্ছে ইকামত। সুতরাং একরম সল্প মিয়াদী ইকামত আর শরীয়াতের হুকুম পরিবর্তনকারী ইকামতের মধ্যে অবশ্যই কিছু পার্থক্য থাকাটা জরুরী। অতএব, এ পার্থক্য নির্ণয়ের সাথেই আমরা একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছি। তাহল তুহরের মুদ্দাতের উপর কিয়াস করে পনের দিন। কেননা, উভয়ের মাঝে একটি علت مشتركه পাওয়া গেছে তাহল হায়েযের সময় যেভাবে রহিত হওয়া আমলগুলো তুহর আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই ফিরে আসে তেমনিভাবে সফরের বেলাও রহিত হয়ে যাওয়া আমলগুলো মুকীম হওয়ার সাথে সাথে আবার ফিরে আসে। বিধায় এ মিলের কারণে ইকামতের মিয়াদকে তুহরের সাথে কিয়াস করা হয়েছে। ঠিক এভাবেই হায়েজের সর্বনিম্ন মিয়াদ তিন দিনের উপর কিয়াস করে সফরের দূরত্ব তিন দিনের উপর করা হয়েছে।

ইকামতের মেয়াদ পনের দিন হওয়ার ব্যাপারে দ্বিতীয় দলীল হল—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَا إِذَا دَخَلْتَ بَلْدَةً وَأَنْتَ مُسَافِرٌ وَ فِيْ عَزْمِكَ أَنْ تُقِيْمَ بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْمِلِ الصَّلٰوةَ وَإِنْ كُنْتَ لَاتَدْرِىْ مَتٰى تَظْعَنُ فَاقْصِرْ -

'হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ও হযরত ইবেন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত তারা বলেন, যদি তুমি মুসাফির অবস্থায় কোন শহরে প্রবেশ কর। আর তোমার সংকল্প থাকে যে, এখানে পনের দিন অবস্থান করবে। তাহলে তুমি পরিপূর্ণ নামাজ আদায় করবে। আর যদি জানা না থাকে যে কখন সফর করবে। তাহলে কসর অব্যাহত রাখো।'

সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, পনের দিন অবস্থানের নিয়্যাত করা পর্যন্ত সে মুসাফির বলে গণ্য হবে। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. যে আয়াতের مفهوم مخالف দ্বারা দলিল পেশ করেছেন তা হানাফী মাযহাবে দলিল হতে পারে না। অর্থাৎ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী مفهوم مخالف কে কোন কিছুর উপর প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে না।

قوله : أَوْ نَوٰى عَسْكَرٌ ذَالِكَ الخ : মুসলিম সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের ভূমিতে প্রবেশ করার পর সেখানে পনের দিন বা ততোধিক থাকার নিয়াত করলে ও উক্ত সৈন্যবাহিনী মুসাফির থেকে যাবে, মুকীম হবে না। ঠিক এভাবে মুসলিম সৈন্য বাহিনী যদি কোন শত্রু কবলিত এলাকা অবরোধ করে রাখে তবে তারাও মুসাফির বলে গণ্য হবে; যদিও পনের দিনের নিয়্যাত করে। মোটকথা, বিদ্রোহীদের দেশে প্রবেশকারী ইসলামী মুজাহিদ বাহিনীর ইকামতের ক্ষেত্রে নিয়াত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, ইকামতের যোগ্য স্থান হল এমন জায়গা যেখানে মানুষ নির্ভয়ে নিশ্চিতভাবে অবস্থানের অবকাশ পেয়ে থাকে। অথচ আলোচ্য ক্ষেত্র এর বিপরীত। কেননা, এখানে মুসলিম বাহিনী বিজীত হলে অবস্থান করতে পারবে। আর পরাজিত হলে পলায়ন করতে হবে। সুতরাং পলায়ন ও অবস্থানের দোদুল্যমান অবস্থান কাফেরের দেশে মুসলিম বাহিনীর জন্য অবস্থানস্থল বলা যাবে না।

ইমাম যুফার রহ. বলেন, মুসলিম সৈন্যবাহিনী কাফের কিংবা বিদ্রোহীদের অবরোধ করলে এবং ইকামতের নিয়াত করলে তা সহীহ হবে। তবে হাঁ, এবিধান তখনই প্রযোজ্য যখন শহরে মুসলিম বাহিনীর শক্তি তুঙ্গে থাকে। কেননা, এতে মুসলিম বাহিনী বাহ্যত অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, মুসলিম বাহিনী কাফের বা বিদ্রোহীদের অবরোধ করে আর ইকামতের নিয়াত করে তবে তা তখন কার্যকর হবে যখন মুসলিম বাহিনীর অবস্থানটি ইট বা মাটির ঘরের ভেতর হবে। আর তাবুর ভেতর হলে তা কার্যকর হবে না। বরং তারা মুসাফির হিসাবে নামাজ কসর করবে।

قوله : بِخِلَافِ أَهْلِ الْأَخْبِيَةِ الخ : যেসব লোকেরা পশু শিকার ও পশু খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ফিরে, তাবু টানিয়ে থাকে, কোথাও গ্রামের মত একত্র হয়ে জীবন যাপন করে না, তাদের ইকামতের নিয়াত সহীহ হবে কি না এব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হল যে, তাদের ইকামতের নিয়াত সহীহ হবে। অর্থাৎ শুরু থেকে তারা মুসাফির নয়। কেননা, ইকামত হল মূল বা আসল। আর সফর হলো তার প্রতিবন্ধক। অতএব, ইকামত তখন বাতিল হবে, যখন সফর তার প্রতিবন্ধক হিসেবে পাওয়া যাবে। যেমন, সে একস্থান থেকে অন্যস্থানে অবস্থানের নিয়াত করল যা তিনদিন পরিমাণ দূরত্বের ব্যবধানে রয়েছে। তখন তারা রাস্তায় মুসাফির হবে। আর এক চারণ ভূমি থেকে অন্য চারণ ভূমিতে স্থানান্তর দ্বারা মুসাফির হয় না। তাই তাদের ইকামত বাতিল হবে না। আর ইকামত বাতিল না হওয়ার দ্বারা তারা মুসাফির হবে না। বরং মুকিমই থাকবে।

وَإِنِ اقْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَأَتَمَّ وَبَعْدَهُ لَا وَبِعَكْسِهِ صَحَّ فِيهِمَا وَيَبْطُلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ بِمِثْلِهِ لَا السَّفَرُ وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ بِمِثْلِهِ وَالسَّفَرِ وَالْأَصْلِيِّ وَفَائِتَةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ تُقْضَى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ آخِرُ الْوَقْتِ وَالْعَاصِي كَغَيْرِهِ وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ مِنَ الْأَصْلِ دُونَ التَّبَعِ كَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالْجُنْدِيِّ -

অনুবাদ : আর মুসাফির যদি ওয়াক্তিয়া নামাজের ক্ষেত্রে মুকীমের পিছনে ইকতিদা করে তবে তা সহীহ এবং পূর্ণ করবে (চার রাকাত)। আর ওয়াক্তের পর ইকতিদা করলে তা সহীহ হবে না। এর বিপরীতে দুনু অবস্থাতে সহীহ। (তথা মুকীম মুসাফীরের ইকতিদা ওয়াক্তের ভেতর ও বাহিরে জায়েয) আর প্রথম আবাস ভূমি বাতিল হয়ে যাবে তার সমকক্ষ দ্বারা। (অর্থাৎ কেহ নিজস্ব আবাস ভূমি থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্য স্থানকে আবাস ভূমিরূপে গ্রহণ করে অতঃপর সফর করে প্রথম আবাস ভূমিতে প্রবেশ করে তবে সে আর মুকীম বলে গণ্য হবে না।) তবে সফর দ্বারা তা বাতিল হয় না। আর অস্থায়ী আবাস ভূমি তার সমকক্ষ দ্বারা বা সফর ও স্থায়ী আবাস দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। আর সফরে বা ইকামতে ফউত হওয়া নামাজ কাযা করবে দু রাকাত এবং চার রাকাত করে। অনুরূপ কাযার বেলায় ওয়াক্তের শেষ সময় ধর্তব্য। অপরাধি অন্যান্যদের মত ইকামতেরও সফরের নিয়্যাত মূল হিসাবে হবে। অনুসারির ন্যায় নয়। যেমন মহিলা, গোলাম ও সিপাহী, (অর্থাৎ মহিলা তার স্বামীর নিয়্যাতের উপর ও গোলাম তার মুনিবের নিয়্যাতের উপর এবং সিপাহী তার নেতার নিয়্যাতের উপর ধর্তব্য হবে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَإِنِ اقْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ الخ : এখানে দুটি মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে : (১) মুসাফিরের মুকীমের ইকতিদা করার হুকুম। (২) মুকীম ব্যক্তির মুসাফিরের ইকতিদা করার হুকুম। প্রথমটি ওয়াক্তের ভেতর জায়েয অর্থাৎ এক ওয়াক্তে মুসাফির ব্যক্তি মুকীমের পিছনে ইকতিদা করতে পারবে। এবং পূর্ণ চার রাকাতই আদায় করবে। কেননা, মুসাফির ব্যক্তি এমন ব্যক্তির ইকতিদা করেছে যার ফরজ নামাজ হলো চার রাকাত। সুতরাং অনুসরণের বাধ্যতার দরুন মুসাফিরের ফরজ ও চার রাকাতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, যেভাবে ইকামতের নিয়্যাত দ্বারা মুসাফিরের ফরিজা চার রাকাতে পরিবর্তীত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যদি ওয়াক্ত চলে যায় আর মুসাফির কাযা নামাজের মধ্যে মুকীমের ইকতিদা করে নেয় তবে ইহা জায়েয নেই। কেননা, ওয়াক্তের পরিবর্তন দ্বারা মুসাফিরের ফরীজা পরিবর্তন হয় না। কারণ, ফরজ নামাজের সবব বা কারণ তো হল ওয়াক্ত। আর ইকতিদা করার কারণে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা সববের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। আর যেহেতু কাযা নামাজে মূল ওয়াক্তের সাথে যুক্ততা পাওয়া গেল না বিধায় মুসাফিরের নামাজ দু রাকাত হতে চার রাকাতে পরিবর্তীত হবে না। যেমন কাযা নামাজে মুকীম হওয়া অবস্থায় দু রাকাতে দু রাকাতই পড়তে হয়। অথচ ওয়াক্তের ভেতর ইকামতের নিয়্যতে দু রাকাতে চার রাকাতের দিকে পরিবর্তন করে নেয়।

দ্বিতীয় সূরত : মুকীম ব্যক্তি মুসাফিরের ইকতিদা করা সহীহ। তবে মুসাফির চার রাকাতী ফরজে দু রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে আর মুকীম মুক্তাদীরা তাদের নামাজ পূর্ণ করবে। এমতাবস্থায় ইমাম সালাম ফিরানোর পর এতটুকু বলার অনুমতি আছে যে, আমি মুসাফির বিধায় আপনারা আপনাদের নামাজ পূর্ণ করুন। মুসাফিরের পিছনে মুকীমের নামাজ আদায় সহীহ হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ হল যে, মুকীম মুক্তাদীরা ইমামকে মুসাফির মনে

করে দুই রাকাত তার বাধ্য বাধকতা গ্রহণ করেছে। সুতরাং দু রাকাত পূর্ণ করা দ্বারা উক্ত বাধ্যবাধকতা আদায় হয়ে গেছে। কিন্তু মুকীম মুক্তাদীর নামাজ এখন পূর্ণ হয়নি। বিধায় মুকীম মুক্তাদী অবশিষ্ট দুরাকাতের ক্ষেত্রে মুনফারিদ হবে। আর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ঐ রাকাতগুলোর মধ্যে কেরাত পড়বে না। কেননা, মুকীম শেষ দু রাকাতে তাহরীমার বেলায় মুক্তাদী তবে অন্যান্য কাজের বেলায় মুক্তাদী নয়। তাহরীমার বেলায় মুক্তাদী এজন্য যে সে প্রথম তাহরীমা ইমামের সাথে আদায় করার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। অন্যান্য কাজের বেলায় মুক্তাদী নয় একারণে যে দুই রাকাত শেষে সালাম ফিরাবার দ্বারা মুসাফির ইমামের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি এমন হয় তাকে লাহিক বলে। আর লাহিকের উপর কেরাত নেই। সুতরাং মুকীম মুক্তাদী শেষ দু রাকাতে কিরাত ছেড়ে দেবে।

قوله : وَيَبْطُلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ بِمِثْلِهِ الخ : عامة المشائخ বা সাধারণ মাশায়িখগণ আবাস ভূমির তিন ভাগ বর্ণনা করেছেন, এক স্থায়ী আবাভূমি (وطن اصلى), দ্বিতীয়ত অস্থায়ী আবাসভূমি (وطن اقامت) তৃতীয়ত বসবাসের আবাসভূমি। (وطن سكنى)। সুতরাং وطن اصلى হল মানুষের জন্মের স্থান অথবা ঐ শহর বা গ্রাম যেখানে তার পরিবার পরিজন বসবাস করে। আর وطن اقامت হল ঐ শহর বা গ্রাম যেখানে মুসাফির পনের দিন অবস্থানের ইরাদা করেছে তার অপর নাম وطن سفر। এবং وطن سكنى বলা হয় ঐ শহর বা গ্রামকে যার মধ্যে ভ্রমণকারী পনেরো দিনের কম অবস্থানের নিয়ত করেছে। محققين দের মতে وطن দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমত وطن اصلى দ্বিতীয়ত وطن اقامت - মুহাক্কিকীনগণ وطن سكنى কে গ্রহণ করেন নি। কেননা, وطن سكنى এর মধ্যে অবস্থানের বর্ণনা পাওয়া যায়নি, বরং সফরের হুকুম অবশিষ্ট থেকে যায়। স্থায়ী আবাস ভূমি তার সমপর্যায়ের আর একটি স্থায়ী আবাস ভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং শরয়ী সফরের পর যদি কেহ তার প্রথম আবাস ভূমিতে প্রবেশ করে তবে মুকীম থাকবে না। বরং কসরের নামাজ পড়তে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. এর মূল বাড়ী ছিল মক্কাতুল মুকাররমায়। কিন্তু তিনি যখন হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন এবং মদীনাকে নিজ আবসভূমিরূপে গ্রহণ করলেন। তখন আর মক্কা তার জন্য আবাস ভূমিরূপে থাকে নি। তাই তো হিজরতের পর যখন তিনি মক্কাতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন তিনি নিজেকে মুসাফির হিসাবে গণ্য করেছেন। আর বলেছেন— أَتِمُّوا صَلٰوتَكُمْ فَانَّا قَوْمٌ سَفَرٌ আর যেহেতু স্থায়ী আবাসভূমি অস্থায়ী আবাসভূমির চেয়ে বড়, তাই অস্থায়ী আবাসভূমি স্থায়ী আবাস ভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। আর এদিকে অস্থায়ী আবাস ভূমি আর একটি অস্থায়ী আবাস ভূমির সমান সমান। তাই অস্থায়ী আবাস ভূমি আর একটি অস্থায়ী আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে।

قوله : وَفَائِتَةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ الخ : যদি কারো সফর অবস্থায় চার রাকাতী নামাজ কাজা হয় আর সে ইকামতের হালতে তা আদায় করতে চায় তবে দু রাকাত আদায় করবে। আর যদি কারো ইকামতের হালতে চার রাকাতী নামাজ কাযা হয় আর সফর অবস্থায় তা আদায়ের ইচ্ছা করে তবে পূর্ণ চার রাকাতই আদায় করতে হবে। দলিল : কাযা আদায়ের অনুরূপ ওয়াজিব হয়ে থাকে। অর্থাৎ নামাজ প্রথমত চার রাকাত ওয়াজিব হলে পরে তা কাযা ও চার রাকাতই ওয়াজিব। আর প্রথমত দু রাকাত ওয়াজিব হলে কাযাও দু রাকাতই ওয়াজিব হবে। আদায়ের মধ্যে ওয়াক্তের শেষ সময় ধর্তব্য। আর ওয়াক্তের শেষ সময় বলতে তাহরীমা পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য। কেননা, ওয়াক্তের মধ্যে আদায় না করার সুরতে নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সবব হিসেবে শেষ ওয়াক্ত ধর্তব্য।

قوله : وَالْعَاصِى كَغَيْرِهِ الخ : ফুকাহাগণের মতে সফর তিন ধরণের হয়ে থাকে। এক : ইবাদাতের জন্য সফর করা। যেমন হজ্জের সফর ইত্যাদি। দুই : মুবাহ সফর, যেমন ব্যবসা বাজিন্য। তিন : অবৈধ সফর; যেমন ডাকাতি করার জন্য সফর। প্রথম দু প্রকারের সফর তা রুখসতের কারণ হতে পারবে সর্বসম্মতিক্রমে;

আর তৃতীয় প্রকার সফর তথা অবৈধ কাজের জন্য সফর আমাদের মতে তা রুখসতের সবব বা কারণ হতে পারবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে এ প্রকারের সফর রুখসতের কারণ হতে পারে না। আমাদের দলিল হল, শরীয়তের বিধানের মুতলাক হওয়া। অর্থাৎ, শরীয়াত কর্তৃক রুখসত পাওয়া তা সাধারণভাবে সকল মুসাফিরকে শামিল করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন- يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَ لَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهَا অন্যত্র বলেন- فَرْضُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ উক্ত আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাধ্য আর অবাধ্যের কোন পার্থক্য করা হয় নি, বরং যেই শরয়ী সফর করবে সেই আদেশের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অন্য কিয়াস দ্বারা তা মুকাইয়্যাদ করা উচিত নয়। অপর দিকে সফর বলা হয় ভ্রমনকে। সুতরাং তার মূলের দিকে তাকালে বাধ্য আর অবাধ্যের পার্থক্য করা যায় না। অতএব যেই শরয়ী সফর করবে সেই রুখসতের হকদার হবে।

بَابُ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

পরিচ্ছেদ : জুমআর নামাযের বিবরণ

شَرْطُ أَدَائِهَا الْمِصْرُ وَهُوَ كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ أَمِيرٌ وَقَاضٍ يُنَفِّذُ الْأَحْكَامَ وَيُقِيمُ الْحُدُودَ أَوْ مُصَلَّاهُ وَمِنًى مِصْرٌ لَا عَرَفَاتٌ وَتُؤَدَّى فِي مِصْرٍ فِي مَوَاضِعَ وَالسُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ وَوَقْتُ الظُّهْرِ فَتَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ وَالْخُطْبَةُ قَبْلَهَا وَتُسَنُّ خُطْبَتَانِ بِجِلْسَةٍ بَيْنَهُمَا وَبِطَهَارَةٍ قَائِمًا وَكَفَتْ تَحْمِيدَةٌ أَوْ تَهْلِيلَةٌ أَوْ تَسْبِيحَةٌ -

অনুবাদ : জুমআর নামায আদায়ের শর্ত হলো শহর হওয়া। আর তা হল প্রত্যেক ঐ স্থান যেখানে শাসক অথবা কাজী রয়েছেন। যিনি বিধি নিষেধ প্রয়োগ করতে এবং হদসসমূহ কার্যকর করতে পারেন অথবা ঈদগাহ হওয়া। আর মিনা শহর (এর অন্তর্ভুক্ত) তবে আরাফা শহর নয়, (তথা মিনাতে জুমআর নামাজ সহীহ আর আরাফাতে জুমার নামাজ সহীহ নয়) আর শহরের কয়েক স্থানে নামাজ আদায় করা যাবে এবং (দ্বিতীয় শর্ত) বাদশা অথবা তার স্থলাভিষিক্ত থাকা, আর (তৃতীয় শর্ত) জুহরের ওয়াক্ত হওয়া, সুতরাং জুহরের ওয়াক্ত চলে যাওয়াতে জুমআর নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। (চতুর্থ শর্ত) নামাজের পূর্বে খুতবা দেয়া। সুন্নাত হল দু খুতবা উভয়টির মাঝে বসা এবং দাড়ানো অবস্থায় ত্বাহারাতের সাথে (খুতবা দেয়া সুন্নাত) আর যথেষ্ট হবে আল হামদুলিল্লাহ অথবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথবা সুবহানাল্লাহ বলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ : উক্ত অধ্যায় ও পূর্বের অধ্যায়ের সাথে মিল রয়েছে, যে মুসাফিরের চার রাকাতে দু রাকাত তেমনি জুমআর নামাজ ও দু রাকাত। তবে তা জুমআর ক্ষেত্রে তানসিফ শুধু একই নামাজে পাওয়া যায়

আর মুসাফিরের প্রত্যেক চার রাকাতী ফরজ নামাজে তানসিফ পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ ব্যাপক বা عام আর বর্তমানের অনুচ্ছেদটি নির্দিষ্ট তথা خاص। সুতরাং عام ওয়ালা অনুচ্ছেদ خاص ওয়ালা অনুচ্ছেদের পূর্বে আসাটা যুক্তিযুক্ত। উল্লেখ্য যে মুসাফিরের নামাজে তানসিফ সফরের কারণে আর জুমআর নামাজে তানসিফ খুতবার কারণে হয়ে থাকে। আইয়্যামে জাহেলিয়াতে মানুষ জুমআকে عروبه বলত। সবচেয়ে প্রথম কাব ইবনে লুআই জুমআকে জুমআ করে নাম করণ করেছেন। ওয়াহিদী এর কাওল অনুযায়ী جمعة এর ميم বর্ণে ضمة, فتحة এবং سكون তিনটিই জায়েয। তবে ميم বর্ণে ضمة দ্বারা অধিক বিশুদ্ধ।

জুমআকে জুমআ এজন্য বলা হয় যে, এদিন আল্লাহ তাআলা অনেক ভাল প্রতিদান একত্র করে থাকেন এবং একারণেও যে সেদিন সমস্ত লোক একত্রিত হয়। জুমআর নামাজ হানাফিয়্যাহ ও শাফেয়ীদের নিকট নয়, বরং সকল মুসলমানদের নিকট ফরয এবং তা কুরআন হাদীস কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত এবং জুমুআকে অস্বীকারকারী কাফের বলে সাব্যস্ত হবে। আমাদের ইমামদের মতে জুমআর নামাজ জোহরের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ الخ

উক্ত আয়াতে ذكر الله দ্বারা যদি নামাজ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তো কোন কথা নেই, আর যদি খুতবা উদ্দেশ্য হয়, তবে পরবর্তী فاسعوا শব্দটি امر যা ওজুব কামনা করে। সুতরাং আয়াত দ্বারা খুতবার দিকে সায়ী ওয়াজিব প্রমাণিত হল। এদিকে খুতবা হল জুমআর নামাজের শর্ত। আর যেহেতু শর্তের দিকে সায়ী এবং শুনা ফরজ হল; সুতরাং জুমআর নামাজ যা মূল উদ্দেশ্য তা তো অবশ্যই ফরজ হবে। আর এ উজুবকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে- وَذَرُوا الْبَيْعَ অর্থাৎ উক্ত উক্তি দ্বারা জুমআর আযানের পর বেচাকেনাকে হারাম করে দেয়া হয়েছে। অথচ ক্রয়-বিক্রয় একটি জায়েয বস্তু। আর নীতিমালা হল আল্লাহ তা'আলা মুবাহ বস্তুকে কোন ওয়াজিব বস্তু দ্বারাই হারাম করে থাকেন। সুতরাং প্রতিয়মান হল, জুমুআর কারণে ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করা হয়েছে তা ওয়াজিব। হাদীস দ্বারা জুমআর নামাজ ফরজ হওয়ার প্রমাণ: রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِىْ يَوْمِىْ هٰذَا فِىْ شَهْرِ هٰذَا فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا -

জেনে রাখ! আল্লাহ তা'আলা জুমআ নামাজ তোমাদের উপর ফরজ করেছেন এই দিবসে, আমার এই মাসে, আমার এই শহরে।

দ্বিতীয় দলিল:

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةً مَمْلُوْكٌ اَوْ اِمْرَأَةٌ اَوْ صَبِىٌّ اَوْ مَرِيْضٌ -

জুমআর নামাজ প্রত্যেক মুসলমানের জামাতের সাথে আদায় করা হচ্ছে ওয়াজিব, তথা ফরজ। তবে চার প্রকারের লোক- দাস, মহিলা অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া।

তৃতীয় দলিল:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِ -

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি কোন অক্ষমতা ছাড়া তিন জুমআ বর্জন করবে তাকে মুনাফিকীনদের থেকে লিখা হবে।

উক্ত হাদীসে জুমআ বর্জনের উপর কঠিন শাস্তির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে ধমকি ফরজ বর্জন করার দ্বারা হয়ে থাকে। আর যেহেতু সকল মুসলমান জুমআর নামাজ ফরজ হওয়ার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তাই ইজমা দ্বারাও জুমআর নামাজ ফরজ হওয়া প্রমাণিত হল। জুমআ নামাজ ফরজ হওয়ার উপর যুক্তি

র্জের প্রমাণ হল : মুসলিম জাতীকে জুমআর নামাজ আদায়ের জন্য জোহরকেবাদ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে থচ নিঃসন্দেহে জোহরের নামাজ ফরয। এদিকে সর্বজন স্বীকৃত যে ফরজকে ফরজ দ্বারাই তরক করা হয় ফল দ্বারা নয়। বিধায় প্রতিয়মান হল যে, জুমআর নামাজ ফরজ।

জুমআর নামাজ আদায় হওয়া সর্বপ্রথম মসজিদ : রাসূলুল্লাহ্ সা. মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে ালেন। তিনি কুবায় আমর ইবনে আউফের মহল্লায় চৌদ্দ রাত অবস্থান করে কুবা থেকে জুমআর দিন মদীনার কে রওয়ানা হলেন। অতঃপর রাস্তায় সালিম ইবনে আতিকের মহল্লায় জুমআর ওয়াক্ত হয়ে যায়। তখন তিনি ওয়ারী থেকে অবতরণ করে বতনে ওয়াদীতে অবস্থিত মসজিদে প্রথম জুমআর নামাজ আদায় করেন এবং তে অনেক মুসলমান অংশ নেন। এটাই ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম জুমআ অনুষ্ঠিত হওয়া মসজিদ।

জ্ঞাতব্য : জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য বারটি শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে ছয়টি মুসল্লির সাথে পাওয়া ত্যাবশ্যকীয় : (১) স্বাধীন হওয়া। (২) পুরুষ হওয়া। (৩) মুকীম হওয়া। (৪) সুস্থ হওয়া। (৫) পাদ্বয় সুস্থ কা। (৬) চোখ ঠিক থাকা। সুতরাং গোলাম, মহিলা, মুসাফির, অসুস্থ, পা অসুস্থওয়ালা এবং অন্ধের উপর মআর নামাজ ফরজ নয়। অবশিষ্ট ছয়টি যা নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। (১) শহর হওয়া, (২) জামাত ওয়া (৩) সুলতান বা তার নাইব উপস্থিত থাকা। (৪) ওয়াক্ত হওয়া। (৫) খুতবা পাঠ করা। (৬) ইযনে আম ধা সর্ব সাধারণের প্রবেশের অনুমতি থাকা।

قوله : شَرْطُ اَدَائِهَا الْمِصْرُ الخ : জুমআর নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো শহর হওয়া। শহরের জ্ঞা দিতে গিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. এর উক্তি নুযায়ী শহর হল : যেখানে রাস্তাঘাট, হাট, বাজার ও বিচারক থাকে, যারা মানুষের মাঝে ন্যায় ইনসাফের মাংসা করে থাকে, এবং কিছু সংখ্যক আলিম-উলামা থাকে যারা মানুষের সমস্যাবলীতে ফাতাওয়া প্রদান রেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর থেকে এব্যাপারে তিনটি মতামত রয়েছে।

১। জামে শহর এমন লোকালয় যেখানে শাসক ও বিচারক থাকে যারা শরীয়াতের বিধি-নিষেধ প্রয়োগ রতে এবং হুদুদ কার্যকর করতে সক্ষম হবেন। জামে শহরের ক্ষেত্রে ইহাই যাহিরে মাযহাব। ইহা ইমাম কারখী হ. অবলম্বন করেছেন। ২। জামে শহর ঐ স্থানকে বলে যেখানে তার অধিবাসীরা তাদের বড় মসজিদে সমবেত লে তাদের স্থান সংকুলান হয় না। ইহা আবু আবদুল্লাহ সালামী গ্রহণ করেছেন। ৩। কমছে কম দশ হাজার জন সতীর স্থান হলো জামে শহর।

দ্বিতীয়ত مصلاة দ্বারা শুধু ঈদগাহ উদ্দেশ্য নয়, বরং مصلاة দ্বারা উপশহর উদ্দেশ্য। এবার উপশহর দ্বারা মন পারিধিকে বুঝানো হয়েছে যা শহরের সাথে সম্পৃক্ত এবং শহরবাসীদের জন্য বানানো হয়েছে। ফানায়ে হরের পরিধি এর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এক গালওয়া এর সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন গালওয়া বলা হয় তিনশত গজ থেকে চারশত গজ পর্যন্ত)। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এক মাইল বা দু মাইলে মাবদ্ধ করেছেন। কেহ কেহ বলেন যে কেহ যদি চিৎকার দেয় অথবা আযান দেয় তবে যতটুকু পর্যন্ত পৌঁছবে তটুকু পর্যন্তকে ফানায়ে শহর বলা হয়। উপরোক্ত আলোচনায় প্রতিয়মান হল যে, জুমুআর নামাজ শহর অথবা নায়ে শহরে জায়েয। পক্ষান্তরে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী জুমার নামাজ গ্রামেগঞ্জে জায়েজ হবে না। আর মাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মালিক রহ. এর মতে জুমার নামাজ গ্রামেগঞ্জেও জায়েয। তাদের দলিল হল াল্লাহর ইরশাদ : فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ উক্ত আয়াতে বিশেষ স্থানের কোন শর্ত করা হয়নি। সুতরাং প্রতিয়মান হল হর, শহরতলী ও গ্রামেগঞ্জে জুমার নামাজ জায়েয। দ্বিতীয় দলিল হল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস াতে তিনি বলেন, ইসলামের (ইতিহাসে) মদীনা শরীফের পর সর্বপ্রথম জুওয়াস নামক স্থানে জুমার নামাজ আদায় করা হয়। আর তাহল বাহরাইনের একটি গ্রামের নাম। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে গ্রামেও জুমুআর নামাজ

সহীহ। অপর দিকে তারা বলেন, জুমার নামাজ অন্যান্য ফরজ নামাজের মত ফরজ বিধায় তা অন্যান্য ফরজ নামাজের ন্যায় আদায় করা হবে। অর্থাৎ, আদায় করার দিক তেকে তা শহর-গ্রামের কোন পার্থক্য নেই।

আমাদের দলিল হল : রাসূল সা. এর হাদীস—

لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ وَلَا فِطْرَ وَلَا اَضْحٰى اِلَّا فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ -

জামে শহর ছাড়া জুমা, তাশরীক, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা নেই।

ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফেয়ীরী রহ. এর দলিলের জবাব : কুরআনের আয়াত তথা فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ তা আপনাদের কথা অনুযায়ী ও মুতলাক হিসেবে নয়, কেননা, আয়াত মুতলাক হলে তার চাহিদা হল জুমার নামাজ শহর বন্দর, গ্রাম জঙ্গল সবখানে সহিহ হওয়া। অথচ আপনারাও বলেন যে জঙ্গলে জুমার নামাজ সহীহ নয়। সুতরাং আয়াত দ্বারা বিশেষ স্থান উদ্দেশ্য আর তা আমরা শহর নিয়েছি। আর আপনারা গ্রাম নিয়েছেন। তবে শহর নেয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, আমাদের উল্লেখিত হাদীসটি এর সামর্থক। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীসের জবাব হল : হাদীসে قرية দ্বারা শহর উদ্দেশ্য। কেমনা, প্রামথিক কালে قرية দ্বারা শহর উদ্দেশ্য হত। যেমন কুরআনে উল্লেখ্য যে, قَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ - قريتين দ্বারা মক্কা ও তায়েফ উদ্দেশ্য, অথচ উভয়টি শহর।

দ্বিতীয় জবাব হল, জুওয়াস বাহরাইনের একটি কিল্লার নাম। আর সাধারণত কিল্লাতে হাকীম ও আলিম থাকেনই। তাই এর দ্বারা জুয়াসা শহর হওয়া প্রমাণিত হল। কিয়াসের জবাব হল যে যদিও অন্যান্য ফরজ নামাজের ন্যায় জুমার নামাজও সব স্থানে সহীহ হওয়ার কথা কিন্তু হযরত আলী রাযি. কোন কোন স্থানে জুমার নামাজ জায়েয হওয়াকে নিষেধ করেছেন। যেমন গ্রামে-গঞ্জে-জঙ্গলে। সুতরাং হযরত আলী রাযি. এর এহেন উক্তি অবশ্যই রাসূল সা. থেকে শুনে হয়ে থাকবে। তাই এটাকে অন্যান্য ফরজ নামাযের সাথে তুলনা করা জায়েয হবে না।

قوله : وَمِنًا مِصْرٌ لَا عَرَفَاتِ الخ : ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে মিনাতে হজ্জের মৌসুমে জুমার নামাজ আদায় করা জায়েয। তবে শর্ত হল হজ্বের আমীর সে ব্যক্তি হতে হবে যে হিজাজের বিচারক। অথবা খলিফা স্বয়ং হজ্জের ইরাদা করে সে স্থানে উপস্থিত হতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, মিনাতে জুমার নামাজ সহীহ নয়। কেননা, মীনা শহর বা উপ শহরের অন্তর্ভুক্ত নয়। একারণে মীনায় ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করা হয় না। শায়খাইন রহ. এর দলীল হল মীনা যদিও শহর নয়, কিন্তু হজ্জের মওসুমে তা শহর হয়ে যায়। কেননা, হজ্জের মওসুমে সেখানে বাজার বসে ও খলিফা অথবা তার স্থলাভিষিক্ত সেখানে উপস্থিত থাকেন। দ্বিতীয় দলিল- মীনা যেহেতু হরমের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু তা ফেনায়ে শহরের অন্তর্ভুক্ত। কেনা, আল্লাহ তাআলার বাণী- هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ উক্ত আয়াতে মীনাকে কাবার সাথে গণনা করেছেন। আরাফার ময়দানে সর্বসম্মতিক্রমে জুমার নামাজ সহীহ নয়। কেননা, আরাফা একটি ময়দান মাত্র। জনবসতী ইত্যাদি কোন কিছুই নাই। আর তা ফানায়ে মক্কারও অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তা হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

قوله : وَالسُّلْطَانِ الخ : জুমার নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হল শাসক বা তার স্থলাভিষিক্ত উপস্থিত থাকা। অথবা সম্রাটের নির্দেশ প্রাপ্ত কেহ থাকবে। যেমন কাজী, আমীর, খতীব ইত্যাদি। তবে শর্ত হল তাদের জুমআ প্রতিষ্ঠা করার ইযনে আম থাকতে হবে। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে খলিফা বা তার স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকা শর্ত নয়।

قوله : وَوَقْتُ الظُّهْرِ الخ : জুমা সহীহ হওয়ার শর্ত থেকে একটি হল জোহরের ওয়াক্ত হওয়া। জোহরের ওয়াক্ত চলে গেলে আর জুমার নামাজ সহীহ হবে না। প্রমাণ! রাসূল সা. যখন হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি.কে মদীনায় প্রেরণ করেন তখন বলেছিলেন- اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ 'সূর্য যখন হেলে যাবে

তখন লোকদেরকে নিয়ে জুমার নামাজ আদায় করো।' অন্যত্র হযরত আনাছ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ

'রাসূল সা. যখন সূর্য হেলে পড়তো, তখন জুমার নামাজ আদায় করতেন।'

قوله : وَالْخُطْبَةُ الخ : জুমার নামাজ সহীহ হওয়ার অপর শর্ত হল খুতবা যার প্রমাণ হল হুজুর সা. জীবনে যত বারই জুমা পড়েছেন খুতবা ছাড়া পড়েন নি। যদি খুতবা জুমার শর্ত হতো না তবে একবার হলেও খুতবা ছাড়া জুমআ পড়াতেন। খুতবা পড়ার সময় হল সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে জুমার নামাজ পড়ার পূর্ব পর্যন্ত। সুতরাং কেহ যদি সূর্য হেলে যাওয়ার আগে বা জুমার নামাজের পরে খুতবা পড়ে তবে তা যথেষ্ট হবে না।

قوله : وَتُسَنُّ خُطْبَتَانِ الخ : দু খুতবা দেয়া সুন্নাত এমনকি উভয় খুতবার মধ্যখানে বসাও সুন্নাত। সুতরাং আমাদের মাযহাব অনুযায়ী দু খুতবার মাঝে তিন তাসবীহ পরিমাণ বসা উত্তম। এভাবেই আমল চলে আসছে। আর হা আমাদের মাযহাব মতে একথাটি শর্ত নয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে শর্ত। এমনকি তার মতে এক খুতবার উপর ইকতিফা করা জায়েয নয়। তার দলিল হল আমলে তাওয়ারুস। অর্থাৎ অতীতের সর্বকালীন আমল।

আমাদের দলিল : জাবির ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا خُطْبَةً وَاحِدَةً فَلَمَّا اَسَنَّ جَعَلَهَا خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ فِيْهِمَا جَلْسَةً

রাসূলুল্লাহ্ সা. দাঁড়িয়ে এক খুতবা পড়তেন, পরে যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন তখন দুই দুই খুতবা পড়তে লাগলেন এবং উভয় খুতবার মাঝে বসতেন। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, এক খুতবার উপর ইকতিফা করা জায়েয আছে।

قوله : وَكَفَتْ تَحْمِيْدَةٌ الخ : খুতবার পরিমাণ কতটুকু হবে, এনিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. এর মতে খুতবার ইচ্ছায় আলহামদুলিল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লা, বলে তবে তা জায়েয হবে। আর যদি খতিব সাহেব অন্য কোন ইচ্ছায় তথা হাচি দেওয়াতে الحمد لله। বলেন, তবে তা সর্বসম্মতিক্রমে খুতবার অন্তর্ভুক্ত হবে না। সাহাবাইন রহ. এর মতে এপরিমাণ দীর্ঘ যিকির হওয়া জরুরী যাকে সাধারণত খুতবা বলা হয়। তাই শুধু আলহামদুলিল্লাহ্ বলা কিংবা সুবহানাল্লাহ বলা এগুলোর নাম খুতবা নয়। সুতরাং খতিব সাহেব যদি শুধু এরকম শব্দাবলী উচ্চারণ করেন, তবে খুতবা আদায় হবে না। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে দুই খুতবা পাঠ করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল, আল্লাহর বাণী فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللهِ। উক্ত আয়াতের তাফসিরে মুফাসসিরীনে কেরামগণ একমত যে, এখানে ذِكْرُ اللهِ। দ্বারা খুতবা উদ্দেশ্য। সুতরাং বুঝা গেল মুতলাকান যিকরুল্লাহ্ দ্বারা খুতবা আদায় হয়ে যাবে। চাই তা কম হউক বা বেশী হউক। উপরন্তু বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান রাযি. খলিফা হওয়ার পর প্রথম বার জুমার খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে উঠলেন এবং আলহামদুলিল্লাহ্ বললেন। তখন তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর মিম্বর থেকে নেমে পড়লেন এবং লোকদের নিয়ে জুমার নামাজ পড়ে নিলেন। উল্লেখ্য যে তখন হযরত সাহাবায়ে কেরামের অনেক বড় জামাত তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহ হযরত উসমান রাযি. এর এহেন কাজকে অপছন্দ করেন নি। সুতরাং সাহাবীগণের ঐক্যমত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শুধু যিকরুল্লাহ্ দ্বারা খুতবা জায়েয হয়ে যায়। তবে হাঁ, শুধু যিকরুল্লাহ্ দ্বারা খুতবা শেষ করা মাকরূহ থেকে খালি নয়।

وَالْجَمَاعَةُ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ سِوَى الْإِمَامِ فَإِنْ نَفَرُوا قَبْلَ سُجُودِهِ بَطَلَتْ وَالْإِذْنُ الْعَامُ وَشَرْطُ وُجُوبِهَا الْإِقَامَةُ وَالذُّكُورَةُ وَالصِّحَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ وَسَلَامَةُ الْعَيْنَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ إِنْ أَدَّاهَا جَازَ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ وَلِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا وَتَنْعَقِدُ بِهِمْ -

অনুবাদ : (পঞ্চম শর্ত হল) জামাত এবং সর্বনিম্ন সংখ্যা ইমাম ছাড়া তিনজন ব্যক্তি হওয়া। আর যদি তারা ইমাম এর সিজদার পূর্বে পলায়ন করে তবে জুমা বাতিল হয়ে যাবে। (ষষ্ঠ শর্ত হল) ব্যাপক অনুমতি থাকা। আর জুমা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হল মুকীম হওয়া (তথা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া) স্বাধীন হওয়া, পুরুষ হওয়া, সুস্থ হওয়া, পাদ্বয় ও চোখদ্বয় সুস্থ থাকা। আর যার উপর জুমার নামাজ ওয়াজিব নয় সে যদি জুমা আদায় করে নেয়, তবে ওয়াক্তিয়া ফরজের পরিবর্তে তা আদায় হয়ে যাবে। মুসাফির, গোলাম, অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে জুমার ইমামতি করা জায়েয। এবং জুমা অনুষ্ঠিতও হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَالْجَمَاعَةُ الخ : জামাত হওয়া জুমার জন্য শর্ত। তবে মুসল্লিদের সর্ব নিম্ন সংখ্যা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে ইমাম ছাড়া সর্বনিম্ন তিনজন হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। এই মত ইমাম যুফার রহ.ও গ্রহণ করেছেন।

সাহাবাইন রহ. এর মতে ইমাম ব্যতিত দুজনই যথেষ্ট। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে সর্বনিম্নে চল্লিশজন হওয়া জরুরী। তিনি দলিল পেশ করেন : হযরত কাব ইবনে মালিক রহ. এর হাদীস তিনি বলেন, আস'আদ ইবনে জুরারা মদীনাতে সর্ব প্রথম চল্লিশজন মানুষের সাথে জুমার নামাজ আদায় করেন। (ابن ماجة)

দ্বিতীয়ত হযরত জাবির রাযি. এর হাদীস প্রচলিত রীতি হল প্রতি চল্লিশ জনে বা তার চেয়ে অধিকের মধ্যে জুমা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সাহাবাইন রহ. এর দলিল হল দ্বিবচনের ভেতর বহু বচনের অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং ইমামের সাথে দুজন ব্যক্তি পাওয়ার বেলা জামাত পাওয়া গেল।

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর দলিল হল : জুমাতে জামাত হওয়া একটি শর্ত এবং ইমাম হওয়া আরেকটি শর্ত। সুতরাং ইমামের গণনা জামাতের মধ্যে থেকে হবে না। বরং ইমাম ছাড়া কমছে কম তিনজন মুক্তাদি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, কুরআনের আয়াত إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ الخ উক্ত আয়াতের চাহিদা হল বর্ণনাকারী হল একজন আর তিনি হলেন ইমাম। তাছাড়া কমছেকম তিনজন সায়ী হওয়া। আর যদিও দ্বিবচনে কোন একদিক থেকে বহুবচনের অর্থ পাওয়া যায় তবুও তা সাধারণভাবে বহুবচন বুঝায় না। উল্লেখিত আলোচনায় সাহাবাইন রহ. এর দলিলের জবাব হয়ে গেছে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিলের জবাব হল : হযরত আসআদ ইবনে জুরারা রাযি. এর জুমা পড়ানো রাসূলুল্লাহ্ সা. এর মদিনায় হিজরত করার পূর্বে ছিল। দ্বিতীয়ত উক্ত হাদীসে একথার প্রতি ইঙ্গিত নেই যে, তার কমে জুমা জায়েয নেই। সুতরাং তা উক্ত মাসআলায় দলিল হওয়ার মত নয়। দ্বিতীয় দলিলের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লামা নববী রহ. বলেন যে, উক্ত হাদীসটি ضعيف।

قوله : فَإِنْ نَفَرُوا قَبْلَ سُجُودِهِ الخ : যদি লোকেরা জুমার নামাজ আরম্ভ করার পূর্বে ইমামকে একা রেখে পলায়ন করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম জুমা আদায় করতে পারবে না, বরং যোহরের নামাজ আদায় করবে। আর যদি ইমাম জুমার নামাজ আরম্ভ করে মুসল্লিদেরকে নিয়ে। অতঃপর সিজদার আগে লোকেরা পিছন থেকে

পলায়ন করে তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে ইমাম এই সুরতেও প্রথম থেকে জোহরের নামায আদায় করবে। আর সাহাবাইন রহ. এর মতে জুমার উপরই বিনা করবে। অর্থাৎ জুমাই আদায় করবে। আর যদি সিজদা-রুকু করার পর লোকেরা ইমাম ছেড়ে চলে যায় তবে আমাদের ইমামত্রয়ের মতে ইমাম সাহেব জুমার নামাজই আদায় করবে। যোহর পড়ার প্রয়োজন নেই। ইমাম যুফার রহ. এর মতে এই সুরতেও ইমাম যোহরই আদায় করবে। সাহাবাইন রহ. এর দলিল হল, জুমার জন্য জামাত হওয়া শর্ত। তবে জামাত আদায়ের শর্ত নয়। অর্থাৎ জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত হল জামাত। আদায়ের শর্ত নয়। এদিকে অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্তটি বছরের শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকতে হবে এমন নয়, বরং অনুষ্ঠিত হওয়ার সীমা পর্যন্ত পাওয়া জরুরী। সুতরাং যখন তাহরীমার সময় জামাত পাওয়া গেল বিধায় জুমা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তারপর আর জামাত বাকী থাকা শর্ত নয়। সুতরাং জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় জামাত পাওয়া গেলে, অতঃপর জামাত ফউত হওয়াতে জুমা ফউত হবে না। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল জামাত জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত। তবে অনুষ্ঠিত হওয়া শুরু করার দ্বারাই হয়। আর এই শুরু পূর্ণতা লাভ করে নামাজ এক রাকাত পূর্ণ হওয়া দ্বারা। কেননা, এক রাকাতের কমে নামাজ হয় না। কেননা এক রাকাতের কম হল لَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ এর অধিনে এসে যায়। সুতরাং নামাজ বলতে হলে কমপক্ষে এক রাকাত পূর্ণ করতে হবে। বিধায় যদি জুমার নামাজে ইমামের সিজদার প্রথমে মুসল্লিরা পলায়ন করে তবে ইমাম জুমার নামাজের উপর বিনা করতে পারবে না। আর যদি সিজদা করার পর লোকেরা পলায়ন করে তবে ইমামের যেহেতু নামাজ শুরু করাটা পূর্ণতা লাভ করেছে বিধায় ইমাম একাকী তার নামাজ তথা জুমা আদায় করে নিবে।

قوله : وَ شَرْطُ وُجُوْبِهَا الخ : জুমা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ছয়টি (যা পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে)। (১) মুকিম হওয়া (২) পুরুষ হওয়া (৩) সুস্থ থাকা (৪) স্বাধীন (৫) পাদ্বয় সুস্থ থাকা (৬) চোখদ্বয় সুস্থ থাকা। উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের বিপরীতদের উপর জুমা ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ মুসাফির, নারী, অসুস্থ ব্যক্তি, দাস, খোড়া ও অন্ধের উপর জুমার নামাজ ওয়াজিব নয়। কেননা, তারা জুমাতে উপস্থিত হওয়া কষ্টকর। তাই ক্ষতি ও অসুবিধার দিক বিবেচনা করে তাদেরকে জুমা আদায় করা থেকে মাজুর হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

قوله : وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ اِنْ اَدَّاهَا الخ : যাদেরকে জুমা আদায় থেকে মাজুর ধরা হয়েছে, যদি তারা মসজিদে উপস্থিত হয়ে মানুষের সাথে জুমা আদায় করে নেয়, তবে ওয়াক্তিয়া ফরজের পরিবর্তে তা আদায় হয়ে যাবে। প্রমাণ হল : তাদের থেকে জুমার নামাজ সাকিত হয়ে যাওয়া নামাজের মধ্যে পাওয়া যায় এমন কোন কারণ নয়। বরং তাদের ক্ষতি ও অসুবিধার জন্য তাদের থেকে জুমার ফরযিয়াত তুলে নেয়া হয়েছে। কিন্তু যদি তারা তাদের এহেন ক্ষতি ও অসুবিধা সহ্য করে জুমা আদায় করে নেয়, তবে তা আদায় হয়ে যাবে। যেমন মুসাফিরের সফরে রোযা পালন করা। তার কষ্টের দিক বিবেচনা করে রোযা স্থগিত করার হুকুম দেয়া হয়েছে কিন্তু যদি সে তা আদায় করে নেয় তবে তা আদায় হয়ে যাবে।

قوله : وَلِلْمُسَافِرِ الخ : যদি মুসাফির, গোলাম ও অসুস্থ ব্যক্তি জুমার ইমামতি করে তবে তা জায়েয। যদিও তাদের উপর জুমা ফরজ নয়। কিন্তু ইমাম যুফার রহ. এর মতে এদের ইমামতি জায়েয নেই। তিনি দলিল দেন যে, তাদের উপর জুমা ফরজ না হওয়াটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও নারীদের মত। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু ও নারী যেহেতু জুমার ইমাম হতে পারবে না, বিধায় তাদের সাদৃশ্য হওয়ায় উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গরাও জুমার নামাজের ইমাম হতে পারবে না। আমাদের দলিল হল : মুসাফির গোলাম এবং রোগির জন্য জুমা না পড়াটা তাদের জন্য রুখসত বা অবকাশ, আর এ অবকাশ দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষতি ও কষ্টের দিক বিবেচনা করে এবার যেহেতু তারা তাদের ক্ষতি ও কষ্ট সহ্য করে জামাতে হাজির হয়ে গেল তাই তাদের জুমআ আদায় করাটা নফল হিসাবে হবে না, বরং ফরজ হিসাবেই আদায় হবে। আর যেহেতু তাদের নামাজ ফরজ হিসাবে আদায় হবে তাই

তাদেরকে ইমাম নিযুক্ত করাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মুসাফির, রোগী, গোলামকে অপ্রাপ্ত শিশুদের উপর ও নারী জাতীদের উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ইমামতি যা শরীয়াতে বৈধ করে নি আর মহিলা পুরুষের ইমামতি করার যোগ্যতাই নেই সুতরাং উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গকে শিশু ও নারীদের উপর কিয়াস করা যাবে না।

وَمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَهَا كُرِهَ فَإِنْ سَعَى إِلَيْهَا بَطَلَ وَكُرِهَ لِلْمَعْذُورِ وَالْمَسْجُونِ أَدَاءُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي الْمِصْرِ وَمَنْ أَدْرَكَهَا فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ أَتَمَّ جُمُعَةً وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ وَيَجِبُ السَّعْيُ إِلَيْهَا وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ فَإِنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُقِيمَ بَعْدَ تَمَامِ الْخُطْبَةِ -

অনুবাদ : যার কোন অক্ষমতা নেই সে যদি জুমআর পূর্বে জোহর পড়ে নেয় তবে তা মাকরূহ। অতঃপর জুমার দিকে ত্বরা করলে জোহর বাতিল হয়ে যাবে। মা'জুরগণ ও বন্দীগণ শহরের ভেতর জামাতে যোহর আদায় করা মাকরূহ। আর যে ব্যক্তি জুমার নামাযে তাশাহুদে অথবা সিজদায়ে সাহুতে পায়, সে জুমআই আদায় করবে। ইমাম খুৎবার জন্য বের হলে পরে নামায বা কথা নেই। (অর্থাৎ ইমাম খুৎবা দানের জন্য বের হলে মুসল্লিরা নামাজ পড়া বা কোন ধরণের কথা বলা নিষিদ্ধ) জুমআর জন্য চলা, এবং প্রথম আযানের পর ক্রয়বিক্রয় ত্যাগ করা অত্যাবশ্যকীয়। ইমাম যখন মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হবেন তখন তার সামনে আযান দেওয়া হবে। আর খুৎবা সমাপ্ত হলে ইকামত বলা হবে।

শব্দার্থ : سَعَى দৌড়ানো, ত্বরা করা। اَلْمَسْجُوْنُ বন্দীগণ। مِنْبَرٌ (ج) مَنَابِرُ (মসজিদের) মিম্বর, মঞ্চ, উচ্চস্থান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَمَنْ لَاعُذْرَ لَهُ لَوْ صَلَّى الخ : ওজর নেই এমন কেহ যদি জুমআর দিন ইমামের জুমআ আদায়ের পূর্বে জোহর পড়ে নে, তবে আমাদের মাযহাব মতে তার জোহর পড়াটা মাকরূহের সাথে বৈধ। কিন্তু ইমাম যুফার রহ. ও ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে ওজর হীন ব্যক্তির জন্য জুমআ পড়ার পূর্বে জোহর পড়া জায়েয নেই। তাদের দলীল হল : জুমআর দিন জুমআ পড়াই হলো মূল ফরজ। আর জোহর হল তার বিকল্প। কারণ হল- আয়াতে কারীমাতে জুমআর নামাযের দিকে ছায়ী করার হুকুম আসছে। এদিকে জুমআ ফউত না হওয়া পর্যন্ত জোহর পড়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং জুমআ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া আর জোহর নিষিদ্ধ হওয়া জুমআর নামায মূল হিসাবে ফরয হওয়াটা প্রমাণ করে। আর সর্বজন স্বীকৃত যে যতক্ষণ পর্যন্ত আসলের উপর ক্ষমতা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বদলের দিকে ফিরে যাবে না। সুতরাং জুমআর নামাযের উপর শক্তি থাকা অবস্থায় জোহরের নামায পড়া জায়েয হবে না। আমাদের দলিল হল, অন্যান্য দিনের ন্যায় শুক্রবারেও জোহর হল মূল ফরজ। একথার দলিল হল, রাসূল সা. এর বাণী- أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ জোহরের প্রথম ওয়াক্ত যখন সূর্য হেলে পড়ে। সুতরাং বুঝা গেল প্রত্যেক দিনই সূর্য হেলে পড়লে জোহরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত আল্লাহর বিধান সামর্থানুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন- মহান প্রভুর ঘোষণা- لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا সুতরাং কোন কষ্ট ছাড়া নামাযের মুকাল্লাফ সরাসরি জোহর আদায়ের প্রতি সামর্থবান। জুমআ আদায়ের

প্রতি নয়। কেননা, জুমআতে এমন কিছু শর্ত রয়েছে যা ছাড়া জুমআ আদায় হয় না, তাই শক্তি থাকা অবস্থায় জুমআ বাদ দিয়ে জোহর আদায় করা মাকরূহ হবে। তবে না জাইয হবে না।

قوله : وَكُرِهَ لِلْمَعْذُوْرِ الخ : মা'জুর লোক যেমন মুসাফির, গোলাম, রোগিরা জুমআর দিন জুমআর পূর্বে অথবা পরে একই শহরে জামাতের সাথে জোহর পড়ে নেয়া মাকরূহ তেমনি কারাগারে বন্দিগণও জুমআর দিন জামাতের সাথে জুহরের নামায আদায় করা মাকরূহ। এবং জুমআর দিন জোহরের জামাত করা বাহ্যিকভাবে জুমআর সাথে সংঘাত পূর্ণ মনে হয় বিধায় জোহরের জামাত করা মাকরূহ।

قوله : مَنْ اَدْرَكَهَا فِى التَّشَهُّدِ الخ : যদি কেহ ইমামকে জুমআর নামাযে তাশাহুদে অথবা সিজদায়ে সাহুতে পায় তবে সে জুমআর নামায পূর্ণ করবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ রহ. ও ইমাম মালিক ও শাফেয়ী রহ. এর মতে যদি দ্বিতীয় রাকাতের অধিকাংশ পেয়ে থাকে যেমন, দ্বিতীয় রাকাতের রুকুতে ইমামের সাথে শামিল হল তবে জুমআই পূর্ণ করবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকাতের অধিকাংশ না পায় তবে জোহরই আদায় করবে। তাদের দলিল হলো, দ্বিতীয় রাকাতের অধিকাংশ না পাওয়া তথা তাশাহুদে শরীক হওয়ার দরুন তার দুদিক রয়েছে। অর্থাৎ একদিক বিবেচনা করলে জুমআ বুঝা যায় আর এক দিক বিবেচনা করলে জোহর মনে হয়। জুমাতো একারণে যে জুমার নিয়ত করা জরুরী আর জোহর তো একারণে যে, তার থেকে জুমার অনেক শর্ত ফউত হয়ে গেছে। যেমন জামাত ইত্যাদি। সুতরাং তার নামাজে যেহেতু দুটি দিক রয়েছে তাই তাকে জোহরের দিক লক্ষ্য করে চার রাকাত মিলাতে হবে; আর জুমার দিক লক্ষ্য করে তা অবশ্যই দু রাকাতের মাথায় বৈঠক করবে। শায়খাইন রহ. এর দলিল হল, উক্ত ব্যক্তি এ অবস্থাতেও জুমার নামাজ পেয়েছে। এমনকি তার জন্য জুমার নামাজের নিয়ত করাও শর্ত। সে জোহর আদায় করবে না। আর জুমআ যেহেতু দু রাকাত বিধায় দু রাকাতই আদায় করবে। চার রাকাত নয়। শায়খাইন রহ. এর সমর্থন হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদীস দ্বারাও হয়, তা হলো—

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا وَ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاقْضُوْا -

হুজুর সা. ইরশাদ করেন, যখন জুমার নামাযের জন্য ইকামত বলা হবে তখন তার দিকে দৌড়িও না বরং শান্ত ও শিষ্টভাবে আস। সুতরাং নামায পড় এবং যা ফউত হয়ে গেল তা পূর্ণ কর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা কাযা কর। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দলিলের জবাব : জুমআ ও জোহর উভয়টি আদায় করবে তা ঠিক নয়। কেননা, জুমআ ও জোহর ভিন্ন ভিন্ন নামাজ। সুতরাং তা এক তাহরীমার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

قوله : وَ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ الخ : ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে ইমাম তার কামরা থেকে জুমার খুৎবার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলে এবং মিম্বরের দিকে যেতে লাগলে মুসল্লিগণ নফল বা সুন্নাত নামায পড়তে পারবে না। এমনকি কোন ধরণের কথাও বলতে পারবে না। আর এ অবস্থা খুতবা থেকে ফারিগ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তবে হা কাযা নামায পড়তে পারবে। সাহেবাইন রহ. এর মতে খুতবা আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত এবং খুতবার পর তাকবীর বলা পর্যন্ত কথাবার্তা বলাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে হা এ সংকির্ণ সময়ে নামাজ পড়ার অনুমতি নেই। তাদের দলিল হলো কথা বলা বা নামায পড়া উভয়টি নিষিদ্ধ। এ কারণে যে খুতবা শুনার মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। কিন্তু খুতবা আরম্ভের আগে বা পরে কথা বলাতে মূলত খুতবার মধ্যে কোন ব্যাঘাত হয়নি। আর নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে তাই তা পড়া যাবে না। আর আগে বা পরে পড়ার অনুমতি নেই।

একারণে যে যদি কেহ এমন সময়ে নামায শুরু করে দেয় তবে খুৎবা শুরুর আগে বা খুতবার শেষে ইকামতের পূর্বে তা শেষ করা যাবে না ; কারণ নামায অনেক সময় দীর্ঘ হয়ে থাকে। সুতরাং তাও খুতবা বা পরবর্তী জামাতের জন্য ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী হতে পারে। বিধায় এ সংক্ষিপ্ত সময়ে নামাজ পড়ার অনুমতি নেই। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল : হযরত ইবনে উমর ও হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ .

হুজুর সা. ইরশাদ করেন, ইমাম যখন (খুতবার উদ্দেশ্যে) বের হন তখন নামায ও কথা নেই। অর্থাৎ নামাজ পড়া যাবে না এবং কথাও বলা যাবে না। উক্ত হাদীসে খুতবার পূর্ব ও পরের কোন ব্যাখ্যা নেই। সাহেবাইন রহ. এর দলিলের জবাব হল, নামাজের ন্যায় কখনো কখনো কথাও দীর্ঘ হয়ে থাকে। তাই যেভাবে খুতবা আরম্ভ করার পূর্বে এবং শেষে তাকবীরের পূর্বে নামায পড়া নিষেধ। তেমনি কথাবার্তা বলাও নিষেধ। আর এখানে নিষেধ দ্বারা মাকরূহ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : بِالْاَذَانِ الْاَوَّلِ الخ : জুমার দিন জুমার জন্য মুয়াজ্জিনগণের আজানের পর থেকে ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করে জুমার জন্য জামে মসজিদ পানে রওয়ানা হয়ে যাবে। দলিল হল আল্লাহর বাণী- اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ الخ উক্ত আয়াতে জুমার দিন ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে নামাজের জন্য যাওয়ার নির্দেশ করা হয়েছে। জুমার দিন আমরা দুটি আযান শুনতে পাই। সুতরাং বেচা-কেনা হারাম হওয়া এবং জুমা অভিমুখে সায়ী করা ওয়াজিব কোন আযানের পর এনিয়ে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম তাহাবী রহ. বলেন, এক্ষেত্রে ঐ আযানই ধর্তব্য হবে যা খুতবার শুরুতে দেওয়া হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ও সিদ্দিকী ও ফারুকী যামানায় জুমার জন্য এটাই মূল আযান ছিল। অতঃপর হযরত উসমান রাযি. এর যামানায় মানুষের আধিক্যের কারণে প্রথমোক্ত আযানের প্রবর্তন করা হয়।

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ, ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য মাসআলায় প্রথমোক্ত আযানই গণ্য। অর্থাৎ প্রথমোক্ত আযানের পর থেকে ক্রয়-বিক্রয় হারাম হওয়া এবং সাথে সাথেই জুমআ অভিমুখে রওয়ানা হওয়াটা ওয়াজিব হয়ে যায়। দলিল হল যদি বলা হয় এক্ষেত্রে দ্বিতীয় আযানই ধর্তব্য, তবে অনেক ক্ষেত্রে জুমআর সুন্নাত ফাউত হয়ে যাবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে খুতবা ফাউত হয়ে যাবে। আর যদি জামে মসজিদ বাড়ী থেকে কিছু দূর হয় তবে দেখা যাবে অনেকেই মূল জুমার নামাযই ফাউত করে ফেলেছে। সুতরাং উল্লেখিত সমস্যাগুলোর নিরসন কল্পে প্রথম আযানই ধর্তব্য হবে। তবে হা শর্ত হল এ আযান সূর্য হেলে পড়ার পর হবে। আর তা দ্বারাই আযানের উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে যাবে।

بَابُ صَلٰوةِ الْعِيدَيْنِ

পরিচ্ছেদ : উভয় ঈদের নামাযের বর্ণনা

تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ عَلٰى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بِشَرَائِطِهَا سِوَى الْخُطْبَةِ وَنُدِبَ فِي الْفِطْرِ أَنْ يَطْعَمَ وَيَغْتَسِلَ وَيَسْتَاكَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَيُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلّٰى غَيْرَ مُكَبِّرٍ وَمُتَنَفِّلٍ قَبْلَهَا -

অনুবাদ : যাদের উপর জুমআ ওয়াজিব তাদের উপর উভয় ঈদের নামায ওয়াজিব খুতবা ছাড়া তার সকল শর্তসহ। ঈদুল ফিতরে মুস্তাহাব হল ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কোন কিছু খাওয়া, গোসল করা, মিসওয়াক করা, খুশবো ব্যবহার করা, তার কাপড় থেকে সুন্দর কাপড় পরিধাণ করা এবং সদকায়ে ফিতর আদায় করা। অতঃপর তার পূর্বে নামাজ ও উচ্চ স্বরে তাকবীর বলা ছাড়া ঈদগাহ অভিমুখে গমন করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ صَلٰوةِ الْعِيدَيْنِ الخ : যেহেতু জুমআ ও ঈদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, বিধায় জুমআর পর ঈদের আলোচনা শুরু করতেছেন। উভয়টির মধ্যে সম্পর্ক এভাবে যে, ১। উভয়টি দিনের নামায, ২। উভয়টি আদায়ে অধিক লোকের সমাগম হয়। ৩। উভয়টির কিরাত জোরে পড়া হয়। ৪। জুমার জন্য যেসকল শর্ত রয়েছে ঈদের জন্য সে শর্ত রয়েছে। তবে হা খুতবার বিধান ভিন্ন। কেননা, খুতবা জুমার জন্য শর্ত আর ঈদের জন্য খুতবা শর্ত নয়। ৫। যার উপর জুমআ ওয়াজিব তার উপর ঈদের নামাযও ওয়াজিব। এত কিছুর পর যেহেত জুমা আদায় হিসাবে ফরজ আর ঈদ আদায় হিসাবে সুন্নাত বিধায় জুমআর আলোচনা পূর্বে করেছেন আর ঈদের আলোচনা পরে করেছেন।

ঈদকে ঈদ হিসাবে নাম করণ করার কারণ : ১। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের উপর এদিন তার অনুগ্রহের اعادہ তথা পুনরাবৃত্তি করেন বিধায় এদিনের নাম করা হয়েছে ঈদের দিন হিসাবে। ২। ঈদ শব্দটি العود মাসদার থেকে আসে যার অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা, বার বার আসা। যেহেতু এমহিমান্বিত দিবসটি প্রতি বৎসর ফিরে আসে এবং আল্লাহর অনুগ্রহের পুণরাবৃত্তি ঘটে এজন্য একে ঈদ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ঈদের নামাযের শুচনা হয় প্রথম হিজরী সনে এ মর্মে আবু দাউদ শরীফে একখানা হাদীস বর্ণিত আছে, তাহল :

عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَ يَوْمَ الْفِطْرِ -

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. যখন মদীনাতে আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীদের জন্য দুটি দিন ছিল খেলতামাশা করার জন্য। তিনি বললেন, এ দুটি দিন কি? তারা বলল, মুর্খতার যোগে আমরা এ দুটি দিন খেলতামাশা করতাম। রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে এ দু

দিনকে অন্য দুইদিন দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। যা এই দুদিনের চেয়েও উত্তম। তাহল ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর।

قوله : تَجِبُ صَلٰوةُ الْعِيْدَيْنِ الخ : যে ব্যক্তির উপর জুমার নামায ওয়াজিব তার উপর ঈদের নামায ওয়াজিব। ইহারই ভিত্তিতে ইমাম হাসান বিন যিয়াদ ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, ঈদের নামাজ ওয়াজিব। নিকায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার মুল্লাহ আলী কারী রহ. লিখেছেন, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী আমাদের মাযহাব মতে ঈদের নামায ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ রহ. এর জাহিরী মাযহাব হল ঈদের নামায ফরজে কেফায়া। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর নিকট ঈদের নামায সুন্নাত। ইহা ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাযহাব। তাদের দলিল হল : নজদবাসী এক গ্রাম্য সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সা. এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এবং এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ এগুলো ছাড়া আমার উপর আর কোন নামায আছে কি? প্রতি উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করলেন, لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ নেই, তবে নফল হিসাবে রয়েছে। উক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেল যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া বাকী সকল গায়রে ফরজ তথা নফল। সুতরাং এর দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, দুই ঈদের নামায ওয়াজিব নয়।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল : রাসূলুল্লাহ্ সা. নিয়মিতভাবে তা পালন করে গেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সা. সর্বদা পালন করাটা ওয়াজিব হওয়ার দলিল।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দলিলের জবাব : ১। প্রশ্নকারী গ্রাম্য আর গ্রাম্যের উপর ঈদের নামাযও ওয়াজিব নয়। বিধায় রাসূলুলাহ্ সা. তাকে ঈদের নামায শিক্ষা দেন নাই। ২। প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, উক্ত সাহাবীর কথোপকথন ঈদের নামায প্রবর্তনের পূর্বে ছিল। ৩। আল্লাহ তাআলার বাণী- وَلِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ উক্ত আয়াত দ্বারাও ঈদের নামায ওয়াজিব বুঝায়। কেননা, ولتكبر الله এর ব্যাখ্যা ঈদের নামায দ্বারা হয়েছে।

قوله : وَنُدِبَ فِى الْفِطْرِ الخ : এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. ঈদুল ফিতরের মুস্তাহাব কার্যাবলীর বিবরণ দিচ্ছেন। তা থেকে একটি হল ঈদগায় যাওয়ার পূর্বে কোন মিষ্টি দ্রব্য আহার করা। এ মর্মে হযরত আনাস রাযি. এর একখানা হাদীস সহীহ বুখারী গ্রন্থে রয়েছে। তাহল :

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَ يَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا -

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদের নামাযের জন্য) তাশরীফ নিতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত বেজোড় খেজুর আহার করতেন না।

দ্বিতীয় মুস্তাহাব হল- ঈদে যাওয়ার পূর্বে গোসল করে যাওয়া। ফকীহ ইবনে সা'দের হাদীস—

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْعَرَفَةِ - (رواه ابن ماجه)

রাসূল সা. ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আজহার দিন এবং আরাফার দিন গোসল করতেন। তাছাড়া ঈদের দিন মিসওয়াক করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করাও মুস্তাহাব। কেননা, দুই ঈদের দিন হল জুমআর ন্যায় একত্র হওয়ার দিন এবং সমাবেশের দিন। তাই এদিনে গোসল করা, মিসওয়াক করা সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। ঈদের দিনে আর একটি মুস্তাহাব হল নিজের ব্যবহৃত বস্ত্রাদী থেকে সর্বোত্তম বস্ত্রটি এদিন পরিধান করা। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. এর নিকট একটি পুস্তিনের বা পশমি জোব্বা ছিল। তিনি তা ঈদ জাতীয় দিনে পরিধান করতেন। ঈদে যাওয়ার পূর্বে ছদকায়ে ফিতর আদায় করা। কেননা, হযরত ইবনে ওমর রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم أَمَرَ بِزَكوةِ الفِطْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلوةِ وَكَانَ هُوَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَالِكَ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ (رواه ابوداود)

রাসূল সা. সদকায়ে ফিতর দানের নির্দেশ দিয়েছেন। যেন তারা লোকেরা নামাযে যাওয়ার আগেই তা আদায় করে দেয়। এবং তিনি নিজেও তা ঈদের দু একদিন আগে আদায় করে দিতেন। তাছাড়া আল্লাহর বাণী- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে تزكى দ্বারা زكوة الفطر তথা সদকায়ে ফিতর বুঝানো হয়েছে। অতঃপর وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى দ্বারা তাকবীর বলে ঈদের নামাজে যাওয়াটা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং ঈদের নামাজে যাওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করা আবশ্যক।

قوله : غَيْرَ مُكَبِّرٍ الخ : ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য যেতে রাস্তায় তাকবীর বলা যাবে কি না এ নিয়ে ইমামদের মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে রাস্তায় তাকবীর না বলা। আর সাহাবাইন রহ. এর মতে রাস্তায় তাকবীর বলা হবে। তবে তাহা অনুচ্চঃ আওয়াজে। খুলাছা প্রণেতা তা পছন্দ করেছেন এবং ইবনে নুজাইম রহ. এ মাযহাবের অনুসরণ করেন। দ্বিতীয় মতানৈক্য হল : তাকবীর বলা না বলা নিয়ে নয় বরং তাকবীরের বৈশিষ্ট নিয়ে আর তা এভাবে যে হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ.এর মতে অনুচ্চঃস্বরে বলা হবে। আর সাহেবাইন রহ. এর মতে উচ্চঃস্বরে বলা হবে। তাদের দলিল : যেহেতু ঈদুল আজহাতে উচ্চস্বরে তাকবীর বলা হয় বিধায় ঈদুল ফিতরেও উচ্চ আওয়াজে তাকবীর বলা হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল : জিকিরে মূল হল গোপনীয়তা, তবে হা যে জিকিরের ব্যাপারে প্রবর্তক নিজে উচ্চ স্বরে পড়ার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, সেখানে জেহেরই হবে। আর যার ব্যাপারে জেহেরের কথা উল্লেখ করেন নি সেক্ষেত্রে গোপনীয়তা অবলম্বন করা হবে। আলোচ্য মাসআলায় ঈদুল আজহার ব্যাপারে জেহের বর্ণিত আছে বিধায় ঈদুল আজহাতে তাকবীর জেহের হবে। আর ঈদুল ফিতরে যেহেতু জেহেরের কথা উল্লেখ করা হয় নি বিধায় ঈদুল ফিতরে তাকবীর অনুচ্চ আওয়াজে হবে।

قوله : وَ مُتَنَفِّلٍ قَبْلَهَا الخ : ঈদের নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া মাকরূহ। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন- أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا রাসূল সা. ঘর থেকে বের হয়ে লোকদেরকে নিয়ে ঈদের নামায পড়তেন। তিনি ঈদের নামাজের পূর্বাপর কোন নফল নামায পড়েন নি। এদিকে রাসূল সা. এর প্রবল আগ্রহ ছিল নামাজের প্রতি। সুতরাং যদি ঈদের নামাজের পূর্বে কোন নফল নামায থাকত তবে তা অবশ্যই পড়তেন। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নফল নামায নেই।

وَوَقْتُهَا مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُثَنِّيًا قَبْلَ الزَّوَائِدِ وَهِيَ ثَلَاثٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الزَّوَائِدِ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ فِيهَا أَحْكَامَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ولم تُقْضَ إِنْ فَاتَتْ مَعَ الْإِمَامِ وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إِلَى الْغَدِ فَقَطْ وَهِيَ أَحْكَامُ الْأَضْحَى لٰكِنَّ هُنَا يُؤَخِّرُ الْأَكْلَ عَنْهَا وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا وَيُعَلِّمُ الْأُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَالتَّعْرِيفُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

وَمِنْ بَعْدَ فَجْرِ عَرَفَةَ إِلَى ثَمَانٍ مَرَّةً اللهُ أَكْبَرُ إِلَى آخِرِهِ بِشَرْطِ إِقَامَةٍ وَمِصْرٍ وَمَكْتُوبَةٍ وَجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ وَبِالاِقْتِدَاءِ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ -

অনুবাদ : ঈদের ওয়াক্তের সূচনা : সূর্য উপরে উঠা থেকে নিয়ে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত। অতিরিক্ত তাকবীর বলার পূর্বে ছানা সহ দুরাকাত নামায পড়বে। এবং প্রতি রাকাতে তিনটি তাকবীর হবে। এবং উভয় কেরাতে সম্পর্ক বজায় রাখবে। অতিরিক্ত তাকবীরের ক্ষেত্রে হাত উঠাবে। নামায শেষে দুই খুতবা দিবে। যাতে সদকায়ে ফিতরের হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবে। ইমামের সাথে না মিললে ঈদের নামাজের কাজা করা যাবে না। আর ইহাই ঈদুল আজহারও বিধান। তবে ঈদুল আজহার ক্ষেত্রে খানাকে নামাজের পর বিলম্ব করা হবে। এবং রাস্তাতে জোরে তাকবীর বলবে। (খুতবাতে) কুরবানী ও তাকবীরে তাশরীকের শিক্ষা দিবে। আর তা ওজরের কারণে পরবর্তী তিনদিন বিলম্ব করা যাবে। আর আরাফা পালনের কোন ভিত্তি নেই এবং আরাফার ফজরের পর থেকে আট নামায পর্যন্ত একবার আল্লাহু আকবার শেষ পর্যন্ত পড়া সুন্নাত। তবে শর্ত হল, মুকীম হওয়া, শহর হওয়া, আর মুকীমের ইকতিদা করার দরুন মহিলা ও মুসাফিরের উপরও তা ওয়াজিব হয়ে যায়।

শব্দার্থ : اِرْتِفَاعٌ ইহা افتعال থেকে, ওপরে ওঠা, উচু হওয়া। زَوَالٌ মধ্যাহ্ন, অস্তগামী। مُثَنِّيًا - ছাড়া পড়নেওয়ালা। يُوَالِي ইহা مُوَلَاةٌ থেকে, অর্থ- ধারাবহিক اَلْأَضْحٰى কুরবানী। اَلتَّعْرِيْفُ - আরাফা পালন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ وَقْتُهَا مِنْ اِرْتِفَاعِ الخ : এখান থেকে গ্রন্থকার রহ. ঈদের নামাজের ওয়াক্তের আলোচনা শুরু করতেছেন। সুতরাং ঈদের নামাজের সূচনা সূর্য পূর্বাকাশে একবর্শা বা দু বর্শা উঠার পর থেকে শুরু হয়। এর পূর্বে এ কারণে পড়া যাবে না যে, তখন নামাজই পড়া নিষেধ। ঈদের নামাজের সূচনার দলিল হলো রাসূল সা. ঈদের নামাজ পড়তেন যখন সূর্য এক বর্শা বা দু বর্শা উপরে উঠে যেতো। আর ঈদের নামাজের শেষ ওয়াক্ত হলো সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত। এ কথার উপর দলীল হলো, একবার রমজানের চাঁদ ২৯ তারিখে দেখা যায় নি। পরের দিন কিছু সাহাবায়ে কেরাম যাওয়ালের পর সূর্য দেখার সাক্ষী দিলেন। এতে রাসূল সা. পরের দিন তথা ২রা শাওয়াল ঈদের নামাজ আদায় করার হুকুম দিলেন।

এতে প্রতিয়মান হলো ঈদের নামাজের শেষ ওয়াক্ত যাওয়াল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

قوله : وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ الخ : আমাদের মাযহাব মতে ঈদাইনের তাকবীর সমূহের মধ্যে কান পর্যন্ত হাত উঠানো হবে। ইহা ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এর মাযহাব। দলীল হল : রাসূল সা. এর বাণী- لَاتُرْفَعُ الْاَيْدِيْ اِلَّا فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ। তন্মধ্যে ঈদাইনের সাত তাকবীরের কথা উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে ঈদাইনের তাকবীরগুলোতে হাত উঠানো হবে না।

قوله : وَ يَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ الخ : গ্রন্থকার রহ. বলেন, দু ঈদের নামাজের শেষে দুটি খুতবা দিতে হবে। প্রমাণ, হযরত ইবনে উমর রাযি. এর হাদীস- قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَبُوْبَكْرٍ وَ عُمَرُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ - 'তিনি বলেন, রাসূল সা. ও আবু বকর রাযি. এবং ওমর রাযি. খুতবার পূর্বে দু ঈদের নামাজ আদায় করতেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন-

شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ - (رواه البخاري)

'আমি ঈদের নামাজে উপস্থিত হলাম হুজুর সা. এর সাথে আবু বকর রাযি. এর সাথে ও উমর রাযি. ও উসমান রাযি. এর সাথে, তারা সবাই উভয় ঈদের নামাজ পড়তেন খুতবার পূর্বে। উভয় হাদীস থেকে যা পাওয়া গেল তা হলো ঈদাইনের নামাজ প্রথমে পড়া হবে। তারপর খুতবা পাঠ করা হবে। কিন্তু যদি কেহ ঈদের খুতবা নামাজের পূর্বেও পড়ে নেয় তবে তাও জায়েয আছে এবং ঈদের নামাজের পরে পুনরায় তা পড়ার প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে ঈদুল ফিতরের খুতবার মধ্যে সদকাতুল ফিতর ও তার আহকামাদির আলোচনা হবে। এবং ঈদুল আযহাতে কুরবানী ও তাকবীরে তাশরীকের আলোচনা হবে। কেননা, এ খুতবাদ্বয় এ উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে।

قوله : وَلَمْ تُقْضَ الخ : ইমামের ঈদের নামাজ আদায়ের পর কারো জন্য একাকী নামাজ পড়ার কোন অনুমতি নেই। ইহাই আমাদের ইমাম মালিক রহ. এর মতামত। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে ঈদের নামাজ পড়তে পারবে। কেননা, তার মতে ঈদাইনের জামাআত শর্ত নয় এবং সুলতান উপস্থিত থাকাটাও শর্ত নয়। তাই তার মতে ঈদের নামাজের কাজা আদায় করা মুস্তাহাব। আমাদের দলিল হলো, ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যা একাকী নামাজ আদায়কারীর পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন জামাআত হওয়া, ঐ সময়ের সুলতান উপস্থিত থাকা ইত্যাদি। সুতরাং যেহেতু একা পড়নেওয়ালার ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত সমূহ পাওয়া যায় না বিধায় তার জন্য একাকী ঈদের নামাজ আদায় করা জায়েয নয়।

قوله : لٰكِنَّ هُنَا يُؤَخِّرُ الْاَكْلُ الخ : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সবকটি নিয়মনীতি একই ধরণের, তবে ঈদুল ফিতরে মিষ্টান্ন নামাজের পূর্বে খেয়ে যাওয়া মুস্তাহাব, কিন্তু ঈদুল আযহাতে ঈদের নামাজের পূর্বে খেয়ে যাওয়া মুস্তাহাব নয়। কেননা, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে যে—

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَأْكُلَ وَ كَانَ لَايَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتّٰى يُضَحِّىْ -

'রাসূলুল্লাহ্ সা. ঈদুল ফিতরে কিছু আহার না করে বের হতেন না। আর ঈদুল আজহার দিন কুরবানী না করে কিছু খেতেনও না। সুতরাং প্রতিয়মান হলো- ঈদুল আজহার নামাজ পড়ে খাওয়া হবে, পূর্বে নয়। এবং ঈদুল আযহাতে যেতে রাস্তায় উচ্চস্বরে তাকবীর বলা মুস্তাহাব। আর তাকবীর হলো—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ -

তা ই হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ্ আ. থেকে বর্ণিত আছে।

قوله : وَالتَّعْرِيْفُ لَيْسَ بِشَيْءٍ الخ : তা'রীফ হলো আরাফা পালন। অর্থাৎ আরাফাতে অবস্থানকারী হাজীদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করতঃ কোন মাঠে একত্র হয়ে হাজীদের ন্যায় দোয়া করা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন ভিত্তি নেই। দলীল হলো- আরাফায় অবস্থান তা নির্দিষ্ট করে আরাফার সাথে নির্দিষ্ট ইবাদত তা অন্যত্র প্রযোজ্য হবে না। যেমন, হজ্বের অন্যান্য ইবাদত অন্য স্থানে আদায় করা যায় না।

قوله : وَ سُنَّ بَعْدَ فَجْرِ عَرَفَةَ الخ : তাকবীর তাশরীক ওয়াজিব নাকি সুন্নাত এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ আলিম উলামারা বলেন তা ওয়াজিব। তাদের দলীল হলো, আল্লাহর বাণী- وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ আর কিছু সংখ্যক আলিমদের মতে তা সুন্নাত। তদের দলীল হলো, হুজুর সা. এর সর্বদা তা বলা এবং তার উপর مواظبت এর সাথে আমল করা। এবার তাকবীরে তাশরীকের শুরু ও শেষ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আর এ মতানৈক্যের মূল কারণ হলো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন, হযরত ওমর, আলী, ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, তাকবীরে তাশরীকের সূচনা হবে আরাফার দিন। অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের নয় তারীখে। এ মতকে হানাফী আলিমগণ সর্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। তাকবীরে তাশরীকের শেষ তারীখের ব্যাপারে ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, আইয়্যামে নাহরের প্রথম দিন অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের দশ তারীখ আসর পর্যন্ত। আর এমত ইমাম আবু হানিফা রহ. গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু হযরত আলী রাযি. বলেন, তাকবীরে তাশরীক আয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত পড়া হবে। অর্থাৎ যিলহাজ্ব মাসের ত্রয়োদশ তারীখের আসরের ওয়াক্তে শেষ করবে। এমতটি সাহেবাইন রহ. গ্রহণ করেছেন। সাহেবাইন রহ. ইবাদতের ক্ষেত্রে যেহেতু আধিক্যকে গ্রহণ করেন বিধায় তারা হযরত আলী রাযি. এর বর্ণনাকে অনুসরণ করেছেন। যেহেতু তাতে আধিক্য রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, তাকবীরে তাশরীকের শেষের ক্ষেত্রে সাহেবাইন রহ. এর মতের উপর ফতওয়া ও আমল গ্রহণ করা হয়েছে। তাকবীর কয়বার পড়বে এ নিয়ে সামান্য মতভেদ রয়েছে। আমাদের মতে একবার পড়া সুন্নাত আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে তিন, পাঁচ, কিংবা সাত বার পড়া সুন্নাত।

قوله : بِشَرْطِ اقَامَةِ الخ : আমাদের ইমামে আ'যম হযরত আবু হানিফা রহ. এর মতে তাকবীরটি প্রত্যেক ফরজ পড়ে পড়া ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো পাঠকারী মুকীম হতে হবে, শহরে হতে হবে, মুস্তাহাব তরীকায় জামাআতের সাথে নামাজ আদায়কারী হতে হবে। আর যা নামাজ আদায়ের পর অন্য কোন আমল পাওয়া যায় অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, নতুবা কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে যায় তবে আর সে তাকবীর বলবে না।

قوله : وَ بِالْاِقْتِدَاءِ يَجِبُ الخ : যদি স্ত্রীলোকেরা বা মুসাফিরেরা কোন মুকীম পুরুষের ইকতিদা করে নেয়, তবে নামাজ শেষে তাদের উপরও তাকবীর বলা ওয়াজিব হয়ে যায় অনুগামী হিসাবে। অর্থাৎ যেহেতু তারা ইমামের অনুগামী তাই ইমামের সাথে তাদের উপর তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। যেমন মুসাফির মুকীমের অনুসরণ করাতে তার উপর চার রাকাতই ওয়াজিব হয়।

بَابُ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

পরিচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের নামাজের বিবরণ

يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَالنَّفْلِ إِمَامُ الْجُمُعَةِ بِلَا جَهْرٍ وَخُطْبَةٍ ثُمَّ يَدْعُو حَتّٰى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ وَإِلَّا صَلُّوْا فُرَادٰى كَالْخُسُوفِ وَالظُّلْمَةِ وَالرِّيحِ وَالْفَزَعِ -

অনুবাদ : জুমার ইমাম সাহেব খুতবা ও জাহরী কিরাত ছাড়া নফলের ন্যায় দু রাকাত নামাজ পড়বে। অতঃপর সূর্য গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত দোয়া করবে। নতুবা (জুমুআর ইমাম উপস্থিত না থাকলে) চন্দ্র গ্রহণ অন্ধকার, অধিক বাতাস এবং ভয়ের (নামাজের) ন্যায় একাকী নামাজ পড়বে।

শব্দার্থ : اَلْكُسُوْفُ - সূর্যগ্রহণ। تَنْجَلِي - باب افعال থেকে اِنْجِلَاءٌ - পরিস্কার হওয়া, স্পষ্ট হওয়া। فُرَادٰى ইহা فَرْدٌ এর ব.ব., ব্যক্তি, জন, বিজোড় (সংখ্যা)। اَلْخُسُوْفُ - চন্দ্র গ্রহণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ الخ : পূর্বের অনুচ্ছেদ ঈদের নামাজ। বর্তমান অনুচ্ছেদ সালাতুল কুসূফ। পরবর্তী অনুচ্ছেদ সালাতুল ইসতিস্কা। সুতরাং এবাবগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে যে, উক্ত নামাজত্রয় দিনে, আজান একামত ছাড়া পড়া হয়। আর এ তিন নামাজের মধ্যে যেহেতু ঈদের নামাজ ওয়াজিব তাই ইহা সর্বাগ্রে। অতঃপর সালাতুল কুসূফ সুন্নাত। তাই ঈদের নামাজের পর তা নিয়ে আলোচনা আর সালাতুল ইসতিসকা, সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে বিধায় তার আলোচনা সর্বশেষে আনা হয়েছে।

قوله : يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ كَالنَّفْلِ الخ : যদি সূর্য গ্রহণ লেগে যায়, তবে জুমার ইমাম সাহেব জামে মসজিদে নতুবা ঈদগাহে লোকদেরকে নিয়ে নফলের ন্যায় দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে এবং প্রতি রাকাতে একটি মাত্র রুকু হবে। ইহাই আমাদের হানাফী মাযহাব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ রহ. বলেন, কুসূফের নামাযে প্রতি রাকাতে দুটি করে রুকু দিতে হবে।

আমাদের দলিল হল : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস—

قَالَ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرْكَعْ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ وَ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ -

'রাসূলুল্লাহ্ সা. এর যামানায় একবার সূর্য গ্রহণ হল, রাসূলুল্লাহ্ সা. এত দীর্ঘ সময় দাঁড়ালেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি রুকু করবেন না। অতঃপর তিনি এ পরিমাণ সময় রুকু করলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি মাথা উঠাবেন না। অতঃপর মাথা উঠালেন যে, মনে হচ্ছিল যে তিনি সিজদাতে যাবেন না। অতঃপর তিনি সিজদাতে গেলেন। মনে হচ্ছিল যে তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন না। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন। মনে হচ্ছিল তিনি দ্বিতীয় সিজদা করবেন না। অতঃপর তিনি সিজদা করলেন। মনে হচ্ছিল তিনি মাথা উঠাবেন না। তারপর তিনি মাথা উঠালেন। অতঃপর একই আমল দ্বিতীয় রাকাতেও করলেন।'

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. এক রাকাতে একই রুকু করেছেন যদিও অনেক দীর্ঘ হয়েছে। আর কিয়াসেরও চাহিদা হলো যে, অন্যান্য নামাজের ন্যায় উক্ত নামাজে ও প্রতি রাকাতে রুকু একটি হওয়া।

قوله : بِلَا جَهْرٍ الخ : সালাতুল কুসূফের উভয় রাকাতের কিরাতই উচ্চস্বরে না হওয়া অর্থাৎ কিরাত নীরবে হওয়া। তবে হা কিরাত দীর্ঘ হবে। কেননা, কোন কোন হাদীসের মধ্যে প্রথম রাকাত সূরা আল ইমরানের সমপরিমাণ পড়ার কথা বর্ণিত আছে। ইহা ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. ও জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতামত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন রহ. বলেন, উচ্চ স্বরে কিরাত পড়বে। ইহা ইমাম আহমদ রহ. এর মতামত। ইমাম ত্বাহাবী রহ. এটিকে গ্রহণ করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

কিরাত উচ্চস্বরে না হওয়ার দলিল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস—

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكُسُوْفَ فَلَمْ اَسْمَعْ مِنْهُ حَرْفًا مِنَ الْقِرَاءَةِ -

'হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমি হুজুর সা. এর সাথে কুসুফের নামাজ পড়েছি, কিন্তু আমি তার কিরাআত থেকে একটুও শুনিনি।'

হযরত সামূরা ইবনে জুনদুব রাযি. এর বর্ণিত হাদীসটি উক্ত হাদীসের সমর্থন করে। তাহলো—

صَلّٰى بِنَا فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ لَا نَسْمَعُ بِهٖ صَوْتًا

'রাসূল সা. আমাদেরকে কুসূফের নামায পড়িয়েছেন। আমরা তার কিরাআতের কোন শব্দ শুনিনি।

অপর দিকে কুসূফের নামাজ তা দিনের নামাজ আর দিনের নামাজের ব্যাপারে হুজুর সা. এরশাদ করেন- صَلٰوةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ দিনের নামাজ বোবা। অর্থাৎ দিনের নামাজে কিরাত নিঃশব্দে হবে। সুতরাং উপরোক্ত

আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, কুসূফের নামাজের কিরাত নিঃশব্দে হবে।

قوله : ثُمَّ يَدْعُوْ حَتّٰى تَنْجَلِيَ الخ : সালাতুল কুসূফ আদায়ের পর ইমাম সাহেব লোকদেরকে নিয়ে দোয়া করবেন সূর্য গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. এরশাদ করেন :

إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ هٰذِهِ الْأَفْزَاعِ شَيْئًا فَارْغَبُوْا إِلَى اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ

'যখন তোমরা এ ধরনের কোন ভয়াবহ অবস্থা দেখতে পাবে তখন তোমরা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর অভিমুখী হবে। হিদায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, দোয়ার মধ্যে সুন্নাত হলো নামাজের পরে হওয়া। বিধায় কুসূফের নামাজের পর দোয়া করা সুন্নাত।

قوله : وَ اِلَّا صَلُّوْا فُرَادٰى الخ : সূর্য গ্রহণের নামাজ ঐ ব্যক্তি পড়াবেন যিনি জুমার ইমাম, নতুবা ঈদাইনের নামাজের ইমামতি করেন। আর যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন তবে একাকী সূর্য গ্রহণের নামাজ আদায় করবে। আর একা পড়ার হুকুম এজন্য যে, তাতে ইমামতি নিয়ে ফিৎনায় না পড়তে হয়। সুতরাং ইমাম না থাকা অবস্থায় উত্তম হলো একা একা সূর্য গ্রহণের নামাজ পড়া।

بَابُ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

পরিচ্ছেদ : ইসতিসকার নামাযের বিবরণ

لَهُ صَلَاةٌ لَا بِجَمَاعَةٍ وَدُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ لَا قَلْبُ رِدَاءٍ وَحُضُورُ ذِمِّيٍّ وَإِنَّمَا يَخْرُجُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ -

অনুবাদ : ইসতিসকার নামাজ রয়েছে। তবে জামাআতে নয়। তা দোয়া এবং ইসতিগফার। যিম্মির উপস্থিতি ও চাঁদর উল্টানো নেই। এবং তিন দিন পর্যন্ত নামাজের জন্য বের হওয়া যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : صَلٰوةُ الْاِسْتِسْقَاءِ الخ : ইসতিসকা কি? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে ইসতিসকা দোয়া ও ইস্তিগফারের নাম এবং ইসতিসকার মধ্যে জামাতের সাথে কোন নামাজ সুন্নাত নয়। দলীল হলো আল্লাহর বাণী— فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا 'তখন আমি বলিলাম তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।' উক্ত আয়াত থেকে দলীল এভাবে যে আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করাকে ইস্তিগফারের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, নামাজের সাথে করেন নি। সুতরাং বুঝা গেল ইসতিসকার মধ্যে আমল হলো দোয়া ও ইস্তিগফার। অপরদিকে রাসূল সা. ইসতিসকা করেছেন। কিন্তু তার থেকে নামাজ আদায় করার বর্ণনা নেই।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন রহ. এর মাযহাব হলো, ইমাম লোকদেরকে নিয়ে দু রাকাত নামাজ পড়বেন। ইহা ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রহ. এরও মাযহাব। দলীল হলো হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর

হাদীস—

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتّٰى اَتَى الْمُصَلّٰى فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهٖ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ وَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدَيْنِ -

'হুজুর সা. জীর্ণ কাপড় পড়ে, বিনয়ের সাথে এবং বিনম্রতার সাথে ঈদগাহে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তবে তিনি খুতবা পড়েননি। দোয়া আর কান্নাকাটিতে লিপ্ত ছিলেন। তিনি দুরাকাত নামাজ পড়লেন। যেমন দু ঈদে পড়া হয়।'

দ্বিতীয় দলীল : হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম রাযি. এর হাদীসেও দু রাকাত নামাজ পড়ার কথা উল্লেখ আছে।

আমাদের পক্ষ থেকে তার জবাব হলো, হুজুর সা. ইসতিসকার নামায কখনও পড়েছেন আর কখনও ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং তা দ্বারা পড়াটা জায়েয প্রমাণিত হলো। কিন্তু সুন্নাত প্রমাণিত হলো না। উল্লেখ্য যে, আমরা ইসতিসকার নামাজ জায়েয হওয়াটা অস্বীকার করি না। বরং কথা হলো ইসতিসকার নামাজ সুন্নাত হওয়া না হওয়া নিয়ে। সুতরাং যেহেতু ইসতিসকার ব্যাপারে রাসূল সা. এর সর্বদা আমল পাওয়া যায়নি বিধায় তা সুন্নাত প্রমাণিত হলো না।

قوله : لَا قَلْبُ رِدَاءٍ الخ : ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে চাঁদর না উল্টানো ইহা ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এরও মাযহাব। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক রহ. এর মতে চাঁদর উল্টানো হবে। কেননা, রাসূল সা. থেকে চাঁদর উল্টানোর বর্ণনা রয়েছে। তার পদ্ধতি হলো যদি চাঁদর চতুষ্কোন বিশিষ্ট হয় তবে উপরের অংশ নিচের দিকে এবং নিচের অংশ উপরের দিকে করবে। আর যদি চাঁদর গোলাকার হয় তবে ডান অংশ বাম দিকে হবে আর বাম অংশ ডান দিকে করবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলীল হলো, ইহা তো একটা দোয়া সুতরাং অন্যান্য দোয়ার সাথে তার বিবেচনা হবে। তাই যেহেতু অন্যান্য দোয়ার মধ্যে চাঁদর উল্টানোর কথা নেই, বিধায় আলোচ্য দোয়ার ক্ষেত্রেও চাঁদর উল্টানো হবে না।

قوله : وَحَضُوْرِ ذِمِّيٍّ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. বলেন, ইসতিসকায় যিম্মি অংশ নেবে না। কারণ, মুসলমানের বের হওয়া আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার জন্য আর কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا الضَّلٰلَ 'কাফেরদের দোয়া হলো ক্ষতি-অনিষ্ট।

অধিকন্তু ইমাম মালিক রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ. বলেন, যিম্মীদেরকে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে না। যদি তারা বিনা নির্দেশে একান্ত বের হয়ে যায়। তবে তাদেরকে নিষেধও করা হবে না।

بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

পরিচ্ছেদ : ভীতিকালীন নামাজের বিবরণ

إِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ وَقَفَ الْإِمَامُ طَائِفَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً لَوْ مُسَافِرًا وَرَكْعَتَيْنِ لَوْ مُقِيمًا وَمَضَتْ هٰذِهٖ إِلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ وَصَلَّى بِهِمْ مَا بَقِيَ وَسَلَّمَ وَذَهَبُوا إِلَيْهِمْ وَجَاءَتِ الْأُوْلٰى وَأَتِمُّوا بِلَا قِرَأَةٍ وَسَلَّمُوا وَمَضَوْا ثُمَّ الْأُخْرٰى أَتِمُّوا بِقِرَاءَةٍ وَصَلَّى فِي الْمَغْرِبِ بِالْأُوْلٰى رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَمَنْ قَاتَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوْا رُكْبَانًا فُرَادٰى بِالْإِيْمَاءِ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرُوْا وَلَمْ تَجُزْ بِلَا حُضُوْرِ عَدُوٍّ -

অনুবাদ : যখন শত্রু বা হিংস্র প্রাণীর থেকে ভয় তীব্র হয় তবে ইমাম সাহেব এক দলকে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড় করে দেবেন। এবং এক দলকে নিয়ে এক রাকাত অথবা মুকীম হলে দু রাকাত পড়বেন। অতঃপর তারা চলে যাবেন শত্রু পানে। আর ঐ দলটি (অর্থাৎ যে দল প্রথমে শত্রুর মোকাবেলায় ছিল) ফিরে আসবে এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে বাকী নামাজ আদায় করবেন এবং ইমাম সহেব সালাম ফিরিয়ে নিবেন আর মুসল্লিরা (সালাম না ফিরিয়ে শত্রুপানে) চলে যাবেন। অতঃপর প্রথম দল ফিরে আসবে এবং তারা কিরাআত পড়া ছাড়া তাদের নামাজ পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরাবে ও (শত্রুর সামনে) চলে যাবে।

অতঃপর দ্বিতীয় দলটি এসে তাদের নামাজ কিরাআতসহ পূর্ণ করবে। আর মাগরিবের ক্ষেত্রে প্রথম দলটি নিয়ে দু রাকাত পড়বে আর দ্বিতীয় দলটি নিয়ে এক রাকাত পড়বে। আর যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভয় তীব্র থেকে তীব্র হয় তবে আরোহী অবস্থায় একাকী ইশারার সাথে নামাজ পড়বে যে দিকে ফিরার সামর্থ হয়। আর যদি শত্রু উপস্থিত না থাকে তবে উল্লেখিত পন্থায় নামাজ পড়া জায়েয নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : إِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. এর উক্তি اذا اشتد الخوف দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝানো যায় যে, তীব্র ভয় হলে শুধু صلوة الخوف প্রবর্তীত। অথচ আম মাশাইখদের মতে তীব্র ভয় হওয়া শর্ত নয়, বরং শত্রু নিকটবর্তী হওয়াই যথেষ্ট। আর কেহ বলেন, আলোচ্য ইবারাতে خوف দ্বারা প্রকৃত ভয় উদ্দেশ্য নয় বরং, শত্রুর হাজিরী বা উপস্থিতি উদ্দেশ্য।

قوله : وَقَفَ الْإِمَامُ الخ : ভয়কালীন সময়ে নামাজের পদ্ধতি হলো, ইমাম সাহেব লোকদেরকে দুভাগে ভাগ করবেন। একভাগ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবে। আর ইমাম সাহেব এক দলকে নিয়ে জামাআত শুরু করবেন। এবং তারা যদি মুকীম হন তবে তাদেরকে নিয়ে চার রাকাআতি নামাজ দু রাকাত আর মুসাফির হলে এক রাকাত আর মাগরীবের নামাজে হলে দু রাকাত পড়বে। অতঃপর তারা শত্রু সম্মুখে চলে যাবে। আর অপর

দলটি এসে ইমামের সাথে শামিল হয়ে এক রাকআত বা দু রাকাত আদায় করবে। অতঃপর ইমাম সালাম ফিরিয়ে তার নামাজ শেষ করবেন। কিন্তু এ দ্বিতীয় দলটি সালাম না ফিরিয়ে শত্রু সম্মুখে চলে যাবে। অতঃপর প্রথম দলটি এসে ক্বিরাআত ছাড়া তাদের নামাজ পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে নেবে। এবং শত্রু সম্মুখে চলে যাবে। সবশেষে দ্বিতীয় দলটি এসে তাদের বাকী নামাজ কিরাআতসহ পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে।

ভয়কালীন সময়ের নামাজের এ পদ্ধতির আসল হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর হাদীস—

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَامُوْا صَفًّا خَلْفَهٗ وَ صَفًّا مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَقَامُوْا فِىْ مَقَامِهِمْ وَاسْتَقْبَلَ هٰؤُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلّٰى بِهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هٰؤُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَ سَلَّمُوْا ثُمَّ ذَهَبُوْا فَقَامُوْا مَقَامَ اُولٰئِكَ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ وَرَجَعَ اُولٰئِكَ اِلٰى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا -

'হযরত ইবনে মাসঊদ রাযি. কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল সা. ভয়কালীন নামাজ পড়িয়েছেন। একদল তার পিছনে দাঁড়িয়েছেন। দ্বিতীয় দল শত্রুর সামনে দাঁড়িয়েছেন। হুজুর সা. তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত নামাজ পড়ালেন। অতঃপর দ্বিতীয় দল এসেএদের স্থানে দাঁড়াল আর (প্রথম দলটি) শত্রুর সামনে চলে গেলেন। হুযূর সা. তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত নামায পড়লেন এবং তিনি সালাম ফিরালেন। অতঃপর প্রথম দলটি এসে একা একা এক রাকাত পড়ে সালাম ফিরালেন এবং শত্রুর সম্মুখে দাঁড়ালেন। আর তারা (দ্বিতীয় দলটি) এদের স্থানে দাঁড়িয়ে একা একা এক রাকাত পড়ে সালাম ফিরালেন।

ইনায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, ভয়কালীন সময়ে নামাযের এ পদ্ধতি তখন প্রযোজ্য হবে যখন ইমাম মাত্র একজন থাকবেন। পক্ষান্তরে যদি যোগ্য ইমাম আরও থাকেন তবে দু দলে পৃথক পৃথকভাবে দুজন ইমামের মাধ্যমে পূর্ণ নামায পড়ে নেয়া উত্তম।

قوله : وَمَنْ قَاتَلَ بَطَلَتْ صَلٰوتُهٗ الخ : আমাদের মাযহাব মতে নামায অবস্থায় যুদ্ধ করা যাবে না। সুতরাং কেহ যদি নামাযান্তে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায় তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মালিক রহ. এর মতে নামাজান্তে যুদ্ধ বিগ্রহ করাতে নামায ফাসিদ হয় না। ইহা ইমাম শাফেয়ী রহ.এর প্রথম মত। ইমাম মালিক রহ. দলিল পেশ করেন আল্লাহর বাণী- وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَ اَسْلِحَتَهُمْ। উক্ত আয়াত থেকে দলিল এভাবে যে, নামাযের ভেতর অস্ত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নামাযের ভেতর অস্ত্র রাখা হয় যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য। সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, নামাজের ভেতর যুদ্ধ-বিগ্রহ করা জায়েয আছে। **আমাদের দলিল হল** : খন্দকের যুদ্ধে হুজুর সা. এর চার রাকাত নামায ছুটে গিয়েছিল, যা পরবর্তীতে আদায় করেছেন।সুতরাং বুঝা গেল যে, নামাজের ভেতর যুদ্ধ-বিগ্রহ জায়েয নেই। ইমাম মালিক রহ. এর দলিলের জবাব হল : নামাযের মধ্যে অস্ত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এজন্য যে কাফেররা যাতে তাদেরকে অস্ত্রহীন মনে না করে এবং আকস্মীকভাবে হামলা না করে বসে। অথবা লড়াইয়ের প্রয়োজন মনে হলে যাতে তাড়াতাড়ি যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে এবং পরবর্তীতে উক্ত নামাজ দোহরাইবে।

قوله : وَ اِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوْا رُكْبَانًا الخ : যদি ভয় এমন হয় যে, শত্রু মুসলমানদেরকে সওয়ারী থেকে অবতরণের অবকাশ দিচ্ছে না তবে এমতাবস্থায় মুসলমানরা সওয়ারীতে বসে ইশারায় নামায আদায়,করবে। আর কিবলা মুখী হওয়ার বেলায় হুকুম এই যে, যদি কিবলামুখী হওয়া সম্ভব না হয় তবে যেদিকে সম্ভব সে দিকে অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায় করবে। দলিল হল আল্লাহর বাণী- فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا সুতরাং প্রয়োজনের কারণে কিবলামুখী হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে যাবে।

بَابُ الْجَنَائِزِ

পরিচ্ছেদ : জানাযার নামাযের বিবরণ

وُلِّيَ الْمُحْتَضَرُ الْقِبْلَةَ عَلٰى يَمِينِهِ وَلُقِّنَ الشَّهَادَةَ فَإِنْ مَاتَ شُدَّ لَحْيَاهُ وَغُمِّضَ عَيْنَاهُ وَوُضِعَ عَلٰى سَرِيرٍ مُجَمَّرٍ وِتْرًا وَسُتِرَ عَوْرَتُهُ وَجُرِّدَ وَوُضِّئَ بِلَا مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ وَصُبَّ عليه مَاءٌ مُغْلِيٌّ بِسِدْرٍ أَوْ حُرُضٍ وَإِلَّا فَالْقَرَاحُ وَغُسِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ وَأُضْجِعَ على يَسَارِهِ فَيُغْسَلُ حَتّٰى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى مَا يَلِيَ التَّخْتَ مِنْهُ ثُمَّ عَلٰى يَمِينِهِ كَذٰلِكَ ثُمَّ أُجْلِسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَمُسِحَ بَطْنُهُ رَقِيقًا وَمَا خَرَجَ مِنْهُ غَسَلَهُ وَلَمْ يُعِدْ غُسْلَهُ وَنُشِّفَ بِثَوْبٍ وَجُعِلَ الْحَنُوطُ على رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُورُ عَلٰى مَسَاجِدِهِ وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُهُ وَلِحْيَتُهُ وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهُ وَشَعْرُهُ -

অনুবাদ : মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিকে ডান পার্শ্বের উপর কিবলামুখী করাবে এবং শাহাদাতের তালকীন করা হবে। যদি সে মৃত্যুবরণ করে তবে তার চোয়াল বেধে দিবে এবং চোখদ্বয় বন্ধ করে দিবে। তাকে বিজোড় সংখ্যা ধুনাকৃত একটি খাটে শোয়াবে। সতর ঢেকে বস্ত্রহীন করবে। কুলি ও নাকে পানি দেয়া ছাড়া ওজু করানো হবে এবং তার উপর উশনান বা বড়ই পাতা সিদ্ধ নতুবা স্বচ্ছ পানি ঢালবে। এবং তার দাড়ী ও মাথা খিতমী (এক প্রকার তৃণ) দ্বারা ধৌত করবে। অতঃপর তাকে বাম পার্শ্বে শয়ন করানো হবে এবং গোসল দেয়া হবে পানি তার নীচে পৌঁছা পর্যন্ত। তারপর অনুরূপ ডান পার্শ্বে শয়ন করানো হবে। অতঃপর নিজের দিকে হেলান দিয়ে বসানো হবে এবং তার পেট হালকাভাবে মুছবে। তার পেট থেকে যা বের হবে ধুয়ে ফেলবে। কিন্তু গোসলের পুণরাবৃত্তি করা হবে না। অতঃপর একটি কাপড় দ্বারা মুছা হবে এবং তার দাড়ীতে ও মাথাতে সুগন্ধি রাখা হবে। আর তার সিজদার অঙ্গসমূহে কাফুর রাখা হবে। তার দাড়ি ও চুল আচড়াবে না এবং তার চুল ও নখ কাটা হবে না।

শব্দার্থ : جَنَائِزُ ইহা جَنَازَةٌ এর বহু বচন। جَنَازَةٌ এর جيم বর্ণে যবরের সাথে মৃত ব্যক্তির জন্য ব্যবহার হয় আর جيـ বর্ণে যেরের সাথে ঐ খাটিয়ার জন্য ব্যবহার হয় যার উপর মৃত ব্যক্তিকে রাখা হয়। اَلْمُحْتَضَرُ (م) مُحْتَضَرَةٌ মুমূর্ষ, মরণোন্মুখ। لُقِّنَ - ماضى مجهول - تفعيل থেকে, تَلْقِيْنًا -বুঝিয়ে দেয়া, জ্ঞান দান করা। غُمِّضَ - تفعيل থেকে تَغْمِيْضًا -বন্ধ করা, অস্পষ্ট করা। مُجَمَّرٌ - আগুনে সেঁকা, ধুনাকৃত। صُبَّ ঢালা হবে। مُغْلِيٌّ - সিদ্ধ। سِدْرٌ - কুলগাছ। حُرُضٌ - উশনান। اَلْقَرَاحُ - স্বচ্ছ। أُضْجِعَ - فعل مجهول - افعال থেকে إِضْجَاعٌ - শয়ন করানো, শুইয়ে দেয়া। اَلْحَنُوْطُ - সুগন্ধি। اَلْكَافُوْرُ - কর্পূর, শ্বেতবর্ণ গন্ধদ্রব্য বিশেষ। يُسَرَّحُ - تفعيل থেকে تَسْرِيْحٌ - খোপা বাধা, আচড়ানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الْجَنَائِزِ الخ : মৃত্যু যেহেতু জীবনের শেষ সময়ে আসে এজন্য জানাযার নামাযকে সর্বশেষে উল্লেখ করেছেন। আর صلوة فى الكعبة কে আর শেষে উল্লেখ করা হয়েছে তার অবস্থাগত দিক থেকে বরকত হাসিল করার জন্য। মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার নামায পড়ার কারণ : দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যে, যদি কাহাকে অনেক ব্যক্তি কোন বিচারকের সামনে উপস্থিত করে আর সবাই খোব বিনয়ের সাথে কান্নাকাটির ভেতর দিয়ে তার পক্ষে সুপারিশ করে তবে বিচারক তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য। তদ্রূপ জানাযার নামাযের প্রবর্তন একারণে যে মুমীনদের বিশাল একদল মুর্দার মাগফিরাতের জন্য মহান প্রভুর দরবারে জমায়েত হয়। সুতরাং মুমীনদের এ জামায়েত মুর্দার উপর রহমত নাযিলের ব্যাপারে বিরাট প্রভাত রাখে। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন—

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهٖ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَايُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ -

'কোন মুসলমান মারা যাওয়ার পর যদি তার জানাযায় এমন চল্লিশ জন ব্যক্তি উপস্থিত হয় যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি, তবে ঐ মুর্দার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ আল্লাহ্ কবুল করেন।

জানাযার নামাজের হুকুম : ফরজ দুই প্রকার- (১) ফরজে আইন, (২) ফরজে কিফায়া। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাতি ফরজে আইন। আর জানাযার নামাজ পড়া, রোগীর সেবা করা ইত্যাদি ফরজে কিফায়া। সুতরাং জানাযার নামায ফরজে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। তাই কিছু সংখ্যক মানুষ আদায় করে নিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

قوله : وَلِىَ الْمُحْتَضَرُ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. এখানে মুমূর্ষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে محتضر শব্দ ব্যবহার করেছেন। তা হয়তো একারণে যে মউত তার নিকটে হাজির। কিংবা মউতের ফিরিস্তা হাজির। সুতরাং মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিকে ডান পার্শ্বে শয়ন করত: কিবলামুখী করাবে। কেননা, ইহাই মুর্দাকে কবরে রাখার সুন্নত তরীকা। দ্বিতীয়তঃ এমন ব্যক্তিকে শাহাদাতের তালকীন করবে। অর্থাৎ তার পার্শ্বে বসে উচ্চ আওয়াজে বলবে- اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ তবে তাকে উক্ত কালেমা পড়ার নির্দেশ দেয়া যাবে না। কারণ এমুহূর্তে মানুষ অত্যন্ত কষ্টে থাকে। তাই নির্দেশ করা দ্বারা (আল্লাহ না চাহে) যদি একান্ত অস্বীকার করে বসে তবে কুফুরের উপর মৃত্যু হবে। তালকীন দেয়ার সপক্ষে দলিল হল, রাসূলুল্লাহ্ সা. এর বাণী- لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উক্ত হাদীসে موتا দ্বারা মুমূর্ষ ব্যক্তি উদ্দেশ্য। কেননা, মৃত ব্যক্তিকে তালকীন দেয়াতে তার কোন কাজে আসে না। সুতরাং স্পষ্ট হল যে موتا দ্বারা মুমূর্ষ ব্যক্তিই উদ্দেশ্য।

قوله : وَ سَتْرُ عَوْرَتِهٖ الخ : মানুষ যেভাবে জীবিত অবস্থায় সম্মানিত ও মর্যাদাশীল তেমনি মৃত্যুর পরও সম্মানিত ও মর্যাদাশীল। তাই মৃত্যুর পর যেহেতু গোসল দেয়া ফরজে কিফায়া, তাই তাকে গোসল দেয়া ও পরিস্কার করণার্থে শরীরের কাপড় খুলে ফেলা হবে, তবে সতর খোলা যাবে না। কিন্তু হিদায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, শুধু সামনের ও পেছনের লজ্জাস্থান ঢাকাই যতেষ্ঠ। আর নাওয়াদীর এর বর্ণনা মতে নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত ঢাকা হবে। মোটকথা, মাইয়্যেতকে গোসল দেয়ার ক্ষেত্রে তার শরীরের কাপড় খুলা হবে, তবে সতর ঢাকা থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরণের ঢিলা কাপড়সহ গোসল দেয়া সুন্নাত। তিনি দলিল দেন যে, হুজুর সা. কে ওফাতের পর পরণের কাপড়সহ গোসল দেয়া হয়েছিল। এর জবাবে আমরা বলি, হুজুর সা. এর সকল জিনিস তার উম্মতের জন্য সুন্নাত তবে শর্ত হল এতে কোন দলিলে মাখছুছ (دليل مخصوص) না থাকা। সুতরাং হুজুর সা. কে তার পরণের কাপড়সহ গোসল দেয়ার ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে دليل مخصوص বিদ্যমান রয়েছে। যেমন হযরত আয়েশা রাযি. এর বর্ণিত হাদীসটির শেষে

রয়েছে— فَقَدْ خُصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخِلَافِ ذَالِكَ بِالنَّصِّ لِعِظَمِ حُرْمَتِهِ আর নসের কারণে রাসূলুল্লাহ্ সা. কে উক্ত হুকুম থেকে খাস করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহর রাসূল সা. এর মান-মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। উক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, সাধারণ মুর্দাদের ক্ষেত্রে কাপড় খুলে গোসল দেয়া সুন্নাত।

قوله : وَ وَضِئَ بِلَا مَضْمَضَةِ الخ : গ্রন্থকার রহ. বলেন, গোসলের পূর্বে ওজু করাবে, তবে কুলি ও নাকে পানি দেয়া ছাড়া। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, জীবদ্দশার হালাতের উপর কিয়াস করে মাইয়্যেতকেও কুলি করানো হবে এবং নাকে পানি দেয়া হবে। আমাদের দলিল হল : মৃত ব্যক্তির নাকে মুখে পানি প্রবেশ করিয়ে তা বের করা কষ্টসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ হুজুর সা. ইরশাদ করেন—

اَلْمَيِّتُ يُوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ وَلَايُمَضْمَضُ وَلَا يُسْتَنْشَقُ

মাইয়্যেতকে নামাযের অজুর অনুরূপ অজু করানো হবে, তবে কুলি করানো হবে না এবং নাকেও পানি দেওয়া যাবে না।

قوله : وَمَسَحَ بَطْنَهُ رَفِيْقًا الخ : ডানে বামে কাত করে গোসল দেওয়ার পর নিজের শরীরের সাথে হেলান দিয়ে বসাইয়া তার পেটে হালকাভাবে মুছা হবে। আর মুছা এজন্য যে তার থেকে কোন নাপাকী পরবর্তীতে বের হয়ে কাফন যেন নাপাক না হয়। আর ইহার মূল হযরত আনাস রাযি. এর হাদীস—

اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا غَسَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَسَحَ بَطْنَهُ بِيَدِهٖ رَفِيْقًا عَلَيْهِ طَالِبًا مِنْهُ مَا يُطْلَبُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَقَالَ طِبْتَ حَيًّا وَ مَيِّتًا -

'হযরত আলী রাযি. যখন রাসূলুল্লাহ্ সা. কে গোসল দিয়েছিলেন তখন তার হাত দ্বারা নম্রভাবে হুজুর সা. এর পেট মুছে ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ঐ জিনিস চাওয়া যা মৃত ব্যক্তিদের থেকে চাওয়া হয়। অর্থাৎ, আলী রাযি. এর উদ্দেশ্য এই ছিল হতে পারে পেট থেকে কোন জিনিস বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কোন জিনিস বের হয়নি। অতঃপর আলী রাযি. বললেন, আপনি তো জীবদ্দশায়ও পাক ছিলেন এবং মৃত্যুর পরও পাক আছেন।' সুতরাং পেট মুছার পর যদি কোন কিছু বের হয় তবে পুনরায় গোসল দেয়ার প্রয়োজন নেই, বরং শুধু উক্ত নাজাসাতটুকু ধৌত করলেই চলবে।

قوله : وَ جُعِلَ الْحَنُوْطَ الخ : মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়ার পর তার মাথা ও দাড়িতে সুগন্ধি (হানুত) লাগানো হবে এবং যে সকল অঙ্গ সিজদার সময় জমিতে লাগে তাতে সুগন্ধি ব্যবহার করবে। মোটকথা, মুর্দার শরীরে সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত। দলিল-হযরত উম্মে আতিয়া রাযি. এর হাদীসে আল্লহর রাসূল সা. ইরশাদ করেন—

وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ

সবশেষে মাইয়্যেতের শরীরে কাফুর লাগাবে বা কাফুর থেকে কিছু লাগাবে।

قوله : وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُهُ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. বলেন, তার চুল দাড়ি আঁচড়ানো যাবে না এবং চুল বা নখ কাটা যাবে না। কেননা, হযরত আয়েশা রাযি. মৃতকে চুল আচড়ানো দেখে বললেন عَلَامَ تَنْصُوْنَ مَيِّتَكُمْ তোমরা কেন তোমাদের মৃতদের মাথার চুল পরিপাটি করছ? সুতরাং তিনি মৃত ব্যক্তির চুল আচড়ানোর প্রতি অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয়ত এসব কিছু করা হয় সৌন্দর্যের জন্য। আর মৃত ব্যক্তির এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই।

وَكَفَنُهُ سُنَّةً إِزَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ وَكِفَايَةً إِزَارٌ وَلِفَافَةٌ وَضَرُورَةً ما يُوجَدُ وَلُفَّ من يَسَارِهِ ثُمَّ مِنْ يَمِينِهِ وَعُقِدَ إِنْ خِيفَ انْتِشَارُهُ وَكَفَنُهَا سُنَّةً دِرْعٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَطُ بها ثَدْيَاهَا وَكِفَايَةً إِزَارٌ وَ لِفَافَةٌ وَخِمَارٌ وَتُلْبَسُ الدِّرْعَ أَوَّلًا ثُمَّ يُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَ الدِّرْعِ ثُمَّ الْخِمَارُ فَوْقَهُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ وَتُجَمَّرُ الْأَكْفَانُ أَوَّلًا وِتْرًا -

---

অনুবাদ : পুরুষের সুন্নাত কাফন হল (তিনটি)- ইজার, কামিজ, চাদর। আর যথেষ্ট হবে ইজার ও চাদর আর জরুরী হবে যা পাওয়া যাবে তাতে। (কাফন) পেচানো হবে তার বাম দিক থেকে। অতঃপর ডান দিক থেকে এবং খুলে যাওয়ার ভয় হলে তা বেধে দিবে। আর মহিলার সুন্নাত কাফন হল (পাঁচটি) কোর্তা, ইজার, ওড়না, চাদর ও সিনাবন্দ যা দ্বারা তার সিনা বেঁধে রাখা হবে। আর যথেষ্ট হবে ইজার, চাঁদর এবং ওড়নায়। (কাফন পরানোর পদ্ধতি হল) প্রথমে কোর্তা পরানো হবে এবং তার চুল দুভাগ করে তার বুকে কোর্তার উপর রাখতে হবে। তারপর তার উপর উড়না পরানো হবে চাঁদরের নীচে (ইজার দেওয়া হবে চাঁদরের নীচে)। কাফনের কাপড়ে (মাইয়্যেতকে রাখার) প্রথমে বেজোড় সংখ্যায় ধুনী দেয়া হবে।

শব্দার্থ : لُفَّ ভাঁজ করা, জড়ানো। اِنْتِشَارٌ - انفعال থেকে, অর্থ ছড়িয়ে পড়া, ছড়িয়ে যাওয়া। ثَدْيًا (ج) أَثْدَاءُ - স্তন, কুচ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

মুসলমান মাইয়্যেতকে কাফন পড়ানো ফরজে কিফায়া। অতএব, মৃত ব্যক্তির সম্পদ থাকা অবস্থায় তার সম্পদ থেকে তাকে কাফন দেওয়া ওয়াজিব। আর না থাকা অবস্থায় তার পারিবারিক দায়িত্ব রয়েছে। যার উপর উক্ত ব্যক্তির উপর মৃত ব্যক্তির কাফনের যিম্মাদারী রয়েছে।

قوله : وَ كَفَنُهُ سُنَّةً الخ : কাফন তিন প্রকার : ১। কাফনে মাসনুন, ২। কাফনে কিফায়া, ৩। কাপনে জরুরত। পুরুষের ক্ষেত্রে মাসনুন কাফন তিনটি : ১। ইজার, ২। কামিজ, ৩। লিফাফা। দলিল হল :

رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُفِّنَ فِيْ ثَلَثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ

বর্ণিত আছে রাসূল সা. কে সাহুলিয়ার তৈরী তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। জাবির ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, রাসূল সা. কে তিনটি কাপড় দ্বারা কাফন পরানো হয়েছিল। ১। ইজার, ২। কামিজ, ৩। চাদর। দ্বিতীয়ত মানুষ সাধারণত জীবদ্দশায় তিনটি কাপড় পরে থাকে। তাই তাকে মৃত্যুর পরও তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া কর্তব্য। ২। পুরুষের কাফনে কিফায়া হল দুটি : ১। ইজার, ২। চাদর। কেননা, হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত :

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِثَوْبَيْهِ الَّذِيْنَ كَانَ يَمْرِضُ فِيْهِمَا اِغْسِلُوْاهُمَا وَكَفِّنُوْنِيْ فِيْهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها اَلَا نَشْتَرِيْ لَكَ جَدِيْدًا قَالَ لَا اَلْحَيُّ اَحْوَجُ اِلَى الْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ -

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আব্বাজান তার ঐ দুটি কাপড়ের ব্যাপারে বললেন, যেগুলো পরিহিত অবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়েছেন, ঐ কাপড়গুলো ধুয়ে নিবে এবং আমাকে এই কাপড় দ্বারাই কাফন দিবে। আয়েশা রাযি. বলেন, আমরা আপনার জন্য নতুন কাফন ক্রয় করব না? তিনি বললেন, না। জীবিত মানুষ মৃত মানুষের তুলনায় নতুন কাপড়ের অধিক উপযোগী।

দ্বিতীয় দলিল হল : ইবনে আব্বাস রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি উটনী থেকে পড়ে মারা গেলেন। তার ব্যাপারে রাসূল সা. বলেন, كَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ তাকে দুটি কাপড়ে কাফন দাও।

উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল যে, কাফন হিসাবে দুটি কাপড়ই যথেষ্ট। তবে হা তিনটি হলো সুন্নাত।

৩। কাফনে জরুরত তথা যা পাওয়া যাবে অর্থাৎ কাফনে মাসনুন না পাওয়াতে কাফনে কিফায়া আর তা না পাওয়া অবস্থায় কাফনে জরুরত তথা যা পাওয়া যায় তা দিয়েই কাফন পরাতে হবে। কেননা, হযরত মুসআব রাযি.কে এক চাদরেই কাফন পরানো হয়েছিল।

قوله : وَكَفَنُهَا سُنَّةً الخ : পুরুষের ন্যায় মহিলারও কাফন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১। কাফনে সুন্নাত। ২। কাফনে কিফায়া। ৩। কাফনে জরুরত। মহিলার কাফনে সুন্নাত হলো পাঁচটি : ১। কোর্তা, ২। ইজার, ৩। ওড়না, ৪। চাদর ৫। সিনাবন্দ, যা দ্বারা তার সিনা বেধে রাখা হয়। প্রমাণ হল হযরত উম্মে আতিয়্যা রাযি. এর হাদীস :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى اللَّوَاتِي غَسَلْنَ اِبْنَتَهُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ

রাসূলুল্লাহ্ সা. তার কন্যা (হযরত যয়নব রাযি.) কে গোসল দানকারিনী স্ত্রীলোকদেরকে পাঁচটি কাপড় দিয়েছিলেন।

যুক্তিনির্ভর প্রমাণ হল : মহিলারা সাধারণত পাঁচটি কাপড় পরে থাকে। তাই তাদেরকে মৃত্যুর পরও পাঁচটি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়।

২। মহিলার কাফনে কিফায়া হল তিনটি : ১। ইজার ২। চাদর ৩। উড়না। উক্ত তিন কাপড়ের কমে প্রয়োজন ছাড়া কাফন দেওয়া মাকরূহ। তবে প্রয়োজনের বেলায় জায়েয। অর্থাৎ মহিলাদের ৩নং কাফন হল কাফনে জরুরত। আর তা হল যা পাওয়া যায় তাই। সুতরাং যদি মাত্র একটি কাপড়ও পাওয় যায় তবে তাই দিয়ে কাফন দেওয়া হবে।

قوله : وَ تُجَمَّرُ الْأَكْفَانُ الخ : কাফনের কাপড়ে মাইয়্যেতকে শোয়ানোর পূর্বে তাতে اجمار তথা ধুনি দিয়ে সুগন্ধিময় করার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা বেজোড় হওয়া সুন্নাত। কেননা, হুজুর সা. ইরশাদ করেন : إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ আল্লাহ বেজোড়, তাই তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন।

فصل

অনুচ্ছেদ

اَلسُّلْطَانُ أَحَقُّ بِصَلَاتِهِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَشَرْطُهَا إِسْلَامُ الْمَيِّتِ وَطَهَارَتُهُ ثُمَّ الْقَاضِي إِنْ حَضَرَ ثُمَّ إِمَامُ الْحَيِّ ثُمَّ الْوَلِيُّ وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ فَإِنْ صَلَّى غَيْرُ الْوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ أَعَادَ الْوَلِيُّ ولم يُصَلِّ غَيْرُهُ بَعْدَهُ فَإِنْ دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ مَا لَمْ يَتَفَسَّخْ -

অনুবাদ : মাইয়্যেতের নামাজের বেশি হকদার সুলতান। আর তা (জানাযার নামায) ফরজে কিফায়া এবং তার জন্য শর্ত হল মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া ও মাইয়্যেত পবিত্র হওয়া (গোসলের মাধ্যমে)। অতঃপর (হকদার) কাজী, যদি উপস্থিত থাকেন তারপর (হকদার) এলাকার ইমাম, অতঃপর (হকদার) ওলী এবং সে অন্যকেও নামায পড়ানোর জন্য অনুমতি দিতে পারবে। যদি সুলতান বা ওলী ছাড়া অন্য কেহ নামায পড়ায় তবে ওলী পুণরায় পড়তে পারবে। ওলীর পর আর কেহ পড়তে পারবে না। আর যদি দাফন করা হয় নামায ব্যতীত তবে (লাশ) গলিত হওয়া পর্যন্ত তার কবরের উপর নামায পড়তে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : জানাযার নামাযের ইমামতের অধিক হকদার রাষ্ট্রপ্রধান। কেননা, বাদশার উপস্থিতিতে অন্য কাউকে ইমাম বানানোর দ্বারা তার অবমাননা হয়। যেহেতু বাদশার ব্যাপারে এসেছে—

اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ مَنْ اَكْرَمَ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَهَانَهُ اَهَانَهُ اللّٰهُ

বাদশা জমিনে আল্লাহর ছায়া স্বরূপ। যে ব্যক্তি তার ইজ্জত করবে আল্লাহ তার ইজ্জত করবেন। আর যে ব্যক্তি তার অবমাননা করবে আল্লাহও তার অবমাননা করবেন। এখন যদি বাদশা উপস্থিত না থাকেন তবে কাজী বা বিচারক যোগ্য বলে গণ্য হবেন। কেননা, তার কর্তৃত্ব সকলের উপর আছে। যদি বিচারক উপস্থিত না থাকেন তবে মহল্লার ইমাম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবেন। কেননা, মাইয়্যেত জীবিত অবস্থায় তার ইমামতিতে সন্তুষ্ট ছিল। অতঃপর মাইয়্যেতের অভিভাবক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। আর অভিভাবকের ধারা বাহিকতা তাহা হবে যাহা বিবাহের অধ্যায়ে বর্ণিত হবে, ইনশাআল্লাহ। যেমন মহিলার ছেলে ও পিতা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে। আর মাইয়্যেতের নামাজ পড়ানোর ক্ষেত্রে পিতা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, অভিভাবক সর্বাবস্থায় মাইয়্যেতের নামাজের অধিক হকদার। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— وَ أُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ - তরফাইন রহ. এর দলীল হল, হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি. এর ওফাতের পর হযরত হুসাইন রাযি. ইমামতের জন্য সাঈদ ইবনুল আস রাযি. কে সামনে বাড়ালেন, (যিনি মদীনার গভর্ণর ছিলেন)। তিনি সামনে যেতে সম্মত না হলে হযরত হুসাইন রাযি. বললেন, সামনে যান। ইহাই সুন্নাত। যদি ইহা সুন্নাত না হত তবে আমি আপনাকে সামনে অগ্রসর হতে দিতাম না। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর দলীলের জবাব হল উক্ত আয়াতটি মিরাস ও বিবাহের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

قوله : فَإِنْ صَلَّى غَيْرُ الْوَلِيِّ الخ : যদি বাদশা, কাজী, ওলী ছাড়া অন্য কেহ জানাযার নামাজ পড়িয়ে দেন তবে ওলীর অধিকার আছে যে, তিনি পুণরায় জানাযার নামাজ পড়তে পারবেন। আর যদি বাদশা বা ওলীর উপর অগ্রাধিকার রাখে এমন কেহ জানাযার নামাজ পড়িয়ে নেন, তবে ওলী পুণরায় মাইয়্যেতের উপর জানাযার নামায পড়তে পারবেন না। কেননা, ওলীর একবার জানাযার নামায আদায় করার দ্বারা ফরজে কিফায়া আদায় হয়ে গেছে। তাই পুণরায় নফল হিসাবে জানাযার নামায আদায় করা শরীয়তে নেই। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, জানাযার নামাজ বারবার পড়া যায়। তিনি দলীল দেন, একবার হুজুর সা. একটি নতুন কবর অতিক্রম করছিলেন। তিনি কবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে বলা হল উহা অমুক স্ত্রীলোকের কবর। হুজুর সা. বললেন, আমাকে জানাযার নামাযের জন্য অবহিত করা হল না কেন? উত্তর দেয়া হল যে আল্লাহর রাসূল সা. এই স্ত্রীলোকটিকে রাতে দাফন করা হয়েছে। আমাদের ভয় হচ্ছিল পোকা, মাকড় আপনাকে কষ্ট দেয় কি না। তাই আমরা আপনাকে খবর দেই নাই। ইহা শুনে রাসূল সা. দাঁড়ালেন এবং কবরের উপর নামাজ পড়লেন।

আমাদের দলিল হল : নামাজ পড়ানোর হকদারদের থেকে যিনি প্রথমবার জানাযার নামাজ পড়াইয়াছেন তা দ্বারা ফরজ আদায় হয়ে গেছে। পুণরায় নফল হিসাবে পড়ার কোন অবকাশ নাই। কারণ, জানাযার নামাজ নফল হিসাবে শরীয়তে নেই। তাই তো মহানবী সা. আজও কবরে জীবিত থাকা অবস্থায়ও কেহ তার জানাযার নামাজ পড়ে না। যদি নফল হিসাবে শরীয়ত সমর্থন করত তবে সকলে মিলে তা পরিহার করতো না। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিলের জবাব হল, নবী কারীম সা. ঐ স্ত্রীলোকটির কবরের উপর নামাজ পড়েছেন এটা তার হক। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ। সুতরাং রাসূল সা. এর হক্বকে বাদ দেয়ার অধিকার কারোরই নেই।

قوله : إِنْ دُفِنَ بِلَا صَلٰوةٍ الخ : যদি কোন মুসলমান মাইয়্যেতকে জানাযার নামায পড়া ছাড়া দাফন করা হয় তবে তার কবরের উপর নামায পড়া হবে। কেননা, রাসূল সা. এক আনসারীয়া স্ত্রীলোকের কবরের উপর নামায পড়েছেন, যাকে জানাযার নামাজ পড়া ছাড়া কবরস্থ করা হয়েছিল। আর কবরের উপর জানাযার নামাজ এতক্ষণ পর্যন্ত পড়া যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুভব হবে যে লাশটি ফেটে যায়নি ও পচে যায়নি। মাইয়্যেত ফুলে গেলে বা লাশটি ফেটে গেলে তার উপর জানাযা জায়েয নেই। ইহাই বিশুদ্ধ মত। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, লাশ দাফনের তিনদিন পর্যন্ত কবরের উপর জানাযার নামায পড়া জায়েয, এরপর জায়েয নেই।

وَهِيَ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ بِثَنَاءٍ بَعْدَ الْأُوْلَى وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَدُعَاءٍ بَعْدَ الثَّالِثَةِ وَتَسْلِيمَتَيْنِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ فَلَوْ كَبَّرَ خَمْسًا لَمْ يُتْبَعْ وَلَا يُسْتَغْفَرُ لِصَبِيٍّ وَلَا لِمَجْنُونٍ وَيَقُولُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا وَيَنْتَظِرُ الْمَسْبُوقُ لِيُكَبِّرَ مَعَهُ لَا مَنْ كَانَ حَاضِرًا فِي حَالَةِ التَّحْرِيمَةِ وَيَقُومُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِحِذَاءِ الصَّدْرِ وَلَمْ يُصَلُّوا رُكْبَانًا وَلَا فِي مَسْجِدٍ -

---

অনুবাদ : নামাযে জানাযার চার তাকবীর। প্রথম তাকবীরের পর ছানা (পড়া হবে), দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ শরীফ (পড়া হবে) তৃতীয় তাকবীরের পর দোয়া (পাঠ করা হবে) এবং চতুর্থ তাকবীরের পর দু দিকে সালাম ফিরাবে (ডানে, বামে)। যদি ইমাম পঞ্চম তাকবীর বলে ফেলেন তবে তার অনুসরণ করা হবে না। আর

পাগল ও বাচ্চার জন্য ইস্তিগফার করবে না; বরং বলবে- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا 'অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী করুন এবং আমাদের জন্য তাকে পুণ্য লাভের মাধ্যম এবং পরকালের সঞ্চয় বানিয়ে দিন। এবং তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকৃত বানিয়ে দিন।' মাসবুক ব্যক্তি অপেক্ষা করবে যাতে ইমামের সাথে তাকবীর বলে। (অর্থাৎ ইমাম এক, দুই তাকবীর বলার পর আগত মাসবুক ব্যক্তি ইমামের আরেক তাকবীর বলার পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর বলবে না)। তবে যে ব্যক্তি ইমামের তাকবীরে তাহরীমাতে ছিল সে ইমামের পরবর্তী তাকবীরের অপেক্ষা করতে হবে না এবং ইমাম (নামাযে জানাযায়) বুক বরাবর দাঁড়াবে। আর মাসজিদে বা আরোহী অবস্থায় (জানাযার নামায) পড়বে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَهِىَ اَرْبَعُ تَكْبِيْرَاتٍ الخ : মান্যবর গ্রন্থকার রহ. বলেন, চার তাকবীরের সমষ্টি হলো জানাযার নামায। অর্থাৎ, নিয়তের পর তাকবীরে তাহরীমা বলবে এবং উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে। অতঃপর আলহামদুলিল্লাহ্ বা আল্লাহর প্রশংসা জাতীয় কোন শব্দ পড়বে। কেহ কেহ বলে— سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ الخ পড়া হবে। যেমনটি অন্যান্য নামাযে পড়া হয়। আমাদের মাযহাব মতে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফতিহা পড়া হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, সূরায়ে ফাতিহা পড়া হবে। তিনি জানাযার নামাযকে অন্যান্য নামাযের উপর কিয়াস করেন। তাই যেমনিভাবে অন্যান্য নামাযে কেরাত পড়া আবশ্যক তেমনি জানাযার নামাযেও কিরাত পড়া আবশ্যক। আমাদের দলিল হল হযরত নাফে রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস— اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ لَايَقْرَأُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি. জানাযার নামাযে কিরাত পড়তেন না। যুক্তিনির্ভর দলিল হল, জানাযার নামায নিরেট একটি মাত্র রুকুন আর তা হল কিয়াম। আর এক রুকুনের মধ্যে কিরাত স্বীকৃত নয়। যেমন তেলাওয়াতে সেজদা একটি মাত্র রুকন তাই তাতেও কিরাত নেই। সুতরাং আমাদের মাযহাব অনুযায়ী জানাযার নামাযে কিরাত নেই। বরং প্রথম তাকবীর বলার পর হামদ বা ছানা পড়বে এবং দ্বিতীয় তাকবীর বলার পর দুরূদ শরীফ পড়বে যা নামাযে তাশাহুদের পরে পড়া হয়। অতঃপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে নিজের জন্য মাইয়্যেতের জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করবে। উক্ত দোয়ার পর চতুর্থ তাকবীর বলে উভয় দিকে সালাম ফিরালেই জানাযার নামায পূর্ণ হয়ে গেল।

قوله : فَلَوْ كَبَّرَ خَمْسًا الخ : ইমাম যদি চতুর্থ তাকবীরের পর পঞ্চম তাকবীর বলে ফেলে তবে মুক্তাদিরা কি করবে এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। আমাদের মাযহাব অনুযায়ী মুক্তাদীরা ইমামের অনুসরণ করবে না। ইমাম যুফার রহ. বলেন, মুক্তাদিরা ইমামের অনুসরণ করবে। তিনি দলিল দেন জানাযার নামাযে চার এর অধিক তাকবীরের মাসআলাটি বিরোধপূর্ণ। যেমন হযরত আলী রাযি. এক জানাযার নামাযে পঞ্চম তাকবীর বলেছেন আর মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করেছিলেন।

আমাদের দলিল হল : দারে কুতনী ও হাকিমে রয়েছে—

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ اَرْبَعًا فِىْ اٰخِرِ صَلٰوةٍ صَلَّاهَا

'রাসূলুল্লাহ্ সা. শেষ যে জানাযা পড়েছেন তাতে চার তাকবীর বলেছেন।'

সুতরাং যেহেতু হুজুর সা. এর সর্বশেষ আমল হল চার তাকবীর, তাই তার পূর্বে যদি এর বিপরীত কোন বর্ণনা থাকে তবে তা রহিত হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম যুফার রহ. এর দলিলের জবাব হল : সাহাবায়ে কেরামগণ এ ব্যাপারে পরামর্শ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সা. এর সর্বশেষ আমলের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সুতরাং হযরত আলী রাযি. এর পঞ্চম তাকবীর বলা রহিত হয়ে গেছে। আর যা রহিত হয়ে যায় তার অনুসরণ করা যায় না। অতএব ইমাম যদি পঞ্চম তাকবীর বলে ফেলেন তবে তার অনুসরণ করা হবে না। এবার প্রশ্ন হল মুক্তাদিরা

কি করবে? এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে দুটি অভিমত রয়েছে। ১। মুক্তাদিরা তাৎক্ষণিক সালাম ফিরাবে; যাতে পঞ্চম তাকবীরের বিরোধিতা প্রকাশ পায়। ২। মুক্তাদিরা তাকবীর না বলে চুপ থাকবে। এবং ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে। যাতে সালামের মধ্যে ইমামের অনুসরণ পাওয়া যায়। হানাফী মাযহাবের অন্যতম কিতাব হিদায়া। উক্ত হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দ্বিতীয় মতটিই গ্রহণীয়।

قوله : وَيَنْتَظِرُ الْمَسْبُوْقُ الخ : ইমামের এক বা দু তাকবীর বলার পর কেহ জানাযার নামাযে শামিল হলে তাৎক্ষণিক ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো না বলে ইমামের তাকবীর বলার অপেক্ষা করবে। সুতরাং ইমাম তাকবীর বললে সেও তাকবীর বলবে। এবং ইমাম সালাম ফিরানোর পর সে তার ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো আদায় করবে। ইহা তরফাইন রহ. এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে হাজির হওয়ার সাথে সাথেই ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো বলবে।

তরফাইনের দলিল : এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মাসবুকের ন্যায়, তবে জানাযার নামাযের প্রতিটি তাকবীর একেক রাকআতের ন্যায়। তাই তো বলা হয়- اَرْبَعٌ كَاَرْبَعِ الظُّهْرِ। সুতরাং মাসবুক ব্যক্তি যেভাবে ছুটে যাওয়া রাকাতগুলো ইমামের সালামের পর পড়ে থাকে, তেমনি জানাযার ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো ইমামের সালামের পর আদায় করা হবে। কেননা, সালামের পূর্বে কাজা করার হুকুম রহিত হয়ে গেছে। আর যদি কেহ ইমামের সাথে প্রথম থেকে উপস্থিত থাকে আর ইমাম তাকবীর বলছেন কিন্তু সে বলেনি এমতাবস্থায় সে ইমামের অন্য তাকবীর বলার অপেক্ষা করবে না, বরং সে তার ছোটে যাওয়া তাকবীর আদায় করে নেবে। কেননা, এই ব্যক্তি মুদরিকের ন্যায়।

قوله : لِيَقُوْمَ لِلرَّجُلِ الخ : জানাযা পুরুষের হোক বা স্ত্রীলোকের হোক নামাযের সময় ইমাম মাইয়্যেতের বুক বরাবর দাঁড়াবে। কেননা, বুক হল কলবের স্থান। আর কলবের মধ্যে ঈমানের নূর বিদ্যমান থাকে। ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে ইহাও বর্ণিত আছে যে, জানাযা যদি পুরুষের হয় তবে ইমাম তার মাথা বরাবর দাঁড়াবে। আর যদি জানাযা স্ত্রীলোকের হয়, তবে ইমাম তার মাঝামাঝি দাঁড়াবে।

قوله : وَلَمْ يُصَلُّوْا رُكْبَانًا : আরোহণ অবস্থায় জানাযার নামায পড়া কিয়াসের চাহিদা অনুযায়ী জায়েয। কেননা, জানাযার নামায মূলত দোয়া। কেননা, তাতে রুকু নেই, সিজদা নেই আর ইসতিহসানের চাহিদা অনুযায়ী আরোহণাবস্থায় জানাযার নামায জায়েয নয়। কেননা, তাতে তাহরিমা আছে। আর নামাযের শর্তসমূহ অনেকটাই তাতে পাওয়া যায়। সুতরাং সতর্কতার কারণে ওজর ছাড়া আরোহণ অবস্থায় তা আদায় করা জায়েয নেই। তেমনি আমাদের মাযহাব অনুযায়ী লাশ মসজিদের ভেতরে আর মুসল্লিরা ইমামসহ মসজিদের বাহিরে হয় তবে তা মাকরূহ হবে। আর যদি শুধু মাইয়্যেত বাহিরে কিন্তু ইমাম ও মুসল্লিরা মসজিদের ভেতরে হয়, তবে কেহ কেহ বলেন মাকরূহ। আর কেহ বলেন, মাকরূহ নয়।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. সর্বসুরতে জায়েয বলেন। আমাদের দলিল হল হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস—

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا اَجْرَ لَهٗ -

রাসূল সা. বলেন যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে মসজিদের ভেতরে তবে তার কোন সওয়াব নেই।

দ্বিতীয়তঃ যদি মাইয়্যেত মসজিদের ভেতর রাখা হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে মসজিদ নাপাক হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। সুতরাং উল্লেখিত অবস্থায় জানাযার নামায পড়া মাকরূহ। আর যদি মাইয়্যেত, ইমাম ও কিছুলোক মসজিদের বাইরে এবং কিছু মুসল্লি মসজিদের ভেতরে থাকে তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা জায়েয।

وَمَنِ اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَا كَصَبِيٍّ سُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُهُمَا أَوْ هُوَ أَوْ لَمْ يُسْبَ أَحَدُهُمَا مَعَهُ وَيَغْسِلُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ الْكَافِرَ وَيُكَفِّنُهُ وَيَدْفِنُهُ وَيُؤْخَذُ سَرِيرُهُ بِقَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ وَيُعَجَّلُ بِهِ بِلَا خَبَبٍ وَجُلُوسٍ قَبْلَ وَضْعِهَا وَمَشْيٍ قُدَّامَهَا وَضَعْ مُقَدَّمَهَا عَلَى يَمِينِكَ ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا ثُمَّ مُقَدَّمَهَا عَلَى يَسَارِكَ ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا -

অনুবাদ : (ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর) যে শিশু ক্রন্দন করে (মারা যায় তবে) তার নামায পড়া হবে। নতুবা নয় (অর্থাৎ ভূমিষ্ট হওয়ার পর না কাদলে তথা মৃত জন্ম নিলে তার উপর নামায পড়া হবে না।) যেমন, কোন শিশু যাকে তার (কাফের) পিতা-মাতার কোন একজনের সাথে বন্দি করা হয় (আর সে মৃত্যুবরণ করে তবে তার ক্ষেত্রেও জানাযার নামাজ পড়া হবে না) তবে যদি তাদের যে কোন একজন ইসলাম গ্রহণ করে অথবা সে নিজে ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা পিতা-মাতা থেকে কাহাকেও তার সাথে বন্দি করা হয় নি (আর এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে) তবে তার উপর জানাযার নামায পড়া হবে। মুসলমান অভিভাবক কাফেরের গোসল দিবে ও কাফন পরাবে এবং দাফন করবে। (খাটিয়াতে লাশ রাখার পর) খাটিয়ার চার পায়া ধরে তাড়াতাড়ি চলবে। রাখার পূর্বে বসা, দৌড় এবং তার আগে চলা ব্যতীত। খাটিয়া রাখার ক্ষেত্রে প্রথমে সামনের ডান দিকে তোমার ডানে তারপর পিছনের ডানদিক (তোমার ডানে) অতঃপর সামনের বামদিক তোমার বামে, পরে পিছনের বামদিক (তোমার বামে রাখবে।

শব্দার্থ : اِسْتَهَلَّ - আরম্ভ করা, ক্রন্দন করা। سُبِيَ বন্ধি করা হয়েছে। قَوَائِمُ الْاَرْبَعِ - চার খুটি। خَبَبٌ - দৌড়ে চলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : مَنِ اسْتَهَلَّ الخ : যদি কোন সন্তান জন্মের পর মরে যায় তবে যদি তার থেকে এমন নিদর্শন পাওয়া যায় যা দ্বারা প্রতিভাত হয় যে সে জীবিত। যেমন, কাদল বা নবজাতকের কোন অঙ্গ নড়াচড়া করল অতঃপর ইন্তিকাল হল তবে নিয়মতান্ত্রিক তার নাম রাখা হবে। গোসল দেওয়া হবে, কাফন পরানো হবে এবং জানাযার নামাযও পড়া হবে। দলিল হল রাসূল সা. এর ইরশাদ :

اِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ صُلِّىَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ

যদি ভূমিষ্ট হওয়া শিশু কাঁদে, তবে তার নামাজ পড়া হবে। আর যদি কাদে না তবে নামায পড়া হবে না। আর যদি জীবিত থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে তাকে কাপড়ে জড়িয়ে কোন গর্তে রাখা হবে মানব জাতির সম্মানার্থে। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, তার নাম রাখা হবে এবং তার গোসল দেওয়া হবে।

قوله : كَصَبِيٍّ سُبِيَ الخ : পূর্বের মাসআলার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে একটি শাখা মাসআলা বর্ণনা করতেছেন। আর তা হল যদি কোন শিশুকে বন্দী করা হয় তবে তা দুভাবে হতে পারে। পিতা-মাতার সাথে নতুবা শুধু তাকে। যদি পিতা-মাতার সাথে বন্দি করা হয় অতঃপর উক্ত শিশুটি মৃত্যুবরণ করে তবে তার পিতা-মাতার ধর্ম অনুযায়ী তার শেষ কাজ করা হবে। অর্থাৎ যদি পিতা-মাতা মুসলমান হয়ে যায় বা তাদের একজন মুসলমান হয়ে যায় তবে তাকে ও মুসলিম হিসাবে গণ্য করতে হবে। আর যদি তার পিতা-মাতা বিধর্ম থেকে যায় তবে তাকে বিধর্মী

হিসাবে গণ্য করতে হবে। কেননা, রাসূল সা. ইরশাদ করেন— اَلْوَلَدُ يَتْبَعُ خَيْرَ الْاَبَوَيْنِ دِيْنًا শিশুধর্ম হিসাবে পিতা-মাতার উত্তম জনের অনুগামী হবে। আর যদি শিশুটি বুঝদার হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেয় তবেও সে মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে। তাই তাকেও ইসলামী কায়দায় দাফন করা হবে। আর যদি পিতা-মাতা ছাড়া শুধু শিশুকে বন্দি করা হয় আর মৃত্যুবরণ করে তবে যেহেতু সে দারুল ইসলাম এর মুসলমানদের অনুগামী হিসাবে তাকেও মুসলমান হিসাবে ধরে নিতে হবে।

قوله : وَيَغْسِلُ وَلِيُّ مُسْلِمٍ الْكَافِرَ الخ : কাফের ব্যক্তি মৃতবরণ করে এবং তার কাফের অভিভাবক বিদ্যমান থাকে তবে সে তার শেষ কাজ করবে। আর যদি মুসলিম ছাড়া তার আর কোন অভিভাবক না থাকে তবে উক্ত মুসলমানই তাকে ধৌত করে কোন কাপড়ে পেচিয়ে কোন গর্তে ফেলে আসবে। আর হা এ কাজ করতে গিয়ে সুন্নতের অনুসরণ করা হবে না। দলিল হলো : হযরত আলী রাযি. আবু তালিবের ইন্তিকালের সংবাদ যখন হুজুর সা.কে দিলেন, তখন তিনি বললেন—

اِغْسِلْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ وَارِهِ وَلَا تُحْدِثْ بِهِ حَدِيْثًا حَتّٰى تَلْقَانِيْ

তাকে গোসল দাও, কাফন পরাও এবং জমিনে লোকিয়ে রাখ। অতঃপর কোন কথা না বলে আমার নিকট চলে আসবে।

গ্রন্থকারের উক্তি ولى দ্বারা নিকটতম আত্মীয় উদ্দেশ্য। কারণ, তাদের মুসলমানের মাঝে প্রকৃত অভিভাবকত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— لَاتَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ 'তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহন কর না।'

قوله : وَيُؤْخَذُ سَرِيْرُهُ الخ : মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফনের পর তাকে চার পায়ায় রাখা হবে এবং চারজন ব্যক্তি খাটিয়ার চার কোণে ধরে নিয়ে যাবে। সুন্নাত তরীকা ইহাই। কেননা, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত- مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تُحْمَلَ الْجَنَازَةُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْاَرْبَعَةِ সুন্নত হল জানাযাকে তার চারদিক থেকে বহন করা অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেছেন—

مَنْ حَمَلَ الْجَنَازَةَ مِنْ جَوَانِبِهَا الْاَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ مَغْفِرَةٌ مُوْجِبَةٌ

যে ব্যক্তি চতুর্দিক থেকে জানাযা বহন করল তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। দ্বিতীয়ত জানাযার সাথে যদি কেহ না যায় তবে এ চারজন অবশ্যই জানাযার জামাত করতে পারবে।

قوله : يُعَجَّلُ بِهِ الخ : জানাযা নিয়ে দ্রুত গতিতে চলবে, তবে দৌড়ে নয়। কারণ, যখন রাসূলুল্লাহ্ সা. কে জানাযার সাথে চলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন- مَادُوْنَ الْخَبَبِ দৌড়ের চেয়ে কম গতিতে। অর্থাৎ, তিনি চলার মধ্যে দ্রুতভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে দৌড়াতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর আমাদের মাযহাব অনুযায়ী জানাযার পিছনে পিছনে চলা মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে জানাযার আগে আগে চলা মুস্তাহাব। আমাদের দলীল হল : হুজুর সা. সা'আদ ইবনে মুয়াজের জানাযার পিছনে পিছনে চলছেন। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন—

فَضْلُ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ عَلَى الْمَشْيِ اَمَامَهَا كَفَضْلِ الْمَكْتُوْبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ

জানাযার আগে আগে চলার চেয়ে জানাযার পিছনে পিছনে চলার ফজিলত এমন, যেমন ফরজের ফজিলত নফলের উপর। আর জানাযা মাটিতে রাখার পূর্বে আগত মুসল্লিরা বসে যাওয়া মাকরূহ।

وَيُحفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ وَيُدْخَلُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَيَقُولُ وَاضِعُهُ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَيُوَجَّهُ اِلَى الْقِبْلَةِ وَتُحَلُّ الْعُقْدَةُ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَيْهِ وَالْقَصَبُ لَا الْآجُرُّ وَالْخَشَبُ وَيُسَجَّى قَبْرُهَا لَا قَبْرُهُ وَيُهَالُ التُّرَابُ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُرَبَّعُ وَلَا يُجَصَّصُ وَلَا يُخْرَجُ مِنَ الْقَبْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً -

অনুবাদ : কবরকে লাহাদ রূপে খনন করবে। মাইয়্যেতকে কিবলার দিক থেকে দাখিল করা হবে। অবতরণকারী বলবে- بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ 'আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ্ সা. এর মিল্লাতের উপর রাখা হল। আর তাকে কিবলামুখী করবে এবং কাফনের গিরা খুলে দিবে। আর 'লাহাদ' এর মুখে কাঁচা ইট বা বাঁশ সমান করে বসিয়ে দিবে। তবে পাকা ইট বা কাঠ দ্বারা নয়। (কেননা, তাতে মাকরূহ)। স্ত্রীলোকের কবর কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে। তবে পুরুষের কবর ঢাকবে না। আর মাটি দেয়া হবে এবং কবরকে কুহান (তথা উটের পিঠের উঁচু হাড়ের অনুরূপ বানানো হবে) এবং চতুর্কোণ বানাবে না। প্লাষ্টার করা হবে না এবং কবর থেকে বের করা হবে না, তবে যদি জমিটি অপহৃত হয়। (তবে বের করে অন্যত্র কবরস্থ করা যাবে)।

শব্দার্থ : يَحْفِرُ (ض) حَفْرًا খনন করা, গর্ত করা। يُلْحَدُ (ف) لَحْدًا কবর খনন করা, দাফন করা। اَلْقَصَبُ - বাঁশ। آجر -ইট, টালি। خَشَبٌ - কাঠ। يُسَجّٰى - কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা। يُهَالُ - মাটি ঢালা হবে। يُسَنَّمُ -উটের পিঠের উঁচু হাড়ের অনুরূপ বানানো। يُجَصَّصُ - প্লাষ্টার করা। مَغْصُوبَةٌ - অপহৃত, লুণ্ঠিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ الخ : কবর দু ধরণের : ১। লাহদ, আর তা হল কবরের ভেতরে কিবলার দিকে কিছুটা গভীর করে দেয়া। ইহাকে বগলী বলে। ২। খাড়া কবর, আর তা হল চওড়া কবর খনন করে ভেতরটা লম্বালম্বী করে খনন করা।

এবার লাহাদ কবর সুন্নাত না কি খাড়া কবর সুন্নাত এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের মাযহাব মতে লাহাদ কবর সুন্নাত। তবে হা যদি ভূমি নরম হয় তবে যেহেতু লাহাদ কবর ভেঙ্গে যাবার ভয় হয় তাই খাড়া কবর খনন করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে খাড়া কবর সুন্নাত। **আমাদের দলিল হল :** রাসূলুল্লাহ্ সা. এর বাণী- اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا - লাহাদ হল আমাদের জন্য আর খাড়া কবর হল অন্য জাতীর জন্য।

قوله : وَيَدْخُلُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ الخ : আমাদের মতে সুন্নাত হল মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিক থেকে কবরে প্রবিষ্ট করা। অর্থাৎ কফিন কবরের কিবলার দিকে রাখা হবে সেখান থেকে লাশ উঠিয়ে লাহাদ কবরে রাখা হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে সুন্নাত হল মাইয়্যেতকে তার কবর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া। তার পদ্ধতিটি হল কফিন কবরের পায়ের কাছে রাখা হবে এবং লাশের মাথা ধরে ধীরে ধীরে শেষ তথা কবরে মাথা রাখার স্থান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে এবং খাড়া কবরে রাখা হবে। তার দলিল হল- রাসূলুল্লাহ্ সা.কে এভাবেই কবরে অবতরণ করা হয়েছিল। আমাদের দলিল হল- চতুর্দিক থেকে কিবলার দিক হল সম্মানিত ও মর্যাদাশীল। তাই এদিক থেকে প্রবেশ করানো যুক্তিযুক্ত হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিলের জবাব হল, রাসূলুল্লাহ্ সা. কে কবরে প্রবেশ করানোর পদ্ধতির ব্যাপারে বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী। সুতরাং তা দলিল হতে পারে না।

قوله : يَقُولُ وَاضِعُهُ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. বলেন, মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সময় بِسْمِ اللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ পড়া হবে। দলিল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা. যুলবাজাইন রাযি.কে কবরে রাখার সময় উক্ত দোয়া পড়েছিলেন। দ্বিতীয় দলিল হলো হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

সুতরাং উক্ত দোয়া পড়তে পড়তে মাইয়্যেতকে কবরে ডান পার্শে শুয়াইয়ে কিবলার দিকে করে দিবে কেননা, রাসূল সা. এই রূপ করার নির্দেশ করেছেন।

عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا عَلِيُّ اِسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ اِسْتِقْبَالًا -

হযরত আলী রাযি. বলেন, বনু আবদুল মুত্তালিবে এক ব্যক্তি ইন্তিকাল করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, হে আলী! তাকে কিবলা মুখী করে দাও।

قوله : وَيُسَوِّى اللَّبِنُ عَلَيْهِ الخ : কবরের উপর কাচা ইট বা বাশের ছাউনি দ্বারা সমান করে দেয়া হবে তবে পাকা ইট বা কাঠ দ্বারা সমান করা মাকরূহ। কেননা, কবর হল গলিত হওয়ার স্থান। তাই এ অস্থায়ী কাজে এত মজবুত ও শক্ত বস্তুর ব্যবহার অহেতুক বৈকি। অপর দিকে পাকা ইট যেহেতু আগুনের তৈরী বিধায় তাতে আগুনের প্রভাব রয়েছে।

قوله : وَيُهَالُ التُّرَابُ وَ يُسَنَّمُ الخ : কাচা ইট বাশ বসানোর পর মাটি ঢালা হবে এবং কবরকে কুঁজ সদৃশ করা হবে। অর্থাৎ জমিন থেকে এক বিঘত বা এর চেয়ে কিছু উঁচু করে বানানো হবে। এবং কবর চতুর্কোণ বানানো হবে না।

দলিল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা. কবরগুলোকে চতুর্কোণ বানাতে নিষেধ করেছেন। ইব্রাহীম নাখয়ী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি রাসূল সা. এর কবর ও শায়খাইন রাযি. এর কবর দেখেছেন তিনি আমাকে বলেছেন যে, তাদের কবরগুলো কোহান সদৃশ ছিল। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে কবর চতুষ্কোন করে সাজানো সুন্নাত

قوله : وَلَا يُخْرَجُ مِنَ الْقَبْرِ الخ : দাফনের পর মাইয়্যেতকে কবর থেকে বের করা নিষেধ। তবে হ্যাঁ যদি উক্ত জমিন অন্যের দখলে চলে যায় আর পরবর্তী মালিক তাতে উক্ত লাশ রাখা হউক তা পছন্দ করে না তবে কবর খুড়ে মাইয়্যেতকে বের করা হবে এবং অন্যত্র কবরস্থ করা হবে।

بَابُ الشَّهِيْدِ

পরিচ্ছেদ : শহীদের বিবরণ

هُوَ مَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ وَالْبَغْيِ وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَوْ وُجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَبِهِ أَثَرٌ أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ظُلْمًا وَلَمْ تَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ فَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِلَا غُسْلٍ وَيُدْفَنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ إِلَّا مَا لَيْسَ مِنَ الْكَفَنِ وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ وَيُغَسَّلُ إِنْ قُتِلَ جُنُبًا أَوْ صَبِيًّا أَوِ ارْتُثَّ بِأَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَوْ تَدَاوِي أَوْ مَضَى عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ أَوْ نُقِلَ مِنَ الْمَعْرَكَةِ حَيًّا أَوْ أَوْصَى أَوْ قُتِلَ فِي الْمِصْرِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قُتِلَ بِحَدِيدَةٍ ظُلْمًا أَوْ قُتِلَ بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ لَا لِبَغْيٍ وَقَطْعِ طَرِيقٍ -

অনুবাদ : শহীদ তিনি যাকে হারবী লোক (কাফের) বিদ্রোহী বা ডাকাতরা হত্যা করে। কিংবা যুদ্ধের ময়দানে মৃত পাওয়া গেল, আর তার দেহে (আঘাতের) চিহ্নও রয়েছে। অথবা কোন মুসলমান তাকে হত্যা করেছে এবং দিয়াত ওয়াজিব হয়নি এমন ব্যক্তিকে কাফন দেওয়া হবে, তার উপর জানাযা পড়া হবে। কিন্তু গোসল দেয়া হবে না এবং তাকে তার রক্তে ও কাপড়ে দাফন করা হবে। তবে যা কাফন থেকে নয়, তা খোলা হবে। এবং কমানো যাবে ও বাড়ানো যাবে (কাফন পূর্ণ করার সুবিধার্থে)। আর গোসল দেওয়া হবে যদি জুনুবী অবস্থায়, না বালিগ অবস্থায়, অথবা জীবনের কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের পর মারা যায়। তা এভাবে (সুযোগ সুবিধা গ্রহণের অর্থ) যে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা, নিদ্রা যাওয়া, চিকিৎসা গ্রহণ করা, তার জ্ঞান থাকা অবস্থায় এক ওয়াক্ত নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়া, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জীবিত স্থানান্তরিত করা, অসিয়ত করা অথবা শহরে নিহত হয় আর জানা নেই যে, সে লৌহাস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যাকৃত হয়েছে। কিংবা হদ বা কিসাস হিসাবে নিহত হয়েছে। (উপরোল্লেখিত সকল অবস্থায় গোসল দেওয়া হবে।) কিন্তু বিদ্রোহীর বা ডাকাতির কারণে নিহত হলে তার গোসল দেওয়া হবে না। (এবং জানাযার নামাজও পড়া হবে না।)

শব্দার্থ : اَلْحَرْبُ (ج) حُرُوْبٌ যুদ্ধ, লড়াই। اَهْلُ الْحَرْبِ -অমুসলিম দেশের অধিবাসী (কাফের)। اَلْبَغْىُ - দুরাচারী, বিদ্রোহী। قُطَّاعُ الطَّرِيْقِ - ডাকাত। مَعْرَكَةٌ (ج) مَعَارِكُ - যুদ্ধ, লড়াই, যুদ্ধক্ষেত্র। دِيَةٌ (ج) دِيَاتٌ - দিয়াত, রক্তমূল্য, হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতি পূরণ। اِرْتُثَّ ইহা افتعال থেকে اِرْتِثَاثٌ - পুরাতন হওয়া ; ثَوْبٌ رَثٌّ পুরানো কাপড়কে বলা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ارتثاث বলা হয়। تَدَاوِى চিকিৎসা করা, প্রতিকার করা। قَوْدٌ কিসাস, প্রতিশোধ, শাস্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الشَّهِيْدِ : শহীদগণের আহকামাদী পৃথক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করার কারণ হলো, যেহেতু শহীদগণের মৃত্যু অন্যান্য মৃত্যুর তুলনায় ভিন্ন ও উত্তম। তাদের ফযিলত ও পুন্যের সমান আর কেহ নয়; স্বয়ং

আল্লাহ তাদের মর্যাদার দিক বিবেচনা করে তাদের মৃত বলতেও নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন—

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ -

সুতরাং শহীদগণের মর্যাদা ও আহকামাদীর ভিন্নতার দরুন তা ভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

শহীদকে শহীদ বলার কারণ : যেহেতু ফেরেশতা তাদের সম্মানার্থে মৃত্যুর সাক্ষ দেন এবং মৃত্যুর সময় জান্নাত তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। তাই شهيد শব্দটি مشهد এর অর্থে ব্যবহৃত হবে যেভাবে فعيل শব্দ مفعول এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি জান্নাতী হওয়ার অঙ্গিকার আছে তাই তাকে শহীদ বলে। তৃতীয়ত, শহীদ ব্যক্তি যেহেতু জীবিত এবং আল্লাহর নিকট উপস্থিত তাই তাকে শহীদ বলা হয়। শহীদ দুই প্রকার : ১। হাকীকী, ২। হুকমী। ১। হাকীকী তথা প্রকৃত শহীদ ঐ ব্যক্তি যে ইসলামের উন্নতির লক্ষ্যে জিহাদের ময়দানে আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের প্রাণ বিলিন করে দেয়। ২। হুকমী তথা হুকুমগত শহীদ তা আবার দুই প্রকার : ১। আখেরাতের আহকামের দিক থেকে শহীদ, যদি দুনিয়াবী আহকামের দিক থেকে তাকে গোসল ইত্যাদি দেওয়া হয়। ২। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দিক থেকে শহীদ। এমনকি তাকে গোসল দেয়া হবে না।

قوله : هُوَ مَنْ قَتَلَهُ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. প্রকৃত শহীদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন : ১। যাকে কোন কাফের হত্যা করেছে অথবা বিদ্রোহী হত্যা করে। ২। কিংবা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় এবং তার দেহে হত্যার চিহ্ন থাকে। ৩। কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করল। অতঃপর দিয়াত ওয়াজিব হল না। এদের হুকুম হলো যে, তাদেরকে কাফন দেওয়া হবে। কেননা, কাফন দেওয়া আদম সন্তানের জন্য সুন্নত। তবে শহীদগণের কাপড় খোলা হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন— زَمِّلُوهُم بِكُلُومِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ তাদেরকে তাদের রক্ত ও যখমসহ আবৃত কর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- بِثِيَابِهِمْ অর্থাৎ তাদের কাপড়সহ আর যদি শহীদের শরীরে কাফন জাতীয় নয় এমন বস্ত্র থাকে তবে তা খুলে ফেলা হবে। অর্থাৎ, মুজা, টুপি, অস্ত্র ইত্যাদি থাকলে তা খুলে ফেলা হবে। দলিল হল : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস—

قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ

রাসূলুল্লাহ্ সা. উহুদের শহীদানের ব্যাপারে হুকুম দিলেন যেন তাদের শরীর থেকে লৌহ ও চর্মের পোষাক খুলে ফেলা হয় এবং যেন তাদের রক্ত ও কাপড়সহ দাফন করা হয়। আর যেহেতু তারা শুহাদায়ে উহুদের শ্রেণীভুক্ত তাই তাদেরকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা, রাসূল সা. শুহাদায়ে উহুদের ব্যাপারে বলেছিলেন وَلَا تُغَسِّلُوهُم, তাদেরকে গোসল দিও না। সুতরাং উপর উল্লেখিত শহীদগণকে গোসল ছাড়া আবৃত করা হবে।

প্রকৃত শহীদের জানাযার নামাজ পড়ার বিধান : আমাদের মতে উক্ত শহীদগণের জানাজার নামাজ পড়া ফরজে কিফায়া। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, শহীদের জানাজার নামাজ নেই। তিনি বলেন, জানাযার নামাজ মূলত মাইয়্যেতের জন্য দোয়া ও সুপারিশ। আর তরবারীর আঘাত যেহেতু শহীদানের সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে ফেলে, তাই তাদের জন্যে আর দোয়ার ও সুপারিশের প্রয়োজন নেই। আমাদের দলিল হল : জানাযার নামাজ মূলত দু কারণে পড়া হয়। ১। দোয়া ও সুপারিশ, ২। মাইয়্যেতের সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নামায পড়া হয়। সুতরাং শহীদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য জানাযার নামাজ পড়া হবে। অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী রহ. একথা বলা যে যার কোন পাপ নেই তার জন্য দোয়া ও সুপারিশ নেই বলা ঠিক নয়। কারণ হুযূর, রাসূল সা. থেকে অধিক পবিত্র আর কে হতে পারে। অথচ তার জানাযার নামায পড়া হয়েছে। অপ্রাপ্ত শিশুরাও গোনাহ থেকে পবিত্র অথচ তাদের জানাযার নামায পড়া ফরযে কিফায়া। সুতরাং শহীদানের জানাযার নামায পড়া ফরযে কিফায়া।

قوله : وَيُغَسِّلُ إِنْ قُتِلَ جُنُبًا الخ : জুনুবী মুসলমান যদি শহীদ হয়, তবে আমাদের ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহ. এর মতে তাকে গোসল দেওয়া হবে। অনুরূপ হায়েয ও নেফাসগ্রস্থ মহিলা পাক হওয়ার পর গোসলের পূর্বে (মারা গেল) শহীদ হয়ে গেলে এমতাবস্থায় তাকেও গোসল দেওয়া হবে। ইহা ইমাম আহমদ রহ. এর অভিমত। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুকে হত্যা করা হয় তবে তাকেও গোসল দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন রহ. এর মতে উল্লেখিত অবস্থায় শহীদগণকে গোসল দেওয়া হবে না। ইহা ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অভিমত। তাদের দলিল হল যে, গোসল জানাবাতের কারণে ওয়াজিব হয়েছিল, তা মৃত্যুর দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় কারণ, গোসল যা মৃত্যুর কারণে ওয়াজিব তা শাহাদাতের কারণে রহিত হয়ে গেছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. শহীদগণের ব্যাপারে বলেন- زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَلَاتُغَسِّلُوهُمْ উক্ত হাদীসে জুনুবী হবে নাকি গায়রে জুনুবী হবে এ ব্যাপারে কোন ব্যখ্যা নেই। দ্বিতীয়ত শহীদকে গোসল দেয়ার অন্যতম কারণ হলো তার অত্যাচারীত হওয়ার নিদর্শন বাকি থাকা।.তাই তাকে গোসল দেওয়া হয়না তার সম্মানার্থে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হলো মাইয়্যেতকে গোসল না দেয়ার কারণ তো শাহাদাত বটে, কিন্তু যদি প্রথম থেকে গোসল ওয়াজিব হয়ে থাকে তবে তা রহিতকারী বলে গণ্য হবে না। শহীদের কাপড়ে যদি নাপাক লেগে থাকে তবে তা ধৌত করা জরুরী। কিন্তু তার শীরের রক্ত ধৌত করা জরুরী নয়। শাহাদত যেহেতু উক্ত নাপাকী রহিত করতে পারে না, তেমনি শাহাদত জানাবাতকেও রহিত করতে পারে না। বিধায় জানাবাতের গোসল দেয়া জরুরী। এর সমর্থন পাওয়া যায় হযরত হানযালা রাযি. এর ঘটনা থেকে। ঘটনাটি হল- যখন হযরত হানযালা রাযি. শহীদ হন তখন ফেরেশতারা তাকে গোসল দিয়েছেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ সা. তার ঘরের লোকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হানযালা কোন অবস্থায় ছিল। তখন হযরত হানযালার স্ত্রী জবাব দিলেন, তিনি রাতে আমার সাথে সহবাস করেছিলেন। যখন যুদ্ধের ঘোষণা তার কানে ভেষে আসল, তখন গোসল ছাড়াই তিনি যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, এটাই কারণ। (ফেরেশতাদের গোসল দেয়ার)। আর নাবালক শিশুদের গোসল দেওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, শুহাদায়ে উহুদের বেলায় আঘাতই গোসলের ব্যাপারে যথেষ্ট ছিল। কেননা, তরবারীর আঘাত গোনাহ থেকে পাক-পবিত্র করে দেয়। আর যেহেতু শিশুদের কোন গোনাহ নাই তাই তারা উহুদের শীদগণের শ্রেণীভূক্ত নয়। সুতরাং যেহেতু তারা শুহাদায়ে উহুদের শ্রেণীভূক্ত নয়, তাই তাদের ন্যায় গোসল বাদ দেয়া যাবে না বিধায় শিশুকে গোসল দেয়া হবে।

قوله : أَوْ إِرْتَثَّ الخ : ارتث ইহা ارتثاث থেকে, অর্থ : পুরানো হয়ে যাওয়া। আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া ব্যক্তি। আঘাতের পর মৃত্যুর পূর্বে জীবনের কিছু সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে তবে বলা হবে উক্ত শহীদ ব্যক্তি পুরানো হয়ে গেছে। জীবনের কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের দরুন আঘাতের চিহ্ন ও হালকা হয়ে গেছে। তাই সে উহুদের শহীদানের শ্রেণীভূক্ত হবে না। তাই তাকে গোসল দেয়া হবে। কেননা, গোসল ঐসব লোকদের দেওয়া হয়নি যারা উহুদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত।

সম্মানিত গ্রন্থকার সুযোগ সুবিধা গ্রহণকারীর বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, যে খাদ্য বা পানিও গ্রহণ করল, কিংবা ঘুমিয়ে গেল, কিংবা চিকিৎসা গ্রহণ করল। কিংবা এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত হল এবং তার জ্ঞানও বাকি ছিল, কিংবা জীবিতাবস্থায় যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে স্থানান্তর করা হয়, কিংবা সে অসিয়ত করে উক্ত সকল অবস্থায় সে সুযোগ সুবিধা গ্রহণকারীদের অন্তর্ভূক্ত। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি আখেরাত সংক্রান্ত কোন বিষয়ে অসিয়ত করে তবে সেও সুবিধা গ্রহণকারী হবে। কেননা, ইহাও সওয়াব

অর্জনের মাধ্যম। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে সেও সুবিধা গ্রহণকারী হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা এটা মাইয়্যেতের আহকাম ভুক্ত বিষয়। উল্লেখিত সূরতে মাইয়্যেতকে গোসল দেয়া হবে। কেননা, সে আঘাতের পর সুযোগ সুবিধা গ্রহনকারীর অন্তর্ভুক্ত। অথচ শুহাদায়ে উহুদের অবস্থা এমন ছিল যে, পানি তাদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা শাহাদাতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকায় তা গ্রহন করেন নি। তবে যদি কোন আঘাত প্রাপ্তকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে এজন্য তুলে আনা হয়, যাতে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট না হয়ে যায়। তবে ইহা সুযোগ গ্রহণকারী হিসাবে গণ্য হবে না।

قوله : أَوْ قُتِلَ فِي الْمِصْرِ الخ : যদি কাহাকে শহরে নিহত পাওয়া যায় আর হত্যাকারী জানা থাকে না, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা, যে মহল্লাতে পাওয়া গেছে সে মহল্লাবাসীর উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর এ দিয়াতের ফায়দা মাইয়্যেতও পেয়ে থাকে। এভাবে যে যদি তার 'ঋণ থাকে তবে তা থেকে আদায় করা হবে সুতরাং সে ফায়দা হাসিল করার দরুন তার আঘাত হালকা হয়ে যাবে। যার দরুন সে শুহাদায়ে শুহুদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারবে না বিধায় তাকে সাধারণ মাইয়্যেতের মতো গোসল দেওয়া হবে। আর যদি হত্যাকারী জানা থাকে, তবে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে এবং শহীদকে গোসল দেয়া হবে না। কেননা, সে শুহাদায়ে উহুদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, কিসাস শাস্তি বিনিময় নয়। সুতরাং তা জুলুমের বিনিময় হবে। তাই জুলুমের প্রতিক্রিয়াও হালকা হবে না।

قوله : أَوْ قُتِلَ بِحَدٍّ أَوْ قَوْدٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তি হদ কিংবা কিসাস হিসাবে নিহত হয়, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে ও জানাযার নামাজ পড়া হবে। কেননা, তার উপর অত্যাবশ্যকীয় হক্বকে আদায় করার জন্য আপন জান দিয়েছে কিন্তু উহুদের শুহাদা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের জান উৎসর্গ করে দিয়েছেন, তাই হদ কিংবা কিসাস হিসাবে নিহত ব্যক্তিকে শহীদানের সাথে যুক্ত করা যাবে না। কেননা হযরত মায়িযে আসলামী রাযি.কে প্রস্তারাঘাতে নিহত করার পর রাসূল সা. মায়িযে আসলামীর চাচাকে নির্দেশ দিয়েছেন— إِذْهَبْ وَ غَسِّلْهُ وَ صَلِّ عَلَيْهِ যাও, তাকে গোসল দাও, এবং তার উপর জানাযার নামায পড়।

قوله : لَا بَغْيٍ وَ قَطْعِ طَرِيْقٍ : যদি কোন বিদ্রোহী অথবা ডাকাত নিহত হয়, তবে আমাদের মাযহাব মতে তার জানাযার নামাজ পড়া হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে জানাযার নামাজ পড়া হবে। আমাদের দলিল হলো, হযরত আলী রাযি. খারেজীদেরকে গোসল দেননি ও জানাযার নামাজ পড়েননি। কেননা, খারেজীরা বিদ্রোহী ছিল। হযরত আলী রাযি. কে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে أَهُمْ كُفَّارٌ তারা কি কাফের! প্রতি উত্তরে হযরত আলী (রাযি.) বললেন, لَا وَلٰكِنَّهُمْ إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا না, তারা আমাদের ভাই, তবে তারা আমাদের সাথে বিদ্রোহ করেছে। সুতরাং বুঝা গেল, বিদ্রোহীরা ও ডাকাতেরা নিহত হলে তাদের জন্য গোসল নেই, জানাযা নেই।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْكَعْبَةِ

পরিচ্ছেদ : ক্বাবার অভ্যন্তরে নামায পড়ার বিবরণ

صَحَّ فَرْضٌ وَنَفْلٌ فِيهَا وَفَوْقَهَا وَمَنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى ظَهْرِ إِمَامِهِ فِيهَا صَحَّ وَإِلَى وَجْهِهِ لَا وَإِنْ تَحَلَّقُوا حَوْلَهَا صَحَّ لِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ إِمَامِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي جَانِبِهِ

অনুবাদ : ক্বাবার অভ্যন্তরে ও উপরে ফরয ও নফল নামায পড়া সহিহ (তথা জায়েয)। আর যে ক্বাবার অভ্যন্তরে নিজের পিঠ তার ইমামের পিঠের দিকে করে দাঁড়ায় তবে তা সহিহ। আর যদি ইমামের দিকে পিঠ করে তবে সহিহ হবে না। আর যদি ক্বাবার চারপাশে হালকা (বৃত্তাকারে) দাঁড়ায়, তবে তাদের থেকে যে তার ইমামের চেয়ে ক্বাবার দিকে অধিক নিকটবর্তী তার নামাজ সহিহ হবে যদি সে পাশে না থাকে যে পাশে ইমাম আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الصَّلٰوةِ الخ : উক্ত পরিচ্ছেদকে كتاب الصلوة এর সর্বশেষে উল্লেখ করার কারণ হলো, যাতে নামাজ অধ্যায়ের সমাপ্তি একটি বরকতময় জিনিস দ্বারা হয়।

قوله : صَحَّ فَرْضُ الخ : আমাদের মতে ক্বাবার অভ্যন্তরে ফরজ নফল নামাজ পড়া জায়েয। তেমনি ক্বাবার উপরে নামাজ পড়া জায়েয। ইমাম মালিক রহ. এর মতে নফল জায়েয, ফরজ জায়েয নাই। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে উভয়টি নাজায়েয।

আমাদের দলিল হল :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَ اُسَامَةُ وَ بِلَالٌ وَ عُثْمَانُ ابْنُ طَلْحَةَ وَ اَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُوْدَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَ عَمُوْدًا يَمِيْنِهِ وَ ثَلَاثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ثُمَّ صَلّٰى وَ كَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ وَكَانَ هٰذَا يَوْمُ الْفَتْحِ -

হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. উসামা রাযি., বিলাল রাযি., উসমান ইবনে তালহা রাযি. ক্বাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং কাবার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাতে অবস্থান করলেন। হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, বিলাল রাযি. বের হয়ে আসতে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ সা. কি কি আমল করেছেন? বিলাল রাযি. বলেন, হুজুর সা. দুটি স্তম্ভ বাম দিকে রাখলেন, একটি ডান দিকে আর তিনটি পেছনের দিকে রাখলেন। অতঃপর তিনি নামায আদায় করেন। তখন বায়তুল্লাহর ছয়টি খুটি ছিল। আর ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের দিন ছিল। সুতরাং বুঝা গেল যে, কাবা অভ্যন্তরে নামাজ আদায় করা জায়েয। নতুবা তিনি কখন আদায় করতেন না। আর নফল নামাজ জায়েয হওয়ার জন্যে যেসব শর্ত রয়েছে তা ফরজেরও শর্ত। এদিকটি বিবেচনা করলে ফরজ নফলের শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয়ত ক্বাবার অভ্যন্তরের নামাজে ইস্তিকবালে ক্বিবলা পাওয়া গেছে। কেননা, সমস্ত ক্বাবা সামনে পাওয়া শর্ত নয়। আর ইহা সম্ভবপর নয়।

قوله : مَنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ الخ : ক্বাবা শরীফের ভেতর জামাতে নামাজ পড়ার চারটি সুরত রয়েছে। ১. মুক্তাদির পিঠ ইমামের পিঠের দিকে হবে। এ সুরতে নামাজ সহিহ হবে। কেননা, উভয় কিবলামুখী। তাই মুক্তাদী তার ইমাম ভুলের উপর একথা মনে করতেছে না এবং নিজের ইমামের অগ্রেও নয়। ২. মুক্তাদির পিঠ ইমামের মুখের দিকে হবে। এ সুরতে জায়েয নয়। কারণ, এ সুরতে মুক্তাদি তার ইমামের আগে হয়ে গেছে। তাই তা একেবারে জায়েয নেই। ৩. মুক্তাদীর চেহারা ইমামের পিঠের দিকে হবে। এ সুরত জায়েয। কেননা, মুক্তাদী সরাসরি ইমামের পেছনে। ৪. মুক্তাদীর চেহারা ইমামের চেহারার দিকে হবে। এ সুরতে মাকরূহের সাথে জায়েয। জায়েয এ জন্যে যে এ সুরতে ইমামের অনুসরণ পাওয়া গেছে। আর মাকরূহ এ কারণে যে, ছবি সামনে রেখে ইবাদত-কারীদের সাদৃশ্য হয়ে যায়। তাই উভয়ের মধ্যে সুতরা রাখা সমিচিন।

قوله : وَاِنْ تَحَلَّقُوْا حَوْلَهَا الخ : মাসজিদে হারামে তথা ক্বাবা শরীফের চারপাশে হালকা বেধে জামাত শুরু হয়, এমতাবস্থায় যদি কেহ ইমাম যে পাশে আছেন সে পাশে ইমাম থেকে একটু আগে বেড়ে যায়, তবে তার নামায সহিহ হবে না। কেননা, সে তার ইমামের সামনে চলে গেছে। আর ইমামের সামনে মুক্তাদির নামাজ সহীহ নেই। আর যদি অন্যপাশে তথা যে পাশে ইমাম নেই, সে পাশে ইমামের ছফের সামনে, তথা ক্বাবা শরীফের অধিক নিকটে চলে যায়, তবে তার নামাজ সহীহ হবে। কেননা, এক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদবর্তিতা প্রকাশ পায় না।

تم كتاب الصلوة

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ هٰذِهِ الْخِدْمَاتِ الدِّيْنِيَّةِ

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

অধ্যায় : যাকাত

هِيَ تَمْلِيكُ الْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ مِنْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ بِشَرْطِ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَشَرْطُ وُجُوبِهَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَمِلْكُ نِصَابٍ حَوْلِيٍّ فَارِغٍ عَنِ الدَّيْنِ وَحَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ نَامٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا وَشَرْطُ أَدَائِهَا نِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ لِلْأَدَاءِ أَوْ لِعَزْلِ مَا وَجَبَ أَو تَصَدُّقٌ بِكُلِّهِ -

---

অনুবাদ : যাকাত হলো হাশিমি গোত্রের কিংবা তাদের আজাদকৃত গোলামদের ভিন্ন মুসলমান ফকীরদেরকে যাকাত দানকারীর তা থেকে উপকৃত না হওয়ার শর্তে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মালের মালিক বানানো। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো (যাকাতদাতা) জ্ঞানবান হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, মুসলমান হওয়া এবং এমন নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া, যার উপর এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। এবং ঋন ও মূল প্রয়োজন মুক্ত থাকা। এবং বর্ধনশীলতা পাওয়া যাওয়া, যদিও অভ্যন্তরীণভাবে।

আর যাকাত আদায় হওয়ার শর্ত : যাকাত আদায় করার সাথে নিয়্যত থাকা, অথবা যা ওয়াজিব হয়েছে তা পৃথক করার সময় নিয়্যত থাকা কিংবা পূর্ণ মাল সদকা করে দেয়া।

শব্দার্থ : اَلْمَنْفَعَةُ - উপকার, মুনাফা, কল্যাণ। مُمَلِّكٌ - মালিক বানানেওয়ালা। اَلْحُرِّيَّةُ - স্বাধীনতা, আজাদী, মুক্তি। حَوْلِيٌّ -বাৎসরিক, বর্ষে। نَامٍ (م) نَامِيَةٌ - বর্ধনশীল, উন্নয়নশীল। عَزْلٌ - আলাদা করণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : كِتَابُ الزَّكٰوةِ الخ গ্রন্থকার রহ. এতক্ষণ ত্বাহারাত ও সালাতের আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ে যাকাত নিয়ে আলোচনা শুরু করতেছেন। নামায অধ্যায়ের পর যাকাত অধ্যায়ের আলোচনার কারণ হলো : কুরআন হাদীসের অনুসরণ করা। যেমন আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে ইরশাদ করেন— اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ - রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ الخ - উক্ত আয়াত ও হাদীসে বা এরকম অন্যান্য আয়াত বা হাদীসে নামাজের পর যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া একটি কারণ উল্লেখ করা যায় যে যাকাত ও সাওম দ্বিতীয় হিজরীতে ফরজ হয়েছে। তবে মুল্লা আলী কারী রহ. এর বরাতে বর্ণিত আছে যে, রোযার পূর্বে যাকাত ফরজ করা হয়েছে : আর এ কথা সতসিদ্ধ যে নামাজ মক্কাতেই ফরজ হয়েছে। এজন্যই যাকাতকে নামাযের পরে ও রোযার আগে আলোচনা করেছেন।

زكوة এর আভিধানিক অর্থ- زكوة (ج) زَكَّا - زَكَوٰتٌ - যাকাত, বরকত ও বৃদ্ধি। (س) زُكَاءً ، زَكْوًا (ن) زَكَا زَكَى বৃদ্ধি পাওয়া, যেমন- زَكَا الْاَرْضُ - ভূমি উর্বর হলো।

زكوة এর শরয়ী সংজ্ঞা : নিসাব পরিমাণ মালের এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শরীয়াত নির্দেশিত পন্থায়

উক্ত মালের একটি বিশেষ অংশ হাশেমী বংশীয় বা তাদের গোলাম ভিন্ন অন্য কোন ফক্বীর মুসলমানকে বা তার ন্যায় মুসলমানকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যাতে মালিক বানানো।

যাকাতকে যাকাত করে নাম করণ করার কারণ : প্রথমতঃ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا -

'আপনি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহন করুন তা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন।' দ্বিতীয় কারণ, হল যাকাত অর্থ বর্ধিত হওয়া। সুতরাং যেহেতু যাকাত দানে মালের মধ্যে বৃদ্ধি হয় তাই এ সদক্বাকে যাকাত নামে অবহিত করা হয়েছে।

যাকাত ফরজ হওয়ার দলীল : পবিত্র কোরআন, হাদীস, ইজমায়ে উম্মত দ্বারা যাকাতের ফরজিয়াত প্রমাণিত। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে وَاٰتُو الزَّكٰوةَ 'তোমরা যাকাত প্রাদান কর' যা ফরজ হওয়ার প্রমাণ। পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِى حَجَّةِ الْوِدَاعِ اِتَّقُوا اللّٰهَ وَ صَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَ صُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَ اَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ وَ اَطِيْعُوا اِذَا اُمِرْتُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ - قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ اُمَامَةَ مُنْذُكَمْ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ وَ اَنَا ابْنُ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً -

সুলাইম বিন আমের রাযি. বলেছেন, আবু উমামাকে বলতে শুনেছি (তিনি বলেন) বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ সা.কে বলতে শুনেছি যে আল্লাহকে ভয় কর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর রমযানের রোযা রাখ, নিজ মালের যাকাত আদায় কর। যখন তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয় তোমরা তখন আনুগত্য করো। তবে তোমরা নিজ প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। হযরত সুলাইম রাযি. বলেন, আমি আবি উমামাকে বললাম, আপনি এ বাণী রাসূলুল্লাহ্ সা. থেকে কত বৎসর বয়সে শ্রবন করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন যে, ত্রিশ বৎসর বয়সে শ্রবন করেছি।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ اِقَامُ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ وَ حَجَّ الْبَيْتِ وَ صَوْمَ رَمَضَانَ -

হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে مرفاعا বর্ণিত আছে, (তিনি বলেন, রাসুলাহ্ সা. ইরশাদ করেন) যে ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর রাখা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া। নামাজ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা এবং রমজানের রোযা রাখা।

সুতরাং কোরআন হাদীসের নির্দেশানুযায়ী ইজমায়ে উম্মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যাকাত ফরজ।

যাকাত ফরয হওয়ার হিকমাত : ১। যে মাল মানুষ অনেক কষ্ট করে অর্জন করে থাকে এবং এ মালের উপর মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল। সুতরাং মানুষ যখন আল্লাহর হুকুম পালনার্থে নিজ পছন্দসই ও প্রিয় মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে তথা যাকাত দান করে তখন তার অন্তর থেকে কার্পণ্য ও কঠোরতা দূর হয়ে যায়। এবং ঈমানের মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রোতিতে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ২। যাকাতের প্রথা যা সমাজে সহানুভূতির শিক্ষা দেয়। যাকাত ধনী-গরীব সবার মধ্যে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করে। মানুষের মধ্যে সমবেদনা, সহমর্মিতার মতো মহান গুণ যাকাত দানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে। ৩। যাকাত প্রদানে মালামাল

বৃদ্ধি তথা মালের মধ্যে বরকত হয়। ৪। যাকাতদাতা যাকাত দানের মধ্যে নিজ পাপ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে থাকে এবং তার ফলশ্রুতিতে জান্নাত প্রাপ্ত হয়। ৫। ধনীদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার দরুন তাদের মালের ভারসাম্য ঠিক থাকে। আর গরীব লোকটি তা দ্বারা লাভবান ও স্বচ্ছল হয়। পক্ষান্তরে সুদি পদ্ধতি প্রচলন থাকলে ধনী ব্যক্তি তার ধন বৃদ্ধি করে রাতারাতি অর্থের পাহাড় গড়ে তুলবে। আর দুঃখী ও গরীব মানুষ অভাব অনটনে দিনাতিপাত করে ধুকে ধুকে মরবে।

قوله : هِىَ تَمْلِيْكُ الخ : উক্ত ইবারত দ্বারা গ্রন্থকার রহ. যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। উক্ত সংজ্ঞায় تمليك শব্দ ব্যবহার করেছেন। تمليك এর অর্থ হলো মালিক বানানো। আর যাকাতের ক্ষেত্রে মালিক বানানো অপরিহার্য। কেননা, কোরআনে এসেছে— وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ উক্ত আয়াতে ايتاء হল تمليك তথা মালিক বানানো। অতঃপর মালিক বানাতে হবে কোন মুসলমান ফকীরকে। তবে হাশেমী বংশের কোন ব্যক্তিকে বা তাদের আযাদকৃত গোলামকে দেয়া যাবে না। কেননা, রাসূল সা. ইরশাদ করেন—

يَا بَنِىْ هَاشِمٍ اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ غَسَالَةَ اَيْدِى النَّاسِ وَاَوْسَاخَهُمْ وَ عِوَضِكُمْ بِخُمُسِ الْخُمُسِ -

'হে হাশেমিগণ! আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য মানুষের হাত ধৌত পানি এবং তাদের ময়লা (তথা যাকাত) অপছন্দনীয় করেছেন এবং তার বিনিময়ে তোমাদের পঞ্চম ভাগের পঞ্চমাংশ দান করেছেন। তাদের গোলামদের ব্যাপারে আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু রাফে' রযি. থেকে বর্ণিত হাদীসের শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন—

مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اِنَّا لَاتَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ -

'গোত্রের গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর আমাদের জন্য সদকা হালাল নয়।'

আর এ মালিক বানানোটি হতে হবে শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট পন্থা অনুযায়ী। এবং মালিকের এ যাকাত প্রদানের লক্ষ হতে হবে একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের হুকুম পালন ও তার সন্তুষ্টির কামনায়। সুতরাং যাকাত প্রদান করে তা থেকে কোনরূপ উপকৃত হওয়া যাবে না। বিধায় মাতা, পিতা, দাদা, দাদী ও ছেলে-সন্তানকে যাকাত দেওয়া যাবে না। কেননা, তাদের এই মাল থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

قوله : وَ شَرْطُ وُجُوْبِهَا الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. এখানে فرض শব্দটি বাদ দিয়ে وجوب শব্দটি উল্লেখ করেছেন যার কারণ হলো, ১। যাকাতের অবস্থা ও পরিমাণ কিছু কিছু خبر واحد দ্বারা প্রমাণিত। আর যা خبر واحد দ্বারা প্রমাণিত হয় তা وجوب -ই হয়ে থাকে। সুতরাং এ দিকটি বিবেচনা করে وجوب শব্দ উল্লেখ করেছেন। নতুবা বলা যায় যে, وجوب শব্দটি مجازا (রূপকার্থে) فرض এর স্থানে ব্যবহার করেছেন। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পাঁচটি শর্ত রয়েছে। ১। জ্ঞানবান হওয়া। ২। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ৩। মুসলমান হওয়া ৪। স্বাধীন হওয়া ৫। নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া।

প্রথম শর্ত হলো : জ্ঞানবান হওয়া। সুতরাং পাগল, মাতাল, অচেতনের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। **দ্বিতীয় শর্ত হলো : প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া**। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। মোটকথা, হানাফি মাযহাব মতে পাগলের ও নাবালেগ সন্তানের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এর মতে তাদের মালে যাকাত ওয়াজিব হবে। তারা বলেন, নাবালেগ ও পাগলের মাল থেকে তাদের অভিভাবক যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে ইসলামী সরকার কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত। তাদের দলীল হলো : যাকাত হলো অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব। তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং বলা যায় যে যাকাত মালিকের উপর একটি আর্থিক দায়িত্ব। সে বালেগ হউক বা না হউক, জ্ঞান সম্পন্ন হউক বা না হউক।

ইমাম শফেয়ী রহ. ইহাকে পাগল বা নাবালেগের তাদের স্ত্রীদের খোরপোষ ওয়াজিব হওয়ার উপর ও তাদের

চাষাবাদের জমি থেকে কর ও ওশর ওয়াজিব হওয়ার উপর কিয়াস করেন। এবং বলেন, যেভাবে তাদের মাল থেকে স্ত্রীদের খোরপোষ ওয়াজিব হয় এবং যেভাবে চাষাবাদের জমি থেকে কর ও ওশর ওয়াজিব হয় তেমনি তাদের মাল নিসাব পরিমাণ হলে তাতেও যাকাত ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয় দলিল : তিরমিযী শরীফের হাদীস—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

'রাসূলুল্লাহ্ সা. লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, সাবধান! যে ব্যক্তি এমন কোন এতিমের অভিভাবক হবে যার সম্পদ রয়েছে। তবে তার উচিত এ মাল দ্বারা ব্যাবসা করা।

তা এভাবে ফেলে রাখবে না যে যাকাত দিতে দিতে তা শেষ হয়ে যায়।' উক্ত হাদীসে حَتّٰى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ দ্বারা যাকাত উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

আমাদের দলিল হলো : রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন—

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ

(رواه ابوداود والنسائي)

'তিন ব্যাক্তি থেকে আল্লাহর হুকুম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ১। ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত। ২। নাবালেগ সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত। ৩। পাগল জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত।

সুতরাং প্রতিয়মান হলো যে, উক্ত তিন ব্যাক্তির উপর আল্লাহর হুকুম বর্তাবে না। তাই তাদের উপর যাকাত ফরজ হবে না। **ইমাম শাফেয়ী রহ. এর কিয়াসের জবাব :** যাকাতকে কর এর উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কারণ কর বা ওশরে কেবল মাত্র জমির কর এর অর্থ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যাকাত কেবলমাত্র ইবাদত। সুতরাং কর ও ওশর হলো জমির দায়। তাতেও ইবাদত রয়েছে তবে তা আনুসাঙ্গিক। তাই مقيس عليه (ওশর ও কর) مقيس (যাকাত) এর মধ্যে বড় ধরনের ব্যাবধান রয়েছে। বিধায় ওশর ও খেরাজের (কর-এর) ওপর যাকাতের কিয়াস করা যা সম্ভবই নয়।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর হাদীসের জবাব : ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীস খানার সনদকে ضعيف তথা দুর্বল বলেছেন। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, উক্ত হাদীসখানা সহীহ নয়। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা সহীহ নয়। আর যদি একান্ত সহীহ মেনে নেয়া হয় তাহলে হাদীসে উল্লেখিত صدقة দ্বারা نفقه বা খরচাদি উদ্দেশ্য।

সুতরাং তা দ্বারা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলীল পেশ করা যায় না।

তৃতীয় শর্ত হলো : মুসলমান হওয়া। অর্থাৎ যাকাত দাতা মুসলমান হওয়া। কারণ, ইহা একটি ইবাদাত। আর ইবাদত কেবল মুসলমানদের পক্ষ থেকে হতে পারে। কাফিরের পক্ষ থেকে হয় না।

চতুর্থ শর্ত হলো : স্বাধীন হওয়া। সুতরাং মুসলমান গোলামের নিকট নিসাব পরিমাণ মাল থাকলেও তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ, গোলাম মূলত কোন মালের মালিক হতে পারে না। অনুরূপভাবে مدبر - ام ولد - مكاتب গোলামের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। ام ولد - مدبر এর মালের মালিক হলো মুনিব আর مكاتب যদি সে তার মালের تصرف করতে পারে তবুও তার এ মালের মূল মালিক হচ্ছে মুনিব। এদিকে যাকাত ওয়াজিব হতে হলে মালের পূর্ণ মালিকানা আবশ্যক।

পঞ্চম শর্ত হলো : নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া। কেননা মাল মানুষকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সা. হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. কে বলেছেন—

ثُمَّ اَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَ تُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ -

লোকদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তাদের ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহন করো এবং তাদের গরীবদের মাঝে তা বন্টন করে দাও।

উক্ত হাদীসে যাকাত দাতাকে ধনী বলা হয়েছে। আর ধনী তখনই হবে যখন তার মালে আধিক্য থাকবে। তবে আধিক্যের নির্ধারিত কোন সীমা নেই। তাই নবী করীম সা. ধনী হওয়াকে নিসাব পরিমাণ মালের সাথে مقيد শর্তযুক্ত করেছেন। তাই সম্মানিত ফক্বীহগণ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাবের পরিমাণকে শর্ত হিসাবে স্থির করেছেন।

অপর একটি শর্ত হলো নিসাব পরিমাণ মালের উপর একটি বৎসর অতিবাহিত হওয়া। কারণ, বর্ধনশীল মালে যাকাত ওয়াজিব হয় পক্ষান্তরে অবর্ধনশীল মালে যাকাত ওয়াজিব হয় না। আর মাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে কি না তা জানার জন্য এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন যাতে পরিপূর্ণভাবে আশস্ত হওয়া যায়। সুতরাং শরীয়ত একে এক বৎসরের সাথে নির্ধারণ করে দিয়েছে। এথেকে প্রতিয়মান হলো যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মালের উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হওয়া।

قوله : فَارِغٌ عَنِ الدَّيْنِ الخ : নিসাব পরিমাণ মালের মালিক ব্যক্তি ঋণ থেকে মুক্ত থাকা। অর্থাৎ যদি কারও এ পরিমাণ ঋন থাকে যে, যা তার পূর্ণ মালকে বেষ্টন করে ফেলে তবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল হল : ঋনী ব্যক্তির মাল তার মৌলিক প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ। তাহল ঋন আদায় করা। কেননা, কর্জ দুনিয়া এবং আখেরাতে উভয়ে ক্ষতিকর। সুতরাং ঋন অনেক বড় দায়বদ্ধতা, বিধায় ঋনী ব্যক্তির এমাল অস্তিত্বহীন হিসাবে গণ্য হবে। এবং মনে করা হবে যে তার নিকট কোন মালই নেই। তার দৃষ্টান্ত এভাবে যে, যদি কারো নিকট অল্প কিছু পানি বিদ্যমান থাকে এদিকে তার আশপাশে কোন পানি নেই। এখন যদি এ পানি দ্বারা অজু করে বসে তবে পরবর্তীতে পিপাসায় পড়ার আশংকা থাকে তবে এক্ষেত্রে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করবে। এবং মনে করা হবে তার কাছে পানি নেই। তদ্রূপ সমপরিমাণ মালের ঋনী ব্যক্তির এমাল যাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে মনে করা হবে তার কাছে কোন মাল নেই।

قوله : وَشَرْطُ اَدَائِهَا نِيَّةٌ الخ : যাকাত যেহেতু একটি ইবাদত, সুতরাং তা নিয়ত ছাড়া সহীহ হবে না। অর্থাৎ যাকাত আদায়ের জন্য শর্ত হলো নিয়ত করা। এবার এ নিয়ত যাকাত আদায় করার সময় হবে নতুবা যাকাত পরিমাণ মাল নিজ সম্পদ থেকে পৃথক করার সময় নিয়্যাত করা হবে। কেননা, নিয়্যাতের ক্ষেত্রে মূল হলো সংশ্লিষ্ট ইবাদাতের সাথে যুক্ত থাকা। যেমন নামাযের ক্ষেত্রে নামাযের নিয়্যাত নামাযের সাথে যুক্ত হয়ে থাকা। আর যাকাত পরিমাণ মাল পৃথক করার সময়ের নিয়্যাত গ্রহনযোগ্য এজন্য যে, তা জরুরতের প্রেক্ষিতে সংকীর্ণতাকে দূর করার জন্য। যেভাবে রোযার ক্ষেত্রে সুবহে সাদিকের পূর্বের নিয়্যাতও গ্রহনযোগ্য।

قوله : تَصَدَّقَ بِكُلِّهِ الخ : যদি কেহ তার পূর্ণ মাল দান করে দেয় তবে استحسان এর ভিত্তিতে তার থেকে যাকাতের ফরযিয়াত রহিত হয়ে যাবে। তবে ক্বিয়াসের চাহিদা হলো তা আদায় না হওয়া। এমনটিই ইমাম যুফার রহ. থেকে বর্ণিত। কেননা, নফল ও ফরয আদায়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য করণ অপরিহার্য। যেমন নামাজের ক্ষেত্রে সাধরণ নিয়্যাতের দ্বারা ফরজ আদায় হয় না।

استحسان এর কারণ হলো : উক্ত মাল থেকে নির্দিষ্ট একটি অংশ আদায় করা ওয়াজিব ছিলো যা উক্ত মালের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ উক্ত মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং নির্দিষ্ট বস্তু পুণরায় নির্দিষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই।

بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ

পরিচ্ছেদ : চতুষ্পদ প্রাণীর যাকাতের বিবরণ

وَهِيَ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ فِيْ أَكْثَرِ السَّنَةِ وَيَجِبُ فِيْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ إِبِلًا بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِيمَا دُونَهُ فِيْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَفِيْ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِيْ سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ حِقَّةٌ وَفِيْ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ جَذَعَةٌ وَفِيْ سِتٍّ وَسَبْعِيْنَ بِنْتَا لَبُونٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ وَفِيْ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ حِقَّتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ فِيْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ ثُمَّ فِيْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَفِيْ مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ وَفِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَثَمَانِيْنَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَفِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَتِسْعِيْنَ أَرْبَعُ حِقَاقٍ إِلَى مِائَتَيْنِ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ أَبَدًا كما بَعْدَ مِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ وَالْبُخْتُ كَالْعِرَابِ -

অনুবাদ : সাঈমা হলো যে চতুষ্পদ জন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময় বৈধ ময়দানে বিচরণ করে খায়। (আর অবশিষ্ট দিন মালিকের নিয়ন্ত্রণে ও ঘাস খাওয়ানো দ্বারা লালিত পালিত হয়) ওয়াজিব হলো পঁচিশটি উটে একটি বিনতে মাখায (بنت مخاض) আর তার কমে পঁচিশটিতে একটি বকরী। আর ছত্রিশটি উটের মধ্যে একটি বিনতে লাবুন (بنت لبون) এবং ছিচল্লিশটি উটের মধ্যে একটি হিক্কা (حقة) (ওয়াজিব হবে।) এবং একষট্টিটি উটের মধ্যে জিযআ (جذعة) এবং ছিয়াত্তরটি উটের মধ্যে দুটি বিনতে লাবুন (بنت لبون) এবং একানব্বই থেকে একশত বিশ পর্যন্ত দুটি হিক্কা (حقتان) (ওয়াজিব হবে)।

অতঃপর যখন উটের সংখ্যা একশত বিশের অধিক হবে তখন নিসাবের বিধান নতুন করে শুরু হবে। প্রত্যেক পাঁচটিতে একটি বকরী একশত পয়তাল্লিশ পর্যন্ত। সুতরাং এক শত পয়তাল্লিশটি উটের মধ্যে দুটি হিক্কা ও একটি বিনতে মাখায। এবং একশত পঞ্চাশটি উটের মধ্যে তিনটি হিক্কা। অতঃপর (নিসাবের বিধানের পুনরাবৃত্তি হবে) প্রত্যেক পাঁচটিতে একটি বকরী এবং একশত পচাত্তরটি উটের মধ্যে তিনটি হিক্কা ও একটি বিনতে মাখাজ এবং একশত ছিয়াশিটি উটের মধ্যে তিনটি হিক্কা ও একটি বিনতে লাবুন এবং একশত ছিয়ানব্বই থেকে দুশত পর্যন্ত চারটি হিক্কা ওয়াজিব হবে। অতঃপর একশত পঞ্চাশের পরবর্তীতে যেভাবে পুনরাবৃত্তি হয়েছে তদ্রূপ (বিধানের) পুনরাবৃত্তি হবে। আর (যাকাতের ক্ষেত্রে) অনারব উট আরব উটের ন্যায়।

শব্দার্থ : سَوَائِمُ ইহা سَائِمَةٌ এর ব.ব. ইহা سَامَتِ الْمَاشِيَةُ 'চতুষ্পদ জন্তু চরেছে' হতে নির্গত। اَلرَّعْيُ চরা, চরানো। تُسْتَأْنَفُ ইহা فعل مجهول - استفعال থেকে اِسْتِئْنَافًا আরম্ভ করা, নতুনভাবে শুরু করা। اَلْبُخْتُ ইহা بُخْتِي এর ব.ব. যা আরব ও অনারব উভয়ের মিশ্রিত বীর্য দ্বারা জন্মলাভ করে। اَلْعِرَابُ -খাঁটি আরব বলা হয়। خَيْلٌ اَوَابِلُ عِرَابٌ وَ اَعْرُبٌ খাঁটি আরবী ঘোড়া বা উট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

মান্যবর গ্রন্থকার রহ. এখান থেকে যাকাতের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করেছেন। তিনি যাকাতের বিষয়ের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করতে হুজুর সা. এর পবিত্র হাদীসের অনুসরণ করেছেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. হযরত আবু বকর রাযি. কে যাকাত সংক্রান্ত বিষয়ের উপর যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে সর্বাগ্রে উটের যাকাত নিয়ে বর্ণনা রয়েছে। তাই বিজ্ঞ গ্রন্থকার রহ. যাকাতের বিষয়াদির মধ্যে সর্বাগ্রে চতুষ্পদ প্রাণী এবং চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে সর্বাগ্রে উটের আলোচনা শুরু করেছেন। দ্বিতীয়ত আরবদের নিকট সর্বাধিক মূল্যবান বস্তু হলো উট, তাই তিনি উটের আলোচনা সর্বাগ্রে করেছেন।

قوله : هِيَ الَّتِي تَكْتَفِي الخ : সাওয়াইম ঐ জন্তুকে বলে যে জন্তুগুলো বছরের অধিকাংশ সময় বৈধ ময়দানে বিচরণ করে খায়। আর অবশিষ্ট দিনগুলো মালিকের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হয় এবং ঘাস খাওয়ানো হয়। পক্ষান্তরে যদি অর্ধ বৎসর মালিক নিজ নিয়ন্ত্রণে লালন পালন করে তবে তা সাঈমার অন্তর্ভুক্ত নয়। এদিকে সাঈমা হওয়ার শর্ত হলো দুধ প্রাপ্তি বা বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হতে হবে। আর যদি আরোহণ বা গোশত অর্জনের উদ্দেশ্যে হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি তা দ্বারা ব্যবসার উদ্দেশ্য হয় তবে سائمة হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হবে না বরং ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হবে।

সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. উক্ত আলোচনায় উটের নাম সংক্রান্ত কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ উল্লেখ করেছেন, যার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো— বিনতে মাখাজ (بنت مخاض) গর্ভবতীর বাচ্চা, উটনির ঐ সাবক যার এক বৎসর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। সাধারণভাবে যেহেতু উট বাচ্চা প্রসবের দ্বিতীয় বৎসর গর্ভবতী হয়ে যায় তাই এ বাচ্চাকে বিনতে মাখাজ (بنت مخاض) বলা হয়। বিনতে লাবুন (بنت لبون) 'দুধওয়ালীর বাচ্চা' উটনীর ঐ মাদী সাবক যার দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। হিক্কা حقة উটনীর ঐ মাদী সাবক যার বয়স চতুর্থ বর্ষে পড়েছে। জিযাআ' (جزعة) উটনীর ঐ মাদী সাবক যে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে যেহেতু এই বর্ষে তার দুধ দাঁত পড়ে যায় তাই তাহাকে জিয'আ (جزعة) বলা হয়। উল্লেখ্য যে, جزعة থেকে বড় উটকে ثانى আর এর থেকে বড়টিকে سديس আর এর থেকে বড়টিকে بازل বলা হয়। তবে এ তিনটি যাকাতে গ্রহন করা হয় না।

قوله : وَيَجِبُ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ الخ : এখান থেকে সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. উটের যাকাত ও তার পরিমাণ উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো উটগুলো سائمة হতে হবে এবং পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হতে হবে। আর যা পাঁচটির নীচে যাকাত ওয়াজিব হয় না। আর পাঁচটি থেকে নয়টি পর্যন্ত একটি বকরী ওয়াজিব হয়। এবং দশটি থেকে চৌদ্দটি পর্যন্ত উটে দুটি বকরী ওয়াজিব হয়। আর পনেরটি থেকে উনিশটি পর্যন্ত উটে তিনটি বকরী ওয়াজিব হয়। আর বিশটি থেকে চব্বিশটি পর্যন্ত চারটি বকরী ওয়াজিব হয়। আর পচিশটি থেকে পয়ত্রিশটি উটে একটি বিনতে মাখাজ ওয়াজিব হবে। আর ছত্রিশটি থেকে পয়তাল্লিশটি উটে একটি বিনতে লাবুন ওয়াজিব হবে। এবং ছিচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত একটি হিক্কা ওয়াজিব হবে। আর একষট্টি থেকে পচাত্তর পর্যন্ত একটি جزعة ওয়াজিব হবে। আর ছিয়াত্তরটি থেকে নব্বইটি পর্যন্ত দুটি বিনতে লাবুন ওয়াজিব হবে। আর একানব্বই থেকে একশত বিশ পর্যন্ত দুটি হিক্কা ওয়াজিব হবে। একশত বিশ থেকে একশত পচিশ পর্যন্ত দুটি হিক্কার সাথে সাথে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। এবং একশত ত্রিশটিতে উপনীত হলে দুটি হিক্কার সাথে দুটি বকরী ওয়াজিব হবে। অনুরূপ একশত পয়ত্রিশটিতে দুটি হিক্কার সাথে তিনটি বকরী ওয়াজিব হবে এবং একশত চল্লিশটিতে উপনিত হলে দুটি হিক্কার সাথে চারটি বকরী ওয়াজিব হবে। আর একশত পয়তাল্লিশটি হলে দুটি হিক্কার সাথে একটি বিনতে মাখাজ ওয়াজিব হবে। আর একশত পঞ্চাশটি হলে তিনটি হিক্কা ওয়াজিব হবে। আর একশত পঞ্চান্নটি হলে তিনটি হিক্কার সাথে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। আর একশত ষাটটি হলে তিনটি হিক্কার সাতে দুটি বকরী ওয়াজিব হবে। আর একশত পয়ষট্টিটি হলে তিনটি হিক্কাসহ তিনটি বকরী

ওয়াজিব হবে। আর একশত সত্তর হলে তিনটি হিক্কাসহ চারটি বকরী ওয়াজিব হবে। একশত পচাত্তর হলে তিনটি হিক্কাসহ একটি বিনতে মাখাজ ওয়াজিব হবে। আর একশত ছিয়াশিটি হলে তিনটি হিক্কার সাথে একটি বিনতে লাবুন ওয়াজিব হবে। এ হুকুম দু'শ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উটের এ হিসাব ও যাকাতের বর্ণনা আমাদের মাযহাব মতে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে একশত বিশ থেকে একটি বেড়ে গেলে তাতে বিনতে লাবুন ওয়াজিব হবে। আর একশত ত্রিশটি হলে একটি হিক্কা ও দুটি বিনতে লাবুন ওয়াজিব হবে। অতঃপর প্রত্যেক চল্লিশটিতে একটি বিনতে লাবুন এবং প্রত্যেক পঞ্চাশটিতে একটি হিক্কা ওয়াজিব হবে। আমাদের দলীল হলো হুজুর সা.এর ঐ ফরমান যা হযরত আমর ইবনে হযম রাযি.কে দিয়েছিলেন তার শেষে আছে—

فَمَا كَانَ اَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَّ عِشْرِيْنَ فَفِيْهَا الْغَنَمُ فِىْ كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ

আর যা পঁচিশ থেকে কম হয় তাতে প্রতি পাঁচটিতে একটি করে বকরী ফরজ হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. যে পঞ্চাশে একটি হিক্কা আর চল্লিশে একটি বিনতে লাবুন এর কথা বলেছেন তা আমরা গ্রহন করি এমনকি এর সাথে আমরা এর কম তথা পঁচিশটিতে একটি বিনতে মাখাজ আর এর চেয়ে কমে প্রতি পাঁচটিতে একটি বকরী যা হাদীসের শেষের ভাষ্য অনুযায়ী গ্রহন করেছি।

قوله : وَالْبُخْتُ كَالْعِرَابِ الخ : যাকাত দানের ক্ষেত্রে আরবী উট আর অনারবী উটের বিধান একই। কারণ, সাধারণভাবে উট শব্দটি উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে।

এক নজরে উটের যাকাতের বিবরণ

মূল পরিমাণ বা নিসাব

উটের পরিমাণ/নিসাব	ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ	উটের পরিমাণ/নিসাব	ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ	উটের পরিমাণ/নিসাব	ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ	উটের পরিমাণ/নিসাব	ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ
৫	১টি বকরী	২০	৪টি বকরী	৪৬	১টি হিক্কা	৯১	২টি হিক্কা
১০	২টি বকরী	২৫	১টি বিনতে মাখাজ	৬১	১টি জিযআ	১০০	২টি হিক্কা
১৫	৩টি বকরী	৩৬	১টি বিনতে লাবুন	৭৬	২টি বিনতে লাবুন	১২০	২টি হিক্কা

প্রথম পুনরাবৃত্তি

উটের পরিমাণ/নিসাব	ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ	উটের পরিমাণ/নিসাব	ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ	উটের পরিমাণ/নিসাব	ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ
১২৫	১টি বকরী ২টি হিক্কা	১৩৫	৩টি বকরী ২টি হিক্কা	১৪৫	১টি বিনতে মাখায ২টি হিক্কা
১৩০	২টি বকরী ২টি হিক্কা	১৪০	৪টি বকরী ২টি হিক্কা	১৫০	৩টি হিক্কা

দ্বিতীয় পুনরাবৃত্তি

উটের পরিমাণ/নিসাব	ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ	উটের পরিমাণ/নিসাব	ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ	উটের পরিমাণ/নিসাব	ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ	উটের পরিমাণ/নিসাব	ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ
১৫৫	১টি বকরী ৩টি হিক্কা	১৬৫	৩টি বকরী ৩টি হিক্কা	১৭৫	৩টি হিক্কা ১টি বিনতে মাখায	১৯৬	চারটি হিক্কা
১৬০	দুটি বকরী ৩টি হিক্কা	১৭০	৪টি বকরী ৩টি হিক্কা	১৮৬	৩টি হিক্কা ১টি বিনতে লাবুন		

فَصْلٌ فِي الْبَقَرِ : فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ ذُو سَنَةٍ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ ذُو سَنَتَيْنِ أَوْ مُسِنَّةٌ وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ فَالْفَرْضُ يَتَغَيَّرُ بِكُلِّ عَشْرٍ مِنْ تَبِيعٍ إِلَى مُسِنَّةٍ وَالْجَامُوسُ كَالْبَقَرِ

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : গরুর যাকাত : (গরুর ক্ষেত্রে ত্রিশের নীচে যাকাত নেই) গরু ত্রিশটিতে একটি পূর্ণ এক বৎসরের নর বা মাদী বাছুর (তাবী বা তাবী'আহ) ওয়াজিব হবে। আর চল্লিশটিতে পূর্ণ দু বৎসরের একটি নর বা মাদী বাছুর (মুসিন্ন বা মুসিন্নাহ) ওয়াজিব হবে। আর চল্লিশ থেকে যা অধিক হবে ষাট পর্যন্ত (অতিরিক্ত সংখ্যাগুলোতে) সেই পরিমাণে ওয়াজিব হবে। অতঃপর ষাটে উপনীত হলে দুটি তাবী' বা তাবী'আহ ওয়াজিব হবে। আর (গরুর সংখ্যা) সত্তরে উপনীত হলে একটি মুসিন্নাহ এবং একটি তাবী' ওয়াজিব হবে। আর গরুর সংখ্যা আশিতে দুটি মুসিন্ন বা মসিন্নাহ ওয়াজিব হবে। অতঃপর প্রতি দশে তাবী' থেকে মুসিন্নাতে এ হুকুম আবর্তিত হবে। আর মহিষ (এর যাকাতের পরিমাণ) গরুর ন্যায়।

শব্দার্থ : اَلْبَقَرُ (ج) بُقُورٌ - اَبْقَارٌ - গরু, ষাড়, বৃষ। اَلْبَقَرَةُ (ج) بَقَرَاتٌ - গাভী। আশরাফুল হিদায়াতে রয়েছে بَقْرٌ অর্থ বিদীর্ণ করা গরুকে بقر এজন্য বলা হয় যে, তা জমীনকে বিদীর্ণ করে بقرة এর মধ্যে ة অক্ষরটি وحدت বা একক বিষয় বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। স্ত্রীলিঙ্গ বুঝানোর জন্য নয়। অতএব بقرة শব্দটি নর এবং মাদী উভয়টিকে শামিল করে। الجاموس (ج) جوامس মহিষ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. গরুর আলোচনা বকরীর আলোচনার পূর্বে করেছেন। কারণ হলো গরু বকরীর তুলনায় বড় ও উটের নিকটবর্তী। উল্লেখ্য যে বকরীর মধ্যে যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত হল তা যেন দুধ বা বংশ বৃদ্ধির জন্য হয়। পক্ষান্তরে যদি হাল চাষ বা বোঝা বহনের জন্য হয়ে থাকে তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে ব্যাবসায়িক ভাবে যাকাত ওয়াজিব হবে। গরুর যাকাতের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার রহ. تبيع (তাবী) ও مسن (মুসিন্ন) শব্দদ্বয় উল্লেখ করেছেন। تبيع হলো গরুর এক বৎসরের নর সাবক এবং এর স্ত্রীলিঙ্গ হলো تبيعة গরুর এক বৎসরে মাদী সাবক। যেহেতু এক বৎসরের সাবক মায়ের পিছনে পিছনে চলে তাই তাকে تبيع বা تبيعة করে নাম করণ করা হয়েছে। আর মুসিন্ন (مسن) হল গরুর দু বৎসরের নর

সাবক। স্ত্রীলিঙ্গ হল মুসিন্নাহ (مسنة) দু বৎসরের মাদী সাবক। যেহেতু দুবৎসরের সাবকের দাত উঠে যায়, তাই তাকে مسن বা مسنة করে নাম করণ করা হয়েছে।

قوله : فِى الْبَقَرِ فِى ثَلَثِيْنَ الخ : ত্রিশটি গরুর মধ্যে এক বৎসরের একটি গো বৎস ওয়াজিব হবে। আর চল্লিশটি গরুর মধ্যে দু বৎসরের একটি গোবৎস ওয়াজিব হবে। আর যা গরু মহিষের যাকাতের বেলায় নর মাদীর মাঝে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। **দলীল :** হযরত মাসরুক রহ. থেকে বর্ণিত হাদীস—

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَّأْخُذَهُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ بَقَرًا تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنًّا اَوْ مُسِنَّةً -

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. যখন তাকে ইয়ামানের গর্ভনর করে পাঠালেন, তখন তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে প্রত্যেক ত্রিশটি গরু হতে একটি تبيع বা تبيعة গ্রহণ করবে। আর প্রত্যেক চল্লিশটির মধ্য একটি مسن বা مسنة গ্রহণ করবে।

قوله : فِيْمَا زَادَ بِحِسَابِهِ الخ : এবার যদি গরুর সংখ্যা চল্লিশ ছাড়িয়ে চলে যায় তবে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে তিনটি রেওয়ায়েত রয়েছে।

১ম রিওয়ায়েত : চল্লিশ থেকে অতিরিক্ত সংখ্যার হিসাব অনুযায়ী যাকাত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যদি চল্লিশ থেকে একটি অতিরিক্ত হয় তবে একটি মুসিন্নাহ ও একটি মুসিন্নার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। অনুরূপ যদি ষাট পর্যন্ত যতটি অতিরিক্ত হবে একটি মুসিন্নাহ ও একটি মুসিন্নাহর চল্লিশ ভাগের এত ভাগ ওয়াজিব হবে। **দলিল হলো :** ত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যবর্তী সংখ্যায় যাকাত ওয়াজিব না হওয়াটা ক্বিয়াসের বিপরীত তবে নস দ্বারা প্রমাণিত। আর চল্লিশের অতিরিক্ত সংখ্যার যাকাত মাফ হওয়ার পক্ষে কোন নস বিদ্যমান নেই এবং ক্বিয়াস দ্বারাও তা প্রমাণ করা যায় না বিধায় চল্লিশের উর্ধ্বের সংখ্যায় যাকাত রহিত করা যায় না।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত : হাসান বিন যিয়াদ রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, চল্লিশের অতিরিক্ত সংখ্যায় কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যখন পঞ্চাশে উপনীত হবে তখন একটি মুসিন্নাহ ও একটি মুসিন্নার এক চতুর্থাংশ ওয়াজিব হবে। অথবা একটি মুসিন্নাহ ও একটি তাবী' এর এক তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। মোটকথা, চল্লিশ ও পঞ্চাশ এর মধ্যবর্তী সংখ্যায় অতিরিক্ত যাকাত মাফ।

তৃতীয় রেওয়ায়েত হলো : চল্লিশের অতিরিক্ত ষাট পর্যন্ত কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। সাহাবাইন রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম মালিক রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ. অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের দলিল হল- রাসূল সা. হযরত মুআয রাযি.কে আদেশ করেছেন— لَاتَأْخُذْ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا গরুর মধ্যবর্তী সংখ্যা থেকে কোন কিছু গ্রহন করবে না। উলামায়ে কেরামগণ اوقاص এর ব্যাখ্যা চল্লিশ ও ষাটের মধ্যবর্তী সংখ্যা দ্বারা করেছেন।

قوله : فَفِيْهَا تَبِيْعَانِ الخ : গরু ষাটের কোঠায় উপনিত হলে দুটি তাবি বা তাবিয়াহ ওয়াজিব হবে। আর সত্তরে পৌছালে একটি মুসিন্নাহ ও একটি তাবী ওয়াজিব হবে। আর আশিতে পৌছলে দুটি মুসিন্নাহ ওয়াজিব হবে।

قوله : فَالْفَرْضُ يَتَغَيَّرُ الخ : প্রতি দশে তাবী থেকে মুসিন্নাতে এবং মুসিন্না থেকে তাবী এ হুকুম আবর্তিত হবে। অর্থাৎ প্রতি ত্রিশটিতে একটি তাবী আর প্রতি চল্লিশে একটি মুসিন্নাহ ওয়াজিব হবে। এভাবে প্রতি আশিতে দুটি মুসিন্নাহ, আর নব্বইটিতে তিনটি তাবী আর একশতটিতে দুটি তাবী ও একটি মুসিন্নাহ ওয়াজিব হবে। এ কিয়াসের ভিত্তিতে হুকুম পরিবর্তীত হতে থাকবে। **দলিল হল :** রাসূল সা. এরশাদ করেন—

فِى كُلِّ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ اَوْ تَبِيْعَةٌ وَ فِى كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنٌّ اَوْ مُسِنَّةٌ

প্রতি ত্রিশটিতে একটি تبيع বা تبيعة এবং প্রত্যেক চল্লিশটিতে একটি مسن বা مسنة ফরজ

قوله : وَالْجَامُوْسُ كَالْبَقَرِ الخ : গ্রন্থকার রহ. মহিষের যাকাত গরুর অনুরূপ বলেন। অতএব, ত্রিশটি মহিষে এক বৎসরের একটি মহিষ সাবক। আর চল্লিশটিতে দু'বৎসরের একটি মহিষ সাবক ওয়াজিব হবে। কেননা, بقر শব্দটি গরু ও মহিষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর গরু ও মহিষ উভয়টিই بقر এর جنس বা প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এক নজরে গরুর জাকাতের বিবরণ

নিসাব	যাকাতের পরিমাণ	নিসাব	যাকাতের পরিমাণ	নিসাব	যাকাতের পরিমাণ	নিসাব	যাকাতের পরিমাণ
৩০	১ বছরের ১টি গো- বৎস	৬০	১ বছরের ২টি গো-বৎস	৮০	২ বছরের ২টি গো-বৎস	১০০	১ বছরের ২টি এবং ২ বছরের ১টি গো-বৎস
৪০	২ বছরী ১টি গো-বৎস	৭০	১ বছরী ১টি ও ২ বছরী ১টি গো-বৎস	৯০	১ বছরী ৩টি গো-বৎস		

فَصْلٌ فِي الْغَنَمِ : فِيْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ وفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِيْ أَرْبَعِ مِائَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَالْمَعْزُ كَالضَّأْنِ وَيُؤْخَذُ الثَّنِيُّ فِي زَكَاتِهَا لَا الْجَذَعُ -

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : বকরীর যাকাত : (চল্লিশটি বকরীর কমে যাকাত নেই)। চল্লিশটি বকরীর মধ্যে একটি বকরী ওয়াজিব। আর একশত একুশটি বকরীর মধ্যে দুটি বকরী। আর দু'শত একটি বকরীতে তিনটি বকরী ওয়াজিব হবে। আর চারশত বকরীতে চারটি বকরী ওয়াজিব হবে। অতঃপর প্রতি এক শতে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। এবং ভেড়া (নিসাবের ক্ষেত্রে) বকরীর ন্যায়। আর বকরীর যাকাতে ছানী (পূর্ণ এক বৎসরের বাচ্চা) গ্রহণ করা হবে। তবে জিযা (ছয় মাস উর্ধ্বের বাচ্চা) গ্রহণ করা হবে না।

শব্দার্থ : اَلْغَنَمُ (ج) أَغْنَامٌ - ছাগ, মেষ, ভেড়া। غَنَمٌ শব্দটি মূলত غَنِيْمَتٌ থেকে নির্গত। এগুলোর প্রতিরক্ষা শক্তি নেই। তাই তার অন্বেষণকারীর জন্য তা غنيمت স্বরূপ। غَنَمٌ শব্দটি اسم جنس - তাই মাদী ও নর সবই অন্তর্ভুক্ত করে। شَاةٌ (ج) شَاءٌ - شِيَاهٌ - বকরী, ছাগল। مَعْزٌ (ج) أَمْعُزٌ - ছাগ, ছাগল। ضَأْنٌ - মেষ, ভেড়া

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : فَصْلٌ فِى الْغَنَمِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. বকরীর আলোচনা ঘোড়ার প্রারম্ভে করার কারণ হল বকরীর উপর যাকাত ফরয সর্বসম্মতিক্রমে। পক্ষান্তরে ঘোড়ার উপর যাকাত ফরয হয় কি না এই ব্যাপারে মতানৈক্য করেছে। সুতরাং যা সর্বসম্মত তা পূর্বে উল্লেখ করাই সঙ্গত। অথবা বকরী অধিক হওয়ার দরুন তার

আলোচনা পূর্বে করেছেন।

قوله : فِي أَرْبَعِيْنَ شَاةً الخ : বকরী সংখ্যা চল্লিশটি হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হয়। এর নিম্নে যাকাত হয় না। আর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো উক্ত বকরীগুলোর উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হওয়া এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় বৈধ মাঠে বিচরণ করে খাদ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হওয়া। সুতরাং উক্ত শর্ত অনুযায়ী চল্লিশটি বকরী থেকে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি বকরী ওয়াজিব হবে। এবং একশত একুশ থেকে দু'শত পর্যন্ত দুটি বকরী ওয়াজিব হবে। অতঃপর প্রতি শতকে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তিনশত হলে তিনটি বকরী আর চারশতে উপনীত হলে চারটি বকরী ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে প্রতি শতে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। **দলীল হলো** : রাসূলুল্লাহ্ সা. এর যাকাত সংক্রান্ত ফরমানে হুবহু এরকমই যাকাত এর বর্ণনা রয়েছে। আর উল্লেখিত যাকাতের ব্যাখ্যায় উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

قوله : وَالْمَعْزُ كَالضَّأْنِ الخ : ভেড়ার নিসাব ছাগলের ন্যায়। কেননা, غنم শব্দটি উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ ভেড়া, দুম্বা, বকরী এবং নর-মাদী যাকাতের ক্ষেত্রে সব সমান। যদি এসব প্রকারই মিলিত হয়ে নিসাব পরিমাণে উপনীত হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হবে। **দলিল হল** : নসের মধ্যে غنم শব্দ উল্লেখ আছে যা اسم جنس - আর اسم جنس তার নিজস্ব انواع কে অন্তর্ভুক্ত করে।

গ্রন্থকার রহ. বলেন, ভেড়া ছাগলের ক্ষেত্রে ثانى গ্রহন করা হবে। এবং جذع গ্রহণ করা হবে না। ثانى এর ব্যাখ্যায় ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, ঐ বাচ্চা যার সামনের দাত পড়ে গেছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বকরীর মধ্যে ثانى হল যার এক বৎসর পূর্ণ হয়েছে। আর جذع বলা হয় যার বয়স ছয় মাসের উর্ধ্বে হয়েছে। যেমন আবু আলী দাক্কাক রহ. হতে বর্ণিত, جذع বলা হয় তাকে যার বয়স নয় মাস হয়েছে। আবু আবদুল্লাহ্ বলেছেন جذع হল এমন সাবক যা আট মাসে পদার্পন করেছে। মোটকথা ثانى হল এক বৎসরের বয়সী সাবক। আর جذع হল যার এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয়নি। বকরীর যাকাতের ক্ষেত্রে ثانى গ্রহনযোগ্য আর جذع গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে হাসান বিন যিয়াদ রহ. ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেন যে, جذع দ্বারা যাকাত দেয়া জায়েয।

আমাদের দলিল হল : হযরত আলী রাযি. থেকে মাওকুফ ও মারফূ' উভয়ভাবে বর্ণিত আছে— لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكٰوةِ اِلَّا الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا যাকাতের ক্ষেত্রে এক বৎসরের বা তদুর্ধ্বেরই সাবক কেবল গ্রহণ করা হবে। অপর দিকে যাকাতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হল মাঝারি গড়নের প্রাণী গ্রহন করা। অথচ جذع ছোট প্রাণীর মধ্যে গণ্য। সুতরাং দলিলে আকলী ও নকলীর ভিত্তিতে বলা যায় যে, যাকাতের ক্ষেত্রে جذع গ্রহণ করা যাবে না।

وَلَا شَيْءَ فِي الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَ الْحُمْلَانِ وَالْفُصْلَانِ وَالْعَجَاجِيلِ وَ الْعَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ وَ الْعَفْوِ وَ الْهَالِكِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَلَوْ وَجَبَ سِنٌّ وَلَمْ يُوجَدْ دَفَعَ أَعْلَى مِنها وَأَخَذَ الْفَضْلَ أَوْ دُونَهَا وَرَدَّ الْفَضْلَ أَوْ دَفَعَ الْقِيمَةَ وَيُؤْخَذُ الْوَسَطُ وَيَضُمُّ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِنْسِ نِصَابِ اِلَيْهِ وَلَوْ أَخَذَ الْخِرَاجَ وَالْعُشْرَ وَالزَّكَاةَ بُغَاةٌ لم تُؤْخَذْ أُخْرَى وَلَوْ عَجَّلَ ذُو نِصَابٍ لِسِنِيْنَ أو لِنُصُبٍ صَحَّ -

---

অনুবাদ : এবং যাকাত ওয়াজিব নয় ঘোড়ার মধ্যে, খচ্চরের মধ্যে, গাধার মধ্যে, মেষ সাবকের মধ্যে, উট শাবকের মধ্যে, মহিষ শাবকের মধ্যে, কাজে নিয়োজিত প্রাণীর মধ্যে, সংগৃহীত খাদ্যে লালিত-পালিত প্রাণীর

মধ্যে, দু' নিসাবের মধ্যবর্তী সংখ্যার মধ্যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর ধ্বংস প্রাপ্তির মধ্যে। যদি কোন এক বয়সের প্রাণী ওয়াজিব হয় আর তা না পাওয়া যায় তবে তার থেকে উন্নত (বয়সে বড়) প্রাণী প্রদান করত অতিরিক্ত মূল্য ফেরত নিবে। অথবা তার থেকে অনুন্নত (কম বয়সের) প্রাণী গ্রহণ করতঃ অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে দিবে। অথবা (যা ওয়াজিব হয়েছে) তার মূল্য দিয়ে দিবে। (যাকাতের ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হওয়া প্রাণীদের থেকে) মধ্যম মানের প্রাণী গ্রহণ করা হবে। এবং (বৎসরের মাঝে) নিসাব জাতীয় প্রাপ্ত মালকে উক্ত নিসাবের সাথে মিলানো হবে। আর যদি কোন বিদ্রোহী কর (خراج) দশমাংশ (عشر) ও যাকাত (زكوة) নিয়ে নেয়, তবে দ্বিতীয়বার তা নেয়া হবে না। যদি নিসাবওয়ালা ব্যক্তি কয়েক বৎসরের বা কয়েক নিসাবের যাকাত অগ্রীম দিয়ে দেয় তবে তা সহীহ।

শব্দার্থ : خَيْلٌ (ج) خُيُوْلٌ - অশ্ব, ঘোড়া, অশ্বশক্তি, بِغَالٌ ইহা بَغْلٌ এর ব.ব., খচ্চর। حَمِيْرٌ ইহা حِمَارٌ এর ব.ব., গাধা, গর্দভ। حُمْلَانٌ ইহা حَمَلٌ এর ব.ব., মেষ শাবক, যার বয়স এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই। اَلْفُصْلَانُ ইহা فَصِيْلٌ এর ব.ব., উটের শাবক, যার বয়স এক বৎসর। عَجَاجِيْلٌ ইহা عِجْلٌ এর ব.ব., মহিষ শাবক, যার বয়স এক বৎসর। عَوَامِلٌ ইহা عَامِلَةٌ এর ব.ব., কাজে নিয়োজিত প্রাণী। اَلْعَلُوْفَةُ সংগৃহীত খাদ্যে লালিত-পালিত প্রাণী। مُسْتَفَادٌ যে মাল বছরের মাঝখানে অর্জিত হয়। بُغَاةٌ ইহা بَغِى এর ব.ব., বিদ্রোহী। عَجَّلَ ইহা تفعيل থেকে تعجيلا দ্রুত করা, অগ্রীম করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : لَا شَيْءَ فِى الْخَيْلِ الخ : ঘোড়ার উপর যাকাত ওয়াজিব কিনা এ নিয়ে ইমামদের নিকট মতানৈক্য রয়েছে। তবে যেসব ঘোড়া নিজ গৃহে লালন-পালন করা হয় এবং আহার্য দান করা হয় আর তা দ্বারা বহন, কৃষি কাজ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ-কাম করানো হয়, সেসব ঘোড়ার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি তা ব্যবসার জন্য লালন-পালন করা হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি ঘোড়াগুলো سائمة তথা বৎসরের অধিকাংশ সময় বৈধ মাঠে ময়দানে বিচরণ করে তবে সাহাবাইন রহ. এর মতে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। ইহাই ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এর মাজহাব। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে এ প্রকার ঘোড়ার ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। যদি سائمة ঘোড়া ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে যাকাত ওয়াজিব। আর যদি তা বোঝা বহনের বা জিহাদের জন্য হয় তবে যাকাত ওয়াজিব নয়। আর যদি দুগ্ধ গ্রহণ বা বংশ বৃদ্ধির জন্য হয় আর তা নর-মাদী উভয় শ্রেণী মিশ্রিত থাকে, তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে এবং ঘোড়ার মালিকের ইখতিয়ার থাকবে তিনি চাইলে ঘোড়া প্রতি এক দিরহাম প্রদান করবেন, নতুবা তার মূল্য নির্ধারণ করতঃ প্রতি দুইশত দিরহাম থেকে পাঁচ দিরহাম প্রদান করবেন। আর উক্ত سائمة ঘোড়াগুলো যদি দুধ গ্রহণ বা বংশ বৃদ্ধির নিয়্যাতে লালন-পালন করা হয় আর তা শুধু নর হয় বা শুধু মাদী হয় তবে এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে— (১) যাকাত ওয়াজিব হবে, (২) যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে অন্যের নর ঘোড়া নিয়ে বংশ বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাহাবাইন রহ. এর দলিল হল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদীস—

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهٖ وَلَا فِىْ فَرَسِهٖ صَدَقَةٌ

'রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, মুসলমানের উপর তার গোলাম ও ঘোড়ার যাকাত নেই।' অনুরূপভাবে তিরমিযী শরীফে হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে—

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ -

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের থেকে ঘোড়া ও ক্রীতদাসের যাকাত মাফ করে দিয়েছি।

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর দলিল হল : দারে কুতনীর একটি রিওয়ায়েত—

فِىْ كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ اَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

দ্বিতীয় দলীল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদীস—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ هِىَ لِذٰلِكَ الرَّجُلِ اَجْرٌ وَ رَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَ تَعَفُّفًا وَ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِىْ رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوْرِهَا فَهِىَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَ نِوَاءً فَهِىَ عَلَى ذٰلِكَ وِزْرٌ الخ -

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন, ঘোড়া তিন শ্রেণীর লোকদের জন্য : এক প্রকার লোকদের জন্য তা পুণ্যের বিষয়। অন্য এক প্রকার লোকদের জন্য তা পুণ্য ও নয় পাপও নয়। আর অন্য এক প্রকার লোকদের জন্য তা বিপদের কারণ। পুণ্য হল সে লোকের জন্য যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য সর্বদা তা প্রস্তুত করে রেখেছে। এটি এ ব্যাক্তির জন্য পুণ্যের বিষয়। আর যে ব্যক্তি তা ধন প্রকাশ ও নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য বেধে রাখে এবং ঘোড়ার গর্দান ও পিঠে আল্লাহর হক্ক ভুলেনি তবে তা তার জন্য আবরণ স্বরূপ। আর যে, ব্যক্তি তা গর্ব ও অহংকারের জন্য বেধে রেখেছে, তা তার জন্য পাপ স্বরূপ' (শেষ পর্যন্ত)।

উক্ত হাদীসে لَمْ يَنْسَى حَقَّ اللهِ وَ رِقَابِهَا এসেছে, যা যাকাত ওয়াজিব হওয়াটাই বুঝায়। কারণ, ঘোড়ার উপর আল্লাহর হক যাকাত ছাড়া আর কিছুই না। **সাহাবাইন রহ. এর পেশকৃত হাদীসের জবাব :** হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদীসে মুজাহিদের ঘোড়া বুঝানো হয়েছে। যায়েদ ইবনে ছাবিত রাযি. বলেন, এখানে ঘোড়া দ্বরা উদ্দেশ্য মুজাহিদের ঘোড়া।

قوله : وَالْبِغَالُ الخ : গাধা, খচ্চরে যাকাত ফরয নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— لَمْ يُنْزَلْ عَلَى فِيْهِمَا شَيْءٌ - এতদুভয়ের সম্পর্কে আমার উপর কোন বিধান অবতীর্ণ হয় নি।

এদিকে যাকাতের পরিমাণ দলিলে নকলী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এতে কিয়াসের কোন দখল নেই। তাই অন্য কোন প্রাণীর উপর কিয়াস করে গাধা বা খচ্চরের উপর যাকাত ওয়াজিহব বলা যাবে না। তবে হা যদি তা ব্যবসার জন্য হয়ে থাকে তবে তা ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে যাকাত ওয়াজিব।

قوله : وَالْحِمْلَانِ وَالْفُصْلَانِ الخ : উটের এক বৎসরের শাবক মহিষের এক বৎসরের শাবক, মেষের এক বৎসর পূর্ণ হয়নি এমন শাবকের উপর ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে যাকাত ফরয নয়। তবে হা উক্ত পশুগুলোর সাথে এক বৎসর বা তদুর্ধ্ব পশু থাকে তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। ইহা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সর্বশেষ মতামত। তাই ইমাম মুহাম্মদ রহ. গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে এ ব্যাপারে অন্য মত হল, উটের শাবকে উটের যাকাত গরুর শাবকে গরুর যাকাত ও মেষের শাবকে মেষের যাকাত ওয়াজিব হবে। তা ই ইমাম যুফার ও মালিক রহ. এর অভিমত। পরবর্তীতে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে তৃতীয় একটি মতামত পাওয়া গেছে। আর তা হল, উক্ত শাবকের মধ্য থেকেই একটি শাবক ওয়াজিব হবে। তা ই, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতামত যা যুফার ও মালিক রহ. গ্রহন করেছেন তার দলিল হল : হাদীসে যেখানেই যাকাতের পরিমাণের আলোচনা হয়েছে, সেখানে ابل - بقر -

غنم শব্দাবলী উল্লেখ হয়েছে। যা ছোট বড় মাঝারী সবটিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। তাই ابل - بقر - غنم ছোট বড় সবটি শামিল করার দরুন যেমন এক বৎসর বা তদুর্ধ্বের উপর যাকাত ফরয তেমনি শাবকদের উপরও ঐ পরিমাণ ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু হানিফরা রহ. এ মতামত যা ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী রহ. গ্রহন করেছেন, তার দলিল হল : উক্ত শাবকগুলোর মধ্যে তার থেকে একটি শাবক যাকাত হিসাবে প্রদান করা যা মালিক তথা যাকাতদাতা ও গরীব উভয়ের প্রতি সুবিচার করা হয়। পক্ষান্তরে শাবকের উপর সে জাতীয় বড় প্রাণী ওয়াজিব করাতে মালিকের জন্য অন্যত্র থেকে ক্রয় করা যা রীতিমত কষ্টের কাজ। সুতরাং সে দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, শাবকের যাকাত প্রদান করা হবে শাবক দ্বারা। ইমাম আবু হানিফরা রহ. এর সর্বশেষ অভিমত যা ইমাম মুহাম্মদ রহ. গ্রহণ করেছেন, তার দলিল হল : নিসাব ও যাকাতের পরিমাণ যুক্তি ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয় না। বরং শরীয়ত যা নির্ধারণ করেছে, তাই নির্ধারণ হয়। সুতরাং যদি কাহারো নিকট এক বৎসরের কম বয়সের মেষ শাবক, বা গো-বৎস বা উটের শাবক থাকে এবং এর চেয়ে অধিক বয়সের শাবক না থাকে তবে সে হয়ত হাদীসে বর্ণিত যাকাতের পশু ক্রয় করে যাকাত আদায় করবে, নতুবা এগুলো থেকে শাবক দ্বারা যাকাত আদায় করবে। প্রথম অবস্থায় উত্তম মাল বা পূর্ণ মাল পরিশোধ করা হল। অথচ যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ মাল বা উত্তম মাল আদায় করা শরীয়ত সমর্থন করে না। কেননা, শরীয়াত যাকাত দানের ক্ষেত্রে মধ্যম মাল দানের নির্দেশ করে। আর দ্বিতীয় অবস্থা এজন্য গ্রহণীয় নয় তা হাদীসের বিপরীত। কেননা, হাদীসে নুন্যতম এক বৎসরের শাবকের কথা উল্লেখ আছে। অতএব, যা শরীয়ত নির্ধারণ করেছে তা আদায় করা সম্ভবপর হলো বিধায় অন্য কোন কিছু যুক্তির ভিত্তিতে ওয়াজিব করা যাবে না।

قوله : وَالْعَوَامِلِ وَالْعَلُوْفَةِ الخ : আমাদের মতেও ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে কাজে নিয়োজিত এবং সংগ্রহীত খদ্যে প্রতিপালিত পশুর উপর যাকাত নেই। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রহ. এর মতে উক্ত প্রাণীগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। তার দলিল হল, কোরআন হাদীসে যাকাতের আলোচনায় কোন শর্ত যুক্ততা নেই। বরং সাধারণভাবে উল্লেখ হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً আপনি তাদের মাল থেকে যাকাত গ্রহন করুন। উক্ত আয়াতে اَمْوَالٌ শব্দটি উল্লেখ আছে যা ব্যাপকার্থবোধক। তা سائمة - علوفة - عوامل সবটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। তদ্রূপ হাদীস শরীফে ইরশাদ হল-

فِىْ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَ فِىْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ اَوْ تَبِيْعَةٌ وَ فِىْ اَرْبَعِيْنَ شَاةٍ شَاةٌ -

উক্ত হাদীসে سائمة হউক বা علوفة বা عوامل হউক তার উপর সমানভাবে যাকাত ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল হল : হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন- لَيْسَ فِى الْاِبِلِ الْحَوَامِلِ صَدَقَةٌ - ভার বহনে নিযুক্ত উটে যাকাত ফরজ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. রাসূলুল্লাহ্ সা. থেকে বর্ণনা করেছেন- لَيْسَ فِى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ কাজে নিয়োজিত উটের উপর যাকাত ফরয নয়।

হযরত জাবের রাযি. রাসূলুল্লাহ্ সা. হতে বর্ণনা করেছেন- لَيْسَ فِى الْبَقَرِ الْمُثِيْرَةِ صَدَقَةٌ চাষাবাদে নিযুক্ত গরুর ক্ষেত্রে যাকাত ফরয নয়।

দ্বিতীয় দলিল : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বর্ধনশীল সম্পদ হওয়া। পক্ষান্তরে উক্ত প্রাণীগুলো বর্ধনশীল নয়। কেননা, বর্ধনশীল হওয়ার দলিল হল এগুলো মুক্ত মাঠে বিচরণ করা বা ব্যবসায়িক হওয়া।

ইমাম মালিক রহ. এর দলিলের জবাব হল : উক্ত আয়াত হাদীস সমূহ মূলত বাহ্যিকার্থে مطلق নয়। কেননা, উক্ত আয়াতটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্তযুক্ত। অথচ যাকাত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফরজ হয়। সুতরাং প্রতিয়মান হয় যে, আয়াত ও হাদীস যাকাত ওয়াজিব তা বর্ণনা করার জন্য এসেছে তা ছাড়া অন্যান্য শর্তের ক্ষেত্রে আয়াতটি মুজমাল (مجمل) আর مجمل এর ব্যাখ্যা হাদীস দ্বারা করা হয়। অতএব, ليس فى الحوامل এ

হাদীসটি خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً আয়াতের জন্য ناسخ নয়; বরং تفسير স্বরূপ।

قوله : وَلَوْ وَجَبَ الخ : সম্পদের মালিকের উপর যে পশু ওয়াজিব হয়েছে তা যদি বিদ্যমান না থাকে তবে যাকাত উসূলকারী তার কাছ থেকে নিম্ন মানের প্রাণী গ্রহন করতঃ অতিরিক্ত মূল্য উসূল করবে। নতুবা তার থেকে অধিক মূল্যের বা বয়সের প্রাণী গ্রহন করে অতিরিক্ত মূল্য ফিরত দিবে। অর্থাৎ কারো উপর উটের যাকাত বাবত بنت لبون ওয়াজিব হল কিন্তু তার নিকট بنت لبون নেই। হা حقة অথবা بنت مخاض আছে। এক্ষেত্রে مصدق হিক্কা গ্রহন করতঃ অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দিবে। যেমন بنت لبون এর মূল্য এক হাজার টাকা আর حقة এর মূল্য পনের শত টাকা এমতাবস্থায় مصدق হিক্কা গ্রহন করতঃ পাঁচশত টাকা মলিকের নিকট ফিরত দিয়ে দিবে। অথবা যাকাত উসূলকারী بنت مخاض গ্রহন করতঃ অতিরিক্ত মূল্যও উসূল করবে। যেমন بنت لبون এর মূল এক হাজার টাকা আর بنت مخاض এর মূল্য সাত শত টাকা। তাহলে উসূলকারী بنت مخاض গ্রহন করতঃ মালিকের কাছ থেকে বাকী তিনশত টাকা উসূল করবে। উল্লেখ্য যে, আমাদের মাযহাব মতে حقة বা بنت مخاض বা بنت لبون এসবের মূল্য নির্ধারণ হবে বাজার মূল্য দ্বারা। আর তা সব সময় উঠানামা করে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে দুটি পশুর মূল্যের তফাত নির্দিষ্ট আছে আর তা হল দুটি বকরী বা বিশ দিরহাম। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে কার উপর بنت لبون ওয়াজিব হয়েছে, কিন্তু তার নিকট حقة বা بنت مخاض আছে, তবে সে ক্ষেত্রে যাকাত উসূলকারী حقة গ্রহন করতঃ বিশ দিরহাম বা দুটি বকরী মালিককে ফিরিয়ে দিবে। অথবা بنت مخاض গ্রহন করতঃ মালিকের কাছ থেকে দুটি বকরী বা বিশ দিরহাম ও উসূল করবে।

قوله : اَوْ قِيْمَتَهُ الخ : আমাদের মাযহাব মতে যাকাত দানের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদান করা জায়েয আছে। অনুরূপ ভাবে ইয়ামিন, কাফফারা, সদকাতুল ফিতর, ওশর ও মান্নতের মধ্যে (পশুর স্থলে) মূল্য প্রদান করা জায়েয আছে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে যে প্রাণী ওয়াজিব হয়েছে কেবল তাই প্রদান করতে হবে। তার মূল্য প্রদান করাতে যাকাত আদায় হবে না। বরং হাদীসে বর্ণিত পশুই যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে।

আমাদের দলিল হল : আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ তোমরা যাকাত প্রদান কর। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানের নির্দেশ করেছেন। সূরা হূদে রয়েছে— وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا সকল প্রাণীর রিজিক প্রদানের দায়িত্ব মহান আল্লাহর। উক্ত আয়াতে মহান প্রভু সকল প্রাণীর রিজিক প্রদানের দায়িত্ব নিজ জিম্মায় নিয়েছেন। এবং তাঁর এ অঙ্গিকার যাকাত প্রবর্তনের মাধ্যমে করেছেন। উক্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা কাউকে اسباب এর মাধ্যমে রিযিক পৌছান। যেমন, ব্যবসা, কৃষি ইত্যাদি। আর কাউকে اسباب ছাড়া রিযিক পৌছান। যেমন, ফকীর, মিসকীন। সুতরাং বুঝা গেল যাকাতের বিধান প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিশ্রুত রিযিক পৌছানো। বলাবাহুল্য যে, رزق বকরী, গাভী ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের অনেক জিনিস প্রয়োজন, যা উক্ত পশু দ্বারা পূর্ণ হয় না। তাই প্রাণীর শর্তারোপ করা গ্রহণযোগ্য নয়, বরং মূল্য দিলে জায়েয হবে।

قوله : وَيُؤْخَذُ الْوَسَطُ الخ : যাকাত সংগ্রহকারী উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহন করবে না। আর নিকৃষ্ট সম্পদও গ্রহন করবে না, বরং মধ্যম মানের সম্পদ গ্রহন করবে। কেননা, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন :

لَاتَأْخُذُوْا مِنْ حَزَرَاتِ اَمْوَالِ النَّاسِ وَ خُذُوْا مِنْ حَوَاشِى اَمْوَالِهِمْ -

"লোকদের উৎকৃষ্ট মাল গ্রহন করো না, বরং তাদের মধ্যম মাল গ্রহন করো।

অপরদিকে মধ্যম মাল গ্রহন করা দ্বারা যাকাত দান ও গরীবের প্রতি সুবিচার করা হয়। তাই যাকাত গ্রহন করার ক্ষেত্রে মধ্যম মাল গ্রহন করা হবে। কেননা, উৎকৃষ্ট মাল গ্রহন করাতে শুধু গরীবের প্রতি আর নিকৃষ্ট মাল

গ্রহন করাতে শুধু যাকাত দাতার প্রতি সুবিচার করা হয়। তাই উভয়পক্ষের প্রতি সুবিচার করার জন্য মধ্যম মানের সম্পদ গ্রহন করা হবে।

قوله : وَيَضُمُّ مُسْتَفَادُ الخ : বৎসরের মাঝখানে কিছু সম্পত্তি অর্জিত হলে পরে যদি তা পূর্বের নেসাবের জাত থেকে থাকে, তবে তা পূর্বের পশুর সাথে গণনা করা হবে এবং তার উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বর্ষপূর্তির কোন প্রয়োজন নেই।

তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন : উক্ত সম্পত্তি যদি পূর্বের পশুর শাবক না হয়ে হেবা, ক্রয়, মিরাস সূত্রে অর্জিত হয়, তবে তার জন্য বর্ষপূর্তির প্রয়োজন আছে। আর যদি বৎসরের মাঝখানে প্রাপ্ত সম্পত্তি পূর্বের পশুর জাত থেকে না থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার জন্য বর্ষপূর্তির প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ, কারো নিকট উটের নিসাব আছে, এবার বৎসরের মাঝখানে কয়েকটি গরু প্রাপ্ত হল, তবে উক্ত গরুর উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বর্ষপূর্তির প্রয়োজন আছে।

قوله : وَلَوْ اَخَذَ الْخَرَاجَ الخ : যদি নির্ধারিত মুসলমান مصدق তথা যাকাত উসূলকারী ব্যতিত অন্য কোন বিদ্রোহী মুসলমানের নগর থেকে কাফিরদের নিকট থেকে রাজস্ব এবং মুসলমানদের থেকে যাকাত উঠিয়ে নেয়, তবে পুনরায় মুসলিম مصدق তা আদায় করবে না। অর্থাৎ পুনরায় তা আদায় করতে হবে না। কেননা, মুসলিম খলিফা বা সম্রাট তাদেরকে রক্ষা করেনি। অর্থাৎ বিদ্রোহীদের হামলা থেকে তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব ন্যায় পরায়ণ খলিফার কর্তব্য। কিন্তু যেহেতু তিনি তাদেরকে রক্ষা করতে পারলেন না বিধায় তাদের থেকে পুণরায় খেরাজ, উশর, যাকাত ইত্যাদি আদায় করতে পারবে না।

قوله : وَ لَوْ عَجَّلَ ذُوْ نِصَابٍ الخ : কয়েক বছরের যাকাত অগ্রীম প্রদান করা জায়েয আছে। কেননা মালের سبب وجوب বিদ্যমান। অধিকন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে দু বৎসরের যাকাত অগ্রীম গ্রহন করেছেন। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, কয়েক বছরের যাকাত অগ্রীম প্রদান করায় কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে আমাদের মাযহাব মতে নিসাবের মালিক বর্ষ পূর্তির পূর্বেও যাকাত আদায় করা জায়েয আছে। ইহা ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এর মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রহ. এর মতে তা জায়েয নেই।

আমাদের দলিল হল : সে ব্যক্তি سبب وجوب বা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণে তার যাকাত আয়াদ করল। আর سبب وجوب এর পর যাকাত আদায় করা জায়েয আছে। যেমন কেহ কাউকে এমনভাবে ভুলবশত গুলি করল যে সে এ ক্ষত থেকে বাচার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ জীবনের আশা নেই। এদিকে ভুলবশত হত্যার জন্য ক্রীতদাস আজাদ করা প্রয়োজন। এখন যদি উক্ত হত্যাকারী যখম কৃত ব্যক্তির মুমূর্ষ অবস্থায় ক্রীতদাস আজাদ করে ফেলে তবে তার এ আজাদ করাটা সহীহ হবে। কেননা, سبب فعل পাওয়া গেছে। তদ্রূপ যাকাতের ক্ষেত্রেও যেহেতু سبب وجوب পাওয়া গেছে তাই অগ্রীম আদায় করলেও তার এ আদায় করাটা সহীহ হবে।

بَابُ زَكٰوةِ الْمَالِ

পরিচ্ছেদ : সম্পদের যাকাতের বিবরণ

يَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا رُبْعُ الْعُشْرِ وَلَوْ تِبْرًا أَو حُلِيًّا أَو آنِيَةً ثُمَّ فِيْ كُلِّ خُمُسٍ بِحِسَابِهِ وَالْمُعْتَبَرُ وَزْنُهُمَا أَدَاءً وَوُجُوبًا وفي الدَّرَاهِمِ وَزْنُ سَبْعَةٍ وهو أَنْ تَكُونَ الْعَشَرَةُ مِنْهَا وَزْنَ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ -

অনুবাদ : (দু'শত দিরহাম অথবা বিশ দীনারের কমে যাকাত ওয়াজিব নয়) দু'শত দিরহামে এবং বিশ দীনারে চল্লিশাংশের এক অংশ ওয়াজিব হবে। যদিও তা খাটি স্বর্ণ অথবা অলংকার বা পাত্র হয়। অতঃপর প্রতি পঞ্চমাংশে এ হিসেবে ওয়াজিব হবে। যাকাত আদায় ও ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়টির ওজন গ্রহনযোগ্য। দিরহামের ক্ষেত্রে وزن سبعة (ওজনে সাবআ) গ্রহনযোগ্য। অর্থাৎ প্রতি দশ দিরহামের ওজন সাত মিসকাল হওয়া।

শব্দার্থ : تِبْرٌ - স্বর্ণরেণু, স্বর্ণপিন্ড, স্বর্ণ বা রূপার পাত, যা দ্বারা কোন অলংকার প্রস্তুত করা হয়। حُلِيٌّ (ج) حَلْيٌ - গহনা, অলঙ্কার। اٰنِيَةٌ -পাত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

আরবদের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু পশু, তাই তার আলোচনা প্রারম্ভে করেছেন। অতঃপর রৌপ্য মুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রাসহ অন্যান্য বস্তুর যাকাতের আলোচনা করেছেন।

قوله : يَجِبُ فِيْ مَائَتَيْ دِرْهَمٍ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. রৌপ্যের নিসাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, দু'শত রৌপ্য মুদ্রাতে যাকাত ওয়াজিব হয়। সুতরাং তার কমে যাকাত ওয়াজিব হয় না। অতএব যদি দু'শত রৌপ্য মুদ্রা থাকে আর তার উপর বর্ষপূর্তি হয়, তাহলে এর উপর চল্লিশভাগের এক ভাগ তথা পাঁচ (দিরহাম) রৌপ্যমুদ্রা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে স্বর্ণমুদ্রা বিশটির নিচে যাকাত ওয়াজিব হবে না। সুতরাং বিশটি স্বর্ণমুদ্রা হলে আর তার উপর বর্ষপূর্তি হলে তার চল্লিশভাগের এক ভাগ তথা অর্ধ স্বর্ণমুদ্রা ওয়াজিব হবে। **দলিল হল :** রাসূলুল্লাহ্ সা. হযরত মুআয রাযি. এর নিকট প্রেরিত পত্রে বলেছেন—

خُذْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِيْمَ وَمِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ نِصْفُ مِثْقَالٍ -

'প্রতি দু'শত দিরহাম হতে পাঁচ দিরহাম এবং বিশ মিসকাল স্বর্ণ হতে অর্ধ মিসকাল গ্রহণ কর।'

হযরত ইবনে উমর ও হযরত আয়েশা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত যে—

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا نِصْفَ دِيْنَارٍ وَمِنَ الْاَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا -

রাসূলুল্লাহ্ সা. প্রত্যেক বিশ দীনার হতে অর্ধ দীনার এবং প্রতি চল্লিশ দীনার হতে এক দীনার গ্রহন করতেন।'

قوله : وَلَوْ تِبْرًا اَوْ حُلِيًّا الخ : تبر বলা হয় রৌপ্যের পাত যা দ্বারা কোন বস্তু প্রস্তুত করা হয় নাই। আর حلى বলা হয় স্বর্ণের অলঙ্কার যা মহিলারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে থাকে। আর اٰنِيَةٌ বলা হয় বর্তন, স্বর্ণ

রৌপ্যের পাত্র। সুতরাং تِبْر - حُلِي - آنِيَة এসবের মধ্যে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী নিসাব পরিমাণ হলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে মহিলাদের অলঙ্কারাদীতে এবং পুরুষের ব্যবহার্য রৌপ্যের আংটিতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। ইহা ইমাম মালিক ও আহমদ রহ. এরও মাযহাব। তাদের দলিল হল যে উক্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহার্য। আর ব্যবহার্য্য বস্তুর উপর স্বাধারণত যাকাত ওয়াজিব হয় না। যেমন দৈনন্দিন ব্যবহারের কাপড় এবং পরিশ্রম করাকালীন কাপড়ের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। **আমাদের দলিল :** যে সম্পদ বর্ধমান তাতে যাকাত ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার سبب বা কারণ হল মাল বৃদ্ধি পাওয়া। আর মালের মাঝে বর্ধমান পাওয়া যায় দুভাবে : ১। خلق বা জন্মগতভাবে। যেমন স্বর্ণ-রৌপ্য ২ فعلى বা কর্মের দ্বারা। যেমন- ব্যবসার দ্বারা।

উল্লেখিত বস্তুসমূহে জন্মগতভাবে বর্ধনের দলিল রয়েছে। অপর দিকে ব্যবহারের কাপড়ের মধ্যে خلق অথবা فعلى কোনভাবেই বর্ধমানের অর্থ পাওয়া যায় না। বিধায় তাতে যাকাত ওয়াজিব হয় না। দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কুরআনে কারীমে আছে—

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ●

'যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং ইহা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না। (অর্থাৎ যাকাত প্রদান করে না। তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান করুন।'

উক্ত আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বর্ণ- রৌপ্য বিগলিত হোক বা না হোক, আর তা বিগলিত হলে তা কোন বস্তুর সূরতে হোক বা না হউক, অথবা অলংকার হোক বা না হোক সর্ব অবস্থায় এতে যাকাত ফরয হবে। কেননা, আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করার কারণে যন্ত্রণা দায়ক শাস্তির ধমকি এসেছে।

قوله : ثُمَّ فِي كُلِّ خُمُسٍ بِحِسَابِهِ الخ : সুরতে মাসআলা হল : যদি রৌপ্য মুদ্রা দু'শ এর বেশি হয় তবে অতিরিক্ত অংশে যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে যদি অতিরিক্ত অংশ চল্লিশ দিরহামের পরিমাণ হয় তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। এভাবে যে দু'শ এর উর্ধ্বে প্রতি চল্লিশে এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। ইহা ইমাম আজম আবু হনিফা রহ. এর মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে দু'শ এর উর্ধ্বে যাকাত ওয়াজিব। অতিরিক্ত অংশ কম হউক বা বেশী হউক। এভাবে দু'শ এর উর্ধ্বে যত দিরহাম বেশী হবে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। সারকথা, যদি কারো নিকট দু'শ এক দিরহাম থাকে তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে শুধু পাঁচ দিরহাম ওয়াজিব হবে। অতিরিক্ত এক দিরহামে কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে হাঁ যদি দু'শ চল্লিশ দিরহাম থাকে তবে ছয় দিরহাম ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন রহ. এর মতে যদি দু'শ এক দিরহাম বিদ্যমান থাকে তবে পাঁচ দিরহাম ও এক দিরহামের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে দু'শ দিরহামের উর্ধ্বে যত দিরহামই হোক না কেন পাঁচ দিরহামের সাথে সাথে অতিরিক্ত দিরহামের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে।

সাহাবাইন রহ. এর দলিল : হযরত আলী রহ. এর বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে রয়েছে— وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابِهِ 'দু'শর উপরে যা অতিরিক্ত হবে তার যাকাত সেই হিসাবেই হবে।' তাছাড়া যাকাত সম্পদের শোকর আদায় হিসাবে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং দু'শ এর উর্ধ্বে যা বেড়েছে তাও দিরহামের হিসাব মুতাবেক শোকর আদায় করা ওয়াজিব।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল : রাসূলুল্লাহ্ সা. কর্তৃক হযরত মুআয রাযি.কে প্রদত্ত নির্দেশ নামায় রয়েছে- لَا تَأْخُذْ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا - নিসাবের ভগ্নাংশ থেকে কিছু গ্রহন কর না'। তদ্রূপ হযরত আমর ইবনে হাজম রাযি. এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে— لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ صَدَقَةٌ - চল্লিশ দিরহামের নীচে কোন যাকাত নেই।

এখানে লক্ষণীয় যে এ হুকুম দু'শ দিরহামের পরবর্তী চল্লিশের ক্ষেত্রে। যুক্তি নির্ভর দলিল হল : অসুবিধা শরীয়াতে অপরিহার্য। অথচ ভগ্নাংশে যাকাত ওয়াজিব করার দ্বারা অসুবিধা হয়। সুতরাং এ অসুবিধা ও জটিলতাকে পরিহার করার জন্য ভগ্নাংশের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। বরং দু'শ এরপর চল্লিশ দিরহাম অতিরিক্ত হয়, তবে তাতে পাঁচ দিরহামের সাথে আর এক দিরহাম ওয়াজিব হবে।

قوله : وَزْنُ سَبْعَةٍ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. বলেন, দিরহামের ক্ষেত্রে وزن سبعة গ্রহনযোগ্য। অর্থাৎ প্রতি দশ দিরহামের ওজন হবে সাত মিছকাল।

প্রাথমিক যুগে তিন ধরনের দিরহামের প্রচলন ছিল— (১) وزن عشرة (ওজনে আশারা) ২। وزن ستة (ওজনে সিত্তা।) (৩) وزن خمسة (ওজনে খামছা।) উক্ত তিন ওজনের মধ্যে وزن عشرة ছিল সর্বোত্তম। আর وزن ستة ছিল মধ্যম এবং وزن خمسة ছিল সর্বনিম্ন। সাধারণ মানুষ এ তিন ওজনের ভিত্তিতে লেনদেন ও যাকাতের আদান প্রদান করত। খলিফা হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযি. খলিফা হলে মনস্থ করলেন যাকাত ও রাজস্ব উত্তম তথা وزن عشرة দ্বারা করবেন। জনগণ তা কমিয়ে দেওয়ার জন্য দরবারে আবেদন করল। সে অনুযায়ী হযরত উমর রাযি. হিসাব বিজ্ঞানীদেরকে তিন ওজনের মধ্যে মধ্যম ওজন নির্ধারণ করার দায়িত্ব দিলেন। সে মতে বিজ্ঞানীরা তিন ওজনের মিছকাল একত্র করায় তার সংখ্যা দাঁড়ায় একুশ। উক্ত একুশ মিছকালকে তিনভাগে ভাগ করাতে প্রতিভাগে সাত মিছকাল হয়। সুতরাং তারা নির্ধারণ করলেন وزن سبعة অর্থাৎ প্রতি দশ দিরহামের ওজন হবে সাত মিছকাল। আর এর উপরই সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এ হিসাবের ভিত্তিতে হযরত উমর রাযি. এর রাষ্ট্রে লেনদেন হত এবং তা ই স্থায়ী হয়ে যায়।

وَغَالِبُ الْوَرِقِ وَرِقٌ لَا عَكْسُهُ وَفِي عُرُوضِ تِجَارَةٍ بَلَغَتْ نِصَابَ وَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ وَنُقْصَانُ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ لَا يَضُرُّ إِنْ كَمُلَ فِي طَرَفَيْهِ وَتُضَمُّ قِيمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى الثَّمَنَيْنِ وَالذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ قِيمَةً -

---

অনুবাদ : এবং (কোন রৌপ্য বস্তুতে) রূপার পরিমাণ বেশি হলে তা রূপা হিসাবেই গণ্য হবে। তবে তার বিপরীত হলে রূপা হিসাবে গণ্য হবে না। আর ব্যবসায়িক পণ্য দ্রব্য রৌপ্যের বা স্বর্ণের নিসাব পরিমাণ পৌঁছলে (তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে)। বছরের মধ্যবর্তী সময়ে নিসাবে হ্রাস হলে ক্ষতিকারক হবে না (অর্থাৎ যাকাত রহিত হবে না) যদি বছরের উভয় প্রান্তে নিসাব পূর্ণ থাকে। (নিসাব পূর্ণ করতে) পন্যদ্রব্যের মূল্য স্বর্ণ রৌপ্যের মূল্যের সাথে যুক্ত করা হবে এবং (নিসাব পূর্ণ করতে) স্বর্ণকে রৌপ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ غَالِبُ الْوَرِقِ وَرِقٌ الخ : যদি রৌপ্য বা স্বর্ণের মধ্যে অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তবে তার দু অবস্থা হতে পারে। রৌপ্যের বা স্বর্ণের পরিমাণ বেশি। যদি এমনই হয় তবে মিশ্রিত বস্তুও রৌপ্যের বা স্বর্ণের ওজনের আওতায় এনে মোটের উপর যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে হিদায়া গ্রন্থকার বেশির পরিমাণ বলেছেন অর্ধেকের চেয়ে বেশি হওয়া। পক্ষান্তরে যদি রৌপ্যের বা স্বর্ণের পরিমাণ কম হয় তবে তা ব্যবসায়িক হলে ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হবে। রৌপ্য বা স্বর্ণ হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হবে না। এক্ষেত্রে হিদায়া গ্রন্থকার কমের পরিমাণ বলেছেন রৌপ্য বা স্বর্ণ অর্ধেকের চেয়ে কম হওয়া।

قوله : وَفِي عُرُوضِ تِجَارَةٍ الخ : স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া অন্যান্য ব্যবসায়িক পণ্য দ্রব্যের উপর বর্ষপূর্তির শর্তে

যাকাত ওয়াজিব। তার নিসাব হল তার মূল্য রৌপ্য বা স্বর্ণের নিসাবের পরিমাণ হওয়া। দলিল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন—

يُقَوِّمُهَا فَيُؤَدِّيْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং প্রতি দু'শ দিরহামে পাঁচ দিরহাম আদায় করা হবে। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত আছে—

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِيْ يُعَدُّ لِلْبَيْعِ -

'রাসূলুল্লাহ্ সা. আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যেন ঐ সম্পদের যাকাত প্রদান করা হয় যা ব্যবসার জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়।' দ্বিতীয়তঃ যে কোন পণ্যে ব্যবসার নিয়াত করার দ্বারা তা বর্ধন সম্পন্ন মালে পরিণত হয়। আর বর্ধন সম্পন্ন মালে (নিসাব পরিমাণ হলে) যাকাত ওয়াজিব। সুতরাং ব্যবসার মালে যাকাত ওয়াজিব হবে।

قوله : وَ نُقْصَانُ النِّصَابِ الخ : আমাদের মাযহাব মতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বৎসরের প্রারম্ভে ও শেষে নিসাব পূর্ণ থাকা অপরিহার্য। বিধায় বৎসরের মধ্য সময়ে নিসাবে হ্রাস হওয়া যাকাত রহিত করে না। ইমাম যুফার রহ. বলেন, বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিসাব পূর্ণ থাকা শর্ত। সুতরাং বছরে কোন এক সময় নিসাব হ্রাস পেলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে অনুরূপ মতামত রয়েছে স্বর্ণ রৌপ্য এবং সাইমা প্রাণীর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে। অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিসাব পূর্ণ থাকার শর্তারোপ করেন নি। তাদের দলিল হল : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য سبب বা কারণ হল বর্ষপূর্তি হওয়া। আর ইহার শাখা পূর্ণ বছর নিসাব বিদ্যমান থাকা।

এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, পূর্ণ বছর নিসাব বিদ্যমান থাকা শর্ত। ইমাম শাফেয়ী রহ. ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্যের মধ্যে অসুবিধা ও জটিলতা থাকার দরুন এশর্ত থেকে মুক্ত করেছেন। আমাদের দলিল হল : বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ে নিসাব পূর্ণ হওয়ার শর্ত আরোপ করা অনেক কঠিন। কেননা, মাল সর্বদা কম বেশি হতে থাকে। তবে শুধু প্রথমে ও শেষে নিসাব পূর্ণ থাকা অপরিহার্য। শুরুতে নিসাব পূর্ণ থাকা একারণে শর্ত যাতে যাকাতের কারণ বা سبب পাওয়া যায় এবং মুখাপেক্ষীহীনতা প্রমাণিত হয়। আর শেষে নিসাব পূর্ণ থাকা একারণে শর্ত যাতে যাকাত ওয়াজিব হওয়া সাবিত হয়। সুতরাং প্রথমে ও শেষে পূর্ণ হওয়া শর্ত।

قوله : وَ تَضُمُّ قِيْمَةَ الْعُرُوْضِ الخ : যদি কারো নিকট ব্যবসায়ীক পণ্য থাকে তবে তা নিসাব পরিমাণ নেই। অপর দিকে তার কাছে কিছু স্বর্ণ বা রৌপ্য আছে। এমতাবস্থায় ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্যকে স্বর্ণ বা রৌপ্যের সাথে যুক্ত করে যাকাত আদায় করবে। কেননা, প্রতিটি জিনিসে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার سبب বা কারণ হচ্ছে বর্ধণ সম্পন্ন সম্পদ হওয়া। আর এগুণ ব্যবসার পণ্যে বান্দার পক্ষ থেকে সাবিত হয় এবং স্বর্ণ রৌপ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা এদুটুকে ব্যবসার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং উভয় অবস্থায় উভয় জিনিসে বর্ধন পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে উভয়টিকে সংযুক্ত করতঃ যাকাত প্রদান করা হবে।

قوله : وَالذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ قِيْمَةً الخ : স্বর্ণ রৌপ্য উভয়টি পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ নিসাবে না পৌঁছলে আর উভয়টি বিদ্যমান থাকে তবে উভয়টির মূল্য যুক্ত করে নিসাব পরিমাণ হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মালিক রহ. এর মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মধ্যে একটি-আরেকটির মূল্যের সাথে সংযুক্ত হবে না এবং পৃথক পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না হলে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। তিনি বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির, মূলগতভাবে ও এক নয়। হুকুমগতভাবেও এক নয়। সুতরাং তার মূল্য সংযুক্ত করা যাবে না।

আমাদের দলিল হল : স্বর্ণ ও রৌপ্য যদিও (حقيقة) মূলগতভাবে এক নয়, তথাপি সামানিয়্যাত (ثمنيت) বা মুদ্রা হওয়ার দিক থেকে উভয়টি একও অভিন্ন। আর ثمنيت বা মুদ্রা হওয়াটিই যাকাত ওয়াজিব হওয়ার سبب বা কারণ। সুতরাং ثمنيت এর দিক থেকে উভয়টি এক প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। অপর দিকে হযরত বুকাইর ইবনে আশাজ্জ রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও আমাদের মাযহাবের সমর্থন করে—

مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ضَمِّ الذَّهَبِ اِلَى الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ اِلَى الذَّهَبِ فِى اِخْرَاجِ الزَّكٰوةِ -

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে নবীজী সা. এর সাহাবাদের এ পদ্ধতি প্রসিদ্ধ ছিল যে, তারা স্বর্ণকে রৌপ্যের সাথে এবং রৌপ্যকে স্বর্ণের সাথে সংযুক্ত করতেন। অতএব, উল্লেখিত দলিলের ভিত্তিতে যাকাত দানের ক্ষেত্রে উভয়টিকে সংযুক্ত করা যাবে বলে প্রমাণিত হল।

بَابُ الْعَاشِرِ

পরিচ্ছেদ : জাকাত উসূলকারীর বিববরণ

هُوَ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ لِيَأْخُذَ الصَّدَقَاتِ من التُّجَّارِ فَمَنْ قال لم يَتِمَّ الْحَوْلُ أو عَلَيَّ دَيْنٌ أَوْ أَدَّيْتُ أَنَا أَوْ إِلَى عَاشِرٍ آخَرَ وَحَلَفَ صُدِّقَ إِلَّا فِي السَّوَائِمِ فِي دَفْعِهِ بِنَفْسِه وَكُلُّ شَيْءٍ صُدِّقَ فِيهِ الْمُسْلِمُ صُدِّقَ فِيهِ الذِّمِّيُّ لَا الْحَرْبِيُّ إِلَّا فِي أُمِّ وَلَدِه وَأَخَذَ مِنَّا رُبُعَ الْعُشْرِ وَمِنَ الذِّمِّيِّ ضِعْفَهُ وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرَ بِشَرْطِ نِصَابٍ وَأَخْذِهِمْ مِنَّا وَلَمْ يُثَنِّ فِي حَوْلٍ بِلَا عَوْدٍ وَعَشَرَ الْخَمْرَ لَا الْخِنْزِيرَ وما في بَيْتِهِ وَالْبِضَاعَةَ وَمَالَ الْمُضَارَبَةِ وَكَسْبَ الْمَأْذُونِ وَثَنَّى إِنْ عَشَرَ الْخَوَارِجُ -

অনুবাদ : উসূলকারী তিনি হবেন যাকে ইমাম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহন করার জন্য নির্দিষ্ট করেন। সুতরাং যে বলে বৎসর পূর্ণ হয়নি বা আমার উপর ঋন রয়েছে অথবা আমি আদায় করেছি বা অন্য উসূলকারীর নিকট দিয়েছি এবং শপথ করে তবে তা সত্যায়ন করা হবে। পক্ষান্তরে সাওয়াইম পশুর যাকাতের ক্ষেত্রে নিজে আদায় করছে বললে গ্রহন যোগ্য নয়। আর মুসলমানকে যে বিষয়ে সত্যায়ন করা হবে সে বিষয়ে যিম্মিকেও সত্যায়ন করা হবে। তবে কাফিরকে সত্যায়ন করা হবে না। তবে হাঁ তার উম্মেওলাদের ব্যাপারে সত্যায়ন করা হবে। (অর্থাৎ দাসীদের ব্যাপারে বলে যে এরা উম্মে ওলাদ তবে সে কথা গ্রহনযোগ্য)। আমাদের (মুসলমানদের) কাছ থেকে দশমাংশের এক চতুর্থাংশ গ্রহন করা হবে। আর জিম্মিদের কাছ থকে অর্ধেক (তথা দশমাংশের অর্ধেক) আর হারবীর কাছ থেকে পূর্ণ দশমাংশ গ্রহন করা হবে নিসাব পূর্ণ হওয়ার শর্তে। (যদি তারা আমাদের কাছ থেকে উসূল করে না তবে আমরাও তাদের থেকে উসূল করা হতে বিরত থাকতে হবে।) এবং

এক বৎসরের ভিতর দুবার উসূল করা যাবে না। দ্বিতীয় বৎসর পুনরায় ফিরার পূর্বে। মদের ওশর গ্রহন করা হবে, তবে শুকরের ওশর, তার বাড়িতে যা আছে তার ওশর কিংবা অন্যের প্রদত্ত পুজির ওশর বা মুজারাবার মালের ওশর অথবা গোলামের উপার্জিত মালের ওশর গ্রহন করা যাবে না। এবং দ্বিতীয়বার ওশর গ্রহন করা হবে যদিও বিদ্রোহীরা পূর্বে একবার নিয়ে নেয়।

শব্দার্থ : نَصَبَ (ن) نَصْبًا - স্থাপন করা, নিয়োগ করা। تُجَّارٌ ইহা تَاجِرٌ এর ব.ব., ব্যবসায়ীবৃন্দ। بِضَاعَةٌ (ج) بَضَائِعُ - পণ্য, মালামাল। مُضَارَبَةٌ - ব্যবসায় লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসা। اَلْمَاذُوْنُ - অনুমতি প্রাপ্ত। এখানে اَلْمَاذُوْنُ দ্বারা উদ্দেশ্য عَبْدُ الْمَاذُوْنِ -অর্থাৎ মুনিব কর্তৃক ব্যবসার অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ العَاشِرِ الخ : ওশর উসূলকারীদেরকে عاشر বলা হয়। ওশর উসূলকারীদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকারী মুসলমানদের কাছ থেকে যে ওশর গ্রহন করা হয় তা প্রত্যক্ষভাবে যাকাত। তদ্রূপ (عاشر) আশির (حربى) কাফের, (ذمى) যিম্মি এবং মুসতামিন (مستامن) থেকেও গ্রহন করে। তবে তাদের থেকে যা গ্রহন করে তা যাকাত নয়। এজন্যে সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. উক্ত পরিচ্ছেদকে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের পর এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদের পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

قوله : وَهُوَ مَنْ نَصَبَهُ الخ : আশির (عاشر) ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যাকে রাষ্ট্রের খলীফা যাকাত উসূল করার জন্য নিযুক্ত করেছেন যাতে তিনি আগত ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে عشر - نصف عشر - ربع عشر ইত্যাদি গ্রহন করেন।

قوله : فَمَنْ قَالَ لَمْ يَتِمَّ الخ : যদি ব্যবসায়ী ব্যক্তি আশিরের কাছে বলে, আমার এ সম্পদের বর্ষপূর্তি হয় নি, অথবা বলে আমি ঋনগ্রস্ত, অথবা বলে আমি আদায় করেছি। নতুবা বলল অন্য কোন আশির এর কাছে আদায় করেছি, অতঃপর শপথ করে তবে তার কথা গ্রহনযোগ্য। প্রথম দু অবস্থা শপথসহ গ্রহণযোগ্য একারণে যে মূলত যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। আর কসমসহ অস্বীকার কারীর কথাই গ্রহণীয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ সুরতে শপথসহ গ্রহনীয় একারণে যে সে আমানত যথাস্থানে পৌছে দেয়ার দাবী করতেছে। তাই তা গ্রহনযোগ্য।

قوله : اِلَّا فِى السَّوَائِمِ الخ :সায়েমা পশুর ক্ষেত্রে যদি উপরোল্লিখিত জবাব দান করে এবং শপথ করে তবে তা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু যদি বলে সে নিজে আদায় করে দিয়েছে তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও তা কসমের সাথে বলে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে তার কথা শপথ সহ গ্রহন করা হবে। এবং তার থেকে দ্বিতীয় বার ওশর গ্রহন করা হবে না। তিনি দলিল দেন : মহান রাব্বুল আলামীনের বাণী- اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ - আয়াতে لِلْفُقَرَاءِ এর لام টি ملكيت এর জন্য এসেছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হল যাকাত দরিদ্রদের জন্য বা যাকাত গরীবদের হক্ব। এদিকে মালিক তা তাদের নিকট পৌছে দিয়েছে বিধায় সে দায়িত্বমুক্ত হয়েছে। **আমাদের দলিল হল :** যাকাত গ্রহন করার একমাত্র হক্বদার হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধানের। যেমন মহান প্রভু বলেন- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً - আপনি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহন করুন। রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন- خُذْ مِنَ الاِبِلِ صَدَقَةً - তুমি উট থেকে যাকাত গ্রহন কর। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, সায়েমা প্রাণীর যাকাত গ্রহন অধিকার রাষ্ট্র প্রধানের। নিসাবের মালিককে এ অধিকার রহিত করার অধিকার দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে اموال باطنة এর নিসাবের মালিক আদায় করার ক্ষেত্রে খলিফার স্থলবর্তী। অতএব এক্ষেত্রে মালিক আমানতদার। আর আমানতদারের কথা গ্রহনযোগ্য। বিধায় اموال باطنة যদি মালিক নিজে আদায় করার দাবী করে এবং কসমও করে তবে তার কথা গ্রহনযোগ্য। কিন্তু সায়েমার যাকাত গ্রহন করার মালিক বা অধিকার রাষ্ট্র প্রধানের, তাই তার অনুমতি ছাড়া তা

মালিক আদায় করে দিয়েছে বললে গ্রহনীয় নয়।

قوله : وَكُلُّ شَيْءٍ صُدِّقَ فِيهِ الْمُسْلِمُ الخ : যদি অতিক্রমকারী জিম্মি বা মুস্তামিন হয় এবং সে বর্ষপূর্তির বা ঋনের প্রাধান্যতা স্বীকার করে ওশর দিতে অস্বিকার করে তবে যেসব সুরতে মুসলমানদের কথা শপথ সহ গ্রহনযোগ্য হয়েছিল সেসব সুরতে জিম্মি বা মুস্তামিনের কথা গ্রহনযোগ্য হিসাবে গৃহিত হবে। কেননা, মুসলমান থেকে যা গ্রহন করা হয় তার দ্বিগুন জিম্মির কাছ থেকে গ্রহন করা হয়। সুতরাং যার থেকে দ্বিগুন নেয়া হল তার মধ্যে ঐসব শর্ত ধর্তব্য হবে, যা মুজাফ ইলাইহী তথা যার উপর দ্বিগুন নেয়া হয় এর মধ্যে ধর্তব্য হয়। সুতরাং মুসলমানের উপর যেভাবে বর্ষপূর্তির ঋন মুক্ত ইত্যাদি শর্ত প্রয়োজন তেমনি জিম্মি বা মুস্তামিনের ক্ষেত্রে তাই প্রজোয্য হবে এবং যেভাবে মুসলমানের বেলায় তার কথা কসমের সাথে গ্রহনীয়, অনুরূপভাবে জিম্মির কথাও কসমের সাথে গ্রহনীয়।

قوله : لَا الْحَرْبِيُّ الخ : যদি বিদ্রোহী বা দারুল হরবের কাফির ব্যবসা-বানিজ্যের উদ্দেশ্যে মুসলিম দেশে প্রবেশ করে আর আশিরকে বলে যে, এ সম্পদের বর্ষ পূর্তি হয়নি, বা আমি গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছি বা অন্য আশির এর কাছে দিয়েছি, তবে তার কথাকে সত্যায়ন করা হবে না। বরং তার কাছ থেকে আশির ওশর গ্রহন করবেনই করবেন। তবে হা যদি তার সাথে কোন বাদী থাকে আর বলে যে, সে ওম্মে ওয়ালাদ অথবা গোলাম থাকে আর সে তাদেরকে সন্তান বলে দাবী করে তবে তার এ দাবী গ্রহন করা হবে। এবং উম্মে ওয়ালাদ ও ছেলেদের উপর থেকে ওশর গ্রহন করা হবে না।

قوله : وَأَخَذَ مِنَّا رُبُعَ الْعُشْرِ الخ : আশির মুসলমানদের থেকে দশমাংশের এক চতুর্থাংশ গ্রহন করবে, জিম্মি ও মুস্তামিনদের থেকে দশমাংশের অর্ধেক গ্রহন করবে আর হরবীদের কাছ থকে দশমাংশই গ্রহন করবে। অনুরূপ হযরত উমর রাযি. যাকাত উসূলকারী কর্মকর্তা এবং আশিরকে হুকুম দিয়েছেন, যেমন তিনি বলেছিলেন—

خُذُوْا مِنَ الْمُسْلِمِ رُبُعَ الْعُشْرِ وَمِنَ الذِّمِّيِّ نِصْفَ الْعُشْرِ وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرَ -

হযরত উমর রাযি. এর এ সিদ্ধান্ত সাহাবায়ে কেরামদের সামনে ছিল, কিন্তু কোন সাহাবা এর ব্যতিক্রম মত পোষণ করেন নি। সুতরাং একথার উপর اجماع প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আকলী দলিল হল : মুসলমানদের থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এজন্য গ্রহন করা হয় যে রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন—

هَاتُوْا رُبُعَ عُشْرِ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

'তোমরা নিজেরা মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ প্রদান কর। প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম প্রদান কর'।

তবে সর্বাবস্থাতেই নিসাব পরিমাণ হতে হবে। পক্ষান্তরে যদি নিসাব পরিমাণ হয় না তবে তার থেকে عشر গ্রহন করা হবে না।

قوله : وَأَخَذَهُمْ مِنَّا الخ : হারবীর কাছ থেকে সে পরিমাণ গ্রহণ করা হবে যে পরিমাণ তারা আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকে। কেননা, হযরত উমার রাযি.কে এ ব্যাপারে আশিরগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে- كَمْ نَأْخُذُ مِمَّا مَرَّ بِهِ الْحَرْبِيُّ আমরা হারবীর কাছ থেকে কি পরিমাণ ওশর করব। প্রতি উত্তরে হযরত ওমর রাযি. বললেন- كَمْ يَأْخُذُوْنَ مِنَّا তারা আমাদের থেকে কি পরিমাণ গ্রহন করে থাকে। জবাবে বলা হল- عشر বা দশ ভাগের এক ভাগ। তখন তিনি বললেন- خُذُوْا مِنْهُمُ الْعُشْرَ তোমরাও তাদের থেকে উসূল গ্রহন কর। আর যদি তারা আমাদের থেকে কি পরিমান গ্রহন করে তা জানা না থাকে তবে হযরত উমর রাযি. বলেন- فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَالْعُشْرُ যদি তোমরা জানতে অক্ষম হও যে, তারা তোমাদের থেকে কি পরিমাণ গ্রহন করে তাহলে উসূর গ্রহন কর। আর যদি জানা

থাকে যে, তারা আমাদের থেকে দশমাংশের এক চতুর্থাংশ গ্রহন করে তবে আমাদের আশিরও তাদের থেকে এ পরিমাণ গ্রহন করবে। আর যদি জানা থাকে যে, তারা আমাদের সবকিছু নিয়ে নেয়, তবে তাদের থেকে আমাদের আশির পূর্ণ মাল নিয়ে নিবে না। কেননা, তা অশোভনীয় আচরণ যে, নিরাপত্তা দেওয়া হল, আবার পূর্ণ মাল ছিনিয়ে নেয়া হল। অনুরূপ যদি হারবীরা আমাদের মুসলমানকে নিরাপত্তা দানের পর হত্যা করে ফেলে তবে আমরা নিরাপত্তা দেওয়ার পর হত্যা করা ঠিক হবে না।

قوله : وَلَمْ يَثْنِّ فِي حَوْلِ الخ : যদি কোন حربى ব্যবসায়ী আশির এর নিকট দিয়ে যাতায়াত করে এবং আশির তা থেকে ওশর গ্রহন করে অতঃপর বর্ষপূর্তির পূর্বে আবার আশির এর নিকট দিয়ে যাতায়াত করে, তবে আশির তার থেকে কোন প্রকার ওশর দ্বিতীয়বার গ্রহন করবে না। তবে হাঁ যদি দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তির পরে বা দ্বিতীয় বর্ষে পুনরায় আশির এর নিকট দিয়ে যাতায়াত করে তবে তার থেকে আশির দ্বিতীয়বার ওশর গ্রহন করবে। কেননা, একই বৎসর বার বার ওশর গ্রহন করাতে মালিকের মাল নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ হারবী থেকে ওশর গ্রহন করার অধিকার হলো তাদের মালের হিফাজত করার প্রেক্ষিতে। দ্বিতীয়তঃ হযরত উমর রাযি. এক আশিরের কাছে নির্দেশনামা লিখেছেন—

اِنَّكَ اِنْ اَخَذْتَ الْعُشْرَ مَرَّةً فَلَا تَأْخُذْ مَرَّةً اُخْرٰى

'যদি তুমি একবার ওশর গ্রহন করে থাক, তবে দ্বিতীয়বার গ্রহন করবে না।' সুতরাং প্রমাণিত হল যে একবার ওশর গ্রহন করার পর বর্ষপুর্তির পূর্বে পুনরায় ওশর গ্রহন করা যাবে না।

قوله : وَ عُشْرُ الْخَمْرِ الخ : যদি কোন জিম্মি বা মুস্তামিন বা হারবী ব্যবসার নিয়্যতে মদ বা শুকর কিংবা উভয়টি সঙ্গে নিয়ে পথ অতিক্রম করে এবং তার মূল্য নিসাব পরিমাণ তথা দু'শ দিরহামের সম পর্যায়ের হয়। তবে তার উপর ওশর ওয়াজিব হবে কিনা এ ব্যাপারে মোট চারটি অভিমত রয়েছে।

১। তরফাইন রহ. এর মতে মদের মূল্যের দশ ভাগের এক ভাগ গ্রহন করা হবে; তবে শুকর এর ওশর গ্রহন করা হবে না।

২। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে কোনটি থেকেই ওশর গ্রহন করা হবে না।

৩। ইমাম যুফার রহ. এর মতে মদ ও শুকর উভয়টি থেকে ওশর গ্রহন করা হবে।

৪। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে যদি জিম্মি উভয়টি নিয়ে যায় তবে আশির গ্রহন করবে, আর আলাদা নিয়ে গেলে শুধু মদের ওশর গ্রহন করবে। আর শুকরের ওশর গ্রহন করবে না। দ্বিতীয় মত তথা ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিল হল ওশর ওয়াজিব হয় মালের মধ্যে। অথচ মদ ও শুকর ইসলামের দৃষ্টিতে কোন মাল নয়। তাই তা থেকে ওশর ওয়াজিব হবে না। তৃতীয় মত তথা ইমাম যুফার রহ. এর দলিল হল : উক্ত বস্তুদ্বয় কাফিরের নিকট সম্পদ, যদিও তা মুসলমানদের নিকট মাল নয়। সুতরাং যেমন তাদের মদ ও শুকর ধ্বংস করাতে জরিমানা ওয়াজিব হয় তেমনি তাদের উক্ত মাল থেকে ওশর গ্রহন করা যায়েজ। চতুর্থ মতামত তথা ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর দলিল হল : تبعيت না পাওয়ার কারণে তা থেকে ওশর নেয়া যাবে না। প্রথম মতামত তথা তরফাইন রহ. এর দীলল হল : মদ ও শুকরের মধ্যে পার্থক্য করার কারণ হল- শুকর হল ذوات القيم বা মূল্য নির্ভর বস্তু আর ذوات القيم থকে মূল্য গ্রহন করা মূল বস্তু গ্রহন করার নামান্তর। সুতরাং শুকর যেহেতু মুসলমানদের জন্য নেয়া দেয়া মালিক হওয়া নাজায়েয। তাই তার ওশর গ্রহন করা হবে না। পক্ষান্তরে মদ হল ذوات الامثال বা সমতুল্য বস্তু। আর ذوات الامثال থেকে মূল্য গ্রহন করা মূল বস্তু গ্রহন করার হুকুম রাখে না। বিধায় মদ যদিও হারাম তথাপি তার মূল্য গ্রহণ করা জায়েয।

দ্বিতীয়ত ঃ ওশর গ্রহন করার অধিকার মূলত নিরাপত্তা দানের কারণে। আর মুসলমান সিরকা তৈরীর জন্য

মদ হিফাযত করে থাকে তাই যেভাবে নিজের মদ হিফাযত করে তদ্রূপ অন্যের মদ তথা জিম্মীর মদ হিফাজত করার জিম্মা নিতে পারে বিধায় ওশর গ্রহন করা যাবে। আর মুসলমান যেহেতু নিজে শুকর হিফাজত করে না এবং ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তা বর্জন করে তদ্রূপ অন্যের শুকর হিফাজতের জিম্মাও নিতে পারবে না।

قوله : وَالْبِضَاعَةُ الخ : بضاعة হল মালিক ব্যবসার জন্য কোন ব্যক্তিকে পুজি দেবে এবং পূর্ণ মুনাফা মালিক পাবে। ব্যবসাকারী কোন কিছু পাবে না। সুতরাং এমন পরিশ্রমকারী মালিকের মাল নিয়ে আশির এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে আশির তার থেকে ওশর গ্রহন করবে না। কেমনা, সে মালিকের পক্ষ থেকে ওশর দেওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত নয়। বিধায় আশির তার থেকে কিছু গ্রহন করলে তা যাকাত হিসাবে হবে না। কারণ, এমাল থেকে ওশর দেওয়াটা মালিকের পক্ষ থেকে আদেশ প্রাপ্ত নয়। আর আশির এর জন্য উসূর ও যাকাত ছাড়া কিছু গ্রহন করার অধিকার নেই।

قوله : وَمَالَ الْمُضَارَبَةِ الخ : مضاربة হল কেহ কাহাকে কিছু টাকা দিল ব্যবসা করার জন্য। অতঃপর মুনাফা যা হবে উভয়ের মাঝে সমানভাবে ভাগ হবে। সুতরাং مضاربة এর মাল নিয়ে যদি কেহ আশির এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে তবে সাহাবাইন রহ. ও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কাওলে জাদীদ মুতাবেক আশির তার থেকে ওশর গ্রহন করবে না। তবে হা যদি এ পরিমাণ মুনাফা হয় যে ব্যবসায়ীর ভাগেই দু'শ দিরহামের অধিক। তবে তা থেকে ওশর গ্রহন করা হবে। অনুরূপভাবে মুনিব কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম ব্যবসার জন্য নিসাব পরিমাণ মাল নিয়ে আশির এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করে তবে আশির তার থেকে ওশর গ্রহন করবে না।

قوله : وَثُنِّى اَنْ عَشَرَ الْخَوَارِجُ الخ : বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ স্থানের কেহ তাদের কোন আশির এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে আর সে তার থেকে ওশর গ্রহন করে, অতঃপর বৈধ শাষকের আশিরের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে তবে বৈধ আশির তার পুনরায় ওশর গ্রহন করতে পারবে।

بَابُ الرِّكَازِ

পরিচ্ছেদ : প্রোথিত সম্পদের বিবরণ

خُمِسَ مَعْدِنُ نَقْدٍ وَنَحْوُ حَدِيدٍ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ أَو عُشْرٍ لَا دَارِهِ وَأَرْضِهِ وَكَنْزٌ وَبَاقِيَةٌ لِلْمُخْتَطِّ له وَزِئْبَقٌ لَا رِكَازُ دَارِ حَرْبٍ وَفَيْرُوزَجٌ وَلُؤْلُؤٌ وَعَنْبَرٌ -

অনুবাদ : খেরাজী কিংবা ওশরী ভূমিতে স্বর্ণ-রৌপ্য লোহা জাতিয় খনিজ দ্রব্য পাওয়া গেলে তাতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। তবে তার ঘরে বা জমিতে পাওয়া গেলে কিছু ওয়াজিব হবে না। এবং প্রোথিত সম্পদ পাওয়া গেলে তার এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। আর বাকী উক্ত জমি জয়ের পর প্রশাষকের প্রথম চিহ্নিত ব্যক্তি মালিক হবে। এবং পারদেও এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। দারুল হরবের প্রোথিত সম্পদ ও ফিরোজা পাথরে এবং মুক্তা ও আম্বরে এক পঞ্চমাংশ নেই।

শব্দার্থ : مُخْتَطُّ لَهٗ - যাকে শাসক বিজয়ের পর কোন ভূমির মালিক বানিয়ে দেন। عَرِيق - পারদ। فَيْرُوزَج - ফিরোজা পাথর, নিলকান্তমনি। لُؤْلُؤ (ج) لَآلِى - মুক্তা, মোতি। عَنْبَر - সামুদ্রিক ফেনা। কেননা, সমুদ্রের ঢেউয়ের সৃষ্ট ফেনা থেকে আম্বরের জন্ম হয়। অতঃপর তা সমুদ্র তীরে ঢেউয়ের আঘাতে নিক্ষিপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, আম্বর সামুদ্রিক ঘাস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : خُمِسَ مَعْدِنُ نَقْدٍ الخ : জমি থেকে তিন ধরনের খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় : (১) كنز (২) معدن (৩) ركاز - মানুষ যে সম্পদ জমিনে প্রোথিত করে রাখে তাকে كنز বলে। আল্লাহ তায়ালা জমি সৃষ্টি লগ্ন থেকে যে সম্পদ তাতে গচ্ছিত রেখেছেন তাকে معدن বলে। আর ركاز হল জমিনে যা প্রোথিত থাকে চাই তা স্রষ্টা কর্তৃক বা মানুষ কর্তৃক প্রোথিত হোক। সুতরাং আমাদের মাযহাব মতে যদি খেরাজী বা ওশরী জমিতে পাওয়া যায় এমন খনিজ সম্পদ যথা স্বর্ণ-রৌপ্য, লোহা ইত্যাদি তবে এর পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতিত অন্যান্য খনিজ পদার্থে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আর স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া গেলে তাতে যাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। তবে হাঁ, এক্ষেত্রে তিনি বর্ষ পূর্তির শর্তারোপ করেন নি। কেননা, বর্ষপূর্তির শর্তারোপ করা হয় সম্পদ বর্ধন হওয়ার জন্য। কিন্তু খনিজ দ্রব্য যেহেতু বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েছে বিধায় তা মূল থেকেই বর্ধনশীল।

আমাদের দলিল হল : মহান প্রভূর বাণী—

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسُ

'জেনে রাখ গণিমতরূপে তোমরা যা কিছু পাও, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য। এদিকে জমি থেকে সম্পদ ও মূলতঃ গণিমতের মালস্বরূপ। কেননা, তা কাফিরের দখল থেকে মুক্ত করে মুসলমান বাঞ্ছিত করার দ্বারা তা মুসলমানগণ প্রাপ্ত হয়। আর যা কাফিরদের কবজা থেকে মুসলমানগণ প্রাপ্ত হয় তার সবকিছুই গণিমতরূপে স্বীকৃত। আর গণিমতের মালের চার পঞ্চমাংশ মালিকের জন্য থাকা আর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তা'আলার রাস্তার জন্য নির্ধারিত। যেমন হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদীসে রয়েছে—

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ قِيْلَ وَمَا الرِّكَازُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ خَلَقَ اللّٰهُ فِى الْاَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ -

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন- ভূগর্ভস্থ সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। কেহ জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! রিকায কি? রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, স্বর্ণ-রৌপ্য যা জমিন সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ তাআলা জমিতে গচ্ছিত রেখেছেন।

সুতরাং বুঝা গেল ভূগর্ভস্থ সম্পদ ও খনিজ দ্রব্য। আর খনিজ দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হল।

যুক্তি নির্ভর দলিল : খনিজ দ্রব্যের অঞ্চলটি কাফিরদের হস্তগত ছিল। অতঃপর মুসলমানের দখলে চলে আসে। সুতরাং উক্ত জমি থেকে যা পাওয়া যাবে তা গণিমতের অন্তর্ভুক্ত। আর গণিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব বিধায় খনিজ দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।

قوله : لَا فِىْ دَارِهٖ وَ اَرْضِهٖ الخ : যদি কেহ তার নিজ বাড়িতে খনীজ দ্রব্য পায় তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না। আর সাহাবাইন রহ. এর মতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে সাহাবাইন রহ. এর দলিল হল রাসূলুল্লাহ্ সা. এর বাণী فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। উক্ত হাদীসখানা ব্যাপক। ইহাতে জমি, বাড়ী ইত্যাদি কোন পার্থক্য করা হয়নি। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল : ইহা সৃষ্টিগতভাবে বাড়ির জমির অংশ বিশেষ। আর বাড়ীর কোন অংশে খেরাজ ওশর কিছুই ওয়াজিব হয় না। তাই খনিজ দ্রব্যে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি কেহ খনিজ পদার্থ স্বীয়

মালিকানাভুক্ত, জমিতে পেয়ে থাকে তাহলে এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দুটি অভিমত রয়েছে— (১) এক পঞ্চমাংশ বা কিছুই ওয়াজিব হবে না। (২) এতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। আর সাহাবাইন রহ. এর মতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। তাদের দলিল হল, পূর্বোক্ত হাদীসখানা— وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশের দলিল হল, মালিকানাভুক্ত। জমির কোন অংশে খেরাজ বা ওশর কোনটিই ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ খনিজ দ্রব্য যেহেতু জমির অংশ বিশেষ, তাই তা থেকে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না।

قوله : وَ كَنْزٌ وَ بَاقِيْهِ الخ : যদি জাহিলী যুগের প্রোথিত সম্পদ মালিকানাধীন ভূমিতে পাওয়া যায় তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে, আর বাকি চার পঞ্চমাংশ প্রাপকের জন্যে হবে, চাই সে মালিক হউক বা না হউক। কেননা, অধিকাংশ লাভ হয় পূর্ণ সংরক্ষণের মাধ্যমে। আর পূর্ণ সংরক্ষণ প্রাপকের দ্বারা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রহ. ও মুহাম্মদ রহ. বলেন, এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে আর বাকী চার পঞ্চমাংশ ঐ ব্যক্তির জন্য হবে যাকে দেশ জয়ের প্রাক্কালে শাসক জমিটির মালিক বানিয়ে দিয়েছেন এবং তার সীমানা চিহ্নিত করে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। শাষক কর্তৃক নির্ধারিত মালিকের অনুপস্থিতে তার উত্তরাধিকারীগণ উক্ত সম্পদের মালিক হবেন। কেননা, দেশ জয়ের পর সর্বপ্রথম তারই হস্তক্ষেপ এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে زيبق তথা পারদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর শেষোক্ত মতানুযায়ী এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ.ও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতানুযায়ী পারদে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না।

قوله : لَا رِكَازَ دَارِ الْحَرْبِ الخ : যদি কেহ দারুল হরবে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করে অতঃপর কোন মালিকানা বাড়িতে ভূগর্ভস্থ সম্পদ পেয়ে থাকে, হউক খনিজ দ্রব্য বা প্রোথিত সম্পদ, তবে তা মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিবে। কেননা, তা নিয়ে নেয়াতে বিশ্বাসঘাতকতা রয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সা.এর ইরশাদ— فِى الْعُهُوْدِ وَفَاءٌ لَا غَدَرَ অঙ্গিকার চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আর যদি সে দারুল হরবের মালিকানা মুক্ত কোন তেপান্তরে ভূগর্ভস্থ সম্পদ পেয়ে থাকে তবে তাহা তারই হবে এবং তা থেকে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না। এবং তা গ্রহন করা বিশ্বাসঘাতকতার অন্তর্ভুক্ত হবে না। অধিকন্তু তা গণিমতের মাল হিসাবেও গণ্য হবে না। কেননা, সে তা গোপনে হস্তগত কারীর ন্যায় পেয়েছে। অনুরূপভাবে ফিরোজা পাথর বা সুরমা পাথর যা পাহাড়ে পাওয়া যায় তাতেও এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— لَا خُمُسَ فِى الْحَجَرِ পাথরের ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ নেই।

অনুরূপভাবে মুক্তা ও আম্বরে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে মুক্তা আম্বর ও সমুদ্র থেকে আহরিত ভূষণের উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রহ. এর দলিল হল, যে সম্পদ মূলত কাফিরের দখলে ছিল, অতঃপর যুদ্ধ জিহাদের ভিত্তিতে মুসলমানগণ প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং এমন সম্পদে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। আর যা এরকম নয়, তাতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না। আর সমুদ্র যেহেতু কার দখলে নয়, তাই তা থেকে আহরিত স্বর্ণ-রৌপ্য, মুক্তা, আম্বর প্রভৃতিতে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না।

بَابُ الْعُشْرِ

পরিচ্ছেদ : ওশর (একাদশমাংশ)

يَجِبُ فِي عَسَلِ أَرْضِ الْعُشْرِ وَمَسْقِيِّ سَمَاءٍ وَسَيْحٍ بِلَا شَرْطِ نِصَابٍ وَبَقَاءٍ إِلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ وَنِصْفُهُ فِي مَسْقِيِّ غَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ وَلَا تُرْفَعُ الْمُؤَنُ وَضِعْفُهُ فِي أَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ لِتَغْلِبِيٍّ وَإِنْ أَسْلَمَ أَوِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ وَخَرَاجٌ إِنِ اشْتَرَى ذِمِّيٌّ أَرْضًا عُشْرِيَّةً مِنْ مُسْلِمٍ وَعُشْرٌ إِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ بِشُفْعَةٍ أَوْ رُدَّ عَلَى الْبَائِعِ لِلْفَسَادِ وَإِنْ جَعَلَ مُسْلِمٌ دَارَهُ بُسْتَانًا فَمُؤْنَتُهُ تَدُورُ مَعَ مَائِهِ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ وَدَارُهُ حُرٌّ كَعَيْنِ قِيرٍ وَنِفْطٍ فِي أَرْضِ عُشْرٍ وَلَوْ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ يَجِبُ الْخَرَاجُ -

অনুবাদ : ওশরী ভূমিতে পানি দ্বারা বা বৃষ্টির পানি দ্বারা সিঞ্চিত হোক তা থেকে উৎপন্ন মধুতে ওশর ওয়াজিব। নিসাব ও দীর্ঘস্থায়িত্বের শর্ত ছাড়া। কিন্তু জ্বালানি কাঠ, বাশ ও ঘাসের ওপর ওশর নেই বলতি দ্বারা বা পানি তোলার চাকি দ্বারা সেচ দেওয়া ভূমিতে উৎপন্ন ফসলে অর্ধেক ওশর ওয়াজিব হবে। এবং ব্যয়ভার নেয়া হবে না। তাগলবীর ওশরী জমির উপর দ্বিগুণ ওশর ওয়াজিব হবে যদিও সে ইসলাম গ্রহন করে অথবা কোন জিম্মি বা মুসলমান তা ক্রয় করে। আর ওশর ওয়াজিব হবে যদি তা (পূর্বে জিম্মির ক্রয় কৃত জমি) কোন মুসলমান শোফআর মাধ্যম লাভ করে অথবা বিক্রি ফাসেদ হওয়ার কারণে তা বিক্রেতাকে ফেরত নেয়া হয়। আর যদি মুসলমান তার বাড়িতে গান বানিয়ে নেয় তবে (যাকাতের) পরিমাণ পানির সাথে ফিরবে (অর্থাৎ ওশরী পানি দ্বারা সেচ করলে ওশর আর খেরাজী পানি দ্বারা সেচ করলে খেরাজ ওয়াজিব হবে) পক্ষান্তরে জিম্মি তার ব্যতিক্রম এবং তার ঘর স্বাধিন (তথা ওশর খেরাজ কিছুই ওয়াজিব হবে না)।

যেমন ওশরী জমিতে প্রাপ্ত আলকাতরা, বা তেলের কূপ (ইহাতে ওশর ওয়াজিব হবে না) তবে হা যদি তা খেরাজি ভূমিতে হয় তবে খেরাজ ওয়াজিব হবে।

শব্দবিশ্লেষণ : اَلْعُشْرُ - এক দশমাংশ। عَسَلٌ - মধু, মিঠা। سَيْحٌ - প্রবাহিত পানি। أَحْطَابٌ (ج) اَلْحَطَبُ - জ্বালানী কাঠ। اَلْقَصَبُ - গিটযুক্ত উদ্ভিদ, বাশ, বেত। حَشَائِشُ (ج) اَلْحَشِيشُ শুকনা ঘাস, খড়-কুটা, তৃণলতা। غُرُوبٌ (ج) غَرْبٌ - বড় বালতি, পশ্চিম। دَالِيَةٌ الية -চাকি, যাতে একাধিক বালতি বেধে গরু বা অন্য কোন কিছু দ্বারা ঘুরানো হয়। مُؤَنٌ ইহা مُؤْنَةٌ এর ব.ব., খাদ্যদ্রব্য, রসদ সংগ্রহ। عُيُونٌ (ج) عَيْنٌ - عَيْنٌ - ঝরনা, চোখ, দৃষ্টি। قِيرٌ - এক জাতিয় তৈল বা পানিতে ছেয়ে যায়। কালো রংয়ের এ পদার্থ পানিরোধ করে নৌকাতে ব্যবহার করা হয়। যেমন আলকাতরা। نَفْطٌ - খনি তৈল, পেট্রোল।

প্রাসঙ্গিক আলোচন :

قوله : وَيَجِبُ فِى عَسَلِ اَرْضِ الْعُشْرِ الخ : মধু যদি ওশরী ভূমি থেকে আহরণ করা হয় তবে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, ওশর ওয়াজিব হবে না। ইহা ইমাম মালিক রহ.এরও অভিমত। তাদের দলিল হল মধু মৌমাছি থেকে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তা রেশম পোকার সাদৃশ্য হল তাই যেভাবে রেশমের মধ্যে ওশর ওয়াজিব হয় না তেমনি মধুর মধ্যেও ওশর ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলিল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা. এর হাদীস—

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلَى اَهْلِ الْيَمَنِ اَنَّ فِى الْعَسَلِ الْعُشْرَ -

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে হুজুর সা. ইয়ামানবাসীদের নিকট লিখলেন, মধুতে ওশর রয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল : মৌমাছি বিভিন্ন ফল ফসলের রস আহরণ করে। সুতরাং যেহেতু ফল ফসলে ওশর ওয়াজিব হয়। তেমনি মধুতেও ওশর ওয়াজিব হবে। কিন্তু রেশম এর ব্যতিক্রম। কেননা, রেশমী পোকা তুত গাছের পাতা আহরণ করে অথচ পাতাতে কোন ওশর ওয়াজিব হয় না। সুতরাং মৌমাছিকে শাহ তুতের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়। মধুর নিসাব সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই।

قوله : وَمَسْقِيِّ سَمَاءٍ الخ : ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে নদী থেকে সিঞ্চিত হউক বা আসমান থেকে বৃষ্টির মাধ্যমে হউক সাধারণভাবে জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের তা কম হউক বা বেশী তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। এবং তাতে এক বৎসর সংরক্ষণের কোন শর্তারোপ করেন নি। পক্ষান্তরে সাহাবাইন রহ. এর মতে দু শর্ত পাওয়া গেলে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। প্রথম শর্ত জমি থেকে উৎপাদিত ফসল নিম্নে এক বৎসর কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ ছাড়া সংরক্ষণ করা যেতে হবে। যেমন, গম, ধান প্রভৃতি। আর যদি এক বৎসর সংরক্ষণ করা সম্ভবপর না হয় তবে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে না। যেমন, আঙ্গুর, তরমুজ, আপেল।

দ্বিতীয় শর্ত হল : উৎপাদিত ফসল কম হলে পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হতে হবে। এর কমে ওশর ওয়াজিব হবে না। আর এক ওয়াসাক রাসূলুল্লাহ্ সা. এর জামানায় প্রচলিত সা এর পরিমাণ ষাট সা। তাই পাঁচ ওয়াসাক তিন সা এর সমপরিমাণ। আর চার মনে এক সা' হয়। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাক হল বার শত মন। সাহাবাইন রহ. এর মতে সবজী জাতীয় পণ্যে ওশর ওয়াজিব হবে না। কেননা, তা ঔষধ প্রয়োগ ছাড়া এক বৎসর কাল পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। মোটকথা, ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহাবাইন রহ. এর মধ্যকার মতানৈক্য দুটি বিষয়ে রয়েছে। প্রথমত ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাব পরিপূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। পক্ষান্তরে সাহাবাইন রহ. এর মতে ওশর ওয়াজিব হতে হলে নিসাব পরিমাণ হতে হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ফল ফসলকে এক বৎসর সংরক্ষণ যোগ্য হওয়া শর্ত নয়। কিন্তু সাহাবাইন রহ. এর মতে শর্ত।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল : আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

তোমরা যা উপার্জন কর এবং জমি থেকে যা উৎপন্ন কর তার উৎকৃষ্ট কিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর।

উক্ত আয়াতখানা ব্যাপক, তাতে কমবেশীর, বর্ষপূর্তির কোন শর্তারোপ করা হয় নি। রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— مَا اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ ভূমি যা উৎপন্ন করে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। উক্ত হাদীসেও

ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। এতে সংরক্ষণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার কোন শর্ত নেই। একারণে সাধারণ জমিতে উৎপাদিত ফসলে ওশর ওয়াজিব হবে চাই তা এক বৎসর কাল পর্যন্ত স্থায়ী হউক বা না হউক।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাযহাব মতে বাঁশ, ঘাস ও জ্বালানী কাঠে ওশর ওয়াজিব হবে না। কেননা, এগুলো সাধারণত বাগানে চাষাবাদ করা হয় না। বরং বাগান থেকে এগুলোকে পরিষ্কার রাখা হয়। তবে যা যদি কেহ স্বীয় জমিতে বাঁশ, ঘাস, জালানী কাঠ উৎপন্ন করে তবে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে।

قوله : وَنِصْفُهُ فِي مُسْقِيٍّ الخ : ক্ষেতে যদি বালতি কিংবা পানি তোলার চরকি দ্বারা বা উটের পিঠে করে পানি দ্বারা সেচ করা হয় আর এথেকে ফসল উৎপন্ন হয় তবে তা থেকে অর্ধেক ওশর ওয়াজিব হবে। তবে যা পূর্বের মত পার্থক্য অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে বর্ষপুর্তি ও নিসাব পরিমাণ হওয়ার শর্ত ধর্তব্য নয়। পক্ষান্তরে সাহাবাইন রহ. এর মতে উক্ত শর্তদ্বয় গ্রহণযোগ্য। উল্লেখিত মাসআলায় অর্ধেক ওশর ওয়াজিব হওয়ার দলিল হল : বৃষ্টি অথবা খাল-বিলের পানি দ্বারা সেচ করার তুলনায় বালতি বা চরকার মাধ্যমে সেচ করা অনেক কষ্টসাধ্য। সুতরাং এহেন কষ্টকে সামনে রেখে অর্ধেক ওশর ওয়াজিব হবে।

قوله : وَضِعْفُهُ فِي أَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ الخ : তাগলাবীর ওশরী জমিতে দ্বিগুণ ওশর ওয়াজিব হবে। চাই সে প্রাথমিকভাবে উক্ত জমির মালিক হউক বা কোন মুসলমানের কাছ থেকে ক্রয় করে থাকুক। কেননা, হযরত উমর রাযি. এর সময়ে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে মুসলমান থেকে যা গৃহীত হবে বনু তাগলাব থেকে তার দ্বিগুন গ্রহন করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তাগলাবী জিম্মি যদি কোন মুসলমান থেকে ওশরী জমি ক্রয় করে তবে এক দশমাংশ ওয়াজিব হবে। কেননা তার মতানুযায়ী মালিকের পরিবর্তে হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন হয় না। বিধায় মুসলমানের মালিকানাধীন থাকাকালে যেহেতু তাতে ওশর ওয়াজিব হত তাই পরেও ওশর ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি তাগলাবীর কাছ থেকে জিম্মি ওশরী জমি ক্রয় করে তবুও তার থেকে দ্বিগুন ওশর গ্রহন করা হবে। কেননা, জিম্মির কাছ থেকে দ্বিগুন ওশর নেয়া হয়। অনুরূপভাবে মুসলমান হয়ে যায় তবুও ইমাম আবু হানিফা রহ. এ মতে দ্বিগুন ওশর বহাল থাকবে। কেননা, ওশরের দ্বিগুন তা উক্ত জমির আর্থিক দায়রূপে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং উক্ত জমি তার নিজস্ব আর্থিক দায়সহই মুসলমানদের মালিকানায় হস্তান্তরিত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে তাগলাবীর উক্ত জমিতে দ্বিগুন রহিত হয়ে পুণরায় এক ওশর ওয়াজিব হবে। মুসলমানের উপরও দ্বিগুণ বহাল রাখার ক্ষেত্রে—ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সাথে একমত। কেননা, তার মাযহাব মতে নতুনভাবে আরোপিত দ্বিগুণ সাব্যস্ত হয় না। কারণ, তার মতে আর্থিক দায় পরিবর্তিত হয় না।

قوله : وَخَرَاجٌ إِنِ اشْتَرَى الخ : কোন মুসলমান যদি তার ওশরী ভূমি কোন জিম্মির (তাগলাবী ছাড়া) কাছে বিক্রি করে ফেলে তবে তাতে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে খেরাজ ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে এক ওশর ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর দলীল হল : তা তাগলাবীর জমির ন্যায় বিধায় দ্বিগুন ওশর ওয়াজিব হবে। অপরদিকে অমূল পরিবর্তনের চেয়ে ওশরকে দ্বিগুণ করে দেয়া সহজ। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দলিল এ জমির উপর পূর্বেই ওশর ধার্য্য ছিল। এখনও তা পূর্ব অবস্থায় ওশরী থাকবে। কেননা, তার মতে জমির মালিক পরিবর্তনের কারণে তার দায় পরিবর্তন হয় না। তবে ব্যায়ের খাত হিসাবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে দুধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম : উসূলকৃত অর্থ যাকাত-ছদকা খাতে ব্যায় হবে। দ্বিতীয় : খেরাজের খাতে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল : কাফিরের অবস্থার উপযোগি হল খেরাজ গ্রহণ করা। কেননা, খেরাজের মধ্যে শাস্তির অর্থ বিদ্যমান। আর কাফির তো শাস্তির উপযুক্ত। সুতরাং উক্ত জিম্মি ক্রেতার নিকট থেকে খেরাজই গ্রহণ করা হবে।

قوله : وَعُشْرٌ اِنْ اَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ الخ : যদি কোন মুসলমান তার ওশরী জমি কোন জিম্মির নিকট বিক্রি করে ফেলে অতঃপর কোন মুসলমান তা শুফআর মাধ্যমে লাভ করে অথবা বিক্রি ফাসেদ হওয়ার দরুন মুসলমানের নিকট ফিরে যায় তবে উক্ত জমি থেকে পূর্বের মত ওশর ওয়াজিব হবে।

প্রথম সুরতে ওশর ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল মুসলমান যদিও তা কোন জিম্মির কাছ থেকে দখল করেছে কিন্তু তার এ দখল শুফার কারণে হওয়াতে তা মূলতঃ ধরে নেয়া হবে যে সে পূর্বের মুসলমান থেকেই ক্রয় করেছে। আর এক্ষেত্রে ওশরই ওয়াজিব হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় সুরতে ওশর ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল, এ বিক্রি ফাসেদ হওয়ার দরুন তা উঠিয়ে নেয়া আবশ্যক। সুতরাং ধরে নেয়া হবে মুসলমান ও জিম্মির মাঝে কোন ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় নাই। আর যেহেতু বিক্রয় সংঘটিত হয় নাই বিধায় যেখাবে পূর্বে উক্ত জমি ওশরী ছিল এখনও তা পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে। এবং ওশর ওয়াজিব হবে।

قوله : وَاِنْ جَعَلَ مُسْلِمٌ دَارَهُ الخ : শত্রু কবলিত এলাকা বিজিত করার প্রাক্কালে শাসক কোন মুসলমানকে একটি বাড়ির মালিক বানিয়ে দিলে তাতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি মালিক পরে উক্ত বাড়িকে বাগানরূপে সাব্যস্ত করে নেয় ও বাগান গড়ে তোলে তবে তাতে ওশর ওয়াজিব হবে। তবে হা যদি উক্ত বাগান ওশরী পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয় তবে ওশর ওয়াজিব, আর যদি তা খেরাজী পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয় তবে তার উপর খেরাজই ওয়াজিব হবে। কেননা, পানি সেচের সাথে আর্থিক দায় সম্পৃক্ত। অর্থাৎ পানি যে ধরনের হবে সে ধরনের অর্থ ওয়াজিব হবে।

قوله : بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ الخ : জিম্মির বাড়িতে কোনরূপ খেরাজ নেই। উক্ত জিম্মি হউক অগ্নিপূজক, খৃষ্টান, ইহুদী বা অন্য যে কোন মতালম্বী। কেননা হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি—

سُنُّوا بِالْمَجُوْسِ سُنَّةَ اَهْلِ الْكِتَابِ الخ

'তোমরা আহলে কিতাবীদের ন্যায় অগ্নিপূজকদেরকে বিবেচনা কর'। (তবে তাদের মেয়ে বিবাহ করা ও তাদের জবেহ বক্ষণ করা থেকে বেঁচে থাক)।

হযরত উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ্ সা.এর এ বাণী শুনামাত্র তা কার্যে পরিণত করেছেন। তবে হা যদি অগ্নি পূজক তার বাড়িতে বাগান তৈরী করে ফেলে তবে তাতে খেরাজ নির্ধারণ করা হবে। যদি সে ওশরী পানি দ্বারা সেচ করে। কেননা, অগ্নিপূজকের উপর ওশর ওয়াজিব করা যায় না। কারণ ওশর ইবাদাতকে শামিল করে, পক্ষান্তরে তাদের মাঝে ইবাদত পাওয়া যায় না। যেমন ওশরী ভূমিতে প্রাপ্ত আলকাতরা বা পেট্রোলে ওশর বা অন্য কিছু ওয়াজিব হয় না। কারণ, এ দুটি পানির ঝর্ণার ন্যায় উৎসারিত ঝর্ণা বিশেষ। আর যেহেতু পানির ঝর্ণার ওশর ওয়াজিব হয় না বিধায় এদুটুতেও ওশর ওয়াজিব হবে না।

তবে হা যদি তা খেরাজী ভূমিতে পাওয়া যায় তবে তাতে খেরাজ ওয়াজিব হবে। তবে শর্ত হল যখন তার চার পার্শ্বে চাষোপযোগী হয়। কেননা খেরাজের সম্পর্ক জমি চাষোপযোগীতার সাথে। উৎপাদনের সাথে নয়।

بَابُ الْمَصْرَفِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত দানের খাত

هو الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ وهو أَسْوَأُ حَالًا من الْفَقِيرِ وَالْعَامِلُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمَدْيُونُ وَمُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ وَابْنُ السَّبِيلِ فَيَدْفَعُ إِلَى كُلِّهِمْ أو إِلَى صِنْفٍ لَا إِلَى ذِمِّيٍّ وَصَحَّ غَيْرُهَا وَبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَتَكْفِينِ مَيِّتٍ وَقَضَاءِ دَيْنِه وَشِرَاءِ قِنٍّ يُعْتَقُ وَأَصْلِه وَإِنْ عَلَا وَفَرْعِه وَإِنْ سَفِلَ وَزَوْجَتِه وَزَوْجِهَا وَعَبْدِه وَمُكَاتَبِه وَمُدَبَّرِه وَأُمِّ وَلَدِه وَمُعْتَقِ الْبَعْضِ وَغَنِيٍّ بِمِلْكِ نِصَابٍ وَعَبْدِه وَطِفْلِه أوهَاشِمِيٍّ وَمَوَالِيهِمْ وَلَوْ دَفَعَ بِتَحَرٍّ فَبَانَ أَنَّهُ غَنِيٌّ أو هَاشِمِيٌّ أو مَوْلَاهُ أو كَافِرٌ أو أَبُوهُ أو ابْنُهُ صَحَّ وَلَوْ عَبْدُهُ أو مُكَاتَبُهُ لَا وَكُرِهَ الْإِغْنَاءُ وَنُدِبَ عن السُّؤَالِ وَكُرِهَ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لِغَيْرِ قَرِيبٍ وَأَحْوَجَ وَلَا يَسْأَلُ من له قُوتُ يَوْمِه -

অনুবাদ : যাকাত দানের খাত হল দরিদ্র, নিঃস্ব এবং নিঃস্ব হল দরিদ্র থেকে অবস্থায় গুরুতর। যাকাত উসূলের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি, মুকাতাব, ঋনগ্রস্ত, অর্থাভাবে যুদ্ধা ব্যক্তি যুদ্ধ করতে অক্ষম, ইবনুসসাবীল, (অর্থাৎ এমন মুসাফির ব্যক্তি যার বাড়িতে সম্পদ আছে, অথচ সে এমন স্থানে আছে যেখানে তার সাথে কোন কিছু নেই)। অতএব তাদের সবাইকে (যাকাতের অর্থ) দেবে অথবা যে কোন একটি শ্রেণীকে দিয়ে দিবে। তবে জিম্মিদেরকে (যাকাতের অর্থ) প্রদান করা যাবে না। তা ছাড়া অন্যান্য (সদকা) তাকে দেয়া যাবে। (যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে না মসজিদ নির্মাণে, মৃতের কাফন ও তার ঋন আদায়ে, স্বাধিন করার জন্য গোলাম ক্রয় করতে (যাকাত দাতা) তার মূল (তথা পিতা দাদা) কে যত বংশই হোক, (তদ্রূপ) তার শাখা (পুত্র, প্রপুত্র) কে যত অধঃস্তনই হোক, (স্বামী) তার স্ত্রীকে (এবং স্ত্রী) তার স্বামীকে, মুনিব তার গোলামকে, তার মুকাতবকে, তার মুদাব্বারকে, তার উম্মে ওলাদকে যার কিয়দাংশ স্বাধীন তাকে নিসাবের মালিক হওয়ার ভিত্তিতে ধনী ব্যক্তিকে, বা তার গোলামকে তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে, বনু হাশেমকে এবং তাদের আযাদকৃত গোলামকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। আর যদি প্রবল ধারণার সাথে যাকাত দিয়ে দেয় অতঃপর প্রকাশ হয় যে সে ধনী বা হাশেমী কিংবা কাফির অথবা তার পিতা বা পুত্র তবে তা সহীহ। (অর্থাৎ, পুনরায় যাকাত আদায় করা জরুরী নয়) আর যদি প্রকাশ পায় যে (যাকাত গ্রহীতা) সে তার গোলাম বা তার মুকাতাব তবে তা সহীহ হবে না। এবং ধনী বানিয়ে দেয়া মাকরূহ। আর মুস্তাহাব হল সওয়াল করা থেকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দেয়া। মাকরূহ হল নিকট আত্মীয় ও অধিক প্রয়োজনীয় (ব্যক্তি) ছাড়া অন্য শহরে (যাকাতের মাল স্থানান্তরিত করা। আর যার কাছে একদিনের খাদ্য রয়েছে সে যেন সওয়াল না করে।

শব্দার্থ : اَلْمَصْرَفُ (ج) مَصَارِفُ ব্যায়ের খাত, ব্যাংক। صِنْفٌ (ج) اَصْنَافٌ - শ্রেণী, প্রকার। قِنٌّ (ج) اَقْنَانٌ - اَقِنَّةٌ - দাস, ক্রীতদাস। تَحَرٍّ - অনুসন্ধান, অভিনিবেশ। بَانَ (ض) بَيَانًا - প্রকাশ হওয়া, স্পষ্ট হওয়া। اَحْوَجُ - অধিক মুখাপেক্ষী, অধিকতর অভাবগ্রস্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

এখান থেকে সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. যাকাত দানের ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা শুরু করতেছেন, যা মূলতঃ মহান প্রভুর বাণী—

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ●

'যাকাত হল দরিদ্রদের জন্য, নিঃস্বদের জন্য, সদকা উসূলের কাজে নিয়োজিতদের জন্য ঐ লোকদের জন্য যাদের মন আকর্ষণ করা হয় দাস মুক্তির জন্য, ঋনগ্রস্তদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিতদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান।'

রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা নবী কিংবা অন্য কারো সন্তুষ্টির উপর সদকার বন্টনকে অর্পন করেন নি। বরং নিজেই এর ক্ষেত্রসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

قوله : هُوَ الْفَقِيْرُ وَالْمِسْكِيْنُ الخ : فقير দরিদ্র, المسكين নিঃস্ব। সুতরাং ফকির মিসকীনের সংজ্ঞায় ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে ফকির ঐ ব্যক্তি যার সামান্য পরিমাণ সম্পদ রয়েছে কিন্তু তা বৃদ্ধিযোগ্য নয়। এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে সে বন্দি। আর মিসকিন হল ঐ ব্যক্তি যার নিকট কিছুই নেই। আহারের বা পরিধানের কোন বস্ত্র নেই। অর্থাৎ ফকিরের তুলনায় মিসকীনের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেই রহ. এর মতামত উল্লেখিত সংজ্ঞার ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ মিসকীনের তুলনায় ফকীরের অবস্থা গুরুতর। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল, কুরআনের আয়াত- أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ - কিংবা দারিদ্র নিষ্পেষিত মিসকীনকে'। উক্ত আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, মিসকীনের নিকট ক্ষুধা নিবারণের মতো খাবার থাকে না। এবং শরীর ঢাকার মতো কাপড় থাকে না। তাই তো মিসকিনের অবস্থান ফকিরের চেয়ে নগণ্য। দ্বিতীয় দলিল হল আল্লাহর বাণী—

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا -

'খয়রাত ঐসকল গরীব লোকদের জন্য যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে। জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাঞ্চা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না।'

উক্ত আয়াতে এমন ব্যক্তিকে ফকীর বলা হয়েছে যার বাহ্যিক অবস্থা দেখলে নিঃস্ব বুঝা যায় না। সুতরাং বুঝা গেল ফকীরের নিকট সামান্য হলেও সম্পদ থাকাটা প্রয়োজন। অন্যথায় সে مسكين এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এবার ফকীর ও মিসকীন এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না কি উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী তা নিয়ে সামান্য মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে ফকীর ও মিসকীন উভয়টি পৃথক পৃথক দুটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে উভয়টি মিলে একশ্রেণী। তাদের এ মতপার্থক্য একটি মাসআলা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহল কেহ তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের নিয়্যত করল যায়েদ, মিসকিন ও ফকিরের জন্য। এবার ইমাম আবু ইউসুফের মতানুযায়ী উক্ত এক তৃতীয়াংশ সম্পদকে দুভাগে ভাগ করা হবে। একভাগে যায়েদের জন্য আর এক ভাগ ফকীর ও মিসকীনের জন্য।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে উক্ত এক তৃতীয়াংশ তিনভাগে ভাগ করা হবে। এক ভাগ যায়েদের জন্য অন্য ভাগ ফকীরের জন্য এবং তৃতীয় ভাগ মিসকীনের জন্য ধার্য করা হবে।

قوله : وَالْعَامِلُ الخ : কুরআনুল কারীমে বর্ণিত যাকাতের তৃতীয় ক্ষেত্র হল العاملين তথা যাকাত ইত্যাদি উসূলকারীগণ। মুসলিম শাসক যাকাত উসূল করার জন্য যদি কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন, তবে তাকে এবং তার সাথের অন্যান্য কর্মীবৃন্দকে যাকাতের মাল থেকে খরছাদি প্রদান করতে পারবে। তবে হা এ পরিমাণ দেয়া হবে যাতে তা দ্বারা তার জীবিকা নির্বাহ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে এত অধিক দেয়া জায়েয নয় যে, সবটুকু যাকাত শুধু তাদেরকেই দিতে হয়, বরং এক্ষেত্রে অর্ধেক যাকাতের মাল দেওয়া হবে। মোটকথা, আমাদের মাযহাব মতে যাকাত উসূলকারীদের জন্য নির্ধারিত কোন অংশ বিশেষ ওয়াজিব নয়। বরং যা দ্বারা তার প্রয়োজন পূর্ণ হবে তাই প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে যাকাতের মাল ব্যয়ের ক্ষেত্র যেহেতু আটটি সুতরাং প্রত্যেককে এক অষ্টমাংশ দেয়া হবে।

এখন যেহেতু مؤلف القلوب শ্রেণীটি ইজমার ভিত্তিতে বাদ পড়েছে। বিধায় বাকী সাত শ্রেণীকে নির্ধারিতভাবে এক সপ্তাংশ করে দেয়া হবে।

আমাদের দলিল হল : যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির প্রাপ্য যথেষ্ঠ হওয়ার অবস্থায় নির্ধারণ করা হয়েছে। যাকাতের পন্থায় নয়। তাই তো দেখা যায় যাকাত উসূলকারী স্বচ্ছল হলে যাকাতের মাল থেকে যথেষ্ট হওয়া পরিমাণ সে গ্রহণ করবে। যদি যাকাত হিসাবে প্রদান করা হত তবে সে যাকাতের হক্বদার হত না। সুতরাং বুঝা গেল যাকাত উসূলকারীকে যাকাতের মাল থেকে প্রদান করা হবে যথেষ্টতার ভিত্তিতে।

قوله : وَالْمُكَاتَبُ الخ : যাকাতের ক্ষেত্রসমূহের চতুর্থ ক্ষেত্র হল দাসমুক্তি। দাসমুক্তির ব্যাপারে দুটি মতামত রয়েছে- (১) জাকাতের টাকা দ্বারা দাস ক্রয় করতঃ তাকে মুক্ত করে দেয়া। (২) مكاتب বা লিখিত চুক্তিবদ্ধ দাসের চুক্তির টাকা পরিশোদ করে দেয়া। সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ যাকাতের মাল মুকাতাব গোলামকে দেয়া হবে। সে তা তার মালিককে প্রদান করত দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ দ্বারা দাস ক্রয় করতঃ তাকে আযাদ করে দিলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে মালিক বানানো পাওয়া যায় না। কারণ নিছক দাস কোন কিছুর মালিক হতে পারে না। অথচ যাকাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত।

قوله : وَالْمَدْيُونُ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. এর বর্ণনা মতে যাকাত দানের পঞ্চম প্রকার হল ঋনগ্রস্থ ব্যক্তি। ঋনগ্রস্থ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যার ঋন রয়েছে এবং সে ঋনের পরিমাণ থেকে বেশি নিসাবের মালিক নয়। যেমন কারোর নিকট দু' হাজর দিরহাম রয়েছে। আর সে উনিশত টাকা ঋনগ্রস্থ তবে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নিকট ঋনগ্রস্ত ঐ ব্যক্তি যে দু দল মুসলমানের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আর্থিকভাবে অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং দায়গ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন তা পরিশোধ করনার্থে যাকাতের মাল গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে আমাদের মতে সে যাকাতের মাল গ্রহণ করতে পারবে না। তবে হাঁ যদি সে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক না থাকে, তবে ফকীর তথা নিসাব পরিমণ মালের মালিক না হওয়ার ভিত্তিতে জাকাতের মাল গ্রহণ করতে পারবে।

قوله : وَمُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ الخ : যাকাত দানের ষষ্ঠক্ষেত্র—ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতানুসারে ঐ মুজাহিদ যে জিহাদের সফরে সম্পদহীন হয়ে পড়ে। হাঁ যদিও তার বাড়িতে সম্পদ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে ঐ হাজ্বী যিনি হজ্ব পালন রত অবস্থায় সম্পদহীন হয়ে পড়েন, অথচ তার বাড়িতে সম্পদ রয়েছে। কানজ গ্রন্থকার রহ. বলেন, সম্পদহীন মুজাহিদকে যাকাত এর অর্থ দেয়া যাবে। হিদায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, আহনাফের নিকট ধনি মুজাহিদকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। কারণ, যাকাতের হকদার হল দরিদ্র ব্যক্তি, যেমন হাদীস শরীফে এসেছে— خُذْهَا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَ رُدُّوهَا فُقَرَا তাদের ধনী লোকদের থেকে যাকাত গ্রহণ কর, আর তাদের দরিদ্রের মাঝে তা বিলেয়ে দাও। সুতরাং বুঝা গেল ধনী মুজাহিদকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না।

قوله : وَابْنِ السَّبِيْلِ الخ : যাকাত দানের সপ্তম স্থান হল ابن سبيل তথা মুসাফির। মুসাফির দ্বারা এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য যার বাড়িতে সম্পদ রয়েছে তবে মুসাফির অবস্থায় অর্থাভাবে পতিত হয়েছে। সে দরিদ্রের ন্যায়। সুতরাং সে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

قوله : فَيَدْفَعُ اِلَى كُلِّهِمْ الخ : আমাদের মাযহাব মতে মালিক উপরোল্লিখিত শ্রেণী থেকে প্রত্যেকটিকে অথবা যে কোন এক শ্রেণীকে অর্থাৎ তার এখতিয়ারাধিনভাবে যে কোন শ্রেণীকে প্রদান করতে পারবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে প্রত্যেক শ্রেণীর কমপক্ষে তিনজন করে মোট একুশজনকে যাকাত দিতে হবে। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না। তিনি দলিল হিসাবে পেশ করেন- পবিত্র আল কোরআনের আয়াত- اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ - উল্লেখ করতঃ বলেন, উক্ত আয়াতে صدقات এর শুরুতে الف لام উল্লেখ করা দ্বারা অধিকার সাব্যস্ত করার অর্থে আর واو সমন্বয় করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং উক্ত সাত শ্রেণী যাকাতের হক্বদার হিসাবে প্রমাণিত হল। আর প্রত্যেক বহুবচন দ্বারা উল্লেখ করেছেন যার সর্বনিম্ন একক হল তিন। বিধায় প্রত্যেক শ্রেণীর কমপক্ষে তিনজনকে যাকাত দেওয়া জরুরী।

আমাদের দলিল হল : উক্ত আয়াতের للفقراء এর لام অব্যয়টি বিশেষত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকার প্রমাণিত করার জন্য নয়। অর্থাৎ একথা বুঝানো যে, যাকাতের ক্ষেত্রে শুধু এ সাতটি, এগুলো ভিন্ন আর নয়। সুতরাং এশ্রেণীগুলো থেকে যে শ্রেণীকেই দেয়া হবে তা নির্দিষ্ট খাতে দেয়া হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। ইহাই হযরত ইবনে উমর রাযি. ও ইবনে আব্বাস রাযি. এর অভিমত। যেমন উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে- قَالَ فِي اَيِّ صِنْفٍ وَضَعْتَهُ اَجْزَأَكَ 'যে শ্রেণীকেই যাকাত দেবে আদায় হয়ে যাবে। হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত- اَيُّمَا صِنْفٍ اَعْطَيْتَهُ مِنْ هٰذَا اَجْزَأَكَ عَنْكَ তুমি যে শ্রেণীকেই যাকাত দবে তোমার জন্য তা যথেষ্ট হবে। সুতরাং বুঝা গেল অনির্দিষ্টভাবে যেকোন শ্রেণীকে যাকাতের অর্থ দিয়ে দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

قوله : لَا اِلَى ذِمِّيٍّ الخ : যিম্মিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়েয নেই। কেননা, হযরত মুয়াজ রাযি. বলেছিলেন—

خُذْهَا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَ رُدَّهَا اِلَى فُقَرَائِهِمْ

'যাকাত মুসলমানদের ধনীদের থেকে গ্রহণ কর এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে ফিরিয়ে দাও।'

সুতরাং জিম্মিদেরকে যাকাত প্রদান করা যাবে না। এছাড়া অন্যান্য সদকা যিম্মিদেরকে দেওয়া যাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— تَصَدَّقُوْا عَلَى اَهْلِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا 'সকল ধর্মের লোককে সদকা প্রদান কর। তবে হারবী বা মুস্তামানকে কোনরূপ সদকা প্রদান করা জায়েয নেই। অর্থাৎ যারা আমাদের সাথে যুদ্ধে বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদেরকে সদকা-খয়রাত বা কোনরূপ লেনদেন করে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা জায়েয নেই। কেননা, মহান প্রভু এরশাদ করেন—

اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۞

'আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। তোমাদের স্বদেশ হতে বহিস্কার করেছে এবং তোমাদেরকে যারা বহিস্কার করণে সাহায্য করেছে। আর তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করছে তারাইতো যালিম। —সূরা মুমতাহিনা

قوله : وَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ الخ : যেভাবে যাকাতের অর্থ যিম্মিকে প্রদান করা যাবে না অনুরূপভাবে যাকাতের অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ, মৃত ব্যক্তির কাফন দেওয়া বা তার ঋন পরিশোধ করা জায়েয নেই। কেননা, যাকাত

আদায়ের শর্ত হল মালিক বানিয়ে দেয়া। মসজিদের ক্ষেত্রে মালিক অনুপস্থিত। আর মৃত ব্যক্তি মালিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না বিধায় যাকাতের অর্থ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ, মৃত ব্যক্তির কাফন দেওয়া জায়েয হবে না।

আর মৃত ব্যক্তির ঋন পরিশোধ করার দ্বারা এ সম্পদের মালিক মৃত ব্যক্তি হওয়াটা প্রমাণিত হয় না। অনুরূপ ভাবে যাকাতের অর্থ দ্বারা গোলাম কিংবা বাদী ক্রয় করত তাকে স্বাধীন করা যাবে না। তবে ইমাম মালিক রহ. এর মতে এক্ষেত্রে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আমাদের দলিল হল, গোলাম বাদী ক্রয় করে মুক্ত করার অর্থ মালিকানা রহিত করা। মালিক বানানো নয়। অথচ মালিক বানানো হল যাকাতের রুকন বা শর্ত। আর আয়াতে বর্ণিত وفي الرقاب দ্বারা মুকাতাব উদ্দেশ্য। সাধারণ গোলাম বাদী উদ্দেশ্য নয়। অনুরূপভাবে যাকাত আদায়কারী তার মূল তথা পিতা, দাদা ও উর্ধ্বতম কাউকে এবং মাতা, নানী ও উর্ধ্বতম কাউকে এবং তার শাখা—তথা পুত্র, নাতি ও মেয়ে অধঃস্তন কাউকে যাকাত দিতে পারবে না। কেননা, মালিকানার লাভালাভ তাদের মাঝে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও অংশীদারিত্ব রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাতের মাল দিতে পারবে না। কেননা, সাধারণত উপকার গ্রহণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অংশীদারিত্ব রয়েছে। তবে সাহেবাইন রহ. এর মতে স্ত্রী-স্বামীকে যাকাতের মালামাল দিতে পারবে। হ্যা নফল সদকা সর্বসম্মতিক্রমে দেওয়া জায়েয। অনুরূপভাবে আপন গোলামকে, মুদাব্বারকে (চাই সে সাধারণ মুদাব্বার কিংবা শর্তযুক্ত মুদাব্বার হোক) উক্ত গোলাম বা বাদীসমূহের বেলায় মালিক বানানো পাওয়া যায় না। কারণ, মুদাব্বার ও উম্মে ওলাদ মুনিবের মালিকানাধীন। তাদের উপার্জন মালিকের মালিকানা সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তাদেরকে যাকাত প্রদান করা মূলত নিজেকে যাকাতের অর্থ দান করা। বিধায় উক্ত ক্ষেত্রসমূহে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে এমন গোলামকে যাকাত প্রদান করা যাবে না যার কিয়দাংশ আযাদ। উক্ত বাক্যের ব্যখ্যা এভাবে যে, দুজন একটি গোলামের মালিক ছিল। অতঃপর একজন তার অংশ স্বাধিন করে দিল। তবে অন্য শরীক তার অংশ স্বাধীন করে দেবে অথবা তার মাধ্যমে উপার্জন করিয়ে তার মূল্য গ্রহণ করতঃ স্বাধীন করে দেবে। এবার যদি সে তার মূল্য গ্রহণ করতে চায় তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে উক্ত গোলাম তার মুকাতাব। সুতরাং এ হিসাবে তাকে উক্ত দ্বিতীয় অংশীদার যাকাতের অর্থ প্রদান করতে পারবে না। পক্ষান্তরে সাহাবাইন রহ. এর মতে উক্ত গোলাম স্বাধীন তবে ঋনগ্রস্ত। সুতরাং দ্বিতীয় অংশীদার তাকে যাকাতের অর্থ দিতে পারবে। অনুরূপভাবে নিসাবের মালিক ধনী ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করা যাবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন- لا تحل الصدقة لغنى 'কোন ধনীর জন্য ছদকা হালাল নয়'। অর্থাৎ নিসাবের মালিক ধনী ব্যক্তি যাকাতের মাল গ্রহন করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে ধনীর গোলাম বা অপ্রাপ্ত সন্তানকে যাকাতের মাল দেয়া জায়েয নেই। গোলামকে এজন্য বৈধ নয় যে তার যাবতীয় সম্পদ মালিকের বলে গণ্য হয়। আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে বৈধ নয় একারণে যে, তার পিতার সম্পদের কারণে তাকে ধনী সাব্যস্ত করা হয়। আর ধনীর প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান দরিদ্র হলে তাকে যাকাতের মাল দেয়া জায়েয আছে। কারণ, তাকে তার পিতার স্বচ্ছলতার কারণে ধনী বলে গণ্য করা হয় না।

অনুরূপভাবে হাশেমী বংশের কাউকে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। (হাশেমী বংশের পরিচয় : হযরত আলী রাযি. ও তার বংশধর, চাই সে হযরত ফাতেমা রাযি. এর ঔরশজাত হোক বা অন্য স্ত্রীর। হযরত আব্বাস রাযি. ও তার বংশধর, হযরত জাফর রাযি. ও তার বংশধর, হযরত আকীল রাযি. ও তার বংশধর, হযরত হারীছ রাযি. ও তার বংশধর এবং তাদের আযাদকৃত গোলাম-বাদীগণও। তাদেরকে হাশেমী বলার কারণ হল, তারা সবাই রাসূলুল্লাহ্ সা. এর উর্ধ্বতন পুরুষ হাশেম ইবনে আব্দে মানাফ-এর সাথে সম্পৃক্ত)। তাদের যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়। এর দলিল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা. এর হাদীস আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. বর্ণনা করেন—

يَابَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ غُسَالَةَ أَيْدِى النَّاسِ وَ أَوْسَاخَهُمْ وَ عَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ

'হে হাশেমীগণ! আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য মানুষের হাত ধৌত পানি এবং তাদের ময়লা (যাকাত) অপছন্দনীয় করেছেন এবং তার বিনিময়ে তোমাদেরকে পঞ্চমভাগের পঞ্চমাংশ দান করেছেন।'

তবে হা তাদেরকে নফল সদকা প্রদান করা যাবে। আর হাশেমীদের স্বাধীনকৃত গোলামগণকেও যাকাত দেওয়া নাজায়েয, তার দলিল হল : আবূ দাউদ শরীফের বিশদ হাদীসের শেষের দিকে রয়েছে, হযরত নাফে' যিনি হুজুর সা. এর আযাদকৃত গোলাম তার জিজ্ঞাসায় রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন— مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ إِنَّا لَاتَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ 'কোন গোত্রের গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত (বিধানের ক্ষেত্রে) আমাদের জন্য যাকাত হালাল নয়। উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না।

قوله : وَلَوْ دَفَعَ بِتَحَرٍّ الخ : কোন ব্যক্তি কাউকে যাকাত প্রদান করল অতঃপর প্রকাশ হল যে, উক্ত যাকাতগ্রহীতা যাকাতের ক্ষেত্র নয়, তবে তার দু' অবস্থা হতে পারে। উক্ত গ্রহীতা তার পিতা-মাতা বা সন্তানাদী বা হাশেমী, কাফির বা ধনী তবে ইমাম আবূ হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে তার যাকাত আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে যাকাত আদায় হবে না। বরং সে দ্বিতীয় বার আদায় করতে হবে। তিনি বলেন, যাকাত আদায়কারী তার যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছে যথার্থ স্থানে যাকাত দান করে নি। অথচ পূর্বেও সে তা বুঝা সম্ভব ছিল। সুতরাং তার যাকাত আদায় হবে না। বরং সে পুণরায় আদায় করতে হবে। ইমাম আবূ হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দলিল হল পবিত্র হাদীস যা ইবনে হুমাম রহ. তার ফতহুল কাদীরে উল্লেখ করেছেন। যার অর্থ হল- হযরত মাআন ইবনে ইয়াজীদ রহ. বলেন, আমি আমার পিতা, দাদা রাসূল সা. এর হাতে বাইয়্যাত গ্রহণ করলাম। তিনি আমার বিবাহের প্রস্তাব দিলেন এবং আমাকে বিবাহ করালেন। এক বিষয়ে আমি তার সাথে তর্কে লিপ্ত হলাম। আমার পিতা ইয়াজিদ কিছু দিনার বের করলেন সদকা করার জন্য। তাই তিনি মসজিদে তা এক ব্যক্তির নিকট রেখে আসলেন।

আমি তা নিয়ে চলে আসলাম। তিনি (ইয়াজিদ) বললেন, আল্লাহর কসম আমি তা তোমাকে দেয়ার ইচ্ছা করি নি। সুতরাং বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ্ সা. এর দরবারে উপস্থাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন- لَكَ مَانَوَيْتَ يَايَزِيْدُ وَ لَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ - হে ইয়াজিদ! তুমি যা নিয়াত করেছ তার প্রতিদান তুমি পাবে। আর হে মাআন তুমি যা নিয়েছ তা তোমার।'

উক্ত হাদীসে ইয়াজিদকে জনাব রাসূলুল্লাহ্ সা. পুণরায় আদায় করার জন্য নির্দেশ দেন নি এবং মাআনকে তা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন নি। দ্বিতীয় দলিল যা ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর দলিলে জবাব। উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহে পরিচয় অবগত হওয়া সম্ভব। তবে তা চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে হয়ে থাকে। নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, কারো প্রয়োজন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কষ্টসাধ্য। সুতরাং এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনার পর যা স্থীর হয় তার উপরই বিষয়টি নির্ভরশীল হয়। যেমন, কেহ কিবলা স্থীর করতে না পেরে চিন্তা-ভাবনা করে এক দিকে কিবলা স্থীর করে নামায পড়ে নেয়। পরে জানতে পারল যে এদিকে কিবলা নয়, তবে উক্ত ব্যক্তির আদায়কৃত নামাযের কাযা ওয়াজিব হয় না। তদ্রূপ উক্ত ক্ষেত্রে যাকাতের মাল দেয়ার পর জানতে পারলে পুনরায় তা আদায় করা ওয়াজিব হবে না। তবে হাঁ যদি উক্ত ক্ষেত্র তার গোলাম বা মুকাতাব হয় তবে তা আদায় হবে না। কেননা, গোলামের ক্ষেত্রে মালিকানার যোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। অথচ মালিক বানানো যাকাত আদায়ের জন্য শর্ত। আর মুকাতাবের ক্ষত্রে যদিও মালিক বানানো পাওয়া যায় তবে তা আদায় অসম্পূর্ণ। সুতরাং যাকাত আদায়কারী তার গোলাম বা মুকাতাবকে যাকাত দিতে পারবে না।

قوله : وَكُرِهَ الْإِغْنَاءُ الخ : কাউকে যাকাত দিয়ে ধনী বানিয়ে দেয়া তথা নিবাস পরিমাণ মালের মালিক বানিয়ে দেয়া মাকরূহ। তবে শর্ত হল তার ঋন অধিক না হওয়া বা পরিবার পরিজন না থাকা। পক্ষান্তরে যদি তার পরিবার পরিজন থাকে বা এত ঋন যে যা দেওয়া হয়েছে তা ঋন খেয়ে নিবে, তবে এত অধিক পরিমাণে

যাকাতের মাল একজনকে দেয়া মাকরূহ নয়। মোটকথা, নিসাব পরিমাণে মাল যাকাত হিসাবে একজনকে প্রদান করা মাকরূহ।

قوله : وَنُدِبَ عَنِ السُّوَالِ الخ : কাউকে এত পরিমাণ দেয়া মুস্তাহাব যে, সে ঐদিন অন্যের নিকট চাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে।

قوله : وَكُرِهَ نَقْلُهَا اِلٰى بَلَدٍ الخ : যাকাতের অর্থ যে শহরে তুলা হবে সেই শহরে ব্যয় করা হবে। অন্য শহরে তা স্থানান্তরিত করা মাকরূহ। কেননা, তাতে প্রতিবেশীদের হক্ব পরিহার করা হল। দ্বিতীয়তঃ হযরত মুআয রাযি. এর হাদীস- خُذْ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَ تُرَدُّ اِلٰى فُقَرَائِهِمْ অর্থাৎ যে স্থানের ধনীর নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে সে স্থানের দরিদ্রের মাঝে তা বন্টন করা হবে। আর অন্য শহরে নিকটাত্মীয় বা অন্য শহরবাসী অধিক প্রয়োজনে মুখাপেক্ষী হলে তা স্থানান্তরিত করা মাকরূহ নয়। কারণ, এতে যাকাত দানসহ আত্মীয়তা রক্ষা করা হবে। আর অন্য শহরে অধিক প্রয়োজন পূরণে যাকাত স্থানান্তরিত করার দ্বারা অধিক পরিমাণ প্রয়োজন দূর করার বিষয় রয়েছে। এদিকে যার প্রয়োজন বেশী সেই মূলত যাকাতের হক্বদার।

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

পরিচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর

تَجِبُ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ ذِي نِصَابٍ فَضَلَ عَنْ مَسْكَنِهٖ وَثِيَابِهٖ وَأَثَاثِهٖ وَفَرَسِهٖ وَسِلَاحِهٖ وَعَبِيدِهٖ عَنْ نَفْسِهٖ وَطِفْلِهِ الْفَقِيرِ وَعَبِيدِهٖ لِلْخِدْمَةِ وَمُدَبَّرِهٖ وَأُمِّ وَلَدِهٖ لَا عَنْ زَوْجَتِهٖ وَ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ وَ مُكَاتَبِهٖ وَ عَبْدٍ أَوْ عَبِيدٍ لَهُمَا وَيَتَوَقَّفُ لو مَبِيعًا بِخِيَارٍ نِصْفُ صَاعٍ من بُرٍّ أو دَقِيقِهٖ أو سَوِيقِهٖ أو زَبِيبٍ أو صَاعٍ من تَمْرٍ أو شَعِيرٍ وهو ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ صُبْحَ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ أو أَسْلَمَ أو وُلِدَ بَعْدَهُ لَا تَجِبُ وَصَحَّ لو قَدَّمَ أو أَخَّرَ -

অনুবাদ : সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব প্রত্যেক স্বাধীন মুসলমান (যখন সে এমন) নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে, যা তার বাসস্থান, বস্ত্র, ব্যবহারিক সামগ্রী, ঘোড়া, অস্ত্র ও দাস-দাসী থকে অতিরিক্ত হয়। সে তার নিজের পক্ষ থেকে অপ্রাপ্ত সন্তানদের পক্ষ থেকে, তার সেবক গোলামদের পক্ষ থেকে মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের পক্ষ থেকে (সদকাতুল ফিতর আদায় করবে। তবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে মুকাতাবের পক্ষ থেকে এক অথবা একাধিক শরীকানা গোলামের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে না। আর স্থগিত থাকবে যদি বিক্রিত গোলামে খিয়ার থাকে। (অর্থাৎ গোলাম অবশেষে যার হবে ফিতরা তার উপর ওয়াজিব হবে)।

ফিতরার পরিমাণ হল অর্ধ সা' গম কিংবা আটা অথবা ছাতু কিংবা কিশমিশ অথবা এক সা' খেজুর বা যব। আর সা' এর পরিমাণ হচ্ছে আট ইরাকী রিতিল। (আর ওয়াজিব হয়) ঈদুল ফিতরের সকালে (অর্থাৎ ফজর উদিত হওয়ার সাথে) সুতরাং যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে মৃত্যু বরণ করে অথবা ফজরের পরে মুসলমান হয় বা

জন্মগ্রহন করে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে না। আর যদি ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পূর্বে অথবা পরে আদায় করে তবে তা সহীহ।

শব্দার্থ : صَدَقَةٌ -এমন দানকে বলে যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়। اَلْفِطْرُ শব্দটি فِطْرَاتٌ মূল ধাতু থেকে গৃহীত। অর্থ সত্তা, প্রকৃতি। কেননা, এসদকা প্রতিটি সত্তার পক্ষ থেকে দেয়া হয়। اَثَاثَاتٌ (ج) اَثَاثٌ - আসবাবপত্র, সামগ্রী। سِلَاحٌ (ج) اَسْلِحَةٌ - অস্ত্র, হাতিয়ার। بُرٌّ - গম। دَقِيْقٌ - শস্য চূর্ণ, ময়দা, আটা। سَوِيْقٌ (ج) اَسْوِقَةٌ - গম ও যবের তৈরী ছাতু বা মন্ড। زَبِيْبٌ - কিসমিস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ : যাকাতের ও সদকাতুল ফিতরের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ্য। কারণ, উভয়টি আর্থিক ইবাদত। তবে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব, আর যাকাত ওয়াজিব বিধায় যাকাতের আলোচনা পূর্বে হয়েছে আর সদকাতুল ফিতরের আলোচনা পরে। সদকাতুল ফিতর প্রবর্তন হওয়ার কারণ সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর বর্ণিত হাদীস—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَهِيَ زَكٰوةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ -

'হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. সদকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন, যা রোযাদারদের জন্য অনর্থক ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্রকারী এবং নিঃস্বদের জন্য খাদ্যসামগ্রী। অতএব, যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে তা আদায় করে নেয় সে ক্ষেত্রে তা গ্রহণীয় সদকারূপে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে তা আদায় করবে সেক্ষেত্রে তা সাধারণ সদকারূপে গণ্য হবে।

قوله : تَجِبُ عَلٰى حُرٍّ الخ : আমাদের মতে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব। কারণ তা অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. ও মালিক রহ. এর মতে সদকাতুল ফিতর ফরয।

আমাদের দলিল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা. স্বীয় খুতবায় বলেছেন, যা হযরত ছা'লাবা ইবনে সুআইর আল আদাবী রাযি. বর্ণনা করেছেন—

اَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَ عَبْدٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ

'প্রত্যেক স্বাধীন দাস ও ছোট বড় ব্যক্তির পক্ষ থেকে অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' যব আদায় কর।'

উক্ত হাদীসখানা খবরে ওয়াহিদ। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরয প্রমাণিত করা যায় না। এজন্য আমরা বলি, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব। আর তা ওয়াজিব হওয়ার কয়েকটি শর্ত রয়েছে— (১) স্বাধীন হওয়া। সুতরাং গোলামের উপর তা ওয়াজিব নয়। কারণ সে নিজেই সম্পদের মালিক নয়। অতএব, অন্যকে কিভাবে মালিক বানাবে। অথচ মালিক বানানো তা আদায়ের রুকন। ২। মুসলমান হওয়া। সুতরাং কাফিরের উপর তা ওয়াজিব হবে না। কারণ, সদকাতুল ফিতর হল ইবাদত তা কেবল মুসলমানদের থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৩) নিসাব পরিমণ মালের মালিক হওয়া। তবে বর্ধনশীল হওয়া শর্ত নয়। মোটকথা, আমাদের মতে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য তৃতীয় শর্ত হল নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া। তবে এমাল মৌলিক প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত হতে হবে। যেমন, থাকার বাসস্থান, পরিধানের বস্ত্র, ব্যবহারিক সামগ্রী, আরোহণের ঘোড়া এবং খিদমতের দাস-দাসী হতে অতিরিক্ত হতে হবে।

তবে ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোন নিসাব নির্ধারণ করেন নি। বরং যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্য এক দিনের আহার সামগ্রী

অতিরিক্ত হবে তার উপরই সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন—

لَاصَدَقَةَ اِلَّا عَنْ ظَهْرِ غَنِيٍّ

ধনী ছাড়া (কারো উপর) সদকা আরোপিত হয় না।

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেল সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ধনী হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ অনেক হাদীসে সদকাতুল ফিতরকে যাকাতুল ফিতর বলা হয়েছে। সুতরাং যাকাতের জন্য যেভাবে নিসাবের মালের মালিক হওয়া আবশ্যক তদ্রূপ সদকাতুল ফিতরেও নেসাবের মালের মালিক হওয়া আবশ্যক।

قوله : عَنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ الخ : নিসাবের মালিক ব্যক্তি সে নিজের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করবে। কেননা, হযরত ইবনে উমর রাযি. বর্ণিত হাদীসে রয়েছে—

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى الخ

রাসূল সা. স্ত্রী ও পুরুষের উপর সদকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন। অনুরূপভাবে নিসাবের মালিক তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের পক্ষ থেকে, খিদমতের গোলাম-বাদী ও মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের পক্ষ থেকে আদায় করবে। কেননা, সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল, এমন ব্যক্তি যার ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন সে করে। একারণেই সদকাতুল ফিতরকে ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয়- زَكٰوةُ الرَّأْسِ ব্যক্তির যাকাত।

قوله : لَا عَنْ زَوْجَتِهِ الخ : স্বামীর উপর আপন স্ত্রীর সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। কারণ, স্বামীর উপর স্ত্রীর অভিভাবকত্ব অসম্পূর্ণ। আর স্ত্রী ব্যয়ভার যদিও স্বামীর দায়িত্বে, তবে তা নির্ধারিত। যেমন, অন্য-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া স্ত্রী যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তার ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। সুতরাং তার পক্ষ থকে তার সদকাতুল ফিতর স্বামীর উপর আদায় করা আবশ্যক নয়। কেননা, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয় পূর্ণ অভিভাবকত্ব ও আর্থিক দায়ভারের কারণে। অনুরূপভাবে পিতার উপর প্রাপ্ত সন্তানদের পক্ষ থেকে ও মুকাতাবের পক্ষ থকে আদায় করা ওয়াজিব নয়। যদিও তারা তার পরিবারভুক্ত হয়। কেননা, তাদের উপর পিতার কোন অভিভাবকত্ব নেই। তবে হাঁ, যদি পিতা তার প্রাপ্ত সন্তানের পক্ষ থেকে অথবা স্বামী তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে, কিংবা মালিক তার মুকাতাবের পক্ষ থেকে আদায় করে ফেলে তবে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে হা যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের অর্থ বিদ্যমান থাকে অথবা ব্যবসা-বানিজ্যের জন্য গোলাম-বাদী থাকে তবে তাদের পক্ষ থেকে আদায় করা পিতা/মালিকের উপর ওয়াজিব হবে না।

قوله : وَعَبْدٍ اَوْ عَبِيْدٍ لَهُمَا الخ : যদি একটি গোলাম দুজনের অংশীদারিত্বে থাকে তবে কারও উপর সদকায়ে ফিতর উক্ত গোলামের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হবে না। কেননা, কেহ পূর্ণ মালিক নয় বরং অসম্পূর্ণ। আর অসম্পূর্ণের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয় না। আর যদি দুজনের মালিকানায় একাধিক গোলাম বাদী বিদ্যমান তাকে তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তাদের কারও উপর উক্ত গোলামদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। তবে সাহাবাইন রহ. এর মতে উভয় শরীকানের মালিকানায় যত জন করে গোলাম হবে সে হিসাবে তাদের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। উক্ত মতানৈক্যের কারণ হলো, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে গোলামের মাঝে ভাগ বন্টন জায়েয নেই। বরং প্রত্যেকেই প্রতিটি গোলামের অংশীদার। বিধায় তাদের কেহই পূর্ণ গোলামের মালিক হলো না বিধায় সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে সাহাবাইন রহ. এর মতে গোলামের মাঝে ভাগ-বন্টন জায়েয বিধায় প্রত্যেকের ভাগে যতটি গোলাম হবে তাদের সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে।

قوله : وَيَتَوَقَّفُ لَوْ مَبِيعًا الخ : যদি কেহ স্বীয় গোলাম বিক্রি করে এবং ক্রেতা বিক্রেতা যে কোন একজনের মধ্যে এখতিয়ার থাকে তবে গোলাম সর্বশেষে যার হবে তিনি তার সদকায়ে ফিতর আদায় করবেন। অর্থাৎ বিক্রি সম্পন্ন হলে ক্রেতার উপর আর বিক্রি ভেঙ্গে গেলে বিক্রেতার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। ইমাম যুফার রহ. এর মতে যার অনুকূলে এখতিয়ার হবে তিনিই সদকায়ে ফিতর আদায় করবেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, মালিকানা যার জন্য সাব্যস্ত তিনিই তার পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করবেন।

قوله : وَنِصْفُ صَاعٍ الخ : সদকায়ে ফিতরের পরিমাণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, গম, আটা, ছাতু, কিশমিশ দিয়ে আদায় করলে তার পরিমাণ হলো অর্ধ সা', আর খেজুর বা যব দিয়ে আদায় করলে তার পরিমাণ হলো এক সা'। ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এর মতে উল্লেখিত সবকটির কোন একটি দিয়ে আদায় করলে এক সা'ই ওয়াজিব হবে। তাদের দলিল হল : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এর হাদীস—

كُنَّا نُخْرِجُ زَكٰوةَ الْفِطْرِ اِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقْطٍ -

'আমরা রাসূলুল্লাহ্ সা. এর যামানায় এক সা' খাদ্যসামগ্রী অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিশমিশ কিংবা এক সা' পনির সদকায়ে ফিতর হিসাবে আদায় করতাম।

আমাদের দলিল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা. এর বাণী—

اَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَ عَبْدٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ -

'প্রত্যেক ছোট-বড় স্বাধীন, দাস ব্যক্তির পক্ষ থেকে অর্ধ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব আদায় করো।'

দ্বিতীয় দলিল : তিরমিযী শরীফের হাদীস— রাসূলুল্লাহ্ স. এক আহ্বানকারীকে মক্কার রাজপথে পাঠালেন (এই বলে যে,) সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী, স্বাধীন, দাস, ছোট, বড় সকলের উপর। দুই মুদ্দ গম অথবা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীতে এক সা' করে।

অনুরূপ ত্বহাবী শরীফে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. থকে বর্ণিত—

كُنَّا نُؤَدِّى الزَّكٰوةَ الْفِطْرَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ -

ইমাম ত্রয়ের দলিলের জবাব হল : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এক সা' গমের মধ্যে অর্ধ সা' দিতেন ফিতরা হিসাবে আর অর্ধ সা' দিতেন নফল হিসাবে। তিনি তা করতেন সতর্কতামূলক।

অথবা আবু সাঈদ রাযি.এর হাদীসে যে طعام এসেছে তা আমাদের মতে গম নয়, বরং জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি। সুতরাং গম ছাড়া অন্য শষ্য উদ্দেশ্য হলে তা আমাদের দলীল হয়ে যায়।

قوله : وَهُوَ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ الخ : সা' এর পরিমাণ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে সা' হল আট ইরাকী রিতিল। আর এক রিতিল হল বিশ আস্তার পরিমাণ আর এক আস্তার সাড়ে ছয় দিরহাম ওজনের সমপরিমাণ। সুতরাং এক রিতিল এক শা' ত্রিশ দিরহাম ওজনের সমপরিমাণ। ইমাম আবু ইউসুফ রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ., মালিক ও আহমদ রহ. এর মতে এক সা' হল পাঁচ রিতিল ও এক রিতিলের এক তৃতীয়াংশ। তাদের দলিল হল হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস—

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيْعَانِ وَ مُدُّنَا أَكْبَرُ الْأَمْدَادِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيْ قَلِيْلِنَا وَ كَثِيْرِنَا وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ -

'রাসূল সা. এর নিকট আরয করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সা' হল সকল সা' এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম এবং আমাদের মুদ্দ হল সকল মুদ্দ হতে বৃহত্তম। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ সা. দোয়া করলেন—হে আল্লাহ্! আমাদের সা' এর মধ্যে বরকত দাও, আমাদের কম ও বেশির মধ্যে বরকত দাও এবং আমাদের জন্য একটি বকরতের সাথে দুটি বরকত নির্ধারণ করে দাও।'

এ থেকে বুঝা গেল যে, মদীনা শরীফের সা' সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সা' ছিল।

আমাদের দলিল হল : হযরত আনাস ও জরীর রাযি. এর বর্ণিত হাদীস—

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطْلَيْنِ وَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ -

'রাসূলুল্লাহ্ সা. এক মুদ্দ তথা দুই রিতিল পানি দ্বারা অজু করতেন এবং এক সা' তথা আট রিতিল পানি দ্বারা গোসল করতেন।'

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল এক সা' হল আট রিতিল। অনুরূপ হযরত উমর রাযি. এর সা' ছিল। আর আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদীসে صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيْعَانِ এ সা' দ্বারা আট রিতিল বিশিষ্ট সা'ই উদ্দেশ্য। কেননা, তা হাশেমী সা' থেকেও ছোট। হাশেমী সা' হলো বত্রিশ রিতিল পরিমাণ। রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরাকী ব্যবহার করতেন। আর তাই হাশেমী রিতিলের বিপরীতে صاعنا اصغر الصيعان বলা হয়েছে।

قوله : صُبْحَ يَوْمِ الْفِطْرِ الخ : আমাদের মতে ঈদুল ফিতরের দিনের ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথেই ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, রমজানের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর থেকে তা ওয়াজিব হয়। **আমাদের দলিল হল :** সদকা ফিতিরের সাথে বিশিষ্ট। এদিকে ফিতির হলো রোযার বিপরীত এবং রোযার সম্পর্ক দিনের সাথে, রাতের সাথে নয়। অতএব ফিতরের সম্পর্কও দিনের সাথে হবে, রাতের সাথে নয়। সুতরাং সদকা যেহেতু ফিতরের সাথে বিশিষ্ট তাই সদকারও সম্পর্ক দিনের তথা ফজর উদিত হওয়ার সাথে হবে। রাতের তথা সূর্যাস্তের সাথে নয়। এজন্য আমরা বলি ঈদের দিনের ফজর উদিত হওয়ার পর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে।

قوله : وَصَحَّ لَوْ قَدَّمَ الخ : যদি কেহ ফজর উদিত হওয়ার আগে বা পরে আদায় করে তথা ঈদের দিনের আগে আদায় করে নেয় তবে তা জায়েয। কেননা, এক্ষেত্রে সদকাতুল ফিতরের সবব পাওয়া গেছে। আর তা হল ঐ সকল ব্যক্তি সত্তা যাদের সে ভরণ-পোষণ বহন করে ও পূর্ণ অভিভাবক রয়েছে। অতএব সবব বা কারণ পাওয়া যাওয়ার পর আদায় করেছে বিধায় তার এ আদায় করাটা কার্যকর হয়েছে। অপরদিকে হযরত ইবনে উমর রাযি. এর হাদীসে রয়েছে— كَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَيْنِ সাহাবায়ে কেরামগণ ঈদুল ফিতরের দু একদিন আগে ফিতরা দিতেন। আর যদি পরে তথা ঈদের দিনের পরে আদায় করে তবে তা জায়েয। বরং আদায় না করা পর্যন্ত তার যিম্মায় থেকেই যাবে। তা আদায় করা আবশ্যক। যত দেরী হউক। তবে হাসান বিন যিয়াদ রহ. বলেন, ঈদের দিন চলে যাওয়াতে তা রহিত হয়ে যায়। কেননা, তা এমন একটি ইবাদত যা ঈদের দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আমাদের দলিল হল : যদিও সদকায়ে ফিতর ইবাদত, তবে তা যাকাতের ন্যায় অর্থাৎ আদায় না করা পর্যন্ত ব্যাক্তির যিম্মায় থেকেই যাবে, যেভাবে যাকাত ফরয হওয়ার পর তা আদায় না করা পর্যন্ত তা ব্যক্তির যিম্মায় থেকে যায়। এজন্য সদকাতুল ফিতর আদায়ের জন্য কোন নির্ধারিত সময় থাকবে না।

كِتَابُ الصَّوْمِ

অধ্যায় : রোযা

هُوَ تَرْكُ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مِنَ الصُّبْحِ اِلَى الْغُرُوْبِ بِنِيَّةٍ مِنْ اَهْلِهِ وَ صَحَّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَهُوَ فَرْضٌ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ وَهُوَ وَاجِبٌ وَالنَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ اِلٰى مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ وَمَا بَقِىَ لَمْ يَجُزْ اِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مُبَيَّتَةٍ -

অনুবাদ : রোযা হল সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে ব্যক্তি নিয়্যাতের আহাল তার নিয়্যাতসহ পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। রমজানের রোযা তা ফরজ এবং নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা তা ওয়াজিব এবং নফলের নিয়্যাত রাত থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সহীহ। সাধারণ নিয়্যাতে বা নফলের নিয়্যাতে উল্লেখিত রোযা সহীহ। তাছাড়া অন্যান্য রোজা (যেমন ক্বাজা রোজা, সাধারণ মান্নতের রোজা, কাফফারার রোজা) রাত্রে নির্দিষ্ট নিয়্যাত ছাড়া সহীহ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : كِتَابُ الصَّوْمِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. كتاب الصلوة এর পর كتاب الزكوة উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআনের আয়াতের অনুসরণ করতে যেয়ে। কারণ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হল- اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ উক্ত আয়াতে صلوة এর পর زكوة এসেছে। তাই গ্রন্থকার এর অনুসরণ করতঃ صلوة এর পর زكوة এর আলোচনা করেছেন। তারপর كتاب الصوم উল্লেখ করেছেন।

রমজানের রোযা হিজরী ২য় বর্ষের শা'বান মাসে ফরয হয়। অর্থাৎ হিজরতের ১৮ মাস পরে শা'বান মাসে تحويل قبلة তথা ক্বিবলা পরিবর্তনের পর রমযানের রোযা ফরজ হয়। এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সা. ও সাহাবায়ে কেরামগণ আশুরা ও আইয়্যামে বীয তথা চন্দ্র মাসের ১৩,১৪,১৫ তারিখে রোযা রাখতেন। পবিত্র রমযানের রোযা একসাথে ফরজ করা হয় নি। বরং ধাপে ধাপে তা ফরজ করা হয়েছে। যেমন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

উক্ত আয়াত দ্বারা সাধারণভাবে ফরজ করা হয়। অতঃপর ايام معدودات দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তা নির্দিষ্ট কিছু দিন হবে। অতঃপর ইখতিয়ার দেওয়া হল যে, মনে চাইলে রোযা রাখবে নতুবা রাখবে না তবে না রাখলে তার ফিদয়া আদায় করবে। যেমন—

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ -

উক্ত আয়াত দ্বারা রাখা না রাখার স্বাধীনতা দেওয়া হল। তবে একথা বলা হল যে, রাখা উত্তম। যেমন-

وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرًا لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অতঃপর এখতিয়ারকে রহিত করে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুকীম সুস্থ ব্যক্তির উপর রমযানের রোযা রাখা অবধারিত করে দেওয়া হল। যেমন— فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ - 'তোমাদের মধ্য থেকে উক্ত মাস যে পাবে সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।'

উক্ত আয়াত দ্বারা রমযানের রোযা অপরিহার্য হয়ে যায় এবং বিধান আরোপিত হয় যে, রাত্রে শুয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস ও পানাহার করা যাবে। তবে শুয়ে গেলে আর এসব করা যাবে না। কিন্তু বিপত্তি ঘটল এই যে, অনেকেই এ বিধানের ব্যাতিক্রম করে ফেলেন। তাই সর্বশেষ বিধান আরোপিত হয় যে, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ -সুতরাং তখন থেকে সূর্যাস্তের পর থেকে ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস ও পানাহার বৈধ হয়।

قوله : وَ هُوَ تَرْكُ الْأَكْلِ الخ : صوم শব্দটি باب نصر ينصر এর ক্রিয়ামূল। অর্থ বিরত থাকা, রোযা রাখা, উপবাস করা, অভুক্ত থাকা। পরিভাষায় صوم বলা হয়

هُوَ تَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مِنَ الصُّبْحِ إِلَى الْغُرُوْبِ بِنِيَّةٍ مِنْ أَهْلِهِ -

রোযা হল সোবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে ব্যক্তি নিয়্যাতের আহাল তার নিয়্যাতসহ পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রোযাকে নিয়্যাতসহ দিনের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলার বাণী—

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ এবং ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ

উক্ত আয়াতসমূহে রোযার পরিচয় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বলা হয়েছে।

যুক্তি নির্ভর দলীল : ধারাবাহিক রাত্র দিনে রোযা রাখা তথা সাওমে ওসাল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এজন্য যে, একাধারে একমাস দিনে রাতে রোযা রাখা মৃত্যু বরণ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তাই দিবারাত্রের মধ্যে একটাকে রোযার জন্য নির্ধারণ করা আবশ্যক। সুতরাং অভ্যাসের বিপরীত হিসাবে দিনের সঙ্গে নির্ধারণ করা উত্তম।

قوله : وَصَحَّ صَوْمُ رَمَضَانَ الخ : রমযানের রোযা নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা, এবং নফল রোযার নিয়্যাত রাত্র থেকে পরের দিন মধ্যাহ্নের পূর্ব পর্যন্ত করা জায়েয। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, রমযানের রোযা ও নির্ধারিত মান্নতের রোযার ক্ষেত্রে নিয়্যাত রাত্রে করা জরুরী। যদি কেহ রাত্রে নিয়্যাত না করে তবে তা জায়েয হবে না। তবে হা নফল রোযার নিয়্যাত ভোরের পর পর্যন্ত করা জায়েয আছে। ইহা ইমাম আহমদ রহ. এরও অভিমত। ইমাম মালিক রহ. এর মতে ফরজ ও নফল সকল রোযার ক্ষেত্রেই রাত্রে নিয়্যাত করা শর্ত। ইমাম মালিক রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এর দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ সা. এর ইরশাদ—

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ -

যে ব্যক্তি রাতে রোযার নিয়্যাত করে নি, তার রোযা হল না।' দ্বিতীয় দলীল হল- যদি রাত্রে নিয়্যাত করা হয় না তবে রোযার প্রথমাংশ রোযা থেকে খালি রয়ে গেল। অতঃপর ভোর হওয়ার পর নিয়্যাত করল। সুতরাং বুঝা গেল যে, রোযার প্রথমাংশ নিয়্যাত থেকে খালি রয়ে গেল। আর দ্বিতীয় অংশ নিয়্যাতসহ পাওয়া গেল। অথচ নিয়্যাত রোযা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। আর যেহেতু প্রথমাংশে নিয়্যাত পাওয়া গেল না আর দ্বিতীয়াংশে পাওয়া গেল, তাই রোযা বিভক্ত হয়ে গেল। অথচ ফরয ও ওয়াজিব রোযা বিভক্ত হয় না। বিধায় রাত্রে নিয়্যাত না পাওয়ার ক্ষেত্রে রোযা ফাসেদ বলে গণ্য হবে। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. নফল রোযার ক্ষেত্রে ভোরের পরে নিয়্যাতকে গ্রহনযোগ্য বলেন। এ কারণে যে, তার মতে নফল রোযা বিভক্তি যোগ্য। সুতরাং তার মতে নফল রোযাতে যে অংশ নিয়্যাত ছাড়া হবে তা ফাসিদ আর যে অংশ নিয়্যাতসহ হবে তা সহীহ বলে গণ্য হবে।

আমাদের দলীল : সুনানে আরবাতে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস—

قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قال نعم قال أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا -

'হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. এর খিদমতে একজন বেদুইন আসলেন। তিনি বললেন, আমি চাঁদ দেখেছি। হযরত হাসান রাযি. তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন, 'রমযানের চাঁদ'। রাসূলুল্লাহ্ সা. এরশাদ করেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি বললেন, জি হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, জি হাঁ। তিনি সা. বললেন, বেলাল! লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যেন তারা রোযা রাখে।

উক্ত হাদীসটি ও আমাদের স্পষ্ট দলীল হয় না। কেননা, এ চাঁদ দেখা পূর্বের রাত্রেরও হতে পারে। অথবা পরের রাতেরও হতে পারে। বিধায় আমাদের সুস্পষ্ট হাদীস হলো যা হযরত ইবনে আকওয়া রাযি. সূত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. রেওয়ায়েত করেছেন। তা হল এই—

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُمْسِكْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ -

রাসূলুল্লাহ্ সা. আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন সে যেন লোকদের মাঝে এই মর্মে ঘোষণা করে যে, যে কিছু খেয়েছে সে যেন অবশিষ্ট দিন রোযা রাখে আর যে পানাহার করে নি সেও যেন রোযা রাখে। অর্থাৎ রোযা রাখার নিয়্যাত করে। কেননা, এই দিনটি হলো আশুরার দিন। উক্ত ঘটনা তখনকার সময়ের যখন আশুরার রোযা ফরয ছিল এবং রমযানের রোযা দ্বারা মানসুখ বা রহিত হয় নাই। সুতরাং উক্ত ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ফরজ রোযার নিয়্যাত দিনে করাও জায়েয।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীল এর জবাব হল : উক্ত হাদীসের মধ্যে মূল রোযার নফী করা হয়নি, বরং রোযার ফযিলত ও পূর্ণাঙ্গতার নফী করা হয়েছে।

আমাদের যুক্তি নির্ভর দলীল হল : রমযানের রোযা ও মান্নতের রোযার দিন এমনিতেই রোযা রাখা ফরয। সুতরাং যেহেতু প্রথমাংশে ইমসাক তথা পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা পাওয়া গেছে বিধায় অন্য অংশে নিয়্যত পাওয়া গেলে তার উপরই নির্ভরশীল হবে। যেমন নফল রোযার বেলায় হয়ে থাকে।

قوله : وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ الخ : রমযানের রোযা ও নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা ও নফল রোযা সাধারণ নিয়াত দ্বারা বা নফল নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, রমযানের রোযার ক্ষেত্রে নফল রোযার নিয়াত গ্রহণীয় নয়। বরং পৃথকভাবে রমযানের রোযার নিয়্যাত করতে হবে। আর যদি কেহ রমযানের নফল রোযার নিয়্যাত করে তবে ফরয রোযাও আদায় হবে না এবং নফল রোযাও আদায় হবে না। আমাদের দলিল হল : রমযান মাস ফরয রোযার জন্য নির্ধারিত। তাই তো রাসূল সা. ইরশাদ করেন—

إِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ إِلَّا رَمَضَانَ -

যখন শা'বান মাস শেষ হয়ে গেল তখন রমযান ব্যাতিত কোন রোযা নেই। সুতরাং রমজান মাস যেহেতু ফরজ রোযার জন্য নির্ধারিত তাই মূল নিয়্যাত দ্বারা তা ই উদ্দেশ্য হবে। যেমন ঘরের মধ্যে মাত্র একজন ব্যক্তি বিদ্যমান। তাকে তার মূল নাম ধরে না ডেকে ওহে প্রাণী বা ওহে ইনসান, বা নাম হিসাবে ওহে যায়েদ বলে ডাক দিলে সেই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তদ্রূপ রমযান মাসে নফল বা অন্য ওয়াজিবের নিয়্যাত করলেও রমযানের রোযাই

আদায় হবে। এবং যখন সে নফল বা অন্য ওয়াজিবের নিয়্যাত করল তবে সে যেন মূল রোযারই নিয়্যাত করল। এবং অন্য অতিরিক্ত একটি জিনিসের নিয়্যাত করল। সুতরাং অতিরিক্ত জিনিসের নিয়্যাত বাতিল বলে গণ্য হবে।

قوله : وَمَا بَقِىَ لَمْ يَجُزْ الخ : ব্যাক্তির জিম্মায় ওয়াজিব হওয়া রোযা যার দিন ক্ষণ নির্ধারিত নেই। যেমন রমযানের ক্বাজা রোযা, বা কাফফারা রোযা বা অনির্ধারিত মান্নতের রোযা। এ সকল রোযার ক্ষেত্রে রাত্রে বা ভোর হওয়ার সাথে সাথে নিয়্যাত করা অপরিহায্য। এর পর তথা ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর নিয়্যাত করে তবে রোযা জায়েয নেই। কারণ, এ ধরণের রোযার কোন নির্ধারিত সময় নেই। বরং সারা বৎসরই তথা রমযান ও নিষিদ্ধ দিন ব্যাতিত অন্য যে কোন দিন তা আদায় করলে তা আদায় হবে একারণে ফজরের ওয়াক্তের সাথে সাথেই নিয়্যাত করে নিতে হবে।

وَيَثْبُتُ رَمَضَانُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ اَوْ بِعَدِّ شَعْبَانَ ثَلْثِيْنَ وَلَا يُصَامُ يَوْمَ الشَّكِّ إِلَّا تَطَوُّعًا وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ اَوِ الْفِطْرِ وَرُدَّ قَوْلُهُ صَامَ فَإِنْ أَفْطَرَ قَضَى فَقَطْ وَقُبِلَ بِعِلَّةٍ خَبَرُ عَدْلٍ وَلَوْ قِنًّا اَوْ أُنْثَى لِرَمَضَانَ وَحُرَّيْنِ اَوْ حُرٍّ وَحُرَّتَيْنِ لِلْفِطْرِ وَإِلَّا فَجَمْعٌ عَظِيمٌ لَهُمَا وَالْأَضْحَى كَالْفِطْرِ وَلَا عِبْرَةَ لِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ -

---

অনুবাদ : রমযান সাবিত হয় রমজানের নতুন চাঁদ দেখা দ্বারা, অথবা শা'বান মাসের ত্রিশ দিন হয়ে যাওয়াতে। আর যে দিনটি সন্দেহপূর্ণ (তা রমযানের কি না) সে দিন নফল ছাড়া অন্য কোন রোজা রাখা যাবে না। যে ব্যক্তি রমযানের অথবা ঈদের নতুন চাঁদ দেখবে এবং তার কথা প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে সে রোযা রাখবে। আর যদি সে ভেঙ্গে ফেলে তবে শুধু সে তার ক্বাজা আদায় করবে। আর রমজানের জন্য গ্রহণ করা হবে আকাশ অপরিস্কারের কারণে একজন আদিল (ন্যায়পরায়ণ) ব্যক্তির সংবাদ যদিও সে গোলাম হয় অথবা মহিলা হয় এবং ঈদের জন্য (আকাশ অপরিস্কারের কারণে) দুজন স্বাধীন পুরুষের অথবা একজন স্বাধীন পুরুষ ও দুজন স্বাধীন মহিলার সংবাদ। নতুবা (আকাশ পরিস্কার থাকলে) রমযান ও ঈদের জন্য বড় এক জামাআতের সংবাদ গ্রহনযোগ্য। আর ঈদুল আজহা ঈদুল ফিতর এর ন্যায়। আর চন্দ্র উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহনযোগ্য নয়।

শব্দার্থ : هِلَالٌ (ج) أَهِلَّةٌ - নতুন চাঁদ, নবচন্দ্র। أَفْطَرَ - افعال থেকে إِفْطَارًا - রোযা ভঙ্গ করা, ইফতার করা। قِنٌّ - গোলাম। مَطَالِعٌ ইহা مَطْلَعٌ এর ব.ব., অর্থ- উদয়স্থল, উদয়, সূচনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَيَثْبُتُ رَمَضَانُ الخ : আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. ফতহুল কাদীর গ্রন্থে লিখেছেন যে, শাবানের উনত্রিশ তারীখ রমযানের চাঁদ দেখা ওয়াজিবে কেফায়াহ। কেননা, আরবী মাস অনেক সময় উনত্রিশ দিনে পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং শাবানের উনত্রিশ তারিখে চাঁদ দেখা গেলে রোযা রাখা হবে। আর যদি দেখা না যায় তবে ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করে পরের দিন থেকে রোযা রাখা হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইর্শাদ করেন—

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِلَالُ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلْثِيْنَ يَوْمًا -

চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার কর, আর যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে তবে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

যুক্তিনির্ভর প্রমাণ : শাবান মাস যেহেতু পূর্ব থেকে চলে আসছে বিধায় তা অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত

নতুন মাসের সূচনা না দেখা যাবে বরং শাবান মাস শেষ হওয়াটা প্রমাণিত হবে না। বরং তা অব্যাহত থাকবে। আর ত্রিশ পূর্ণ হলে তা নিঃসন্দেহে শেষ হয়ে যাওয়াটা প্রমাণিত হবে। বিধায় পরের দিন থেকে রোযা রাখতে হবে।

قوله : وَلَايُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ الخ : يوم الشك (সন্দেহপূর্ণ দিন) সে দিনকে বলা হয় যে দিন চাঁদ দেখা যায় না مطلع তথা উদয়স্থল অপরিস্কার থাকার কারণে। আর যদি উদয়স্থল পরিস্কার থাকার পরও চাঁদ দেখা যায় না তবে শাবানের ত্রিশ তারিখকে يوم الشك বলা যাবে না। يوم الشك এর বিধান হল এ দিনে নফল ছাড়া আর কোন প্রকার রোযা রাখা যাবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— لَايُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا تَطَوُّعًا যে দিনটি সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে তা রমযান কি না সে দিনে নফল ছাড়া অন্য কোন রোযা রাখা যাবে না।

আকলী দলীল হল : সন্দেহপূর্ণ দিনে রোযা রাখার দ্বারা ইহুদী ও নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। মোটকথা, সন্দেহপূর্ণ দিনে নফল ছাড়া তথা রমযানের রোযার নিয়্যাতে রোযা রাখা মাকরূহ। তবে যদি কেহ রমযানের নিয়্যাতে রেখে নেয় আর পরে প্রমাণিত হয় যে এ দিনটি রমযানেরই ছিল তবে তার এদিনের রোযা কাযা করতে হবে না।

قوله : وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ الخ : যদি কেহ একা চন্দ্রের উদয়স্থল পরিস্কার থাকা অবস্থা চাঁদ দেখে। আর তার এ সাক্ষ্য ইমাম গ্রহণ না করেন তবুও সে রোযা রাখবে। কেননা, সে চাঁদ দেখার কারণে তার উপর রমযানের রোযা আবশ্যক হয়ে গেছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আর রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ সুতরাং আয়াত এবং হাদীস তার ক্ষেত্রে রোযা ওয়াজিব হওয়াটা বুঝায়। আর সে ঐ দিন রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলে যদিও সহবাস দ্বারা তবে তার উপর শুধু ক্বাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, যদি সহবাস দ্বারা রোযা ভেঙ্গে ফেলে তবে কাজার সাথে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

قوله : وَقُبِلَ بِعِلَّةٍ الخ : আকাশ অপরিস্কার তথা চাঁদ উদয়স্থল অপরিস্কার হলে একজন ন্যায়পরায়ণ তথা আদিল ব্যক্তির রমজানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে সংবাদ গ্রহন করা হবে। হোক সে স্বাধীন বা গোলাম, পুরুষ বা মহিলা। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মালিক রহ. এর দুটি মতের মধ্যে একটি মত হল এ ক্ষেত্রে দুজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ হবে। কেননা, তাদের মতে রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে নিসাবে শাহাদাৎ প্রয়োজন। আর নিসাবে সাহাদাতের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের ইরশাদ হল : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ তাই দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণীয়। একজনের সাক্ষ্য গ্রহনীয় নয়।

আমাদের দলিল হলো : রমযানে রোযা রাখা একটি দ্বীনি কাজ, যার সংবাদ দিয়ে সে মানুষের উপর রমযানের রোযা ওয়াজিব করতেছে। তাই এ ক্ষেত্রে নিসাবে শাহাদাতের প্রয়োজন নেই। যেমন, হাদীস বর্ণনা একটি দ্বীনি বিষয় তাই তা বর্ণনা করার জন্য স্বাধীন, পরাধীন, পুরুষ মহিলার কোন শর্ত নেই। তবে বর্ণনাকারী আদিল হতে হবে।

অপর দিকে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, যার সারসংক্ষেপ হল, রাসূলুল্লাহ্ সা. এ ব্যাপারে এক বেদুঈন সাহাবার সংবাদ গ্রহন করতঃ হযরত বিলাল রাযি. কে নির্দেশ দিলেন লোকদেরকে জানিয়ে দাও তারা যেন আগামীকাল রোযা রাখে। সুতরাং উদয়স্থল অপরিস্কার হলে একজন আদিল ব্যক্তির সংবাদ রমযানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে গ্রহনীয়।

قوله : وَحُرَّيْنِ أَوْ حُرٍّ وَ حُرَّتَيْنِ الخ : রমযানের উনত্রিশ তারীখে যদি আকাশ অপরিস্কার তথা চাঁদ উদয়স্থল অপরিস্কার থাকে তবে রোযা রাখার ন্যায় মহত কাজে একজনের সংবাদ গ্রহনীয় নয় বরং এ ক্ষেত্রে নিসাবে

শাহাদাত প্রয়োজন। আর তা হল দুজন স্বাধীন পুরুষ অথবা একজন স্বাধীন পুরুষ ও দুজন স্বাধীন মহিলা এবং তারা হদ্দে কাযাফ অথবা জেনার সাজা প্রাপ্ত না হতে হবে। এবং তাদের সাক্ষ্যর শব্দ শাহাদাৎ দ্বারা হওয়া জরুরী। কেননা, ঈদুল ফিতরের চাঁদের সাথে বান্দাদের স্বার্থ জড়িত আছে। আর তা হল রোযা না রাখা। সুতরাং এর মধ্যে বান্দার উপকার থাকার দরুন এটা শুধু দ্বীনি বিষয় নয়, বরং এটা বান্দার হক্কসমূহের সাথে সাদৃশ্য হয়ে গেল। আর বান্দার হক্কসমূহ সাব্যস্ত করার জন্য নিসাবে শাহাদাত জরুরী। এজন্য একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহনীয় নয়।

قوله : وَإِلَّا فَجَمْعٌ عَظِيمٌ لَهُمَا الخ : আর যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তথা চাঁদ উদয়স্থল পরিষ্কার হলে রমযানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে অথবা ঈদুল ফিতরের ক্ষেত্রে বড় এক জামাআতের দেখাটা গ্রহনীয় হবে। এক দু জনের দেখা গ্রহনীয় হবে না। কেননা, আকাশ পরিষ্কার থাকা অবস্থায় শুধু এক দুজনের চাঁদ দেখা আর বাকীরা না দেখা সন্দেহের সৃষ্টি করে। আর সন্দেহের সাথে শরীয়তের কোন হুকুমই প্রযোজ্য হয় না। এজন্য বড় এক দলের সাক্ষ্য গ্রহনীয় হবে। বড় দলের পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেহ কেহ বলেন, বড় দল দ্বারা মহল্লার সকল লোক উদ্দেশ্য। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে এর দ্বারা পঞ্চাশ জন ব্যক্তি উদ্দেশ্য। তিনি তা কাসামাতের উপর কিয়াস করেছেন।

মোটকথা, বড় দল বলতে এমন লোক সমাগম হওয়া বাঞ্ছনীয় যাদেরকে একসাথে মিথ্যুক বলা যায় না। এমন একদলের সাক্ষ্য দেওয়া গ্রহনীয়।

قوله : والأَضْحَى كَالْفِطْرِ الخ : ঈদুল আযহার চাঁদ দেখার হুকুম হল ফিতরের চাঁদ দেখার অনুরূপ। অর্থাৎ যেভাবে আকাশ অপরিস্কার থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণীয় ছিল না তদ্রূপ ঈদুল আজহাতেও এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহনীয় নয়। আর আকাশ পরিস্কার থাকা অবস্থায় যেভাবে ঈদুল ফিতরে বড় এক দলের সাক্ষ্য গ্রহনীয় তদ্রূপ ঈদুল আজহার চাঁদ দেখার ক্ষেত্রেও বড় এক দলের সাক্ষ্য গ্রহনীয় ইহা যাহির রিওয়ায়েত অনুযায়ী। আর ইহাই বিশুদ্ধ।

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ

পরিচ্ছেদ : যেসব বিষয়ে রোজা ভঙ্গ হয় এবং যেসব বিষয়ে রোজা ভঙ্গ হয় না এর বিবরণ

فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوِ احْتَلَمَ أَوْ أَنْزَلَ بِنَظَرٍ أَوِ ادَّهَنَ أَوِ احْتَجَمَ أَوِ اكْتَحَلَ أَوْ قَبَّلَ بِخِلَافِ الْإِنْزَالِ بِهِ أَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ غُبَارٌ أَوْ ذُبَابٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ أَوْ أَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ أَوْ قَاءَ وَعَادَ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ أَعَادَهُ أَوْ اسْتَقَاءَ أَوِ ابْتَلَعَ حَصَاةً أَوْ حَدِيدًا قَضَى فَقَطْ -

অনুবাদ : যদি রোযাদার ভুলে পানাহার করে অথবা স্ত্রী সহবাস করে ফেলে কিংবা সপ্নদোষ হয়, কিংবা (কোন মহিলার দিকে) তাকানোতে বীর্যস্খলিত হয় অথবা তৈল লাগায় কিংবা শিঙ্গা লাগায় অথবা সুরমা ব্যবহার

করে কিংবা বীর্যস্খলন ব্যাতিরেকে চুম্বন করে অথবা তার রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় গলার ভিতর ধুলা বালু কিংবা মাছি প্রবেশ করে অথবা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্য খেয়ে ফেলে কিংবা অনিচ্ছাকৃত বমি এসে ফিরে যায় তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। আর যদি সে নিজে তা (বমি করে) ফিরায় তথা গলধঃকরণ করে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে কিংবা কঙ্কর অথবা লোহা গিলে ফেলে তবে (উক্ত রোযার) শুধু ক্বাজা আদায় করবে।

শব্দার্থ : جَامَعَ - مفاعلة থেকে مُجَامَعَةً স্ত্রীসহবাস করা, সঙ্গম করা। اِحْتَلَمَ - افتعال থেকে اِحْتِلَامًا স্বপ্নদোষ হওয়া। اِدَّهَنَ তৈল লাগানো। اِحْتَجَمَ - افتعال থেকে اِحْتِجَامًا শিঙ্গা লাগানো। اِكْتَحَلَ - افتعال থেকে اِكْتِحَالًا চোখে সুরমা লাগানো, সতেজ হওয়া। غُبَارٌ (ج) اَغْبِرَةٌ ধুলাবালু। اِسْتِقَاءٌ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা, বমি করানো। اِبْتَلَعَ - افتعال থেকে اِبْتِلَاعًا - গলধঃকরণ করা, গিলে ফেলা। حَصَاةٌ (ج) حَصَوَاتٌ - পাথর, কঙ্কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : فَاِنْ اَكَلَ الصَّائِمُ الخ : রোযাদার যদি ভুলক্রমে পানাহার করে অথবা স্ত্রী সহবাস করে ফেলে তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ, এক ব্যক্তি ভুল বশত পানাহার করলে রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করলেন—

تِمَّ عَلٰى صَوْمِكَ فَاِنَّمَا اَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَ سَقَاكَ -

রোযা পূর্ণ কর, কেননা, আল্লাহ তাআলা তোমাকে আহার করিয়েছেন ও পান করিয়েছেন। সুতরাং যেহেতু তা পানাহারের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হল সুতরাং অন্যান্য রুকনের ক্ষেত্রেও তা প্রমাণিত হবে। আর সহবাসও পানাহারের সাদৃশ্য। এদিকে যেহেতু হাদীস দ্বারা ভুল বশত পানাহারের দ্বারা রোযা ভঙ্গ না হওয়া প্রমাণিত হল, তাই ভুল বশত সহবাসের কারণে রোযা ভঙ্গ না হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হবে। তবে ক্বিয়াসের দাবী হল রোযা ভেঙ্গে যাওয়া যা ইমাম মালিক রহ. এর মাযহাব।

অনুরূপভাবে রোযা অবস্থায় কেহ ঘুমিয়ে গেল অতঃপর তার সপ্নদোষ হয়ে গেল তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন—

ثَلَاثٌ لَايُفْطِرْنَ الصِّيَامُ اَلْقَيْئُ وَالْحِجَامَةُ وَالْاِحْتِلَامُ

তিনটি জিনিস দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না—অনিচ্ছা সত্ত্বেও বমি আসা, শিঙ্গা লাগানো, স্বপ্নদোষ।

দ্বিতীয়ত স্বপ্নদোষের মধ্যে প্রকৃত সহবাস পাওয়া যায় নি। বাহ্যতও না এবং মর্মগতও না। তাই রোযা বিনষ্ট হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। অনুরূপভাবে যদি কোন রোযাদার সুশ্রী কোন মহিলা বা তার লজ্জাস্থানের দিকে তাকায় এবং ততে বীর্যপাত হয়ে যায়, তবুও তার রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা, তাতেও বাহ্যত বা মর্মগত সহবাস পাওয়া যায়নি। অনুরূপভাবে যদি কেহ তার শরীরের অন্য অঙ্গে তৈল ব্যবহার করে তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ, এতে রোযার বিপরীত কোন জিনিস পাওয়া যায় নি। তেমনিভাবে যদি কেহ শিঙ্গা লাগায় অথবা সুরমা ব্যবহার করে তবুও তার রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা, পূর্বে উল্লেখিত হাদীস তথা ثَلَاثٌ لَايُفْطِرْنَ الصِّيَامُ اَلْقَيْئُ وَالْحِجَامَةُ وَالْاِحْتِلَامُ উক্ত হাদীসে প্রকাশ্যভাবে حجامة তথা শিঙ্গা লাগানোকে রোযা ভঙ্গ না হওয়া বুঝা যায়। আর সুরমার ব্যাপারে আবু রাফে' রাযি. থেকে বর্ণিত :

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمُكْحَلَةٍ اِثْمِدَ فِيْ رَمَضَانَ فَاكْتَحَلَ وَهُوَ صَائِمٌ

রাসূলুল্লাহ্ সা. ইছমিদ নামী সুরমাদানী অন্বেষণ করলেন। অতঃপর তিনি রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করলেন। তেমনি হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত—

اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِكْتَحَلَ وَهُوَ صَائِمٌ

সুতরাং বুঝা গেল যে, রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করা রোযা ভঙ্গের কারণ নয়। অনুরূপভাবে রোযা অবস্থায় কেহ কোন নারীকে চুম্বন করল এবং বীর্য স্খলন না হয় তবে তার রোযা বহাল থাকবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে বাহ্যত ও মর্মগত সহবাস পাওয়া যায়নি। আর রোযা ভঙ্গের কারণ হল সহবাস। আর যদি রোযাদার ব্যক্তির চুম্বনের সাথে সাথে বীর্যস্খলন ঘটে যায় তবে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। কেননা, ইহাতে মর্মগত সহবাসের অর্থ পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছায় মুখে মাছি বা ধুলা প্রবেশ করে তা উদরে চলে যায় তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে ক্বিয়াসের চাহিদা হলো রোযা ভেঙ্গে যাওয়া। কারণ রোযা ভঙ্গকারী বস্তু তার উদরে প্রবেশ করেছে যদিও তা অস্বাভাবিক হোক। যেমন মাটিও কঙ্কর পাকস্থলিতে প্রবেশ করাতে রোযা ভেঙ্গে যায়। তবে ইসতিহসানের চাহিদা অনুযায়ী রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ, মাছি, ধুলা ইত্যাদি থেকে অনেক সময় বেঁচে থাকা সম্ভব নয়; বরং অনিচ্ছাকৃতভাবেই তা প্রবেশ করতঃ উদরে প্রবেশ করে। সুতরাং মাছি, ধুয়া, ধুলা ইত্যাদিতে রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে হা যদি কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলোকে গিলে ফেলে তবে তার রোযা সর্বসম্মতিক্রমে ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি কোন খাদ্যদ্রব্য দাঁতের ফাকে লেগে থাকে আর রোযাদার তা জিহ্বা দ্বারা নেড়ে খেয়ে ফেলে, তাহলে দেখতে হবে তাকি একটি চানা/বুটের সমান অর্থাৎ অধিক নাকি চানা বুটের চেয়ে কম। যদি কম হয় তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ, এথেকে বেচে থাকা কষ্টকর। সুতরাং তা থুথুর ন্যায় হয়ে গেলে যেভাবে থুথু গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না, তদ্রূপ অল্প পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দাঁত থেকে বের করে গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার রহ. এর মতে কম হোক বা বেশী হোক তাতে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কারণ, তার মতে মুখের ভিতরের অংশ শরীরের বাহিরের অংশ। তাইতো কুলি করা দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। সুতরাং রোযা অবস্থায় দাঁত থেকে কোন জিনিস পেটে যাওয়া এর অর্থ হলো বহিরাগত কোন জিনিস পেটে গেল। আর বাহিরের কোন জিনিস পেটে যাওয়াতে সর্বসম্মতিক্রমে রোযা ভেঙ্গে যায়। তেমনি যদি বমি নিজে নিজেই হয়ে যায় তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন-

مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاء

'যার বমি নিজে নিজে হয়ে যায় তার উপর কাযা নেই। আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তার উপর ক্বাযা ওয়াজিব।'

অতএব যদি বমি নিজে নিজে হয়ে যায় তবে রোযা ভঙ্গ হবে না, চাই তা কম বা বেশি হোক। কেননা, উক্ত হাদীসখানা হলো মুত্বলাক। যাতে কম বেশির কোন শর্তারোপ নেই। আর যদি বমি নিজে নিজে হয়ে পুনরায় তা উদরে ফিরে যায়, তবে আমাদের মাযহাব মতে রোযা ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, তিনি বলেন, পুনরায় ফিরে যাওয়াতে বহিরাগত কোন জিনিস ফিরে যাওয়ার সাদৃশ্য। সুতরাং যেভাবে বহিরাগত কোন জিনিস খেয়ে ফেলাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, অনুরূপভাবে বমি ফিরে যাওয়াতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল হল : বমি ভিতরে চলে যাওয়াতে না বাহ্যিকভাবে ভঙ্গ হয় আর না মর্মগতভাবে। কেননা, বাহ্যিকভাবে তো কোন জিনিস মানুষ মুখে দিয়ে গিলে ফেলাতে রোযা ভঙ্গ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা তো পাওয়া গেল না। আর মর্মগতভাবে তো ইফতার হলো কোন খাদ্যদ্রব্য দ্বারা খাদ্য গ্রহন করা অথচ বমি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। উপরোল্লিখিত কারণসমূহে রোযা ভঙ্গ হয় না বিধায় তার ক্বাজা ও কাফফারা কোনটিই ওয়াজিব হয় না।

قوله : وَإِنْ أَعَادَهُ أَوِ اسْتَقَاءَ الخ : যদি বমি মুখ ভরা পারিমাণ নিজে নিজেই হয় অতঃপর তা ইচ্ছাকৃতভাবে

গলধঃকরণ করা হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে বের হওয়া অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও প্রবেশ করানো ইচ্ছাকৃতভাবে পাওয়া গেছে। এতে বাহ্যিকভাবে রোযা ভঙ্গের কারণ পাওয়া গেছে। সুতরাং তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। এবং উক্ত রোযার ক্বাজা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি রোযাদার স্বেচ্ছায় বমি করে এবং তা মুখ ভর্তি পরিমাণ হয়ে থাকে, তবে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে, এবং তার উপর ক্বাযা ওয়াজিব হবে। দলীল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা.এর হাদীস— مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاء যে স্বেচ্ছায় বমি করে তার উপর ক্বাজা ওয়াজিব। এখানে উক্ত হাদীসের কারণে কিয়াসকে বর্জন করা হয়েছে। অথচ কিয়াসের চাহিদা হলো ভিতরে প্রবেশ হওয়া দ্বারা রোযা ভঙ্গ হওয়া আর ভিতর থেকে বের করা দ্বারা রোযা ফাসিদ না হওয়া। যেমন পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি। আর এ ক্ষেত্রে ক্বাজার সাথে কাফফারা ওয়াজিব হয়নি। কারণ, অপরাধটি পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়নি। কেননা, বমি করাতে বাহ্যত ইফতার পাওয়া যায়নি। কেননা বাহ্যত ইফতারের জন্য শর্ত হল কোন জিনিস ভিতরে প্রবেশ করানো পাওয়া যাওয়া। সুতরাং পরিপূর্ণ অপরাধ না পাওয়ার দরুন শুধু ক্বাযা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি কঙ্কর কিংবা লোহার খন্ড আহার করাতে তার উপর ক্বাযা ওয়াজিব হবে। তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। ক্বাযা এ কারণে যে এখানে বাহ্যত কোন জিনিস উদরে প্রবেশ করানো পাওয়া গেছে। আর কাফফারা ওয়াজিব হবে না, কারণ মর্মগতভাবে রোযা ভঙ্গ হওয়া পাওয়া যায়নি। কারণ মর্মগতভাবে রোযা খাদ্যদ্রব্য তথা ক্ষুধা নিবারণে উপকারী কোন বস্তু ভিতরে প্রবেশ করানো পাওয়া যায় নি। কেননা, সে কঙ্কর বা লোহা খেয়েছে যা খাদ্যসামগ্রী নয়। সুতরাং মর্মগতভাবে ইফতার না পাওয়ার দরুন অপরাধ পূর্ণ হয়নি। তাই কাফফারা ওয়াজিব হবে না। বরং শুধু ক্বাযা ওয়াজিব হবে।

وَمَنْ جَامَعَ اَوْ جُومِعَ اَوْ أَكَلَ اَوْ شَرِبَ غِذَاءً اَوْ دَوَاءً عَمَدًا قَضٰى وَكَفَّرَ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَلَا كَفَّارَةَ بِالْإِنْزَالِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَبِإِفْسَادِ صَوْمٍ غَيْرِ رَمَضَانَ وَإِنِ احْتَقَنَ اَوْ اسْتَعَطَ اَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنِهِ اَوْ دَاوٰى جَائِفَةً اَوْ آمَّةً بِدَوَاءٍ وَوَصَلَ إِلٰى جَوْفِهِ اَوْ دِمَاغِهِ أَفْطَرَ وَإِنْ أَقْطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ لَا وَكُرِهَ ذَوْقُ شَيْءٍ وَمَضْغُهُ بِلَا عُذْرٍ وَمَضْغُ الْعِلْكِ لَا كُحْلٌ وَدَهْنُ شَارِبٍ وَسِوَاكٌ وَالْقُبْلَةُ إِنْ أَمِنَ -

অনুবাদ : যে ব্যক্তি (রোযা স্মরণ অবস্থায়) ইচ্ছাকৃতভাবে সঙ্গম করে অথবা সঙ্গমকৃত হয় কিংবা ঔষধ বা খাদ্যরূপে কিছু আহার করে বা পান করে তবে (ভঙ্গ হওয়া রোযার) ক্বাযা করবে এবং জিহারের কাফফারার অনুরূপ কাফফারা আদায় করবে। আর স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্য কোন স্থানে সঙ্গমোত্তর বীর্যপাতে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। রমযানের রোযা ছাড়া অন্য রোযা নষ্ট করার দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হবে না। যদি ডুশ ব্যবহার করে কিংবা নাক দ্বারা ঔষধ প্রবেশ করায় অথবা কানে ঔষধের ফোটা প্রয়োগ করে কিংবা পেটের ভিতর পর্যন্ত বা মাথার ভিতর পর্যন্ত উপনীত ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা করে আর ঔষধ পেটে বা মাথায় পৌছে যায় তবে (উল্লেখিত সকল অবস্থায়) রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি পুরুষাঙ্গের ছিদ্রপথে ফোটা ফোটা করে ঔষধ ঢালে তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। কোন জিনিসের স্বাদ গ্রহন করা, কিংবা ওজর ছাড়া (আপন সন্তানের) খাদ্য চিবিয়ে দেওয়া, অথবা আটা চিবানো মাকরূহ (তবে রোযা ভঙ্গ হবে না)। সুরমা ব্যবহার করা অথবা গোঁফে তৈল দেওয়া কিংবা মিসওয়াক করা অথবা চুম্বন দেয়া যদি সে আশ্বস্ত থাকে (যে সে সহবাসে পৌছবে না) তাহলে এসব কার্য মাকরূহ নয়।

শব্দার্থ : غِزَاءٌ (ج) اَغْزِيَةٌ - খাদ্য, পথ্য। دَوَاءٌ (ج) اَدْوِيَةٌ - ঔষধ, চিকিৎসা, প্রতিশেধক : فَرْجٌ (ج) فُرُوجٌ ফাঁক, গুপ্তাঙ্গ। তবে এখানে সম্মুখ দ্বার ও গুপ্তাঙ্গ দ্বার উভয়টি উদ্দেশ্য। اِحْتَقَنَ (افتعال থেকে) احتقانا - ডুশ ব্যবহার করা, গুহ্যদ্বারে ঔষধ প্রবেশ করানো। اِسْتَعَطَ - নাক দ্বারা ঔষধ প্রবেশ করানো। اَقْطَرَ - افعال থেকে اِقْطَارًا - ফোঁটা ফোঁটা পড়তে দেওয়া। جَائِفَةٌ - পেট। اَمَّةٌ - এমন যখম যা মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছে। اَحْلِيْلُ - পুরুষাঙ্গের ছিদ্র। مَضْغٌ - চর্বন, চিবানো। اَلْعَلْكُ - আটা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَمَنْ جَامَعَ الخ : যদি রোযাদার স্বেচ্ছায় সঙ্গম করে, আর তার এ সঙ্গম গুপ্তাঙ্গে বা গুহ্যদ্বারে হোক তবে তার উপর ক্বাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে যার সাথে সঙ্গম করেছে, তার উপর কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। ক্বাযা এজন্য ওয়াজিব হয় যে, যাতে উদ্দেশ্য এবং নেকী পূর্ণ হয়ে যায়। কেননা, রোযার উদ্দেশ্য হল নফসে আম্মারাকে দমন করা। সুতরাং সঙ্গমের কারণে (রোযার উদ্দেশ্য) নফসে আম্মারাকে দমন করা পাওয়া গেল না, বরং বিপরীত হল। তাই ঐ দিনের রোযা বিনষ্ট হয়ে গেল। বিধায় এ জন্য ঐ দিনের রোযার কাযা ওয়াজিব হবে। আর কাফফারা এজন্য ওয়াজিব হবে যে সঙ্গমের দ্বারা পরিপূর্ণ অপরাধ পাওয়া গেল। এবং তা বাহ্যত ও মর্মগতভাবে সঙ্গম পাওয়া গেছে বিধায় তা মহান প্রভুর ঘোষণার বিপরীত হয়েছে। তাই কাফফারা ওয়াজিব হবে। উল্লেখ্য যে উক্ত কাফফারাকে গোসল ওয়াজিব হওয়ার উপর কিয়াস করে বলা যায় যে, কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য বীর্যস্খলন শর্ত নয়, বরং শুধু সহবাসই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে রোযাদারের ইচ্ছাকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য আহার বা পান করাতে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও ক্বাযা কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলিল হলো : কাফফারার সম্পর্ক হলো রোযা ভঙ্গ হওয়ার সাথে যা ইচ্ছা স্বাধীন পরিপূর্ণভাবে রমযান মাসে পাওয়া যায়। আর পূর্ণ অপরাধ যেভাবে সহবাসের মধ্যে বিদ্যমান তেমনি পানাহার করার মধ্যেও পাওয়া যায়। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করার দ্বারা ক্বাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে।

قوله : كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ الخ : রোযার কাফফারা যিহারের কাফফারার অনুরূপ। আর যিহারের কাফফারা সম্পর্কে মহান প্রভুর নির্দেশ হল :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ❁ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا -

'যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে, অতঃপর নিজেদের কথা প্রত্যাখ্যান করে, (তবে তাদের কাফফারা এই যে) পরস্পর স্পর্শ করার পূর্বে একটি গোলাম স্বাধীন করবে, এটা তোমাদের জন্য উপদেশ হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সংবাদ রাখেন। আর যে পায় না (অর্থাৎ গোলাম স্বাধীন করতে সামর্থ হয় না) সে পরস্পর স্পর্শ করার পূর্বে ধারাবাহিক দুমাস রোযা রাখবে। আর যে এতেও সামর্থবান হয় না সে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে। (সূরা মুজাদালা)

মোটকথা, রোযার কাফফারা জিহারের কাফফারার ন্যায় অর্থাৎ গোলাম আজাদ করবে। গোলাম না পাওয়ার ভিত্তিতে ধারাবাহিক দুমাস রোযা রাখবে। তাতেও সামর্থবান না হলে ষাটজন মিসকিনকে দুবেলা আহার করাবে। অতএব আমাদের মাযহাব মতে ধারাবাহিকতা শর্ত। অর্থাৎ একটি না পাওয়া গেলে অন্যটি ওয়াজিব হবে। যেমন, গোলাম আজাদ করতে সামর্থ্য না হলে দুমাস রোযা রাখতে পারবে। আর দুমাস রোযা রাখতে সামর্থ্য হলে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াতে পারবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে ধারাবাহিকতা শর্ত নয়। বরং উক্ত তিনটি থেকে যে কোন একটি করলেই হবে।

قوله : وَلَا كَفَّارَةَ بِالْإِنْزَالِ الخ : যদি কেহ নারীর সম্মুখ দ্বার বা গুহ্যদ্বার ছাড়া অন্যস্থানে তথা রানে বা পেটে সঙ্গম করে আর এতে বীর্যপাত ঘটে তবে কাজা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, এতে মর্মগত সঙ্গম পাওয়া গেছে। কিন্তু বাহ্যত সঙ্গম পাওয়া যায়নি। কেননা, বাহ্যত সঙ্গম হল লজ্জাস্থান লজ্জাস্থানে প্রবেশ করানো।

قوله : وَبِإِفْسَادِ الصَّوْمِ الخ : রমযান মাস ছাড়া অন্যান্য রোযা রেখে ভেঙ্গে দিলে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, রমযানের রোযা ভেঙ্গে দেওয়া বড় অপরাধ। আর রমযান ছাড়া অন্য রোযা ভঙ্গতে রমজানের তুলনায় লঘু অপরাধ সাব্যস্ত হয়। রমজানের রোযা ভেঙ্গে দেওয়াতে বড় অপরাধ দুটি কারণে : ১। রোযা ভঙ্গের অপরাধ। ২। রমযান মাসের পবিত্রতা ভেঙ্গে দেওয়ার অপরাধ। কিন্তু অন্য রোযা ভেঙ্গে দেওয়াতে শুধু রোযা ভাঙ্গার অপরাধ সাব্যস্ত হয়। বিধায় শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। দ্বিতীয়তঃ রমযানের রোযা ভাঙ্গার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হয় নস দ্বারা। যা কিয়াস বিরোধী। সুতরাং তার উপর অন্যান্য রোযা ভাঙ্গাকে কিয়াস করা যাবে না।

قوله : وَإِنِ احْتَقَنَ الخ : যদি কেহ রোযা অবস্থায় ডুশ ব্যবহার করে, অথবা নাকে ঔষধ (ব্যবহার করে,) অথবা কানে ঔষধের ফোটা প্রয়োগ করে, অথবা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতানুযায়ী পেটের ভিতর পর্যন্ত বা মগজের ভিতর পর্যন্ত উপনীত ক্ষত স্থানে ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, রসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন— اَلْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ কোন কিছু প্রবেশের কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং বের হওয়ার দ্বারা ভঙ্গ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোতে রোযা ভঙ্গের মর্ম পাওয়া গেছে তাই রোযা ভেঙ্গে গেছে। কারণ, রোযা ভঙ্গ করার অর্থ হল শরীরের উপকারী কোন কিছু শরীরে প্রবেশ করানো।

قوله : وَإِنْ أَقْطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ الخ : যদি কেহ রোযা অবস্থায় স্বীয় যৌনাঙ্গের ছিদ্র দিয়ে ঔষধ পৌঁছায়। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, রোযা ভঙ্গ হবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে রোযা ভঙ্গ হবে। উক্ত মতানৈক্যের কারণ হল, উক্ত ছিদ্র ও পেটের মধ্যে সংযোগ আছে কি না। তাই ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, উক্ত ছিদ্র ও পেটের মধ্যে সংযোগ আছে কেননা, পেশাব যা পেট থেকেই আসে, সুতরাং ঔষধ ছিদ্রে দিলে তা পেট পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আর পেট পর্যন্ত উপকারী বস্তু প্রবেশ করাতে রোযা ভেঙ্গে যায়। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল, পুরুষাঙ্গের ছিদ্র ও পেটের মধ্যে সংযোগ আছে কিন্তু তা অন্ডকোষ এর মাধ্যমে আড় হয়ে আছে। আর পেশাব ঐ অন্ডকোষ চুইয়েই পড়ে বিধায় ঔষধ ইত্যাদি ছিদ্রে দিলে পেট পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তাই রোযা ভঙ্গ হবে না।

قوله : وَكُرِهَ ذَوْقُ شَيْءٍ الخ : যদি কোন রোযাদার ব্যক্তি কোন কিছুর স্বাদ আস্বাদন করে, তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না তবে তা মাকরূহ। রোযা না ভাঙ্গার কারণ হল, বাহ্যিকভাবে কোন কিছু গলধঃকরণ পাওয়া যায়নি এবং মর্মগতভাবেও এমন কিছু পাওয়া যায়নি যা শরীরের জন্যে উপকারী। তাই রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে গলার ভেতরে প্রবেশের আশংকা থাকার কারণে তা মাকরূহ। অনুরূপভাবে স্ত্রীলোকের জন্যে অক্ষমতা ভিন্ন কোন বস্তু চিবিয়ে আপন শিশুকে খেতে দেওয়া রোযা ভঙ্গের কারণ নয়। তবে তা মাকরূহ। কারণ এ সুরতে গলধঃকরণের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে হা যদি নিজে চিবিয়ে দেয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ না থাকে, তবে চিবিয়ে দেয়া মাকরূহ নয়। কেননা, এক্ষেত্রে শিশুর জীবন রক্ষা করা অপরিহার্য। তেমনিভাবে আটা বা গাদ রোযা অবস্থায় চিবানো মাকরূহ। তবে রোযা ভঙ্গ হয় না। কারণ তা আঠাযুক্ত থাকার কারণে দাতের সাথে মিশে থাকে। তা উদর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তবে যেহেতু পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে এবং লোকেরা ভাববে যে সে রোযাদার নয়, এজন্য তা মাকরূহ। কোন কোন ফকিহ বলেন, যদি গাদ জমাট না হয়, তবে তা চিবানো দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে।

قوله : لَا كُحْلِ الخ : চোখে সুরমা ব্যবহার করা ও গোফে তৈল ব্যবহার করা মাকরূহ ছাড়া জায়েয। কেননা, এগুলো হলো জীবনোপকরণের বস্তু।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ্‌ সা. আশুরার দিবসে সুরমা ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। অনুরূপভাবে রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা মাকরূহ ছাড়া জায়েয। তা সকালে হউক বা সন্ধ্যাবেলা। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে সন্ধ্যাবেলা মিসওয়াক করা মাকরূহ। **আমাদের দলিল হল :** ইবনে মাজা শরীফের হাদীস রাসূলুল্লাহ্‌ সা. ইরশাদ করেন— خَيْرُ خِلَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكِ রোযাদারের সর্বোত্তম আমল হল মিসওয়াক করা। উক্ত হাদীসে সকাল বিকালের কোন শর্তারোপ করা হয়নি। বরং রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং বলেছেন তা সর্বোত্তম আমল। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা মাকরূহ ছাড়া জায়েয, বরং ছওয়াবের কাজ।

قوله : وَ قُبْلَةٌ اِنْ اَمِنَ الخ : যদি রোযাদার নিজের উপর পূর্ণ নির্ভর থাকে যে সে চুম্বন পর্যন্তই থাকবে সহবাস বা বীর্যস্খলনে পৌছবে না তবে নিজ স্ত্রী বা বাদীকে চুম্বন দিতে পারবে। কিন্তু যদি প্রবল নির্ভরতা থাকে না তবে চুম্বন করা মাকরূহ। আর যদি চুম্বনের সাথে সাথে সহবাস হয় তবে কাজা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে, আর যদি চুম্বন হয় এবং বীর্যস্খলন হয়ে যায় তবে শুধু কাজা ওয়াজিব হবে।

মোটকথা রোযাদারের জন্য সহবাস বা বীর্যস্খলন থেকে পূর্ণ নিরাপদ হলে চুম্বন দেয়া বিনা মাকরূহে জায়েয। কেননা, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে,

اَنَّهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَ يُبَاشِرُ وَ هُوَ صَائِمٌ -

রাসূলুল্লাহ্‌ সা. রোযা অবস্থায় (আপন স্ত্রীকে) চুম্বন দিতেন ও পরস্পর জড়িয়ে ধরতেন।

হযরত উম্মে সালমা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে—

اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَ هُوَ صَائِمٌ

রাসূলুল্লাহ্‌ সা. তাকে রোযা অবস্থায় চুম্বন করতেন।

সুতরাং উপরোল্লিখিত রিওয়াওয়ত দ্বারা রোযা অবস্থায় চুম্বন করার অনুমতি পাওয়া গেল।

فَصْلٌ : لِمَنْ خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ الْفِطْرُ وَلِلْمُسَافِرِ وَصَوْمُهٗ أَحَبُّ إِنْ لم يَضُرَّهُ وَلَا قَضَاءَ إِنْ مَاتَا عَلَيْهِمَا وَيُطْعِمُ وَلِيُّهُمَا لِكُلِّ يَوْمٍ كَالْفِطْرَةِ بِوَصِيَّةٍ وَقَضَيَا مَا قَدَرَا بِلَا شَرْطِ وَلَاءٍ فَإِنْ جَاءَ رَمَضَانُ قَدَّمَ الْاَدَاءَ عَلَى الْقَضَاءِ وَلِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ اِنْ خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ وَالنَّفْسِ وَلِلشَّيْخِ الْفَانِي وهو يَفْدِي فَقَطْ وَلِلْمُتَطَوِّعِ بِغَيْرِ عُذْرٍ في رِوَايَةٍ وَيَقْضِي

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ভয় করে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার তবে জায়েয রোযা ভেঙ্গে দেয়া এবং মুসাফিরের জন্যও তবে মুসাফিরের রোযা রাখা অধিক পছন্দনীয় যদি কোন ক্ষতি সাধিত না হয়। আর কাজা করতে হবে না যদি তারা (অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তি) অসুস্থতা ও সফর অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে এবং তাদের ওলী প্রতি দিনের জন্য ফিতরার ন্যায় তাদের অসিয়াতে (মিসকীনদেরকে) খানা খাওয়াবে। আর (অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হলে বা মুসাফির সফর থেকে আসলে) উভয়ে কাজা করবে যতটুকু সম্ভব ধারাবাহিকতার শর্ত ছাড়া। যদি এমতাবস্থায় রমজান চলে আসে, তবে আদাকে কাযার উপর অগ্রবর্তী করবে। (অর্থাৎ চলিত রমযানের রোযা

প্রথমে রাখবে আর রমযান মাস শেষ হলে পূণরায় তার বিগত কাযা রোযা আদায় করবে।) গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারীনী নিজের ব্যাপারে অথবা নিজ সন্তানের ব্যাপারে আশঙ্কিত হলে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয, আর শায়খে ফানীর জন্যও রমযানের রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। সে শুধু ফিদয়া আদায় করবে। এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী নফল রোযা আদায়কারী কোন উজর ছাড়া রোযা ভঙ্গ করতে পারবে এবং (তার কাজা আদায় করবে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : لِمَنْ خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ الخ : এ পর্যন্ত সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. রোযার মাসআলা মাসাইলের আলোচনা করেছেন এখন থেকে ঐসব উজরের কথা বর্ণিত হবে যা দ্বারা রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। সুতরাং তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অসুস্থতা বৃদ্ধির ভয় করে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয আছে। অর্থাৎ, রমযান মাসে এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে, এখন আশঙ্কা হয় যে যদি সে রোযা রাখে তবে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে তাহলে এসূরতে আমাদের মাযহাব মতে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে যদি এ আশংকা হয় যে যদি সে রোযা রাখে তবে ধ্বংস হয়ে যাবে অথবা অঙ্গহানী হয়ে যাবে তবে সে ক্ষেত্রে রোযা বর্জন করার অনুমতি আছে। তবে যদি এমন আশংকা হয় না তাহলে রোযা বর্জন করা জায়েয হবে না। আমাদের দলিল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী—

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ -

উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত مريضا শব্দটি মুতলাক। তাতে সবধরণের অসুস্থতা বুঝানো হয়েছে। তাই যে কোন ধরণের অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয বুঝায়। কিন্তু যেহেতু রোযা ভঙ্গ করা প্রবর্তন করা হয়েছে কষ্ট লাঘব করার জন্য, সুতরাং কষ্ট তখনই হবে যখন রোগ বৃদ্ধি পাবে, যা আরোগ্য লাভে দেরী হয়। এজন্য রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি শুধু অসুস্থতা বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত হবে।

قوله : وَلِلْمُسَافِرِ الخ : অনুরূপভাবে মুসাফির স্বীয় সফর অবস্থায় রমজানে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। তবে কষ্ট না হওয়া অবস্থায় রেখে নেয়াই অধিক উত্তম। দলিল হল : সফরটাই কষ্টের কারণ। এজন্য শুধু সফরকেই রোযা না রাখার ক্ষেত্রে উজর হিসাবে ধরে নেয়া হয়। এজন্যই সাধারণ মুসাফিরের জন্যও রোযা ভঙ্গ করা জায়েয, কষ্ট হউক বা না হউক। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে মুসাফিরের জন্য সম্পূর্ণরূপে রোযা না রাখা উত্তম।

আমাদের দলিল হল : মুসাফিরের রমজানের রোযার দুটা সময় রয়েছে : ১। রমযান মাসেই, যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহর ইরশাদ- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ উক্ত আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা মুকীম মুসাফির সবাই শামিল। ২। রমযান ছাড়া অন্য মাসে আদায় করা যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন- اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ - উক্ত আয়াতে عِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ হল রমযানের খলিফা আর আসল কখনো খলিফার সমকক্ষ হয় না। এজন্য কষ্টবোধ না হলে রমজানেই রাখাটা ভালো। অপর দিকে ইবাদত উত্তম সময়ে আদায় করা ছোয়াবের দিক বিবেচনায় উত্তম।

قوله : وَلَاقَضَاءَ اِنْ مَاتَا عَلَيْهِمَا الخ : যদি অসুস্থ ব্যক্তি তার অসুস্থতায় মৃত্যু বরণ করে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না এবং এজন্য মহান করুণাময় প্রভুর কাছে পাকড়াও হবে না এবং তার জন্য কোন ফিদয়া আদায় করতে হবে না। কেননা, তাদের উপর কাযা তখন ওয়াজিব হয় যখন অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে এ পরিমাণ সময় পায় যে তা আদায় করতে পারবে, অথবা মুসাফির ব্যক্তি সফর শেষে এ পরিমাণ সময় পায় যে কাযা আদায় করতে পারবে, তখন তাদের উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি অসুস্থ অবস্থায় অথবা সফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে তাদের উপর কাযা মূলত ওয়াজিবই হইনি। বিধায় তাদের উপর কাযা ওয়াজিব হবে না।

قوله : وَيُطْعِمُ وَلِيُّهُمَا الخ : এমন ব্যক্তি যার উপর রমযানের কাযা রোযা ওয়াজিব সে যদি মৃত্যুর সম্মুখিন

অবস্থায় তার উত্তরাধীকারীদেরকে তার রোযার ফিদিয়া দেয়ার ওসিয়াত করে যায় তবে তার উত্তরাধিকারীগণ প্রতি একদিনের রোযার বদলাতে একজন মিসকিন বা ফকীরকে অর্ধ সা' গম বা এক সা' যব বা খেজুর দিবে।

قوله : وَقَضَايَا قَدْرًا الخ : যাদের উপর রমযানের কাযা রোযা রাখাটা ওয়াজিব হয় তারা ধারাবাহিকতার শর্ত ছাড়া কাযা রোযা আদায় করে যাবে। সুতরাং যদি চায় বিচ্ছিন্নভাবে রাখতে, তবে তা পারবে, আর যদি চায় ধারাবাহিকভাবে রাখতে তবে তাও পারবে।

এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হল : পবিত্র কোরআন শরীফে মোট আট প্রকার রোযার আলোচনা হয়েছে তন্মধ্যে ১। রমযানের রোযা ২। হত্যার কাফফারার রোযা ৩। জিহারের কাফফারার রোযা ৪। এবং শপথের কাফফারার রোযা। উক্ত চার প্রকার রোযার ক্ষেত্রে লাগাতার তথা ধারাবাহিকতার শর্তারোপ করা হয়েছে। আর বাকী চার প্রকার তথা ৫। রমজানের কাযা রোযা ৬। হজ্জে তামাত্তু ও কিরানের রোযা। ৭। মাথা মুন্ডানের কাফফারার রোযা এবং ৮। শিকারের ক্ষতিপূরণের রোযা। উক্ত রোযাসমূহ ধারাবাহিকতার শর্তারোপ করা হয় নি। তাছাড়া মাশায়েখে কেরামগণ একটি মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, তা হল যে যে ক্ষেত্রে দাস মুক্তির কথা বলা হয়েছে সে ক্ষেত্রে تتابع তথা ধারাবাহিকতার শর্তারোপ করা হয়েছে। আর যে যে ক্ষেত্রে দাসের কথা বলা হয় নি সে ক্ষেত্রে تتابع তথা ধারাবাহিকতার শর্তারোপ করা হয়নি। আর রমযানের রোযার কাযা আদায়ের ব্যাপারে দাস মুক্তির শর্তারোপ করা হয় নি, তথা দাস স্বাধিন করলে কাযা আদায় হবে একথা বলা হয়নি বিধায় রমযানের কাযা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার শর্তারোপ করা হয়নি।

قوله : فَإِنْ جَاءَ رَمَضَانَ الخ : পূর্বের রমযানের কাযা হওয়া রোযা আদায় করতে করতে আবারো রমজান চলে আসল। তবে উক্ত ব্যক্তি তার কাযা রোযা রেখে এই রমজানের রোযা আদায় করবে। অতঃপর রমযানের পর পূর্বের কাযা হওয়া রোযা আদায় করবে। কারণ, রমযান মাস আসার সাথে সাথে উক্ত রমজানের রোযাই ফরজ রয়েছে। এদিকে প্রথম রমজানের রোযা তার দায়িত্বে বির্ধারিত আছে। তবে এ বিলম্বের কারণে তার উপর কোনরূপ ফিদিয়া আবশ্যক হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও মালিক রহ. বলেন, বিলম্ব করলে কাযা আদায়ের সাথে প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে ফিদিয়া আদায় করতে হবে।

আমাদের দলিল হল : আল্লাহ তাআলা কাযা এর নির্দেশ শর্তহীনভাবে দিয়েছেন। তাই শর্তহীন বিষয় দ্বারা তাৎক্ষণিক হয় না বরং বিলম্বিতভাবে হয়। তাই তো কাযা আদায়ের পূর্বে যদি কেহ নফল রোযা রাখে তবে তা আদায় হবে।

قوله : وَلِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الخ : উক্ত ইবারতটি عطف হয়েছে وللمسافر এর উপর। এখানে মাসআলা হলো, যদি গর্ভবতী মহিলা অথবা স্তন্যদানকারিনী মহিলা রমযানের রোযা রাখার কারণে তাদের সন্তানের ক্ষতির আশংকা হয় অথবা নিজের প্রাণের আশংকা হয় তবে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে। পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করে নেবে তার কোন কাফফারা বা ফিদিয়া ওয়াজিব হবে না। কাফফারা এজন্য নয় যে, এখানে উজরের কারণে রোযা ভঙ্গ করা পাওয়া গেছে।

তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, এক্ষেত্রে কাযার সাথে সাথে ফিদিয়া আবশ্যক হবে। তিনি বলেন, যেভাবে শায়েখে ফানীর উপর ফিদিয়া আবশ্যক হয় তদ্রূপ তাদের উপরও ফিদিয়া আবশ্যক হবে।

আমাদের দলিল হল : শায়খে ফানীর নস দ্বারা কিয়াসের বিপরীত সাব্যস্ত হয়েছে। একারণে এর উপর অন্য সূরতকে কিয়াস করা যাবে না।

قوله : وللشَّيْخِ الْفَانِيْ الخ : শায়খে ফানী দ্বারা ঐ বৃদ্ধলোক উদ্দেশ্য যিনি রোযা রাখতে অক্ষম। আর ফানী বলা হয় এজন্য যে, তিনি ফানী তথা মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে গেছেন বা তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। সুতরাং শায়খে ফানীর হুকুম হল তিনি প্রতি রোযার বিনিময়ে ফিদিয়া আদায় করবেন। কিন্তু ইমাম মালিক রহ. এর

অভিমত হল তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব নয়। ইহা ইমাম শাফেয়ী রহ. এরও অভিমত। আমাদের দলিল হল, রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবব বা কারণ হল মাসের উপস্থিতি। যেমন পবিত্র কুরআনের ইরশাদ :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

সুতরাং যেভাবে মাসের উপস্থিতি সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে ঠিক তেমনি শায়খে ফানীর ক্ষেত্রেও পাওয়া গেছে। কিন্তু বার্ধক্য জনিত ওজরের কারণে শায়খে ফানীর জন্য রোযা ভঙ্গ করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। আর তার বার্ধক্যতার ওজর এমন যা দূরীভূত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অন্যথায় তার উপর কাযা ওয়াজিব করা হতো। যেমন অসুস্থ ও মুসাফীর ব্যক্তির বেলায় হয়ে থাকে।

সুতরাং শায়খে ফানী যেহেতু রোযা রাখতে অক্ষম। তাই তার ক্ষেত্রে ক্বাযা ওয়াজিব করা যাচ্ছে না। তাই ফিদিয়া ওয়াজিব হবে।

قوله : وَلِلْمُتَطَوِّعِ الخ : যদি কেহ নফল রোযা বা নফল নামাজ শুরু করে অতঃপর তা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর কাযা করা ওয়াজিব। কেননা, আমাদের মাযহাব মতে যেহেতু ভঙ্গ করা জায়েয নেই সুতরাং তা ভঙ্গ করার দ্বারা অপরাধ সাব্যস্ত হবে আর উক্ত অপরাধীর উপর কাযা ওয়াজিব হয়। অধিকন্তু ইমাম মালিক রহ. এর মুওয়াত্তাতে হযরত আয়শা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিও আমাদের মাযহাব সমর্থন করে। তা হল নিম্নরূপ-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأُهْدِيَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عليه فَدَخَلَ عَلَيْنَا رسول اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وسلم فَبَدَرَتْنِي حَفْصَةُ وَكَانَتْ بِنْتُ أَبِيهَا فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ -

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও হাফসা নফল রোয অবস্থায় ছিলাম। আমাদের সামনে খাবার আসল। আমরা রোযা ভেঙ্গে ফেললাম। অতঃপর আমাদের কাছে নবী কারীম সা. তাশরীফ আনলেন, হাফসা রাযি. আমার থেকে অগ্রবর্তী হয়ে (তিনি বাপের বেটি) জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, এর স্থলে একদিন রোযা কাযা করে নাও। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা ওয়াজিব হবে। পরবর্তীতে তা আদায় করতে হবে।

وَلَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ اَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمٍ وَلَمْ يَقْضِ شَيْئًا وَلَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ ثُمَّ قَدِمَ وَنَوَى الصَّوْمَ فِي وَقْتِهِ صَحَّ وَيَقْضِي بِإِغْمَاءٍ سِوَى يَوْمٍ حَدَثَ فِي لَيْلَتِهِ وَبِجُنُونٍ غَيْرِ مُمْتَدٍّ وَبِإِمْسَاكٍ بِلَا نِيَّةِ صَوْمٍ وَفِطْرٍ وَلَوْ قَدِمَ مُسَافِرٌ اَوْ طَهُرَتْ حَائِضٌ اَوْ تَسَحَّرَ ظَنَّهُ لَيْلًا وَالْفَجْرُ طَالِعٌ اَوْ أَفْطَرَ كَذٰلِكَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أَمْسَكَ يَوْمَهُ وَقَضَى وَلَمْ يُكَفِّرْ كَأَكْلِهِ عَمْدًا بَعْدَ أَكْلِهِ نَاسِيًا وَنَائِمَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وُطِئَتَا -

---

অনুবাদ : নাবালক যদি (রমযানের দিনে) প্রাপ্ত বয়স্ক হয় অথবা কাফির ইসলাম গ্রহন করে তবে সে দিনের অবশিষ্টাংশ (পানাহার থেকে) বিরত থাকবে, এবং কাযা করবে না। আর যদি মুসাফির রোযা ভাঙ্গার নিয়ত করে অতঃপর (তার বাড়িতে) ফিরে আসে এবং ওয়াক্তের ভেতরে রোযার নিয়াত করে তবে (তা) সহীহ। রমযানের যে

দিনের রাত্রে বেহুশী হবে সে দিন ছাড়া অন্যান্য দিন বেহুশীর দরুন (রোযার) কাযা আদায় করবে। অদীর্ঘায়িত পাগলামীর দরুন (উক্ত দিনের কাযা আদায় করবে)।

রোযা রাখার বা না রাখার নিয়াত ছাড়া ইমসাক (তথা বিরতি পালন) দ্বারা কাযা আদায় করবে, আর যদি (দিনের কোন অংশে) মুসাফির (নিজ আবাসভূমিতে) ফিরে আসে অথবা হায়েযগ্রস্থ স্ত্রীলোক পবিত্র হয় কিংবা তার ধারণামত রাত্র মনে করে সেহরী খেয়ে নেয় এমতাবস্থায় ফজর উদিত হয়, অথবা এভাবে ইফতার করে নেয় এমতাবস্থায় সূর্য বিদ্যমান থাকে তবে (উল্লেখিত সর্ব অবস্থায়) বাকী দিন পানাহার সহবাস ইত্যাদি থেকে) বিরত থাকবে এবং কাযা আদায় করবে তবে কাফফারা আদায় করবে না যেমন ভুলে খাওয়ার পর ইচ্ছাধীন খেলে এবং ঘুমন্ত মহিলা বা পাগল মহিলা সহবাসকৃত হলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ بَلَغَ صَبِى الخ : রমযানের দিনের বেলা কোন নাবালক প্রাপ্ত বয়স্ক হলে অথবা কোন কাফির ব্যক্তি মুসলমান হলে তারা দিনের অবশিষ্টাংশ রোযাদারের ন্যায় তথা পানাহার ও সহবাস ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে যাতে রমযানের ওয়াক্তের হক আদায় হয়। কেননা, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানগণ রোযা রাখবে আর তারা আহার, সহবাস ইত্যাদিতে মত্ত থাকবে বড় মন্দকথা। এজন্য উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ও রোযা ভঙ্গের কার্যাদী থেকে বিরত থাকবে। তবে যদি তারা দিনের অবশিষ্টাংশ খেয়ে নেয় বা এমন কাজ করে যাতে রোযা ভেঙ্গে যায় তবে তাদের উপর কাযা ওয়াজিব হবে না। কেননা, তাদের উপর উক্ত দিনের কাযা ওয়াজিব হয়নি। বরং বিরত থাকাটা ওয়াজিব হয়েছে। এদিকে রোযার কাযা ওয়াজিব হয়ে থাকে কিন্তু বিরত থাকার কাযা ওয়াজিব হয় না। তবে হা উক্ত দিনের পরে রমযানের অবশিষ্ট দিন থাকলে সে ক্ষেত্রে বাকী দিনগুলোর রোযা তার উপর ফরজ হবে। কেননা, সে দিনগুলোর মধ্যে তার রোযা আদায়ের যোগ্যতা রয়েছে। আর যেদিন প্রাপ্ত বয়স্ক হল বা কাফির ইসলাম গ্রহণ করল সে দিন ও পূর্বের গত হয়ে যাওয়া রমজানের রোযার ক্ষেত্রে কাযা ওয়াজিব হবে না। কারণ, তখন তারা শরীয়াতের মুখাতাব ছিল না। সুতরাং শরীয়াতে মুখতাব না থাকার কারণে তাদের উপর রোযা ওয়াজিব হয়নি। আর যা আদায় হিসাবে ওয়াজিব হয় না তা কাযা হিসাবেও ওয়াজিব হবে না।

قوله : وَلَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ الخ : যদি মুসাফির ব্যক্তি রমযান মাসে নিয়াত করে রোযা ভঙ্গের অতঃপর নিজ বাসস্থানে ফিরে আসে এবং রোযার নিয়াত করে তবে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত তার রোযা রাখার নিয়াত করাটা কার্যকর হবে এবং তার রোযা আদায় হবে। আর এক্ষেত্রে তার রোযা রাখা ফরজ হয়ে গেছে। কারণ, তার নিয়াতের সময় তথা মধ্যাহ্নের পূর্বে পৌছাতে সফরে যে রোযা ভাঙ্গার অবকাশ ছিল তা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তার অবকাশ দূরীভূত হওয়াতে রোযা রাখা জরুরী হয়ে গেল।

قوله : وَيَقْضِى بِاِغْمَاءِ الخ : যদি কেহ রমযানে কোন এক ফজরের পর অর্থাৎ দিনের কিয়দাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর বেহুশ হয়ে যায় আর তার এঅবস্থা কিছু দিন স্থায়ী থাকে তবে সে যে দিন বেহুশ হয়েছিল সে দিনের রোযা কাযা করতে হবে না। কেননা, সে রোযার নিয়ত দ্বারা রোযা ভঙ্গের কাজ থেকে বিরত ছিল। সুতরাং বাহ্যত যেহেতু নিয়তের সাথে রোযা ভঙ্গের কারণ থেকে বিরত পাওয়া গেল তাই ধরে নেয়া হবে যে সে রোযা পেয়েছে। আর যেহেতু ঐ দিনের রোযা পাওয়া গেল বিধায় তার কাযা করার কোন জরুরত নেই। তবে হা ঐ দিনের পর আরো কিছুদিন বেহুশীতে চলে গেলে তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে মাতাল বা পাগল হওয়া যা দীর্ঘায়িত নয়, তবে উক্ত রোযার কাজা করতে হবে। তবে যদি তা দীর্ঘায়িত হয় অর্থাৎ পুরো রমযান মাসই সে মাতাল থাকে তবে তার কাজা করতে হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রহ. এর মতে পুরো রমযান মাসই যদি মাতাল থাকে তবুও কাযা ওয়াজিব হবে। কেননা, তিনি মাতালকে বেহুশীর উপর কিয়াস করেন। সুতরাং যেভাবে বেহুশীর বেলায় প্রথম দিন ছাড়া অন্যান্য দিনের কাযা ওয়াজিব হয় তদ্রূপ মাতালের

উপরও রোযার কাযা ওয়াজিব হবে। **আমাদের দলিল হল :** যদি উজর প্রথম হয় যা কষ্টের সবব তাহলে দায়িত্ব থেকে ইবাদত বাদ পড়ে যাবে। আর যদি ওজর কষ্টের কারণ না হয় তবে ঐ উজরের কারণে ইবাদত বাদ পড়বে না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় যে বেহুশী একমাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত থাকে না। কিন্তু মাতাল সাধারণত এক মাস বা তার চেয়ে বেশি পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। তাই মাতালের সূরতে একমাস পর্যন্ত রোজার কাজা পালন করা কষ্টকর বিধায় পুরা রমজান মাস মাতাল থাকা অবস্থায় রোযার কাজা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে যদি কেহ রোযা রাখা বা না রাখার নিয়ত ছাড়া ইমসাক তথা পানাহার, স্ত্রীসহবাস ইত্যাদি থেকে রমযান মাসে বিরত থাকে তবে তার জন্যও শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। ইমাম যুফার রহ. এর মতে যদি সুস্থ মুকীম ব্যক্তি এমন করে তবে তার জন্য কাযা ওয়াজিব হবে না। কারণ, তার মতে সুস্থ মুকীম ব্যক্তির নিয়ত ছাড়াও রোযা হয়ে যায়।

আমাদের দলিল হল : রমযানে পানাহার, সহবাস থেকে শর্তহীনভাবে বিরত থকার নাম রোযা নয়; বরং ইবাদাতের নিয়তে বিরত থাকার নামই হল ইবাদাত। এখন যদি সে নিয়ত না করে তবে তার এ বিরত থাকাটা ইবাদাত বলে গণ্য হবে না। সুতরাং যেহেতু সে ইবাদাতের রোযা আদায় করেনি বিধায় তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে।

قوله : وَلَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ الخ : যদি কোন মুসাফির ব্যক্তি রমজানের দিবসের কোন অংশে বাড়িতে ফিরে আসে, অথবা হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীলোক পবিত্র হয় তবে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় অবশিষ্ট দিন পানাহার বা সহবাস ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে এবং রমজানের পর তার কাজা আদায় করবে। তদ্রূপ রমযানের রাতে কেহ এই মনে করে সাহরী খেল যে, এখনও রাত রয়েছে। কিন্তু পরে প্রমাণিত হল যে, সুবহে সাদীক উদিত হয়ে গেছে। এমনিভাবে কেহ ধারণা করল যে, সূর্যাস্ত হয়ে গেছে আর ইফতার করে নিল। অতঃপর দেখা গেল যে, সূর্যাস্ত হয়নি। তবে অবশিষ্টাংশের বিরতী পালন করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, সাহরী আহারকারী পূর্ণ দিনের আর ইফতারকারী বাকী সময়টুকুর বিরতী পালন করা ওয়াজিব এবং রামজান পরে উক্ত রোযার কাযা আদায় করবে। উল্লেখিত ব্যক্তি বর্গের এহেন কাজের দ্বারা গোনহগার হবে না এবং কাফফারা আদায় করতে হবে না। তবে যেহেতু প্রথম দু'সুরতে মূল থেকে রোযা রাখা পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত রোযার কাযা আদায় করতে হবে আর শেষের দুঅবস্থায় যেহেতু রোযা ভেঙ্গে গেছ তাই পুণরায় তা কাযারূপে আদায় করতে হবে। আর বাকি সময় পানাহার বা সহবাস ইত্যাদি যা রোযা ভঙ্গের কারণ হয় তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব, তার কারণ হল যেহেতু রমযানের দিন একটি মর্যাদাপূর্ণ দিন সুতরাং তার হক্ব আদায় করা ওয়াজিব। এখন কোন ব্যক্তি রোযার যোগ্য হলে সে রোযা রাখার মাধ্যমে রমজানের হক্ব আদায় করবে। আর যদি রোযার যোগ্য না হয় তবে বিরত থাকার মাধ্যমে রমযানের হক্ব আদায় করবে। অথবা বিরত থাকবে অভিযোগ থেকে বেঁচে থাকার জন্য। কেননা, যখন সুস্থ ব্যক্তি পানাহার বা রোযা ভঙ্গের অন্য কোন কাজ করবে তখন অন্য মানুষ তার প্রকৃত অবস্থা না জেনে তিরস্কার করবে এবং বিদ্রূপ করবে তাই তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য বাকী দিন বিরতী পালন করবে। কেননা, হাদীসে আছে - اِتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ

আর কাফফারা এজন্য ওয়াজিব হবে না যে, প্রথম অবস্থায় তথা মুসাফির অবস্থায় তো রোযা না রাখার রোখছত রয়েছে। আর হায়েয নিফাস অবস্থা তো এমনিতেই রোয রাখা হারাম। আর তাদের উক্ত অবস্থার পরিবর্তন পাওয়া গেছে দিনের বেলা তাই মূলত তাৎক্ষণিকভাবে তাদের উপর রোযা ওয়াজিবই হয় নি। তবে হা কাযা হিসাবে ওয়াজিব এবং পরের দিন থেকে যে কয়টা রমজানের রোযা পাবে তা তাৎক্ষণিক রাখা ফরজ। অপর দু অবস্থা তথা সুবহে সাদীকের পর সেহরী খাওয়াতে এবং সূর্যাস্ত হওয়ার পূর্বে ইফতার করাতে উক্ত রোযার কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ, তা ইচ্ছাপূর্বক ছিল না। বরং সে রাত মনে করে সেহরী খেয়েছ এবং ইফতারকারীরও ধারনা ছিল যে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এ অপরাধ লঘু আর লঘু অপরাধের কারণে কাফফারা

ওয়াজিব হয় না। এর সমর্থন হযরত উমর রাযি. এর বক্তব্য দ্বারা পাওয়া যায়। তাহল তিনি একবার রমযান মাসে সন্ধ্যা বেলায় আরো সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে কুফার মসজিদের বারান্দায় বসা ছিলেন। ইত্যবসরে এক পেয়ালা দুধ আনা হল। তিনি নিজেও পান করলেন এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও পান করলেন। অতঃপর মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ করলেন আযান দেয়ার জন্য। মুয়াজ্জিন যখন আযান দেয়ার জন্য উপরে উঠলেন দেখলেন এখনো সূর্য অস্ত যায়নি। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন- وَالشَّمْسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ হে আমীরুল মুমিনীন! সূর্য এখনো রয়েছে। হযরত উমর রাযি. বললেন—

بَعَثْنَاكَ دَاعِيًا وَلَمْ نَبْعَثْكَ رَاعِيًا مَا تَجَانَفْنَا لِإِثْمٍ قَضَاءُ يَوْمٍ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ -

আমরা তোমাকে আহ্বানকারীরূপে প্রেরণ করেছি, রাখাল বানিয়ে পাঠাইনি। (আল্লাহ না চাহেতো আমরা) গুনাহের ইচ্ছা করিনি। আমাদের জন্য একটি রোযা কাযা করা সহজ।' উক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল এমন ইজতিহাদী ভুল দ্বারা যদি রোযা ভেঙ্গে যায় তবে কোন গুনাহ হবে না এবং কাফফারা আদায় করাও ওয়াজিব হবে না।

قوله : كَأَكْلِهِ عَمْدًا بَعْدَ أَكْلِهِ الخ : যদি কেহ রমযানে ভুলে কিছু খেয়ে ফেলে অতঃপর তার ধারণা অনুযায়ী রোযা ভেঙ্গে যাওয়ায় পুনরায় খেয়ে ফেলল, তবে তার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, ভুল বশত পানাহার দ্বারা রোযা বাকী না থাকার সন্দেহ কিয়াস দ্বারা সৃষ্টি হয়। কেননা কিয়াসের দাবী হল ভুল বশত পানাহার দ্বারা রোযা বাকী না থাকা। কেননা ঐ সূরতে বিরত থাকার শর্ত বিলুপ্ত হয়েছে। সুতরাং এর পরের আহার যেন রোযা অবস্থায় হল না। আর যখন ইচ্ছাকৃত আহার রোযা অবস্থায় হল না তাই তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন রোযাদার মহিলা ঘুমন্ত থাকে অথবা পাগল থাকে আর এমতাবস্থায় কোন পুরুষ তার সাথে সহবাস করে ফেলে তবে উক্ত মহিলার রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে হা শুধু কাযা ওয়াজিব হবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, তাদের পক্ষ থেকে ইচ্ছা স্বাধীনতা না পাওয়া যাওয়ার কারণে অপরাধ পাওয়া যায় নি। আর কাফফারা অপরাধ ছাড়া ওয়াজিব হয় না। এজন্য তাদের উপর কাফফারা ওয়াজিব করা হয় নি। তবে যেহেতু এরকম ঘটনা বিরল তাই এ সুরতে কাজা ওয়াজিব করার দ্বারা যেহেতু কষ্ট নেই, তাই এই সুরতে কাযা ওয়াজিব করা হয়েছে।

فَصْلٌ : مَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ النَّحْرِ أَفْطَرَ وَقَضَى وَإِنْ نَوَى يَمِينًا كَفَّرَ أَيْضًا وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ هذه السَّنَةِ أَفْطَرَ أَيَّامًا مَنْهِيَّةً وَهِيَ يَوْمَا الْعِيدِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَقَضَاهَا وَلَا قَضَاءَ إِنْ شَرَعَ فِيهَا ثُمَّ أَفْطَرَ -

---

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কুরবানীর দিনে রোযা রাখার মান্নত করে, তবে রোযা না রেখে কাযা করবে। আর যদি (উক্ত বাক্য দ্বারা) শপথের নিয়্যাত করে থাকে তবে অনুরূপভাবে কাফফারা আদায় করবে। আর যদি কেহ এই বৎসর রোযা রাখার মান্নত করে তবে নিষিদ্ধ দিনে রোযা রাখবে না। আর নিষিদ্ধ দিন হল দুই ঈদের দিন (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা) তাশরীকের দিন। আর (ছেড়ে দেয়া রোযার) কাযা আদায় করে নেবে, যদি কেহ (নতুনভাবে) উক্ত দিনে রোযা শুরু করে অতঃপর ভেঙ্গে দেয় তবে কাযা আদায় করতে হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : مَنْ نَذَرَ صَوْمَ الخ : আমাদের মাযহাব মতে কেহ যদি ঈদুল আজহার দিনে রোযা রাখার মান্নত করে

তবে তার মান্নত করাটা সহীহ হবে। এদিন যেহেতু রোযা রাখা নিষিদ্ধ তাই এদিন না রেখে অন্য একদিন তার কাযা আদায় করবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম যুফার রহ. এর মতে তার মান্নত করাটা সহীহ হয় নি। ইহা ইমাম মালিক ও আহমদ রহ. এরও অভিমত। আমাদের দলিল হল, কুরবানীর দিন রোযা সত্তাগতভাবে শরীয়ত সম্মত। তবে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ভিন্ন কারণে। আর তাহল আল্লাহর দাওয়াত হতে বিমুখতা। সুতরাং যদি কেহ ঐ দিন রোযা রাখে তবে সে যেন আল্লাহর দাওয়াত থেকে বিমুখতা করল। আর তা অত্যন্ত খারাপ কাজ মেটকথা, নিষিদ্ধ পাঁচদিন সত্তাগতভাবে রোযা রাখা অনুমোদিত যদিও তা গুণগতভাবে অনুমোদিত নয়। বরং অপরাধ আর অনুমোদিত কাজে মান্নতকারী বৈধ। এজন্য ঐদিন রোযার মান্নত করা বৈধ। তবে হা ঐদিন মান্নত পূর্ণ করতে হলে আল্লাহর দাওয়াত থেকে বিমুখতা আবশ্যক হয় যা অপরাধজনক। এজন্য উক্ত দিন আদায় না করে অন্য দিন তার কাযা আদায় করবে।

قوله : وَاِنْ نَوٰى يَمِيْنًا الخ : যদি কেহ কুরবানির ঈদের দিন শপথের সাথে রোযা রাখার মান্নত করে, তবে তার উপর কাযার সাথে সাথে শপথ ভঙ্গের কাফফারাও আবশ্যক হবে। কেননা, মান্নতকারীর এরকম বলার দ্বারা দুটি প্রমাণিত হল ১। মান্নত যা পূর্ণ করা। আর তা স্বকীয়ভাবে উজুবের দাবীদার। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- وَلْيُوفُوا نُذُورَكُمْ 'তোমরা তোমাদের নজরকে পূণ কর।' আর ইয়ামিন উজুবের দাবী রাখে ভিন্ন কারণে আর তা হল আল্লাহর নামের অসম্মান করা থেকে বাচানো। আর উভয়টি যেহেতু কুরবানীর দিনে রোযা না রাখার কারণে ফউত হয়েছে বিধায় তার বিনিময় হিসাবে মান্নাতের রোযার কাযা ওয়াজিব হবে এবং শপথ ভঙ্গের কারণে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

قوله : وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ هٰذِهِ السَّنَةِ الخ : যদি কেহ এক বৎসর রোযা রাখার নজর করে তবে তার দুটি সূরত আছে ১ হয়তো নির্দিষ্ট করে বলবে, যেমন বলল এই বৎসর আমি রোযা রাখবো। অথবা অনির্দিষ্টভাবে বলল, যেমন এক বৎসর রোযা রাখবো। কিতাবে উল্লেখিত মাসআলা নির্দষ্ট করে বলার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং নির্দিষ্ট করে বলার কারণে তার উপর এক বৎসরের রোযা লাজেম হবে। আর এক বৎসরের ভেতর অবশ্য ঐ পাঁচদিন থাকবে, যাতে রোযা রাখা জায়েয নয়। কেননা, ঐ পাঁচদিন ও নজরের অন্তর্ভূক্ত। তাই পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করে নেবে আর একান্ত যদি উক্ত নিষিদ্ধ পাঁচ দিনও রোযা রেখে ফেলে তবে তার নজর পূর্ণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার তার কাযা করতে হবে না। আর যদি বৎসর নির্দিষ্ট না করে তবেও তার দুটি অবস্থা রয়েছে : হয়ত ধারাবাহিকতার শর্তারোপ করা হবে অথবা ধারাবাহিকতার শর্তারোপ করা হবে না। যদি ধারাবাহিকতার শর্তারোপ করে তবে তার হুকুম হল এই মাত্র নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে যে হুকুম বলা হয়েছ সে হুকুমই। অর্থাৎ উক্ত পাঁচ দিনের কাযা আদায় করবে। আর যদি ধারাবাহিকতার শর্ত করে না তবে উক্ত পাঁচ দিনের রোযা ও রমযানের রোযা কাযা আদায় করতে হবে কেননা যখন নির্দিষ্ট করেনি তখন স্বাভাবিকভাবেই বারো মাসের রোযা লাজেম হয়ে গেছে। তাই নির্দিষ্ট পাঁচ দিনের এবং রমযান মাসের রোযার কাযা আদায় করে বার মাসকে পূর্ণ করবে।

قوله : وَلَا قَضَاءَ اِنْ شَرَعَ الخ : যদি কেহ নিষিদ্ধ দিনগুলোতে রোযা রাখা শুরু করে অতঃপর তা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার কোন কাযা আদায় করতে হবে না। কারণ উক্ত দিন রোযা রাখা হারাম। সুতরাং এদিন রোযা শুরু করাতে তার উপর মূল হিসাবে ওয়াজিব হয় নি। আর যা মূলগতভাবে ওয়াজিব হয়নি তার কাযা কেমন করে ওয়াজিব হবে সুতরাং তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

পরিচ্ছেদ : ই'তিকাফের বিবরণ

سُنَّ لُبْثٌ فِي مَسْجِدٍ بِصَوْمٍ وَنِيَّةٍ وَأَقَلُّهُ نَفْلًا سَاعَةٌ وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَالْجُمُعَةِ أَوْ طَبِيعِيَّةٍ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَإِنْ خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ فَسَدَ وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ وَمُبَايَعَتُهُ فِيهِ وَكُرِهَ إِحْضَارُ الْمَبِيعِ وَالصَّمْتُ وَالتَّكَلُّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحَرُمَ الْوَطْئُ وَدَوَاعِيهِ وَبَطَلَ بِوَطْئِهِ وَلَزِمَهُ اللَّيَالِي أَيْضًا بِنَذْرِ اعْتِكَافِ أَيَّامٍ وَلَيْلَتَانِ بِنَذْرِ يَوْمَيْنِ -

অনুবাদ : রোযার সাথে ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা সুন্নাত। আর নফল ই'তিকাফের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল এক মুহূর্ত। আর মহিলাগণ স্বীয় ঘরের নামাজের স্থানে ই'তিকাফ করবে। শরয়ী প্রয়োজন যেমন জুমার জন্য অথবা প্রাকৃতিক প্রয়োজন যেমন পেশাব পাখানা ব্যতিত বের হবে না। যদি বিনা ওজরে কিছু সময়ের জন্য বের হয় তবে (ই'তিকাফ) ফাসিদ হয়ে যাবে। তার (ই'তিকাফকারীর) পানাহার, ঘুম ও ক্রয়-বিক্রয় মসজিদেই হবে। আর ক্রয় বিক্রয়ের পণ্য (মসজিদে) উপস্থিত করা ও চুপ থাকা এবং কল্যাণমূলক কথা ছাড়া কোন কথা বলা মাকরূহ। সহবাস করা, সহবাসের দিকে আহ্বানকারী কোন কাজ করা হারাম। সহবাস দ্বারা ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যায়। দিন সমূহের ই'তিকাফের মান্নত দ্বারা রাতসমূহ আবশ্যক হবে। আর দুদিনের নজর দ্বারা (উক্ত দু'দিনের) রাতদ্বয় আবশ্যক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الْاِعْتِكَافِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. রোযার আলোচনার পর ই'তিকাফের আলোচনা এজন্য এনেছেন যে ই'তিকাফের জন্য রোযা হল পূর্ব শর্ত। আর শর্ত পূর্বেই থাকে বিধায় রোযার আলোচনা ই'তিকাফের পূর্বে করেছেন।

اعتكاف শব্দটি باب افتعال এর مصدر অর্থ বিচ্ছিন্ন থাকা, নিঃসঙ্গ থাকা, (মসজিদে) ই'তিকাফ করা। কুদূরী গ্রন্থের উক্তি অনুযায়ী শরীয়াতের পরিভাষায় ই'তিকাফ হল : هُوَ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَنِيَّةِ الْاِعْتِكَافِ রোযা অবস্থায় মসজিদে ই'তিকাফের নিয়তসহ অবস্থান করা।

قوله : سُنَّ لُبْثٌ فِي مَسْجِدٍ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. বলেন, ই'তিকাফের নিয়তে রোযা অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা সুন্নাত। মোটকথা, ই'তিকাফের জন্য চারটি জিনিস জরুরী। (১) অবস্থান, (২) মসজিদ, (৩) ই'তিকাফের নিয়ত, (৪) রোযা। হিদায়া গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী অবস্থান করা হল ই'তিকাফের রুকন। কেননা, ই'তিকাফের আভিধানিক অর্থ হল অবস্থান করা। সুতরাং অবস্থানের অর্থ পাওয়া জরুরী। আর নিয়ত হল অভ্যাস ও ইবাদাতের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টিকারী। এজন্য নিয়ত সকল ইবাদাতের মাকসূদ অর্জনে শর্ত। একারণে ই'তিকাফের জন্যও নিয়ত করা শর্ত। আর আমাদের মাযহাব মতে রোযা অবস্থায় হওয়াও ই'তিকাফের জন্য শর্ত। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. ও আহমদ রহ. এর মতে রোযা শর্ত নয়। আমাদের দলিল হল : হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদীস—

قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন, রোযা ব্যতিত ই'তিকাফ নেই।

আবু দাউদ শরীফের অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে—

عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت السُّنَّةُ على الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ منه وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِالصَّوْمِ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ -

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, মু'তাকিফের জন্য সুন্নাত হল রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সেবা করবে না, জানাজায় উপস্থিত হবে না, স্ত্রীলোককে স্পর্শ করবে না এবং স্ত্রী সহবাস করবে না। অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ছাড়া বের হবে না। ই'তিকাফ রোযা ছাড়া সহী হবে না। আর ই'তিকাফ জামে মসজিদ ছাড়া হবে না।' বর্ণিত উভয় হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত। আর ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য আমাদের মাযহাবের সর্বসম্মতি মতামত হল রোযা শর্ত।

উল্লেখ্য যে, ওয়াজিব ই'তিকাফ হল মান্নতের ইতিকাফ। যেমন কেহ একদিন বা এক মাসের ই'তিকাফের নজর করল।

আর রমজানের শেষের দশ দিন ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. সর্বদা তা করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে—

قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ عَشْرَ الْأَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اِلَى اَنْ تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى -

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. যখন মদীনায় তাশরীফ নিলেন, তখন থেকে ওফাত পর্যন্ত রমজানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন।

তাই তো রমযানের শেষের দশদিন ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আর যেহেতু তা রমযান মাসে। তাই রোযা তো এমনিতেই ফরয। সুতরাং ফরয ছেড়ে সুন্নাতে মুয়াক্কাদার পালন করার প্রশ্নই ওঠে না।

قوله : وَ اَقَلُّهُ نَفْلًا الخ : নফল ই'তিকাফের জন্য নির্দিষ্ট সময় নেই, বরং ই'তিকাফের নিয়াতে যতটুকু সময় মসজিদে কাটাবে তাকেই ই'তিকাফ বলা হবে। তা এক মুহূর্ত ই হোক না কেন। দলিল হল- নফলের ভিত্তিই হল সহজ ও আসানের উপর। যেমন নামাজে কিয়াম ফরজ, কিন্তু নফল নামাজে দাড়ানোর সামর্থ থাকা স্বত্বেও বসে আদায় করা জায়েয। সুতরাং বুঝা গেল নফলের ভিত্তিই হলো সহজের উপর।

قوله : وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ الخ : আমাদের মতে স্ত্রীলোকদের জন্য ঘরের মধ্যে নামাজের জন্য যে জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, সেখানে ই'তিকাফ করা উত্তম। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে পুরুষ ও স্ত্রীলোক সবার জন্য জামাত হয় এমন মসজিদেই ই'তিকাফ করা জায়েয আর ঘরের মধ্যে কারো ই'তিকাফ করা জায়েয নয়। তিনি বলেন, ই'তিকাফ দ্বারা সে স্থানের সম্মান করা হয়। সুতরাং ই'তিকাফ ঐ স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হবে যা শরয়ীভাবেও সম্মানিত। আর শরয়ীভাবে সম্মানী শুধু মসজিদ। তাই শুধু মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়েয হবে। ঘরে ইতিকাফ করা জায়েয নেই।

আমাদের দলিল হল : ই'তিকাফ হল নামাজের জন্য অপেক্ষা করার ই'বাদত। আর একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, মহিলা মসজিদে নামাজের জন্য অপেক্ষা করে না বরং ঘরের নামাজের স্থানে বসে নামাজের জন্য অপেক্ষা করে বিধায় এখানেই সে ই'তিকাফ করবে।

قوله : وَلَايَخْرُجُ مِنْهُ الخ : মু'তাকিফের জন্য স্বীয় মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয নেই। তবে দুটি প্রয়োজনে বের হওয়া জায়েয আছে। (১) শরয়ী প্রয়োজনে। যেমন জুমার নামাজের জন্য বের হওয়া বা

জানাবতের গোসলের জন্য বের হওয়া। (২) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে। যেমন পেশাব-পায়খানার জন্য বের হওয়া। আমাদের মাজহাব মতে শরয়ী প্রয়োজনে তথা জুমার নামাজের জন্য জামে মসজিদে যাওয়া জায়েয। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মালিক রহ. এর মতে জুমআর জন্য মু'তাকিফ অন্য মসজিদে যেতে পারবে না। তাদের দলিল হল : প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হওয়া নাজায়েয। আর প্রয়োজন হল তাই যা আবশ্যকীয়। কিন্তু জুম'আর নামাজে অন্য মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন এভাবে দেখা দেয় না যে, যদি সে সাত দিনের নিয়ত করে তবে যে কোন মসজিদে পালন করত শুক্রবারে জামে মসজিদে যেতে পারবে। আর যদি এ থেকে বেশী দিনের নিয়াত করে তবে জামে মসজিদে তা পালন করাতে জুমার জন্য বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে না। সুতরাং এ দু সুরতে এমন কোন উজর পাওয়া যায় নি যা দ্বারা জুমআর নামাজের জন্য বের হওয়া জায়েয করে। তাই অন্য মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করার জন্য বের হওয়া জায়েয হবে না। **আমাদের দলিল হল** : একথা সর্তসিদ্ধ যে প্রত্যেক মসজিদে ই'তিকাফ করার বিধান শরীয়াত সম্মত। যেমন মহান প্রভূর বাণী-

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত مساجد শব্দটি ব্যাপক, যা সব ধরণের মসজিদকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং জুমার জন্য বের হওয়া তার ই'তিকাফের নজর থেকে এমনভাবে বহির্ভূত হবে যেমনিভাবে মানবিক প্রয়োজনের জন্য বের হওয়া বহির্ভূত। কেননা, ই'তিকাফের অনুমতির জন্য জুমার নামাজ তরক করা কোনভাবে জায়েয হবে না। কারণ নজরের কারণে ই'তিকাফ ওয়াজিব হওয়া জুমার নামাজ ওয়াজিব হওয়ার চেয়ে নিম্ন মানের। কেননা জুমার নামায আল্লাহ কর্তৃক ওয়াজিব কৃত আর ওয়াজিব ই'তিকাফ বান্দা কর্তৃক ওয়াজিব। সুতরাং বুঝা গেল জুমার নামাজের জন্য বের হওয়া জায়েয। তবে কখন বের হবে তার কিছু ব্যাখ্যা হল যে, যদি জামে মসজিদ নিকটে থাকে তবে দ্বিপ্রহরের পর বের হবে। আর যদি দূরে হয়, তবে এতটুকু পূর্বে বের হওয়ার ইজাযত রয়েছে যে, নামাজ খুতবাসহ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মোটকথা, অন্য মসজিদ থেকে মু'তাকিফ ব্যক্তি জামে মসজিদে জুমার নামাজ খুতবা এবং তার সুন্নাতগুলো আদায় করা যায় এই পরিমাণ সময় জামে মসজিদে অবস্থা করাতে তার ই'তিকাফ নষ্ট হবে না।

قوله : فَإِنْ خَرَجَ سَاعَةً الخ : মু'তাকিফ যদি বিনা ওযরে মসজিদ থেকে বের হয় যদিও এক মুহূর্তের জন্যও তবুও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তার ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর তাই কিয়াসের দাবি। সাহাবাইন রহ. বলেন, ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না। তবে হা যদি অর্ধেক দিনের বেশি সময় বাহিরে থাকে তবে ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই ইসতিহসানের দাবী। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল : ই'তিকাফের রুকন হল, মসজিদে অবস্থান করা। মসজিদ থেকে বের হওয়া তার বিপরীত। আর বস্তু তার বিপরীত দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। তাই মসজিদ থেকে বের হওয়া দ্বারা ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। বের হওয়া অল্প সময়ের জন্য হউক বা বেশী সময়ের জন্য হউক। যেমন রোযা অবস্থায় আহার করা রোযার বিপরীত, তাই তো অল্প বা বেশি খাওয়া দ্বারা রোযা ফাসিদ হয়ে যায়। আরো যেমন হদস অজু ভঙ্গকারী। সুতরাং উক্ত হদস কম হউক বা বেশী তা দ্বারা ওজু ভেঙ্গে যাবে।

قوله : و أَكْلُهُ وشُرْبُهُ الخ : মসজিদের ভেতরে পানাহার, ঘুমানো জায়েয। কেননা, এগুলির প্রতি মানুষের প্রয়োজন অতি প্রসিদ্ধ। সুতরাং এ প্রয়োজনটি এমন যা মসজিদে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব। তাই তা মসজিদে জায়েয। দ্বিতীয়ত হুজর সা. এর ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন স্থান ছিল না। আর যেহেতু মসজিদ ভিন্ন অন্য কোন স্থান ছিলনা বুঝা গেল পানাহার করা মসজিদেই হতো। অনুরূপভাবে মসজিদের ভেতরে ক্রয় বিক্রয় করা জায়েয। তবে তা প্রয়োজন সাপেক্ষে। কেননা, অনেক সময় মু'তাকিফের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। অথচ তার এমন কেহ নেই যে তার ব্যবস্থা করবে। তাই মু'তাকিফের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে মসজিদ যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য এবং বান্দার হক্ব থেকে তাকে মুক্ত রাখা হয়েছে,

তাই মসজিদের ভেতরে পণ্যসামগ্রী উপস্থিত করা মাকরূহ।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মু'তাকিফ ছাড়া অন্য ব্যক্তির জন্য মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ। কেননা, আমর ইবনে শুয়াইব রাযি. থেকে বর্ণিত—

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ فِى الْمَسْجِدِ وَ اَنْ يُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ اَوْ يُنْشَدَ فِيْهِ شِعْرًا وَ نَهٰى عَنِ الْمُتَحَلِّقِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -

'রাসূলুল্লাহ্ সা. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা, হারিয়ে যাওয়া বস্তু অনুসন্ধান করা, কবিতা আবৃত্তি করা এবং জুমার নামাজের পূর্বে হালকা বন্দী হয়ে বসা থেকে নিষেধ করেছেন।'

উক্ত হাদীস থেকে মসজিদের ভেতরে ক্রয়-বিক্রয় করা থেকে নিষেধ প্রমাণিত হল। তবে মু'তাকিফের যেহেতু প্রয়োজন রয়েছে, তাই তাকে ছাড় দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে মু'তাকিফের জন্য ইবাদত মনে করে চুপ করে মসজিদের ভেতর বসে থাকাও মাকরূহ। কেননা, তা অগ্নি পূজকদের কাজ। আবার অনর্থক বা গুনাহের কথা বলা মাকরূহ, তবে দ্বীনের যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করা মাকরূহ নয়, বরং উত্তম।

قوله : وَيَحْرُمُ الْوَطْىُ الخ : মু'তাকিফ ব্যক্তি প্রাকৃতিক জরুরতে যেয়ে আপন স্ত্রীর সাথে সঙ্গ করা হারাম। কেননা, সাহাবায়ে কেরামগণ এমন করতেন। অতঃপর আয়াত অবতীর্ণ হল—

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ

উক্ত আয়াতে ই'তিকাফ অবস্থায় সহবাস করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং তা মু'তাকিফের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে সহবাসের দিকে আহ্বানকারী কার্যাদী তথা চুম্বন দেয়া বা স্ত্রীকে স্পর্শ করা হারাম। আর যদি একান্ত কেহ এ হারাম কাজে লিপ্ত হয় তবে তার ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। সে রাতে সহবাস করুক বা দিনে। এমনইভাবে সহবাসের পর বীর্যপাত হউক বা না হউক।

সুতরাং রমযানের রাতে যারা ই'তিকাফ করে না, তাদের জন্য স্ত্রী সহবাস জায়েয। কিন্তু মু'তাকিফের জন্য জায়েয নয়। কেননা, মু'তাকিফের ক্ষেত্রে রাতও ই'তিকাফের সময়। সুতরাং যেসব জিনিস ই'তিকাফের কারণে দিনে নিষিদ্ধ এগুলি রাতেও নিষিদ্ধ।

قوله : وَلَزِمَ اللَّيَالِى الخ : কেহ কিছু দিন ই'তিকাফের নজর করলে তার উপর ঐদিনের সাথে রাতসমূহেরও ই'তিকাফ নাজিম হবে এবং ধারাবাহিকভাবে লাজিম হবে। অর্থাৎ যদ দিনেরই নজর করবে ততদিন রাত ধারাবাহিকভাবে পালন করতে হবে।

আলোচ্য মাসআলায় দিনের উল্লেখ দ্বারা রাতসমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে একটি নীতির ভিত্তিতে। তা হল দিনসমূহের উল্লেখ বহুবচন দ্বারা তার বিপরীতজাতগুলো তথা রাতসমূহও অন্তর্ভুক্ত। যেমন কেহ বলল- مَا رَاَيْتُكَ مُنْذُ اَيَّامٍ আমি তোমাকে কয়েকদিন থেকে দেখিনি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কয়েক দিন রাতসহ দেখিনি। এমন কখনও নয় যে, আমি তোমাকে কয়েক দিন দেখিনি, রাতে দেখেছি। সুতরাং প্রমাণিহ হল যে দিনগুলোর উল্লেখ দ্বারা রাত সহ ই'তিকাফ করা লাজিম হবে। আর ধারাবাহিক এজন্য লাজিম হবে যে, ই'তিকাফের ভিত্তিই হলো ধারাবাহিকতার উপর।

قوله : وَلَيْلَتَانِ الخ : যদি কেহ দুদিনের ই'তিকাফের নিয়াত করে তবে উক্ত দু দিনের সাথে তার রাতদ্বয়ও লাজিম হবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, প্রথম রাত দাখিল হবে না। **আমাদের দলিল হল :** দ্বিবচনের মধ্যেও বহুবচনের মর্ম রয়েছে। এজন্যই তো রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন- اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهَا جَمَاعَةٌ

দ্বিতীয়তঃ ইবাদাতের ক্ষেত্রে সতর্কতার জন্য দ্বিবচনকে বহু বচনের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অতএব বহু বচনের মধ্যে তার রাতসমূহ দাখিল হবে। তাই দ্বিবচনেও তার রাতদ্বয় দাখিল হবে এবং দুদিন ই'তিকাফের নজর করাতে উক্ত দুদিনের রাতদ্বয় ই'তিকাফ করা লাজিম হবে। الله اعلم.

كِتَابُ الْحَجِّ

অধ্যায় : হজ্জ

هُوَ زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوصٍ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ بِفِعْلٍ مَخْصُوصٍ فُرِضَ مَرَّةً على الْفَوْرِ بِشَرْطِ حُرِّيَّةٍ وَبُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَصِحَّةٍ وَقُدْرَةِ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ فَضُلَتْ عن مَسْكَنِهِ وَعَمَّا لَا بُدَّ منه وَنَفَقَةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ وَعِيَالِهِ وَأَمْنِ طَرِيقٍ وَمَحْرَمٍ أو زَوْجٍ لِامْرَأَةٍ فِي سَفَرٍ فَلَوْ أَحْرَمَ الصَّبِيُّ أو عَبْدٌ فَبَلَغَ أَوْ عُتِقَ فَمَضَى لم يَجْزِ عن فَرْضِهِ وَمَوَاقِيتُ الْإِحْرَامِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَذَاتُ عِرْقٍ وَجُحْفَةُ وَقَرْنٌ وَيَلَمْلَمُ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ بِهَا وَصَحَّ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهَا لَا عَكْسُهُ وَلِدَاخِلِهَا الْحِلُّ وَلِلْمَكِّيِّ الْحَرَمُ لِلْحَجِّ وَالْحِلُّ لِلْعُمْرَةِ -

অনুবাদ : حج হল নির্দিষ্ট স্থানের জিয়ারত করা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কার্যাবলীর সাথে তাৎক্ষণিকভাবে এক বার ফরজ করা হয়েছে। স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবান, সুস্থতা, বাহন ও পাথেয় সক্ষমতার শর্তে যা তার বাসস্থান থেকে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে এবং তার পরিবার পরিজন ও যাওয়া আসার খরচা থেকে অতিরিক্ত হয় এবং পথও নিরাপদ হয় (অর্থাৎ পথ নিরাপদ হওয়ার শর্তে) আর যদি কোন নাবালক কিংবা গোলাম ইহরাম বাঁধে অতঃপর (নাবালক) সাবালক হয় কিংবা (গোলাম) স্বাধীনতা লাভ করে, তারপর হজ্জের ক্রীয়াকর্ম সম্পন্ন করে তবে তাদের থেকে ফরয হজ্জ আদায় হবে না। মাওয়াকীতে ইহরাম (তথা ইহরামের স্থানসমূহ) হল যুল হুলাইফা, যাতু ইরক, জুহফা, কারণ, ইয়ালামলাম। এসব স্থানের অধিবাসীদের জন্য এবং উক্ত স্থান হয়ে অতিক্রম-কারীদের জন্য উক্ত স্থানের পূর্বে ইহরাম বাধা সহীহ, তবে এর বিপরীত সহীহ নয়। (অর্থাৎ, উক্ত স্থান অতিক্রমের পর ইহরাম বাধা সহীহ হবে না।) মিকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য (মিকাত হল) হিল, (হারামের বাইরের এলাকা) আর মক্কাবাসীদের জন্য (মিকাত হল) হজ্জের ক্ষেত্রে হারাম এবং উমরার ক্ষেত্রে হিল।

শব্দার্থ : مَخْصُوصٌ - বিশেষ, বিশিষ্ট, নির্দিষ্ট। اَلْفَوْرُ - তাৎক্ষনিকভাবে, অবিলম্বে। إِيَابٌ - প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমণ। عِيَالٌ - পরিবার-পরিজন, পোষ্যবর্গ। اَحْرَمَ - افعال থেকে اِحْرَامًا (হজ বা উমরার জন্য) এহরাম বাধা। مَوَاقِيْتٌ - ইহা مِيْقَاتٌ এর ব.ব. । অর্থ- নির্দিষ্ট মাস, সময়সূচী, (হজ্জের) মীকাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : كِتَابُ الْحَجِّ الخ : গ্রন্থকার রহ. ইতিপূর্বে রোজা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেননা, তাহল ইবাদাতে বাদানিয়্যাহ। তাইতো তা مفرد আর হজ্জ ইবাদাতে বাদানিয়াহ ও মালিয়াহ এর সমষ্টি। তাই তো তা مركب। আর مفرد এর আলোচনা পূর্বে হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। দ্বিতীয়ত হজ্জ জীবনে একবার ফরজ হয়। পক্ষান্তরে রোজা প্রতি বৎসরে একবার ফরজ হয়। তাই তার গুরুত্ব হজ্বের উপর হওয়াতে তার আলোচনা গ্রন্থকার রহ. পূর্বে করেছেন।

হজ্জের পরিচয় : حج শব্দটি ح বর্ণে যবর যোগে যেমন আল্লাহর বাণী اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ আবার ح বর্ণে যের যোগেও ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহর বাণী وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (الاية) অতএব, حج শব্দটি باب نصر থেকে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ হজ্জ করা, উদ্দেশ্য করা, ইচ্ছা করা।

পরিভাষায় হজ্জ বলা হয় নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করার ইচ্ছা পোষণ করা।

হজ্জ কখন ফরজ হয়েছিল : কেহ কেহ বলেন হজ্জ ফরজ হয়েছে নবম হিজরীতে। কেননা, হযরত আবু বকর রাযি. নবম হিজরীতে হজ্জ পালন করেছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, পঞ্চম হিজরীতে, কেহ বলেন ষষ্ঠ হিজরীতে হজ্জ ফরজ হয়েছিল।

হজ্জ ফরজ হওয়ার প্রমাণ : হজ্জ ফরজ হওয়ার প্রমাণ পবিত্র কুরআন সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلِلّٰهِ على النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -

অনেক হাদীস দ্বারা হজ্জের ফরজিয়াত প্রমাণিত। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সা. এর হাদীস—

(١) حُجُّوْا فَاِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلُ الذُّنُوْبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ الدَّرَنَ

তোমরা হজ্জ আদায় কর। কেননা, হজ্জ গুনাহসমূহকে এভাবে ধুয়ে মুছে ফেলে যেভাবে পানি ময়লাকে ধুয়ে মুছে ফেলে।

(٢) مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا

যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করে মারা গেল সে যেন ইহুদী হয়ে মরে কিংবা খ্রীষ্টান হয়ে মরে।

(٣) بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الخ

উক্ত হাদীসেও ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি হজ্জ বলেছেন। আর ইজমায়ে উম্মতের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. এর যুগ থেকে শুরু করে এ যাবৎ সকল মুসলমান হজ্জের ফরজিয়াতের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে আসছেন।

قوله : فُرِضَ مَرَّةً عَلَى الْفَوْرِ الخ : মানুষের জীবনে হজ্জ একবারই ফরজ হয়। দলিল হল, মুসলিম শরীফের একটি হাদীস—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ -

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সা. আমাদেরকে খুতবা দিলেন, হে লোকসকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করা হয়েছে। অতএব, তোমরা হজ্জ কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বৎসর কি (হজ্জ ফরজ)? রাসূলুল্লাহ্ সা. চুপ করে রইলেন। এমনকি তিনি তা তিনবার বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, যদি আমি হা বলতাম, তবে (প্রতি বৎসর) ওয়াজিব হত। আর তোমরা তা পালন করতে কখনো সক্ষম হতে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, তোমরা আমাকে এমন সব প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক যা আমি তোমাদের থেকে এড়িয়ে থাকি। কেননা, তোমাদের পূর্বে অনেক জাতী অধিক প্রশ্ন করার কারণে ও নবীদের সাথে মতানৈক্য করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব যখন আমি তোমাদেরকে কোন

বিষয় করতে নির্দেশ দেই তা তোমরা সাধ্যমত পালন কর আর যখন তোমাদেরকে কোন বিষয় থেকে নিষেধ করি তা তোমরা ছেড়ে দাও। সুতরাং বুঝা গেল হজ্জ বার বার ফরজ হয় না এবং জীবনে একবারই ফরজ হয়। দ্বিতীয়তঃ হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল, বায়তুল্লাহ শরীফ। এদিকে বায়তুল্লাহ্ শরীফও একটি। তাই একবার ওয়াজিব হবে। গ্রন্থকার রহ. এর উক্ত ইবারতের দ্বিতীয় মাসআলা হল : যাদের উপর হজ্জ ফরয তাদের হজ্জ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব নাকি বিলম্বের সাথে আদায় করলে হবে। এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ., ইমাম আহমদ, কারখী রহ. এর মতে ফরজ হওয়ার পরই এ বৎসর হজ্জ পালন করে নেয়া ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যা হজ্জ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ওয়াজিব বুঝা যায়। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নিকট হজ্জ বিলম্বে আদায় করা জায়েয। তাদের মতে যে বৎসর হজ্জ ফরজ হয়েছে সে বৎসর পালন না করে তবে সে গুনাহগার হবে না। তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে যদি সে হজ্জ পালনে বিলম্ব করে এমন কি মৃত্যু বরণ করে তবে সে গুনাহগার হবে। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, সে গুনাহগার হবে না। **ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতের দলিল :** হজ্জ নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। আর যা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হয় এবং তা নির্দিষ্ট সময়ে ফউত হয়ে যায় তাহলে তা ঐ নির্দিষ্ট সময়েই আদায় করতে হবে। যদি এ সময়ে আদায় না করে তবে হজ্জের মাস চলে যাওয়াতে দ্বিতীয় বৎসর আদায় করতে হবে। সুতরাং এক বৎসরের দীর্ঘতা হয়ে গেল। এসময়ে জীবন মরণের কোন স্থায়িত্ব নেই। তাই সতর্কতার দরুন হজ্জের সময় সীমা সংকুচিত করা হয়েছে।

قوله : بِشَرْطِ حُرِّيَّةٍ وَ بُلُوْغِ الخ : হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হল স্বাধীন হওয়া। সুতরাং গোলামের উপর হজ্জ ফরজ হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন—

أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ عَشَرَ حِجَجٍ ثُمَّ اعْتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ

কোন গোলাম যদিও দশবার হজ্জ করে অতঃপর স্বাধীন হয়, তাহলেও ইসলামের ফরজ হজ্জ তার উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ স্বাধীন হওয়ার পর হজ্জ ফরজ হওয়ার অন্যান্য শর্ত পাওয়া গেলে তার উপর হজ্জ ফরজ হবে। দ্বিতীয় শর্ত হল বালিগ হওয়া। সুতরাং নাবালেগের উপর হজ্জ ফরজ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন—

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشَرَ حِجَجٍ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ

কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক যদিও দশবার হজ্জ করে, অতঃপর প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তবে ইসলামের ফরজ হজ্জ তার উপর ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয়তঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সমস্ত ইবাদত রহিত হওয়ায় হজ্জও তাদের উপর ফরজ হবে না। তৃতীয় শর্ত হল জ্ঞানবান হওয়া। কেননা, পাগল তার নিজ সত্তারও হেফাজত করতে পারে না। তবে সে কিভাবে হজ্জের মত মহান কাজ আঞ্জাম দিবে। চতুর্থ শর্ত হল : সুস্থতা। কেননা, অসুস্থ ব্যক্তি সে নিজেই অক্ষম আর অক্ষম ব্যক্তি কোন ইবাদাতের মুকাল্লাফ নয়।

قوله : وَقُدْرَةِ زَادٍ الخ : গ্রন্থকার রহ. এখান থেকে হজ্জ ফরজ হওয়ার অপর একটি শর্ত বর্ণনা করেছেন। তাহল পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হওয়া। অর্থাৎ, যাতায়াত ও অন্যান্য খরচাদী বহনে সক্ষম হওয়া। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. কে مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا এর অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন- "তা হল পাথেয় ও বাহন"। উক্ত পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হতে হলে আর কিছু শর্ত রয়েছে। তাহল পাথেয় ও বাহনে যা খরচ হয় তা বাসস্থান ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজন এবং ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ থেকেও উদ্বৃত হতে হবে। কেননা, এগুলোর সাথে বান্দার হক জড়িত। আর বান্দার হক শরীয়তের হক্বের উপর অগ্রগণ্য।

قوله : وَ مُحْرِمٍ أَوْ زَوْجِ الخ : যদি স্ত্রীলোকের উপর হজ্জ ফরজ হওয়ার অন্যান্য শর্তাবলী পাওয়া যায় তবে তার জন্য শর্ত হল মাহরাম বা স্বামীর সাথে যাওয়া। তবে মাহরামের সুস্থ মস্তিস্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত। আর হা সে স্বাধীন হউক বা গোলাম হউক এতে কোন সমস্যা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে যদি কাফেলার মধ্যে নির্ভরযোগ্য আর মহিলা থাকে তবে স্ত্রীলোক তার স্বামী বা মাহরাম ছাড়া হজ্জে যেতে পারবে। আমাদের দলিল হল রাসূলুল্লাহ্ সা. এর হাদীস—

لَايَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثُلٰثَةَ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلَّا وَ مَعَهَا اَبُوْهَا اَوْ اِبْنُهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ مَحْرَمٌ مِنْهَا -

আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাসী কোন স্ত্রীলোকের জন্য হালাল নয় তিন দিন কিংবা ততোধিক দূরত্বে সফর করা পিতা, ছেলে, স্বামী, ভাই কিংবা মাহরাম ছাড়া।

সুতরাং বুঝা গেল স্ত্রীলোকের জন্য জায়েয নয় স্বামী বা মাহরাম ছাড়া সফর করা, যদি তা হজ্জের উদ্দেশ্যেও হয় না কেন। দ্বিতীয়তঃ মাহরাম ছাড়া সফর করতে মহিলাদের জন্য ফিতনার আশংকা প্রবল। তবে হা যদি স্ত্রীলোকের আবাসভূমি থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত তিন দিনের কম সময়ের দূরত্বের ব্যবধান থাকে, তবে মাহরাম ছাড়া সফরে যেতে পারবে। কেননা, শরীয়ত মাহরাম ছাড়া তিন দিনের কম সময়ের সফরের অনুমতি দিয়েছে।

قوله : وَلَوْ اَحْرَمَ صَبِيٌّ الخ : যদি নাবালক ইহরাম বাধে অতঃপর সাবালক হয়, কিংবা দাস ইহরাম বাধে অতঃপর স্বাধীন হয় এবং নাবালক সাবালক অবস্থায় ও গোলাম স্বাধীন অবস্থায় হজ্জের কার্যাদী আঞ্জাম দেয়, তাহলে তা দ্বারা হজ্জের ফরজিয়্যাত আদায় হবে না। বরং পরে পাথেয় ও বাহনসহ হজ্জ ফরজ হওয়ার অন্যান্য শর্তাবলী পাওয়া যায় তবে তাদের উপর হজ্জ পালন করা আবশ্যক। কেননা, প্রথমে তারা নফল হজ্জের ইহরাম বেধেছিল, তাই তা ফরজ আদায়ের ইহরামের পরিবর্তন হবে না। বরং তা তখন নফল হিসাবেই পালন হবে।

قوله : وَمَوَاقِيْتُ الْاِحْرَامِ الخ : مواقيت অর্থ যদিও নির্দিষ্ট সময়সমূহ, কিন্তু এখানে রূপকার্থে নির্দিষ্ট স্থানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং মিকাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন স্থান যা ইহরাম ছাড়া অতিক্রম করা জায়েয নেই। মিকাত হল সর্বমোট পাঁচটি। (১) মদীনাবাসীদের জন্য মিকাল হল 'যুল হুলাইফা' (ذو الحليفة)। তা মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। (২) ইরাকবাসীদের মিকাত হল 'যাতু ইরক' (ذات عرق)। এ স্থানটি মক্কা থেকে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত উমর রাযি. বসরা ও কুফা বিজয় করার পর এ স্থানটিকে হজ্জের ক্ষেত্রে মিকাত নির্ধারণ করেছিলেন। (৩) সিরিয়াও মিশরবাসীর মিকাত হল 'যুহ্ফা' (جحفة)। এ স্থানটি লোহিত সাগর থেকে ছয় মাইল দূরে, মদীনা থেকে তিন মঞ্জিল এবং মক্কা শরীফ থেকে বিরাশি মাইল দূরে অবস্থিত। (৪) নজদবাসীদের মিকাত হল 'কারণ' (قرن)। (৫) ইয়ামানবাসীদের মিকাত হল 'ইয়ালামলাম' (يلملم)। এ স্থানটি মক্কা থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। উক্ত মিকাতসমূহের অধিবাসী ও এ পথে অতিক্রম কারীদের জন্য উক্ত মিকাতসমূহ ইহরাম বাধার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। উক্ত মিকাতসমূহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর বর্ণিত হাদীস—

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ شَاءَ حَتّٰى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ -

রাসূলুল্লাহ্ সা. মদীনাবাসীদের জন্য যুল হুলাইফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য যুহফা, নজদবাসীদের জন্য ক্বারন এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মিকাত নির্ধারণ করেছেন। এসব মিকাত উক্ত স্থানের অধিবাসী ও

যারা এস্থানসমূহ দিয়ে হজ্জ ও উমরা করার ইচ্ছা পোষণ করে তাদের জন্য প্রযোজ্য। তাছাড়া যারা আছে তারা যেখান থেকে ইচ্ছা ইহরাম বাধতে পারে। এমনকি মক্কাবাসীরা মক্কা থেকেই ইহরাম বাধবে। সুতরাং বহিরাগত কেহ যদি মক্কাতে প্রবেশ করতে চায় তবে ইহরাম বাধা ওয়াজিব। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন—

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايُجَاوِزُ الْمِيْقَاتَ اَحَدٌ اِلَّا مُحْرِمًا -

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সা. কে বলতে শুনেছি, ইহরাম অবস্থা ছাড়া কেহ যেন মিকাত অতিক্রম না করে। সুতরাং কেহ যদি মিকাতে যাবার আগেই ইহরাম বেধে নেয়, তবে তা জায়েজ কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ الخ উক্ত আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী রাযি. ও ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নিজের এলাকা থেকে ইহরাম বেধে বের হবে। দ্বিতীয়তঃ এতে কষ্ট অধিক। আর ইবাদতের বেলায় অধিক কষ্ট উত্তম যেমন হাদীসে এসেছে— اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ اَحْمَضُهَا সর্বোত্তম ইবাদাত হল যার মধ্যে অধিক কষ্ট হয়। কিন্তু বহিরাগতদের জন্য উক্ত মিকাত অতিক্রমের পর ইহরাম বাধা জায়েয নেই।

قوله : وَلِدَاخِلِهَا الْحِلُّ الخ মিকাতের ভেতরের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাধার স্থান হল 'হিল' (অর্থাৎ হারামের বাহিরের স্থান)। দলিল হল হজ্জ ও উমরা পালনকারী ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে ইহরাম বাধতে পারে। আর যেহেতু তার গৃহ মিকাতের অভ্যন্তরে তখন 'হিল'ই হবে তার ইহরাম বাধার স্থান। আর মক্কাবাসীদের জন্য হজ্জের ক্ষেত্রে হারাম। অর্থাৎ হারামের যেখানে ইচ্ছা সেখান থেকেই ইহরাম বাধতে পারবে। আর উমরার ক্ষেত্রে হিল অর্থাৎ হারামের সীমানা থেকে বের হয়ে হিল এর ভেতর থেকে ইহরাম বাধতে হবে।

بَابُ الْاِحْرَامِ

পরিচ্ছেদ : ইহরামের বিবরণ

وإذا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ فَتَوَضَّأْ وَالْغُسْلُ أَحَبُّ وَالْبَسْ إِزَارًا وَرِدَاءً جَدِيْدَيْنِ أو غَسِيْلَيْنِ وَتَطَيَّبْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَقُلْ اللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي وَلَبِّ دُبُرَ صَلَاتِك تَنْوِي بِهَا الْحَجَّ وَهِيَ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَزِدْ فِيهَا وَلَا تَنْقُصْ -

অনুবাদ : যখন ইহরাম বাধার ইচ্ছা করবে, তখন অজু করবে। তবে গোসল উত্তম এবং নতুন কিংবা ধৌত করা দুটি তহবন্দ ও চাদর পরিধান করবে। আতর ব্যবহার করবে। দুরাকাত নামাজ পড়বে এবং বলবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

'হে আল্লাহ! আমি হজ্জের নিয়াত করেছি। সুতরাং আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করো।' অতঃপর তোমার নামাজের পর তালবিয়া পাঠ করবে ও তা দ্বারা হজ্জের নিয়াত করবে। আর তালবিয়া হল :

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

'আমি হাজির হে আল্লাহ্! আমি হাজির আমি হাজির। তোমার কোন শরীক নাই। আমি হাজির। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। এবং নিয়ামত ও রাজত্য তোমারই এবং তোমার কোন শরীক নেই।' আর তুমি তাতে বাড়াও কম করো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

احرام অর্থ নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রবেশ করা। পরিভাষায় احرام বলা হয় হজ্জ ও নামাজ আদায় করনার্থে নিজের উপর বৈধ অন্যসব কিছুকে হারাম করা।

قوله : وَاِذَا اَرَدْتَ اَنْ تُحْرِمَ الخ : যখন কেহ ইহরাম বাধার মনস্থ করবে তখন প্রথম ওজু করবে। তবে গোসল করা উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. তার ইহরামের জন্য গোসল করেছেন। আর অজু গোসলের মধ্যে অজুর তুলনায় গোসলে পরিচ্ছন্নতা পূর্ণতর। অতঃপর ইহরামের দুটি কাপড় তহবন্দ ও চাদর পরিধান করবে। তা নতুন বা ধৌত করা। তহবন্দ হল এমন কাপড় যা নাভির নিচ থেকে টাখনো পর্যন্ত লম্বা। আর চাদর যা পিঠ দুই কাধ ও বক্ষ ঢাকা পরিমাণ কাপড়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. তার ইহারামের এ দুটি কাপড় পরিধান করে ছিলেন। আর মুহরিমের জন্য সেলাই করা কাপড় পরিধান করা নিষেধ। তবে শীত গরমে উপযোগী ও সতর ঢাকা উক্ত কাপড়দ্বয় দ্বারাই সম্ভব। কেননা, তহবন্দ ও চাদর পরিধানের মাধ্যমে সেলাই করা কাপড় থেকে রক্ষা আবার সতর ও শীত গরম নিবারণও সম্ভব।

قوله : وَتَطَيَّبُ الخ : অতঃপর আতর ব্যবহার করবে। (যদি বিদ্যমান থাকে) ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে এমন খোশবু ব্যবহার করা মাকরূহ যার ঘ্রাণ ও অস্তিত্ব ইহরামের পরও অবশিষ্ট থাকে। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মালিক রহ. এর মতামতও তাই।

প্রসিদ্ধ মতের দলিল : হযরত আয়েশা রাযি. এর বর্ণিত হাদীস—

قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاِحْرَامِهٖ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ -

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সা.কে ইহরামের পূর্বে ইহরামের জন্য সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

كِفَايَةٌ গ্রন্থকার রহ. বলেন, এখানে হযরত আয়েশা রাযি. এর সুগন্ধি লাগানো দ্বারা এমন সুগন্ধি বুঝানো হয়েছে, যার অস্তিত্ব ও ঘ্রাণ ইহরামের পরও অবশিষ্ট থাকে। যেমন অপর এক হাদীসে হযরত আয়েশা রাযি. বলেন—

لَقَدْ رَأَيْتُ بِيْضَ الطِّيْبِ فِيْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ اِحْرَامِهٖ

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সা. এর সিথিতে ইহরাম বাধার পরও সুগন্ধির চিহ্ন ও ঝলক দেখেছি।

দ্বিতীয়তঃ ইহরামের পর সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ, তাই বলে কি ইহরামের পূর্বের সুগন্ধি থেকে কেউ উপকৃত হওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং তা থেকে উপকৃত হওয়া নিষিদ্ধ নয়।

قوله : وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ الخ : ইহরাম বাধার পূর্বে দুরাকাত নামাজ পড়া সুন্নাত। কেননা, হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত—

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ اِحْرَامِهٖ -

নবী করীম সা. তার ইহরামের সময় যুল হুলাইফায় দু রাকাত নামাজ পড়েছেন। অনুরূপভাবে আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও বর্ণিত হাদীসে দুরাকাতের উল্লেখ আছে। উক্ত দু'রাকাতে ফাতেহার সাথে যে কোন সূরা পড়তে পারে। তবে প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করা উত্তম। কেননা, এতে রাসূলুল্লাহ্ সা. এর فعل থেকে বরকত হাসিলের সৌভাগ্য হয়। নামাজ সমাপনান্তে ইহরাম বেধে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْحَجَّ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّیْ

সহজতার দোয়া এজন্য যে, হজ্জ এর মত মহান ইবাদতটি করতে নিশ্চয় অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। তাই সহজতার দোয়া অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

قوله : وَلَبِّ دُبُرَ صَلٰوتِكَ الخ : আমাদের মাযহাব মতে উত্তম হল ইহরামের নামাজের পর পরই তালবিয়া পাঠ করা। অর্থাৎ নামাজ ও তালবিয়া পাঠের মাঝখানে অন্য কোন কাজ করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. নামাজের পর তালবিয়া পাঠ করেছেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন— لَبّٰى دُبُرَ صَلَاتِهٖ রাসূলুল্লাহ্ সা. নামাজের পরই তালবিয়া পড়েছেন। হজ্জকারী ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করে হজ্জের নিয়াত করবে। তালবিয়া হল :

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ -

উক্ত তালবিয়া হল হযরত ইব্রাহীম আ. এর আহ্বানে সাড়া দান করা। কেননা, হযরত ইব্রাহীম আ. কাবা শরীফ নির্মাণ শেষে মহান প্রভূর নির্দেশ আল্লাহ তাআলার শিখানো বাণী দ্বারা পবিত্র কাবা শরীফে হজ্জের আহ্বান করেছেন।

হযরত ইব্রাহীম আ. এর এ আহ্বানে যে যতবার সাড়া দিয়েছে আল্লাহ চাহেতো সে ততবারই হজ্জ করার সৌভাগ্য অর্জন করবে।

قوله : وَزِدْ فِيهَا وَلَاتَنْقُصْ الخ : তালবিয়ার উক্ত শব্দাবলীর কোনটিই বাদ দেয়া যাবে না। কেননা, অধিকাংশ বর্ণনাকারীর সর্বসম্মতিক্রমে এ তালবিয়া বর্ণিত হয়েছে। অতএব, তা থেকে কোন অংশ বাদ দেয়া যাবে না। তবে হ্যা কোন শব্দ বৃদ্ধি করা হলে তা জায়েয।

فَإِذَا لَبَّيْتَ نَاوِيًا فَقَدْ أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ الرَّفَثَ وَالْفُسُوقَ وَالْجِدَالَ وَقَتْلَ الصَّيْدِ وَالْإِشَارَةَ إِلَيْهِ وَالدَّلَالَةَ عَلَيْهِ وَلُبْسَ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْقَبَاءِ وَالْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَاقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَالثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَو عُصْفُرٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا لَا يَنْفُضُ وَسَتْرُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَغَسْلُهُمَا بِالْخِطْمِيِّ وَمَسَّ الطِّيبِ وَحَلْقَ رَأْسِهِ وَقَصَّ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ -

অনুবাদ : অতঃপর যখন হজ্জের নিয়তে তালবিয়া পড়েছো তখন তুমি মুহরিম হয়ে গেছ। সুতরাং সহবাস, পাপাচার, ঝগড়া-বিবাদ, শিকার হত্যা করা বা তার প্রতি ইঙ্গিত করা কিংবা শিকার সম্পর্কে অবহিত করা, কুর্তা, পাজামা, পাগড়ী, টুপি, আবা এবং মোজা পরিধান করা (থেকে বেচে থাক।) আর যদি জুতা না পাওয়া যায় তবে টাখনু থেকে নিচের দিকে মোজা কেটে দিবে এবং কুসুম, জাফরান বা ওরসে রঞ্জিত কাপড় (থেকে বেচে

থাকবে।) তবে যদি তা ধৌত হয়, ঘ্রাণ আসে না (তবে তা নিষেধ নয়) এবং চেহারা ও মাথা ঢেকে ফেলা, মাথা মুণ্ডানো, নখ ও চুল কাটা থেকে বেচে থাক।

শব্দার্থ : اَلرَّفَثُ - অশ্লীল মেলামেশা, অশ্লীল কথা। اَلْفُسُوْقُ - ফাসিক হওয়া, পাপাচার। اَلْجِدَالُ - ঝগড়া, কলহ-বিবাদ। سَرَاوِيْلُ - পাজামা। اَلْمَصْبُوْغُ - রং করা হয়েছে এমন, রঞ্জিত। نَفْضًا (ن) يَنْفُضُ - ঝাড়া দেয়া, ঝেড়ে ফেলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : فَإِذَا لَبَّيْتَ نَاوِيًا الخ : যখন হজ্জের ইচ্ছুক ব্যক্তি নিয়ত এবং তালবিয়া পাঠ করে নিবে তখন থেকেই মুহরিম হয়ে যাবে। সুতরাং যদি নিয়ত ছাড়া তালবিয়া পাঠ করে নেয় অথবা নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করে না তবে মুহরিম হতে পারবে না। কেননা, মুহরিম হতে হলে উভয়টিই আবশ্যক।

قوله : فَاتَّقِ الرَّفَثَ الخ : এখান থেকে সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. ইহরাম অবস্থায় যেসব কর্ম করা নিষেধ তার আলোচনা শুরু করতেছেন। সুতরাং ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস, পাপাচার তথা ফাসেকী কাজ কর্ম (যা কবীরা গুনাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়) ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি নিষেধ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ -

যে ব্যক্তি হজ্জের দিনসমূহে নিজের উপর ফরজ করে নেয় সে যেন সহবাস, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ না করে।

উক্ত لا তথা না বাচক শব্দ দ্বারা নিষেধ বুঝানো হয়েছে।

قوله : وَقَتْلَ الصَّيْدِ الخ : ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষেধ। তা জবেহ কিংবা অন্য কোন পদ্ধতিতে হউক না কেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, - وَلَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যা করো না। উক্ত আয়াতে صيد যদিও ব্যাপকার্থবোধক তবে অন্য আয়াত দ্বারা শুধু স্থলভাগে صيد বা শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং জলে শিকার করা নিষেধ নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলাই ইরশাদ করেন وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا 'ইহরাম অবস্থায় তোমাদের জন্য স্থলের প্রাণী শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।' উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল ইহরাম অবস্থায় শুধু স্থলের প্রাণী শিকার করা নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে মুহরিমের জন্য শিকারের প্রতি ইশারা ইঙ্গিত করা কিংবা শিকার সম্পর্কে কাউকে অবহিত করা জায়েয নেই। কেননা, একবার হযরত আবু কাতাদা রযি. একটি বন্য গাধা শিকার করলেন। তখন তিনি অবশ্যই হালাল ছিলেন। তার সাথী-সঙ্গিরা তা খেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সা. কে এ ঘটনা জানানো হলে তিনি তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা কি আবু কাতাদাকে ইঙ্গিত করেছিলে। তোমরা কি শিকার কোথায় আছে তা বলে দিয়েছিলে? তোমরা কি তাহাকে সাহায্য করেছিলে? তারা সবাই বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছিলেন, যদি এমন হয় তবে খেতে কোন অসুবিধা নেই।

সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা, শিকারের স্থান বলে দেয়া, শিকার করতে সাহায্য করা সবই নিষিদ্ধ।

قوله : و لُبْسَ الْقَمِيْصِ الخ : ইহরাম অবস্থায় সিলাই করা কাপড় অর্থাৎ পাঞ্জাবী, পাজামা, পাগড়ী, টুপি, আবা, মুজা ইত্যাদি পরিধান করা জায়েয নেই। তবে জুতা না পাওয়া অবস্থায় এমন মুজা পরিধান করতে পারবে যার كعب (তথা পায়ের পাতার মধ্যস্থলের জোড়ার অংশ) থেকে নিচের অংশ কর্তিত। দলিল হল, হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহরাম অবস্থায় আপনি কিরূপ কাপড় পরিধানের নির্দেশ দেন? রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করলেন- 'পাঞ্জাবী, পাজামা, টুপি এবং মোজা পরিধান করবে

না। আর যদি কারো কাছে জুতা না থাকে তাহলে সে যেন মোজা পরিধান করে। তবে كعب এর নিচ থেকে কেটে দেবে। এমন কিছু পরিধান করবে না যাতে জাফরান কিংবা ওরস মিশ্রিত।' উক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, উপরোক্ত কাপড়সমূহ পরিধান করা নিষেধ।

قوله : وَالثَّوْبُ الْمَصْبُوْغُ الخ : কুসুম, জাফরান ও ওরস রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা মুহরিমের জন্য নিষেধ কেননা, পূর্বের মাসআলায় বর্ণিত হযরত ইবনে উমর রাযি. এর হাদীসের শেষে রয়েছে মুহরিম এমন কাপড় পরিধান করবে না যাকে জাফরান বা ওরস দ্বারা রঞ্জিত করা হয়েছে।

সুতরাং বুঝা গেল মুহরিম সুগন্ধি যুক্ত কাপড় পরিধান করতে পারবে না। তবে যদি সুগন্ধি যুক্ত কাপড় এমনভাবে ধৌত করা হয় যে, তার ঘ্রাণ আর অবশিষ্ট নেই শুধু রং রয়েছে তবে তা পরিধান করতে পারবে কেননা, তাহাবী শরীফে বর্ণিত হযরত ইবনে উমর রাযি. এর হাদীস—

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَلْبَسُوْا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ غَسِيْلًا -

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন, জাফরান কিংবা ওরস রঞ্জিত কাপড় তোমরা পরিধান করবে না। তবে তা ধৌত করা হলে (পরিধান করা যাবে।)

قوله : وَسِتْرَ الرَّأْسِ الخ : মুহরিম পুরুষের জন্য স্বীয় চেহারা, মাথা ঢাকা নিষিদ্ধ। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম মালিক রহ. ও আহমদ রহ. এর মতে পুরুষদের জন্য চেহারা ঢাকা জায়েয। আমাদের দলিল হল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস— জনৈক মুহরিম ব্যক্তিকে তার বাহন ফেলে দিলে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, তোমরা তাকে বড়ই পাতা মেশানো পানি দ্বারা গোসল দাও এবং দু কাপড় দ্বারা তাকে কাফন পরিধান করাবে। তাকে সুগন্ধি মাখাবে না এবং তার মাথা ও চেহারা ঢাকবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া বলা অবস্থায় উত্থিত করা হবে। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকগণ ইহরাম বাধা অবস্থায় চেহারা ঢাকবে না। অথচ তা খুলে রাখাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে। কিন্তু পুরুষের চেহারা খুলা রাখাতে ফিতনার আশংকা নেই, তাই তা খুলা রাখাটাই যুক্তিযুক্ত।

قوله : وَغَسْلِهِمَا الخ : মুহরিম ব্যক্তির জন্য খিতমী দ্বারা মাথা ও চেহারা ধৌত করা নিষিদ্ধ। কেননা, খিতমিতে সুগন্ধ থাকে। আর মুহরিমের জন্য সুগন্ধ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অথবা খিতমির প্রতিক্রিয়ায় মাথার ওকুন ধ্বংস হয়। অথচ ইহরাম অবস্থায় প্রাণী হত্যা করা নিষেধ।

قوله : وَمَسَّ الطِّيْبِ الخ : মুহরিম ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— اَلْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ হজ্জকারী হলো ধুলামলিন ও অপরিপাটি। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, হজ্জকারী অপরিপাটি থাকবে। আর সুগন্ধি ব্যবহার করা পরিপাটির নিদর্শন।

قوله : وَحَلْقَ رَأْسِهِ الخ : মুহরিম ব্যক্তি মাথার চুল বা অন্য কোন স্থানের পশম মুন্ডাতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— وَلَاتَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ তোমরা তোমাদের মাথা মুন্ডাবে না। অনুরূপভাবে চুল কাটা বা নখ কাটা নিষিদ্ধ। কেননা, তা দ্বারা ধুলা মলিনতা বা অপরিপাটিতা বিদূরীত হয়ে যায়। যা হাজ্জীদের জন্য উচিত নয়।

لَا الِاغْتِسَالَ وَدُخُولَ الْحَمَّامِ وَالِاسْتِظْلَالَ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَلِ وَشَدَّ الْهِمْيَانِ فِي وَسْطِهِ وَأَكْثِرِ التَّلْبِيَةَ مَتَى صَلَّيْتَ أَوْ عَلَوْتَ شَرَفًا أَو هَبَطْتَ وَادِيًا أَوْ لَقِيتَ رَكْبًا وَبِالْأَسْحَارِ رَافِعًا صَوْتَكَ بِهَا وَابْدَأْ بِالْمَسْجِدِ بِدُخُولِ مَكَّةَ وَكَبِّرْ وَهَلِّلْ تِلْقَاءَ الْبَيْتِ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُسْتَلِمًا بِلَا إِيذَاءٍ -

অনুবাদ : তবে গোসল করা, গোসলখানায় প্রবেশ করা, গৃহের বা হাওদার ছায়া গ্রহণ করা, কোমরে টাকার থলে বাঁধা নিষিদ্ধ নয়। আর বেশি বেশি তালবিয়া পড়া যখন নামায পড়বে অথবা উঁচু স্থানে আরোহণ করবে কিংবা উপত্যকায় নেমে আসবে অথবা সওয়ারীদের সাক্ষাৎ করবে এবং শেষ রাতের সময়ও তা পড়বে উচ্চ আওয়াজে। মক্কাতে প্রবেশ করে মসজিদে হারাম থেকে শুরু করবে। বাইতুল্লাহ শরীফ দেখে আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। অতঃপর কাহাকেও কষ্ট দেওয়া ছাড়া হজরে আসওয়াদের মুখমুখি হবে আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং (হজরে আসওয়াদে) চুম্বন দেওয়া অবস্থায়।

শব্দার্থ : اِسْتِظْلَالًا - استفعال থেকে, অর্থ ছায়া, ছায়া পাওয়া। اَلْهِمْيَانُ - টাকার থলে। عَلَوْتَ (ن) عُلُوًّا - ওপরে উঠা, উঁচু হওয়া। هَبَطْتَ (ض،ن) هُبُوْطًا -অবতরণ করা, নীচে নামা। وَادِيًا (ج) اَوْدِيَةٌ - উপত্যকা, নদী। اَلْاَسْحَارُ - প্রভাত, সকাল। مُسْتَلِمًا - استفعال থেকে اِسْتِلَامًا - চুম্বন করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : لَا الِاغْتِسَالَ الخ : মুহরিমের উপর গোসল ফরজ হলে তা আদায় করা ওয়াজিব। আর সাভাবিক অবস্থায় মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে তার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। কেননা, হুজুর সা. ইহরাম অবস্থায় গোসল করেছেন। অনুরূপ মুহরিম ব্যক্তি গোসল করার জন্য হাম্মামখানায় প্রবেশ করে গোসল করতে পারবে। কেননা, হযরত উমর রাযি. মুহরিম অবস্থায় গোসল করেছেন।

قوله : وَالِاسْتِظْلَالُ الخ : আমাদের মাযহাব মতে মুহরিম ব্যক্তি ঘরের ছায়া বা শামিয়ানার ছায়া বা অন্য কোন কিছু দ্বারা ছায়া গ্রহণ করতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মালেক রহ. এর মতে শামিয়ানার ছায়া গ্রহণ করা মাকরূহ।

আমাদের দলিল হল : হযরত উকবা ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, আমি উসমান রাযি. কে দেখেছি মুহরিম অবস্থায় তার জন্য শামিয়ানা টানানো হতো এবং তার তরবারি গাছে ঝুলানো থাকতো। দ্বিতীয়তঃ শামিয়ানা ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করে না। সুতরাং তা ঘরের ন্যায় হয়ে গেল। আর গৃহের ছায়া গ্রহনে কোন অসুবিধা হয় না। তাই শামিয়ানা গ্রহন করতে মাকরূহ হবে না।

قوله : وَشَدَّ الْهِمْيَانِ الخ : আমাদের মাযহাব মতে মুহরিমের জন্য কোমরে টাকার থলে বাধতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম মালিক রহ. এর মতে যদি থলের ভেতর স্বীয় টাকা থাকে তবে তা সহীহ, অন্যথায় কোমরে থলে বাধা জায়েয নয়। **আমাদের দলিল হল :** টাকার থলে যেহেতু সেলাইকৃত কাপড়ের ন্যায় নয় তাই তো বাধতে কোন অসুবিধা নেই। তাতে নিজের টাকা রাখুক বা অন্যের।

দ্বিতীয়তঃ একবার হযরত আয়েশা রাযি. কে মুহরিম ব্যক্তির কোমরে টাকার থলে বাধার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বললেন, 'যেভাবে পার নিজের খরচের হিফাযত কর।' উক্ত হাদীস থেকে থলে বাধা জায়েয হওয়াটা প্রমাণ করে।

قوله : وَاَكْثِرِ التَّلْبِيَةَ الخ : ইমাম আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ্ রহ. বলেন, মুহরিম ব্যক্তি যখনই নামায পড়বে

তার পরই বেশি বেশি করে তালবিয়া পাঠ করবে। ইমাম তাহাবী রহ. বলেন, শুধু ফরজ নামাযের পর তালবিয়া পাঠ করা হবে। আর যখন উচু স্থান থেকে নিচে আর নীচ স্থান থেকে উপরে অথবা কোন উপত্যকায় অবতরণ করবে কিংবা সওয়ারীদের সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন বেশি বেশি করে তালবিয়া পাঠ করা হবে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এসকল অবস্থায় অধিক হারে তালবিয়া পাঠ করতেন। দ্বিতীয়তঃ ইহরাম অবস্থায় তালবিয়া পাঠ নামাজে তাকবীর বলার মত। সুতরাং যেভাবে নামাজে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থাতে যেতে তাকবীর বলতে হয়, তদ্রূপ মুহরিম এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যেতে তাকবীর বলবে। আর আমাদের মাযহাব মতে তালবিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করা হবে। আর তাই সুন্নাত। কেননা, তালবিয়া পাঠে ইলানই উদ্দেশ্য। আজানও খুতবার ন্যায়। তাই তালবিয়া উচ্চস্বরে হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ হুজুর সা. ইরশাদ করেন— أَفضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ 'উত্তম হজ্জ হল উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা ও রক্ত প্রবাহিত করা। (তথা কুরবানী করা)।'

قوله : وَابْدَأْ بِالْمَسْجِدِ الخ : মুহরিম ব্যক্তি মক্কাতে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কাজ হলো মসজিদে হারামে যাওয়া। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. যখন মক্কাতে প্রবেশ করেছিলেন, তখন সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে গিয়েছেন। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে।

إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ -

আর মসজিদে হারামের বাবুসসালাম দিয়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. এ দরজা দিয়েই প্রবেশ করেছেন। অতঃপর যখন কাবা শরীফ দেখবে তখন আল্লাহু আকবার বলবে সাথে সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। এ সময় আল্লাহ ও তাঁর কাবা শরীফের মহত্ত্ব ও বড়ত্ব অন্তরে উপস্থিত করতঃ যত খুশি দোয়া করতে পার। কেননা, কাবা শরীফ দেখার সময় দোয়া করলে তা কবুল হয়।

قوله : ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْحَجَرَ الخ : অতঃপর মুহরিম ব্যক্তি হজরে আসওয়াদের মুখোমুখী হয়ে আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং যদি কোন মুসলমানকে কষ্ট না দিয়ে স্পর্শ করা সম্ভব হয় তাহলে তার উপর ওষ্ঠদ্বয় রেখে চুম্বন করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. হজরে আসওয়াদের উপর ওষ্ঠদ্বয় রেখে চুম্বন করেছেন। অন্যথায় (তথা কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার সাথে) চুম্বন দেয়া থেকে বিরত থাকবে এবং দূর থেকে হজরে আসওয়াদ বরাবর হয়ে আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে। কেননা, হুজুর সা. হযরত ওমর রাযি. কে বলেছেন, তুমি শক্তিশালী পুরুষ দুর্বলকে কষ্ট দিবে, তাই তুমি হজরে আসওয়াদের সামনে মানুষের মাঝে চাপ সৃষ্টি করো না। তবে ফাঁক পেলে মুখ কিংবা হাত দিয়ে স্পর্শ করে নিও। দ্বিতীয়তঃ চুম্বন করা সুন্নাত। আর মুসলমানকে কষ্ট না দেওয়া ওয়াজিব। সুতরাং সুন্নাত পালন করতে যেয়ে ওয়াজিব লঙ্ঘনের অনুমতি নেই।

وَطُفْ مُضْطَبِعًا وَرَاءَ الْحَطِيْمِ آخِذًا عَنْ يَمِيْنِكَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَرْمَلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ فَقَطْ وَاسْتَلِمِ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَرْتَ بِهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَاخْتِمِ الطَّوَافَ بِهِ وَبِرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَقَامِ أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْقُدُوْمِ وَهُوَ سُنَّةٌ لِغَيْرِ الْمَكِّيِّ -

---

অনুবাদ : এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দরজা সংলগ্ন দিকটি তোমার ডান দিকে রেখে [illegible] উপর [illegible] مضطبع অবস্থায় (তথা নিজের চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর [illegible] তাওয়াফ করবে। প্রথম তিন চক্করে শুধু রমল করবে। যখনই হজরে আসওয়াদের পাশ দিয়ে [illegible] চুম্বন করবে। আর তাওয়াফ শেষ করবে চুম্বনের মাধ্যমে এবং মাকামে ইব্রাহীমে অথবা মসজিদের [illegible]

স্থানে সহজ হয় সেখানে দু রাকাত নামায পড়বে। (এ প্রকার তাওয়াফ মক্কার) বহিরাগতদের জন্য। এবং তা মক্কাবাসী মুসলমানদের ভিন্ন অন্যান্যদের জন্য সুন্নাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : طُفْ مُضْطَبِعاً الخ : হজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা ওয়াজিব। তেমনি ডান দিক থেকে অর্থাৎ বায়তুল্লাহ শরীফের দরজা সংলগ্ন দিকটি ডান দিকে রেখে হাতিমের বাইরের দিকে সাতবার তাওয়াফ করা ওয়াজিব। কেননা, এভাবে রাসূলুল্লাহ্ সা. তাওয়াফ করেছেন। আর যদি কেহ বাম দিক থেকে তাওয়াফ করে নেয় তবে তার তাওয়াফ আদায় হবে না। বরং হাজী মক্কায় অবস্থানরত সময়ে পুনরায় তাওয়াফ করে নেবে। আর যদি ইহরাম খুলে ফেলেতবে কুরবানী ওয়াজিব হবে। উল্লেখ্য যে, হাতীম বলা হয় মীযাবে রহমতের স্থানকে। حطم অর্থাৎ ভাঙ্গা অংশ। ক্বাবা শরীফের কিছু অংশ মুশরিকরা কাবা পুনঃনির্মানের সময় অর্থাভাবে বাদ দিয়ে দেয়। মূলত তা কাবারই অংশ বিশেষ। তাই তার হুকুম ক্বাবা শরীফের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কাবা শরীফের চতুর্পার্শে তাওয়াফের সময় হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা হবে। সুতরাং হাতিমের ভেতর দিয়ে কেহ প্রবেশ করে তথা হাতিম ও ক্বাবার ফাক দিয়ে তাওয়াফ করলে তার তাওয়াফ হবে না। যেমন, হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে— اِنَّ الْحَطِيْمَ مِنَ الْبَيْتِ নিশ্চয় হাতিম ক্বাবা শরীফের অন্তর্ভুক্ত। আর পবিত্র কুরআন শরীফের নির্দেশ হল وَالْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -আর তারা যেন প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে। উক্ত আয়াতে প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ বলা হয়েছে এরকম বলা হয়নি যে প্রাচীন গৃহের মধ্যে তাওয়াফ করে। আর প্রাচীন গৃহ দ্বারা সম্পূর্ণ কাবাই উদ্দেশ্য একারণে পুরা কাবা শরীফকে প্রদক্ষিণ করা জরুরী।

قوله : تَرْمُلُ فِى الثَّلَاثَةِ الخ : রমল এর সঙ্গা দিতে গিয়ে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন—

اَلرَّمَلُ اَنْ يَهُزَّ فِى مَشْيَةِ الْكَتِفَيْنِ كَالْمُبَارِزِ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ

রমল হল হাটার সময় কাধ ঝাকি দিয়ে চলা যুদ্ধমুখী দুই সারির মাঝখানে দম্ভকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো। তাওয়াফে রমলের কারণ : হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের বৎসর রাসূলুল্লাহ্ সা. মক্কাতে আসলেন। কাফেররা কাবা শরীফ খালি করে পাহাড়ে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সা. সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে কাবা শরীফে পৌঁছলেন। তখন শুনতে পেলেন, কতিপয় কাফের বলছে, মদীনার তাপ মুসলমানদেরকে কাহিল করে দিয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সা. স্বীয় বাহু দিয়ে রমল করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকে রমল করতে নির্দেশ করলেন। যদিও সে কারণ এখন আর নেই, তবুও তা বিধান হিসেবে রয়ে গেছে। আর হযরত জাবির রাযি. ও হযরত ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ সা. কুরবানির হজ্জে প্রথম তিন চক্করে রমল করেছেন। সুতরাং তা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

قوله : وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ الخ : যদি সম্ভব হয় তবে প্রতি চক্করের প্রারম্ভে হজরে আসওয়াদকে স্পর্শ বা চুম্বন করা হবে। কেননা, বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ নামাজের মত। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন, اِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ নিশ্চয়ই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সালাতের ন্যায়। সুতরাং নামাজের প্রতি রাকাত যেভাবে তাকবীর দিয়ে শুরু করতে হয়, তদ্রূপ তাওয়াফের প্রতি চক্করে হজরে আসওয়াদ সম্ভব হলে চুম্বন বা স্পর্শ করতঃ তাকবীর ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে শুরু করতে হবে।

আর যদি হজরে আসওয়াদ স্পর্শ বা চুম্বন করা সম্ভব হয় না তবে সেদিকে মুখ করে তাকবীর ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে ও তাওয়াফ শুরু করবে। দলিল হল বুখারী শরীফের হাদীস—

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا اَتَى عَلَى الرُّكْنِ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَىْءٍ فِى يَدِهٖ

রাসূলুল্লাহ্ সা. উটের উপর তাওয়াফকালে যখনই হজরে আসওয়াদের নিকট আসতেন তখনই স্বীয় হস্ত মোবারকে যা থাকত তা দ্বারা সে দিকে ইশারা করতেন। অনুরূপভাবে তাওয়াফ শেষেও হজরে আসওয়াদ সম্ভব হলে স্পর্শ বা চুম্বন করবে।

قوله : وَيَرْكَعْتَيْنِ فِى الْمَقَامِ الخ : অতঃপর মাকামে ইব্রাহীমে অথবা মসজিদে হারামের যে স্থানে সম্ভব হয় সেখানে দু রাকাত নামায পড়বে। (মাকামে ইব্রাহীম হল ঐ পাথর যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম আ. কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। এ পাথরে এখনও হযরত ইব্রাহীম আ. এর পদচিহ্ন রয়েছে।)

আমাদের মতে এ নামায পড়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে এ নামাজ সুন্নাত। তিনি বলেন, এ নামায ওয়াজিব হওয়ার পেছনে কোন দলিল নেই, তাই সুন্নাত। আমাদের দলিল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন—

وَلْيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ

তাওয়াফকারী যেন প্রতি সাত চক্করে দুই রাকাত নামায পড়ে। উক্ত হাদীসে يصل শব্দটি امر এর, যা ওয়াজিব কামনা করে। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সা. তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমে আসলেন এবং তেলাওয়াত করলেন— وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى (তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাজের স্থানরূপে গ্রহণ কর)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সা. দুরাকাত নামায পড়লেন।

উক্ত আয়াতেও اتخذوا শব্দটি امر এর, যা ওয়াজিবই বুঝায়। সুতরাং প্রমাণিত হল তাওয়াফে কুদুমের পর মাকামে ইব্রাহীমে বা মসজিদে হারামে দু রাকাত নামায পড়া ওয়াজিব।

قوله : وَهُوَ سُنَّةٌ لِغَيْرِ الْمَكِّيِّ الخ : মক্কা শরীফে পৌঁছেই যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে কুদুম বলা হয়। আমাদের মতে বহিরাগতদের এ তাওয়াফ সুন্নাত। তবে ইমাম মালিক রহ. এর মতে ওয়াজিব। আমাদের দলিল হল : وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ এ আয়াতে তাওয়াফকে ফরজ করা হয়েছে। আর তা পুনরাবৃত্তি হয় না। এদিকে ইজমার ভিত্তিতে তাওয়াফে জিয়ারতকে ফরজ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং যখন তাওয়াফে জিয়ারত ফরজ হওয়াটা প্রমাণিত হল বিধায় দ্বিতীয় আর কোন তাওয়াফ ওয়াজিব হবে না। আবার এ সুন্নাত তাওয়াফ মক্কাবাসীদের জন্য নয়, বরং বহিরাগতদের জন্য। কেননা, এ তাওয়াফ বহিরাগতদের জন্য আগমনের ফলে সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। আর মক্কাবাসীদের আগমন পাওয়া যায় না।

ثُمَّ اُخْرُجْ إِلَى الصَّفَا وَقُمْ عَلَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ مُهَلِّلًا مُكَبِّرًا مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاعِيًا رَبَّكَ بِحَاجَتِكَ ثُمَّ اهْبِطْ نَحْوَ الْمَرْوَةِ سَاعِيًا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ وَافْعَلْ عَلَيْهَا فِعْلَكَ عَلَى الصَّفَا وَطُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَتَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَقِمْ بِمَكَّةَ حَرَامًا وَطُفْ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَا لَكَ ثُمَّ اُخْطُبْ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَعَلِّمْ فِيهَا الْمَنَاسِكَ ۔

অনুবাদ : সাফা পাহাড়ের দিকে বের হবে তাকবীর বলা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা ও রাসূলুল্লাহ্ সা. এর উপর দরূদ পড়া এবং তোমার প্রয়োজনীয়তা তোমার প্রভূর কাছে প্রার্থনা করা অবস্থায়। তাতে ক্বাবার দিকে মুখ করে দাড়াবে। অতঃপর মারওয়ার দিকে অবতরণ করে সবুজ নিশানদ্বয়ের মাঝে দৌড়াবে। আর এখানে এমন

কাজ করবে যেভাবে সাফাতে করেছ। এভাবে উভয়ের মাঝে সাত চক্কর দাও, যা শুরু করবে সাফা থেকে আর শেষ করবে মারওয়াতে। অতঃপর মক্কাতে ইহরাম অবস্থায় অবস্থান করবে এবং যখনই তোমার ইচ্ছা হবে তখনই বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে। অতঃপর ইয়াওমুত তারবিয়া (আট জিলহজ্জ এর) পূর্বে (ইমাম) খুতবা দিবে এবং তাতে হজ্জের (সার্বিক বিষয়াদি) শিক্ষা দিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : ثُمَّ اخْرُجْ اِلَى الصَّفَا الخ : তাওয়াফে কুদুম শেষ করে সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ করার জন্য বের হবে। তাই প্রথমত সাফা পাহাড়ে আরোহণ হয়ে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে দরূদ শরীফ পাঠ করে যত খুশী আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে। কেননা, হযরত জাবির রাযি. কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন, এমন কি যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফ দেখলেন তখন কাবামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহর সকাশে দোয়া করলেন।

হিদায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, যে কোন দরজা বা গেইট দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সা. বাবে বনুমাখজুম তথা বাবে সাফা দিয়ে শুধু এজন্য বেরিয়েছেন যে, তা সাফার দিকে যাওয়ার নিকটতম দরজা ছিল। এজন্য নয় যে, তা সুন্নাত।

قوله : ثُمَّ اهْبِطْ الخ : অতঃপর মুহরিম ব্যক্তি সাফা থেকে মারওয়া অভিমুখে যাবে এবং চলার গতি সাধারণ চলন হবে। অতঃপর যখন বাতনে ওয়াদীতে পৌঁছবে তখন দুই সবুজ নিশানদ্বয়ের মাঝে সা'ঈ তথা দৌড়াবে। তারপর মারওয়াতে যাবে এবং কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও দরূদ পাঠ করে নিজের প্রয়োজনের বিভিন্ন দোয়া করবে। এভাবে সাত চক্কর দিবে। আর হা সাফা থেকে মারওয়া যাওয়া এক চক্কর আর মারওয়া থেকে সাফা যাওয়া দ্বিতীয় চক্কর। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবে। তাই গ্রন্থকার রহ. বলেন, সাফা থেকে শুরু করা হবে আর মারওয়াতে যেয়ে শেষ হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— اِبْدَأُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ আল্লাহ তাআলা প্রথমে যেটি দিয়ে শুরু করেছেন তোমরাও তা থেকে শুরু কর। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাফা দ্বারা শুরু করেছেন। তাই আমরা আমাদের সাঈ সাফা থেকে শুরু করা উচিত। সুতরাং এভাবেই আমল চলে আসছে। উল্লেখ্য যে, সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ আমাদের মতে ওয়াজিব। তা হজ্জের রুকন নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে হজ্জের রুকন। আমাদের দলিল হল— فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا এদুটির মাঝে তাওয়াফ করায় তোমাদের কোন গুনাহ নেই। উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত فلاجناح দ্বারা বুঝা যায় যে, তাতে সাঈ করা বৈধ। আর তা অবৈধ নয়। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

উক্ত আয়াতেও لا جناح দ্বারা বৈধতা বুঝানো হয়েছে তা ওয়াজিব বা ফরজ বুঝানো হয়নি। অতএব, আয়াতের বাহ্যিক মর্ম অনুযায়ী তা ফরজ ওয়াজিব কোনটাই প্রমাণিত করে না। তবে তার পূর্ববর্তী আয়াত- اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ উক্ত আয়াতে شعائر الله দ্বারা ফরজ সাব্যস্ত করা যায়। কেননা, شعائر ইহা شعير এর বহুবচন। তার অর্থ চিহ্ন, আলামত। সুতরাং তা দ্বীনের আলামত বা চিহ্ন হল। আর দ্বীনের আলামত বা চিহ্ন ফরজই হয়ে থাকে। তাই সাঈ ফরজ বুঝায়। তবে পরবর্তী আয়াতে শুধু বৈধতা বুঝায়। তাই আমরা উভয়টির উপর আমল করতে যেয়ে বলি সাঈ হল ওয়াজিব। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ্ সা. এর হাদীস عَلَيْكُمُ السَّعْىُ فَاسْعَوْا

উক্ত হাদীসখানা খবরে ওয়াহিদ, তাই তা দ্বারা সর্বোচ্চ ওয়াজিব সাব্যস্ত করা যায়। তাই আমরা বলি সাঈ ওয়াজিব, রুকন নয়।

قوله : ثُمَّ اَقِمْ بِمَكَّةَ الخ : গ্রন্থকার রহ. বলেন সাঈ এরপর ইহরাম অবস্থায় মক্কাতে অবস্থান করবে এবং যখনই ইচ্ছা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করবে। কেননা, তা নামাযের ন্যায়। আর নামাজ সর্বোত্তম ইবাদত তাই তাওয়াফও সর্বোত্তম ইবাদত। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন—

اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ الصَّلَاةُ اِلَّا اَنَّ اللهَ اَحَلَّ فِيْهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فِيْهِ فَلَا يَنْطِقُ اِلَّا بِخَيْرٍ

বায়তুল্লাহর তাওয়াফ হল নামায, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাতে কথা বলা বৈধ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কথা বলবে সে যেন উত্তম কথা বলে। সুতরাং নামাজের ন্যায় যত বারই মন চাইবে ততবারই তাওয়াফ করা যাবে। তবে হা এ তাওয়াফের পর সাঈ নেই। কেননা, সাঈ করা শুধু তাওয়াফে কুদুমের পর একবারই জায়েয। আর ইহরাম খুলবে না। একারণে যে এখনও তার মূল হজ্জ আদায় হয়নি। এজন্য হজ্জের ক্রীয়াকর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার পূর্বে ইহরাম থেকে মুক্ত হবে না। অর্থাৎ এমন কোন কাজ করবে না যাতে ইহরাম শেষ হয়ে যায়।

قوله : ثُمَّ اخْطُبْ الخ : ৭ই জিলহজ্জ জোহরের নামাযের উদ্দেশ্যে খুতবা দেয়া হবে। যাতে হাজীদের হজ্জের যাবতীয় কার্যাদী সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হবে। (অর্থাৎ, মিনায় যাওয়া, আরাফার ময়দানে جمع بين الصلاتين এবং তাতে অবস্থান, মুযদালিফায় আগমন ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করণসহ নিয়ম কানুন শিক্ষা দেওয়া হবে।) হিদায়া গ্রন্থকারের ভাষ্য অনুযায়ী হজ্জে মোট তিনটি খুতবা রয়েছে। (১) ৭ই জিলহজ্জ জুহরের পর (২) ৯ই জিলহজ্জ আরাফার ময়দানে জুহরের নামাযের পর। (৩) ১১ই জিলহজ্জ মিনায় জুহরের পর। সুতরাং প্রথম ও তৃতীয় খুতবাতে মাঝে কোন বৈঠক হবে না, বরং একটি খুতবা হবে। আর আরাফার ময়দানে ৯ই জিলহজ্জ দুটি খুতবা হবে, উভয়টির মাঝে বৈঠক হবে।

ثُمَّ رُحْ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ اِلَى مِنًى ثُمَّ إِلَى عَرَفَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ ثُمَّ اُخْطُبْ ثُمَّ صَلِّ بَعْدَ الزَّوَالِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ بِشَرْطِ الْإِمَامِ وَالْإِحْرَامِ ثُمَّ إِلَى الْمَوْقِفِ وَقِفْ بِقُرْبِ الْجَبَلِ وَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ حَامِدًا مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا مُصَلِّيًا دَاعِيًا ـ

অনুবাদ : অতঃপর ইয়াওমুত তারবিয়া (আটই জিলহজ্জ মক্কা থেকে) মিনাতে যাবে। তারপর আরাফার দিবসের ফজরের নামাজের পর আরাফার দিকে যাবে। অতঃপর খুতবা দিবে তারপর সূর্য হেলে পড়ার পর এক আযানে ও দুই ইকামতে ইমাম ও ইহরামের শর্তে জুহর ও আছর পড়বে। তারপর মাওকাফ এর দিকে যাবে এবং আল্লাহর প্রশংসা, তাকবীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তালবিয়া, নামাজ ও প্রার্থনাকারী অবস্থায় জবলে রহমতের নিকট থামবে। বতনে ওরায়না ছাড়া সমগ্র আরাফা হল উকুফের স্থান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ

قوله : ثُمَّ رُحْ مِنْ مَكَّةَ الخ : ইয়াওমুত তারবিয়া তথা আটই জিলহজ্জ মক্কাতে ফজরের নামায আদায় করে

সূর্যোদয়ের পর মিনার দিকে বের হবে। কেননা, বর্ণিত আছে—

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ رَاحَ اِلٰى مِنًى فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ رَاحَ اِلٰى عَرَفَاتٍ -

'রাসূলুল্লাহ্ সা. ৮ তারিখে মক্কাতে ফজরের নামায পড়েন। অতঃপর যখন সূর্য উদিত হল তখন মিনার উদ্দেশ্যে চললেন এবং সেখানে জুহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং ফজর আদায় করেন। তারপর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।' সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা পরিস্কার হল যে, মক্কাতে ফজর পড়ার পর সূর্যোদয়ের পর মিনার উদ্দেশ্যে বের হওয়াটা সুন্নাত। অনুরূপভাবে মিনাতে ফজরের নামায পড়ে সূর্যোদয়ের পর আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জ আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হবে। আর মক্কা থেকে বের হওয়া এবং মিনা থেকে আরাফার দিকে সূর্যোদয়ের পর বের হওয়া উত্তম। তবে যদি কেহ সূর্যোদয়ের পূর্বে বের হয়ে যায় তবে তা সহীহ। কেননা, মিনায় তার পালনীয় হজ্জের আর কোন বিধি বিধান বাকী নেই। তাই সূর্যোদয়ের পূর্বেও ফজরের নামাজ আদায় করেই আরাফাতে চলে যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

قوله : ثُمَّ اخْطُبْ الخ : ৯ই জিলহজ্জ আরাফায় সূর্য ঢলে পড়লে ইমামুল মুসলিমীন অথবা তার স্থলাভিষিক্ত হাজিদের নিয়ে জুহর নামাজের পূর্বে জুমার ন্যায় দুটি খুতবা দিবেন। উভয় খুতবার মাঝে বৈঠক দ্বারা পৃথক করবেন। ইমাম উক্ত খুতবাতে হজ্জের নিয়মাবলির শিক্ষা দিবেন।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রহ. এর মতে নামাযের পর খুবতা দেয়া হবে। **আমাদের দলিল হল** : হযরত জাবির রাযি. এর হাদীস যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, হুজুর সা. আরাফার ময়দানে জুহরের নামাযের পূর্বে খুতবা দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত খুতবার উদ্দেশ্য হল হজ্জের কার্যাদির শিক্ষা দেয়া। আর উভয় নামাজ একত্রে আদায় করাটা হল হজ্জের কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নামাজের পূর্বে দেয়াতে উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে অর্জিত হয়।

قوله : ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ الزَّوَالِ الخ : আরাফার ময়দানে ইমাম লোকদের নিয়ে জুহরের সময় এক আযান ও দুই ইকামতের সাথে জুহর ও আছর আদায় করবেন। কেননা, অনেক হাদীসে মশহুর দ্বারা তা রাসূলুল্লাহ্ সা. এর আমলরূপে প্রমাণিত। আর উক্ত দু নামাজের জন্য শুধু এক আজানই যথেষ্ট। তা হবে জুহরের নামাজের পূর্বে। আর উভয় নামজের জন্য দুই ইকামত হবে এবং আছরের নামাজের জন্য আযান নেই। একারণে যে হযরত জাবির রায. এর হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ্ সা. এ দুনামায এক আযানে ও দুই ইকামতের সাথে আদায় করেছেন। দ্বিতীয়তঃ আছরের নামাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আদায় করা হচ্ছে এবং সমস্ত লোকজনও উপস্থিত আছেন, তাই পুণঃরায় আযানের কোন প্রয়োজন নেই। শুধু ইকামতই যথেষ্ট।

قوله : ثُمَّ اِلَى الْمَوْقِفِ الخ : ইমাম তার মুসল্লিদের নিয়ে আরাফায় দু নামায একত্রে আদায়ের পর উকুফের স্থানের দিকে যাবেন। এবং জাবালে রহমতের নিকটে অবস্থান নিবেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. উক্ত পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করেছিলেন। তবে হা বাতনে উরায়না ছাড়া আরাফার যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান নেয়া যাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. বাতনে উরায়নাতে অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে ওয়াদিয়ে মুহাসসির ব্যতীত সমগ্র মুযদালিফা উকুফের স্থান।

জ্ঞাতব্য ঃ উকুফে আরাফা হজ্জের রুকনসমূহের অন্যতম রুকন। কেননা, সহীহ হাদীসে এসেছে الحج عرفة। হজ্জ হল উকূফে আরাফা। উকূফে আরাফার জন্য শর্ত হল দুটি। ১টি হল উক্ত অবস্থান আরাফার জমিনে হওয়া। ২য় টি হল তার নির্দিষ্ট সময়ে হওয়া। তবে হা এর জন্য নিয়তের কোন প্রয়োজন নেই। শুধু অবস্থান পাওয়া গেলেই চলবে।

ثُمَّ إلَى مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَانْزِلْ بِقُرْبِ جَبَلِ قُزَحَ وَصَلِّ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَيْنِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ولم تَجُزِ الْمَغْرِبُ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ صَلِّ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قِفْ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُصَلِّيًا مُلَبِّيًا دَاعِيًا وَهِيَ مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ ثُمَّ إلَى مِنًى بَعْدَمَا أَسْفَرَ فَارْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِن بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ كَحَصَى الْخَذْفِ وَكَبِّرْ بِكُلِّ حَصَاةٍ وَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِهَا ثُمَّ اذْبَحْ ثُمَّ احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَالْحَلْقُ أَحَبُّ وَحَلَّ لَكَ غَيرُ النِّسَاءِ -

অনুবাদ : অতঃপর সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় যাবে এবং জবলে কুযাহ এর নিকটে অবতরণ করবে এবং (তথায়) এক আযান ও এক ইকামতে মাগরিব ও ইশার নামায মানুষদেরকে নিয়ে আদায় করবে। তবে রাস্তায় মাগরিবের নামাজ পড়ে নেয়া জায়েয নয়। অতঃপর গলসে (তথা ফজর উদিত হওয়ার পরই অন্ধকারে) ফজরের নামায আদায় করে নেবে। তারপর তাকবীর ও তাহলিল, নবীজী সা. এর উপর দরূদ, তালবিয়া, (নিজ প্রয়োজন নিয়ে প্রভূর কাছে) প্রার্থনা করা অবস্থায় উকূফ তথা অবস্থান করবে। আর সমগ্র মুযদালিফা উকুফের স্থান তবে বাতনে মুহাস্সার ছাড়া। (কেননা, তাতে অবস্থান করা নিষিদ্ধ)। অতঃপর পরিস্কার হলে (সূর্য উদিত হলে) মিনাতে চলে যাবে এবং বাতনে ওয়াদী থেকে জামরাতুল আকাবায় আঙ্গুলের মাথায় রেখে ছুড়ে মারার মতো ছোট ছোট সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে এবং প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপে তাকবীর বলবে এবং প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথে তলবিয়া পাঠ করা বন্ধ করে দিবে। তারপর কুরবানী করবে। অতঃপর মাথা মুন্ডাবে বা ছাটবে এবং মাথা মুন্ডানো উত্তম এবং তোমার জন্য স্ত্রী সহবাস ছাড়া সব কিছু হালাল হল।

শব্দার্থ : قُزَحْ শব্দের ق বর্ণে পেশ ও ز বর্ণে যবর। অর্থ- উঁচু। উক্ত পাহাড়টি উঁচু হওয়াতে তাকে قزح করে নাম করণ করা হয়েছে। غَلَسْ অন্ধকার, শেষ রাতের অন্ধকার। حَصًى - কঙ্কর, পাথর, নুড়ি। اَلْخَذْفُ আঙ্গুল দিয়ে নিক্ষেপ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : ثُمَّ اِلَى مُزْدَلِفَةَ الخ : ৯ই জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর মাগরীবের নামায না পড়েই ইমাম ও হাজীগণ সবই ধীরস্থীরভাবে চলে মুযদালিফায় পৌছবে। কেননা, রাসূল সা. সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত এতে কাফিরদের বিরুধীতা প্রকাশ পায়। কারণ, তারা জাহেলী যুগে সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফা থেকে রওয়ানা হতো।

قوله : وَانْزِلْ بِقُرْبِ جَبَلِ الخ : মুযদালিফায় এসে হাজীদের জন্য মুস্তাহাব হলো জবলে কুযাহ এর নিকটবর্তী হওয়া। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. এ পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করেছিলেন। হযরত উমর রাযি. ও এ পাহাড়ের নিকটে অবস্থান করেছিলেন। তবে তা চলাচলের পথে অবস্থান না করা, কেননা, এতে পথচারীদের কষ্ট হয়।

قوله : وَصَلِّ بِالنَّاسِ الخ : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী ইমাম মুযদালিফায় পৌছে হাজীদের নিয়ে ইশার সময়ে এক আযানে ও এক ইকামতে মাগরীব ও ইশার নামায আদায় করবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার রহ. আরাফায় জুহর ও আছরের উপর কিয়াস করে বলেন উভয় নামাজের জন্য এক আযান ও দুই ইকামত হতে হবে। ইমাম তাহাবী রহ. এর অভিমত ও অনুরূপ।

আমাদের দলিল হল : হযরত জাবির রাযি. এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. মুযদালিফায় মাগরীব ও ইশার নামায এক আযান ও এক ইকামতে আদায় করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ইশার নামায তার নিজ ওয়াক্ত

অনুযায়ী আদায় করা হচ্ছে। তাই লোকদের অবহিত করার জন্য আলাদা করার জন্য আলাদা ইকামতের প্রয়োজন নেই। তবে আরাফার ময়দানে যেহেতু আছরের নামায তার ওয়াক্তের পূর্বে পড়া হয়েছে তাই ইকামতের মাধ্যমে লোকদেরকে অতিরিক্ত সতর্ক করানো হয়েছে। সুতরাং উভয় নামাযের জন্য এক আযান ও এক ইকামতই যথেষ্ট।

قوله : وَلَمْ يَجُزِ الْمَغْرِبُ الخ : যদি মুযদালিফায় পৌঁছার পূর্বে মাগরিবের নামায আদায় করে নেয়া হয় তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ এর মতে সূর্য উদিত হওয়ার আগে আগেই তা পুনরায় আদায় করতে হবে এবং এ আদায় করাটা উক্ত ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে যদি রাস্তায় কেহ আদায় করে নেয়, তবে সে গুনাহগার হবে। তবে তার এ আদায় করাটা সহীহ হবে। কেননা, উক্ত ব্যক্তি মাগরিবের নামায তার ওয়াক্ত মত আদায় করেছে। আর যে ব্যক্তি নামাজ তার ওয়াক্ত মত আদায় করে তার উপর পুনরায় আদায় করাটা ওয়াজিব হবে না। তবে হ্যা এস্থানে মাগরীবকে বিলম্বে আদায় করা সুন্নাত। সুতরাং এর ব্যতিক্রম করাতে সে গুনাহগার হবে।

ইমাম আবু হানিফা রাযি. ও মুহাম্মদ রহ. এর দলিল আরাফাতে ও মুযদালিফায় যাওয়ার পথে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রহ. রাসূলুল্লাহ্ সা. কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মাগরিবের নামায পড়ে নিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করলেন- اَلصَّلٰوةُ اَمَامَكَ নামায তোমার সম্মুখে, অর্থাৎ মুযদালিফায়। উক্ত হাদীস প্রমাণিত করে যে, মাগরিবের নামায বিলম্বে পড়া ওয়াজিব। তার কারণ হল যাতে মুযদলিফায় জমে বাইনাস সালাতাইন পাওয়া যায়। সুতরাং এই দুই নামায একত্রে আদায়ের জন্য ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পুনরায় আদায় করাটা ওয়াজিব করা হয়েছে। তবে ফজর উদিত হয়ে গেলে যেহেতু এ দুনামাজ একত্রিত করা সম্ভব নয়, কাজেই ফজর উদিত হয়ে গেলে তা পুনরায় পড়াকে রহিত করা হল।

قوله : ثُمَّ صَلِّ الْفَجْرَ الخ : ১০ই জিলহজ্জ ফজর উদিত হলে ইমাম হাজীদেরকে নিয়ে غلس তথা অন্ধকারেই ফজরের নামায আদায় করবেন। কেননা, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ صَلَّاهَا يَوْمَئِذٍ بِغَلَسٍ রাসূল সা. সেদিন ফজরের নামাজ অন্ধকারেই পড়ে ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ মুযদালিফায় ফজরের নামাজ অন্ধকারে পড়া হয় মুযদালিফায় অবস্থানের প্রয়োজনের তাগিদে। তাই অন্ধকারেই ফজরের নামায পড়া হয়।

قوله : وَقِفْ مُكَبِّرًا الخ : যদি সম্ভব হয় তবে জবলে কুযাহে অবস্থান করবে। নতুবা তার সন্নিকটে অবস্থান করবে এবং তাকবীর, তাহলীল, দুরূদ শরীফ, তালবিয়া ও নিজের জন্য যত খুশী দোয়া করবে। কেননা, এখানে দোয়া কবুল করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সা. এস্থানে দোয়া করেছিলেন। আর হা মুযদালিফার সমস্ত স্থানেই উকূফ করা যাবে তবে বাতনে মুহাসসিরে অবস্থান করা যাবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. এখানে অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ আমাদের মাযহাব মতে উকুফে মুযদালিফা ওয়াজিব রুকন নয়। সুতরাং যদি কেহ তা উজর ব্যতীত ছেড়ে দেয় তবে তার উপর দম (কুরবানি) ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, মুযদালিফায় অবস্থান করা রুকন। তিনি দলিল পেশ করেন, কুরআনের আয়াত দ্বারা—

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ -

উক্ত আয়াতে মাশআরুল হারামে জিকির করার নির্দেশ করা হয়েছে। আর মাশআরুল হারাম হল মুযদালিফা। সুতরাং যদি মুযদালিফায় অবস্থান করা না হয় তবে জিকির করা যাবে না। তাই মুযদালিফায় অবস্থান করাটা রুকন হিসাবে সাব্যস্ত হল। আমাদের দলিল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা. তার পরিবারের লোকদেরকে

রাত্রেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে এনির্দেশও দিয়েছিলেন যে, তারা যেন সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত জামারাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ না করে। সুতরাং যদি মুযদালিফায় অবস্থান করা রুকন হতো তবে রাসূল সা. এমনটি করতেন না। কেননা, উজরের কারণে রুকন স্থগিত হয় না।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর উল্লেখিত দলিলের জবাব হল, আয়াতে জিকির উল্লেখ আছে, আর একথার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত যে, জিকির রুকন নয়। সুতরাং জিকির যার উপর মাওকূফ তা রুকন হতে পারে না। তবে অন্যান্য হাদীস দ্বারা মুযদালিফায় অবস্থান করাটা ওয়াজিব প্রমাণিত।

قوله : ثُمَّ اِلَى مِنَى الخ : অতঃপর ১০ই জিলহজ্জ সূর্য উদিত হওয়ার পর ইমাম ও লোকেরা মুযদালিফা থেকে মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবে এবং বাতনে ওয়াদির দিক থেকে জামরাতুল আকাবাতে আঙ্গুলের মাথায় রেখে ছুঁড়ে মারার মতো ছোট ছোট সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. যখন মিনাতে আগমন করলেন তখন জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত কোথায়ও নামেন নি এবং তিনি বলেছেন-

عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ لَايُؤْذِى بَعْضُكُمْ بَعْضًا

তোমারা আঙ্গুলের মাথায় রেখে ছোড়ে মারার মত ছোট ছোট কঙ্কর নাও, যাতে তোমাদের একে অপরকে আঘাত না দেয়।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ রমী বা কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হলো ইয়াওমুননাহার ও পরবর্তী দিন। আর তিনটি জামারায় নিক্ষেপ করতে হয় তা হল জামারাতুল আকাবা, মাসজিদুল খায়েফ, জামারাতুল ওসতা, সুতরাং প্রথম দিন শুধু জামারায়ে আকাবাতে রমী করবে। আর বাকি দিনগুলোতে তিনটি জামারায় নিক্ষেপ করবে। উক্ত স্থানসমূহে পাথর নিক্ষেপের পদ্ধতি হল ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পিঠে রেখে শাহাদাত আঙ্গুলের সাহায্যে তা নিক্ষেপ করবে। এবং প্রতিটিতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হবে। আর ঐ কঙ্কর সংগ্রহ করবে জামারার আশপাশ ব্যতীত অন্য স্থান থেকে। কেননা, তার আশপাশ থেকে সংগ্রহ করা মাকরূহ। আর উক্ত কঙ্করগুলি আঙ্গুল পরিমাণ বড় হবে।

قوله : وَكَبِّرْ بِكُلِّ حَصَاةٍ الخ : প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর পাঠ করবে। কেননা, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. ও ইবনে উমর রাযি. এর হাদীসে তাকবীর বলার কথা উল্লেখ আছে। আর হাজীগণ জামারায়ে আকাবাতে বিলম্ব করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. এস্থানে বিলম্ব করেন নি। আর প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের পর থেকে তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করে দিবে। কেননা, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে তাই বর্ণিত। অনুরূপ হযরত জাবির রাযি. বর্ণনা করেন—

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ اَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَى بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

রাসূলুল্লাহ্ সা. জামারাতুল আকাবায় প্রথম কঙ্করটি নিক্ষেপের সময় তালবিয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

قوله : ثُمَّ اذْبَحْ الخ : জামারাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর আগ্রহ থাকলে কুরবানী করবে। অতঃপর মাথা মুন্ডাবে বা চুল ছাটবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন-

اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِى يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نَرْمِىَ ثُمَّ نَذْبَحَ ثُمَّ نَحْلِقَ -

আজকের দিনে তথা কুরবানীর দিনে আমাদের প্রথম কাজ হল কঙ্কর নিক্ষেপ করা, অতঃপর কুরবানী করা তারপর মাথা মুন্ডানো। দ্বিতীয়ত মাথা মুন্ডানো বা কুরবানী করা, ইহরাম মুক্ত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। তাই এগুলোর মাধ্যমে ইহরাম ত্যাগ করবে। মাথা ছাটার চেয়ে মুন্ডানো উত্তম। কেননা, বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে,

রাসূল সা. ইরশাদ করেন—

اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ -

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সা. তিনবার মাথা মুন্ডানোওয়ালাদের জন্য দোয়া করেছেন যা উক্ত আমল অধিক উত্তম হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল। দ্বিতীয়তঃ হলকের দ্বারা শরীর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা উদ্দেশ্য। সুতরাং উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে হলকই কার্যকর।

قوله : وَحَلَّ لَكَ غَيْرُ النِّسَاءِ الخ : মাথা মুন্ডানো বা ছাটার পর থেকে ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ সব কিছু মুহরিমের জন্য হালাল। তবে সহবাস বা সহবাসের দিকে আকর্ষণীয় কর্ম ছাড়া। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রহ. এর মতে সুগন্ধি ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। কারণ তাও সহবাসের দিকে আকর্ষণীয়। আমাদের দলিল হল রাসূল সা. এর বাণী- حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا النِّسَاءَ -স্ত্রী সহবাস ছাড়া (মাথা মুন্ডানোর পর) মুহরিমের জন্য সব কিছু হালাল হয়ে গেছে। আমাদের মাযহাব মতে লজ্জাস্থান ছাড়া স্ত্রীর অন্য অঙ্গ থেকে স্বামী উপভোগ করতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে তা হালাল।

আমাদের দলিল হল- লজ্জাস্থান ছাড়াও অন্যভাবে স্ত্রীর সাথে সহবাস শাহাওয়াত পুরণের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পূর্ণ হালাল হওয়া তথা তাওয়াফের পর পর্যন্ত তা বিলম্বিত করা হবে।

ثُمَّ إِلَى مَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ غَدًا أَوْ بَعْدَهُ فَطُفْ لِلرُّكْنِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بِلَا رَمَلٍ وَسَعْيٍ إِنْ قَدَّمْتَهُمَا وَإِلَّا فُعِلَا وَحَلَّ لَكَ النِّسَاءُ وَكُرِهَ تَأْخِيرُهُ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ثُمَّ إِلَى مِنًى فَارْمِ الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي ثَانِي النَّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ بَادِيًا بِمَا تَلِي الْمَسْجِدَ ثُمَّ بِمَا تَلِيهَا ثُمَّ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَقِفْ عِنْدَ كُلِّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ ثُمَّ غَدًا كَذٰلِكَ ثُمَّ بَعْدَهُ كَذٰلِكَ إِنْ مَكَثْتَ وَلَوْ رَمَيْتَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ قَبْلَ الزَّوَالِ صَحَّ وَكُلُّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَارْمِ مَاشِيًا وَإِلَّا فَرَاكِبًا وَكُرِهَ أَنْ تُقَدِّمَ ثَقَلَكَ إِلٰى مَكَّةَ وَتُقِيمَ بِمِنًى لِلرَّمْيِ ثُمَّ إِلَى الْمُحَصَّبِ فَطُفْ لِلصَّدْرِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَهُوَ وَاجِبٌ اِلَّا عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ اشْرَبْ من زَمْزَمَ وَالْتَزِمِ الْمُلْتَزَمَ وَتَشَبَّثْ بِالْأَسْتَارِ وَالْتَصِقْ بِالْجِدَارِ -

---

অনুবাদ : অতঃপর কুরবানীর দিন কিংবা তারপরের দিন কিংবা তার পরবর্তী দিন মক্কাতে গমন করবে এবং সাত চক্কর বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করবে। রমল বা সা'ঈ ছাড়া যদি পূর্বে (তথা তাওয়াফে কুদুমের পর) করে থাকে। নতুবা (পূর্বে সাফা ও মারওয়াতে সাঈ না করলে) রমল ও সাঈ করবে। আর (এ তাওয়াফের পর) তোমার জন্য স্ত্রী সহবাস হালাল হল। আর কুরবানীর এ দিনগুলো থেকে তাওয়াফে জিয়ারতকে বিলম্ব করা

মাকরূহ। অতঃপর মিনাতে গমন করে কুরবানির দিনগুলোর দ্বিতীয় দিনে সূর্য হেলে পড়ার পর তিনটি জামারায় মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী জামারায় শুরু করা অবস্থায় অতঃপর তার নিকটবর্তী জামারায় তৎপর জামারায়ে আকাবায় رمى তথা কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। এবং প্রত্যেক ঐ রমীর সময় থামবে যার পরে পুণর্বার রমী রয়েছে। অতঃপর পরের দিন (সূর্য হেলে পড়ার পর) অনুরূপ (রমী) করবে। তারপর অবস্থান করলে পরের দিন (তথা চতুর্থ দিন) অনুরূপ (রমী) করবে। আর যদি তুমি চতুর্থ দিন সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে রমি কর তবে তা সহীহ। আর যে রমীর পর আরেকটি রমী রয়েছে সে ক্ষেত্রে হাটা অবস্থায় রমী করবে। নতুবা আরোহী অবস্থায় রমী করবে। আর তোমাদের মালামাল আগে মক্কাতে পাঠিয়ে দেয়া এবং তুমি রমীর জন্য মিনায় অবস্থান করা মাকরূহ। তারপর (মক্কাতে রওয়ানা হলে) মুহাসসাবে যাবে এবং বায়তুল্লাহর সাত চক্কর তাওয়াফে সদর কর এবং তা ওয়াজিব। তবে মক্কাবাসীদের উপর এ তাওয়াফ ওয়াজিব নয়। অতঃপর জমজমের পানি পান করবে। তারপর মূলতাযিমকে আঁকড়ে ধরবে। বায়তুল্লাহর গিলাফ জড়িয়ে ধরবে এবং দেয়ারের সাথে মিশে মিশে থাকবে।

শব্দার্থ ঃ مَايَلِيَ পরবর্তী। ثِقْلٌ ওজন, বোঝা। تَشَبَّثَ - تفعل থেকে تَشَبُّثًا - এটে লেগে থাকা, আঁকড়ে ধরা। اِلْتَصَقَ - افعال থেকে اِلْتِصَاقًا - মিশে থাকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : ثُمَّ اِلَى مَكَّةَ الخ : গ্রন্থকার রহ. বলেন, কুরবানীর দিবসে কঙ্কর নিক্ষেপ, মাথা মুন্ডানো এবং জবাই করার পর সেদিন অথবা এগারো তারিখ, কিংবা বার তারিখ মক্কা শরীফ গমন করবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করবে। আর এ তাওয়াফকে তাওয়াফে জিয়ারত বলে তা হজ্জের অন্যতম রুকন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. মাথা মুন্ডানোর পর বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করেন। অতঃপর মিনায় গমন করেন ও সেখানে জুহরের নামায আদায় করেন। আর যদি হাজী তাওয়াফে কুদুমের পর সা'ঈ করে থাকে তবে উক্ত তাওয়াফে রমল করবে না এবং সা'ঈ তার উপর ওয়াজিব নয়। আর যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সা'ঈ করে না তবে উক্ত তওয়াফে রমল করবে এবং সাফা মারওয়াতে সা'ঈ করবে। কেননা, সা'ঈ শরীয়তে একবারই প্রমাণিত। আর এমন তাওয়াফে রমল হয় যে তাওয়াফের পর সা'ঈ রয়েছে। আর উক্ত তাওয়াফে জিয়ারত হজ্জের রুকন। কেননা, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন— وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ 'তোমরা যেন প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ কর' এ আয়াতে এ তাওয়াফেরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ তাওয়াফের অপর নাম— طواف الافاضة বা طواف يوم النحر - এ তাওয়াফের পর স্ত্রী সহবাসও হালাল হয়ে গেল। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ ইহরাম ভঙ্গ হয়ে গেল। সুতরাং হাজী আর মুহরিম নন।

قوله : وَكُرِهَ تَاخِيْرُهُ الخ : তাওয়াফে জিয়ারতকে কুরবানীর দিনগুলো থেকে বিলম্ব করা মাকরূহ। কেননা, তাওয়াফে জিয়ারত কুরবানীর দিনগুলোর সাথে নির্দিষ্ট। তবে মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও কেহ এ তাওয়াফকে উক্ত দিনগুলো থেকে বিলম্ব করে ফেলে তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তার উপর দম (কুরবানী) ওয়াজিব হবে।

قوله : ثُمَّ اِلَى مِنَى الخ : গ্রন্থকার রহ. বলেন, তাওয়াফে জিয়ারতের পর মিনায় যেয়ে অবস্থান নিবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. তাওয়াফে জিয়ারতের পর মিনায় চলে যান এবং সেখানে জুহরের নামায আদায় করেন। দ্বিতীয়ত হাজীর উপর এখনও কঙ্কর নিক্ষেপ বাকী রয়েছে। সুতরাং তা পূর্ণ করতে হলে মিনায় যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। মিনায় অবস্থান নেয়ার পর ১১ই জিলহজ্জ সূর্য হেলে পড়ার পর তিনটি কঙ্কর জামারায় নিক্ষেপ করবে এবং তা শুরু করবে মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী জামারা থেকে। তাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপে আল্লাহু আকবার বলবে। প্রথম জামারায় নিক্ষেপের পর একটু থামবে। অতঃপর দ্বিতীয় জামারা যা

প্রথমটির নিকবর্তী তাতেও সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপে আল্লাহু আকবার বলবে। অনুরূপ জামারায়ে আকাবায়ও কঙ্কর নিক্ষেপ করবে এবং প্রতিটিতে আল্লাহু আকবার বলবে। অতঃপর সেখানে আর থামবে না।

قوله : ثُمَّ غَدًا كَذَالِكَ الخ : কুরবানীর দিনগুলোর তৃতীয় দিবস তথা ১২ই জিলহজ্ব সূর্য ঢলে পড়ার পর হাজ্বী পূর্ব বর্ণিত তিনটি জামারায় رمى করবে। অতঃপর হাজ্বী তাড়াতাড়ি করতে চাইলে رمى এর পরই মক্কাতে চলে যাবে। আর যদি তথায় অবস্থান করে তবে ১৩ তারিখে সূর্য হেলে পড়ার পর পূর্বের ন্যায় رمى করবে। আর যদি কেহ ১৩ তারিখ সূর্য হেলে পড়ার আগেই নিক্ষেপ করে নেয় তবে তা সহীহ। ১২ তারিখ চলে যেতে চাইলে অনুমতি আছে। একারণে যে আল্লাহ তা'আলার বাণী— فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ الخ উক্ত আয়াতে দুদিনের মাথায় চলে যাওয়াতে তার কোন গুনাহ নেই এবং বিলম্ব করাতেও কোন গুনাহ নেই বলা হয়েছে। তবে ১৩ তারিখ সূর্য হেলে পড়ার পর رمى করে যাওয়াটা ভাল। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. চতুর্থ দিন পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করেছেন।

قوله : وَكُلُّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ الخ : গ্রন্থকার রহ. উক্ত ইবারতে একটি মূলনীতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তা হল প্রত্যেক ঐ রমী যার পরে রমী রয়েছে তা পায়ে হেটে করা উত্তম। আর প্রত্যেক ঐ রমী যার পরে রমী নেই তা আরোহণ অবস্থায় করা উত্তম। অর্থাৎ কুরবানীর দিন জামারায়ে আকাবাতে আরোহন অবস্থায় আর সর্বশেষ রমীতে আরোহণ অবস্থায় রমী করা ভাল। কারণ তারপরে আর কোন রমী নেই। তা ছাড়া বাকীগুলোতে পায়ে হেটে করা উত্তম। তাতে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের অধিকতর নিকটবর্তী।

قوله : وَكُرِهَ اَنْ تُقَدِّمَ الخ : গ্রন্থকার রহ. বলেন, স্বীয় মালামাল মক্কাতে আগেই পাঠিয়ে দেয়া এবং رمى এর জন্য মিনায় অবস্থান করা মাকরূহ। কেননা, হযরত উমর রাযি. এরকম করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং এজন্য শাস্তি দিতেন। দ্বিতীয়ত এরকম করাতে তার মন তার মালামালের দিকে ধাবিত থাকবে, যার ফলে তার মন থেকে একাগ্রতা শেষ হয়ে যাবে।

قوله : ثُمَّ اِلَى الْمُحَصَّبِ الخ : মিনায় রমী করার পর মক্কাতে চলে আসতে মুহাসসাবে অবতরণ করবে। (মুহাসসাব হল মক্কা ও মিনার মাঝামাঝি একটি কঙ্করময় স্থানের নাম। এস্থানটি মক্কার তুলনায় মিনার অধিক নিকটে।) এ স্থানে অবতরণের কারণ হল রাসূলুল্লাহ্ সা. মিনায় তার সাহাবীদেরকে বলেছিলেন আমরা আগামীকাল খায়ফে মুহাসসাবে অবতরণ করব। কথা মতো রাসূলুল্লাহ্ সা. এস্থানে অবতরন করেছিলেন। সুতরাং এস্থানে অবতরণ করা সুন্নাত।

قوله : فَطُفْ لِلصَّدَرِ الخ : হাজী সর্বশেষ মিনা থেকে মক্কাতে পৌছলে কাবা শরীফের তাওয়াফ করবে। তবে হা এতাওয়াফে رمل করবে না। কেননা, রমল একবারই ওয়াজিব। উক্ত তাওয়াফকে طواف صدر (প্রত্যাবর্তনের তাওয়াফ) বলা হয়। যেহেতু হাজ্বী এ তাওয়াফের পর বায়তুল্লাহ্ থেকে প্রত্যাবতর্ন করেন। কেননা, তার পরে হাজ্বীগণ বিদায় নিয়ে চলে যান। মক্কাবাসীরা যেহেতু প্রত্যাবর্তন করে না কাবা শরীফ থেকে বিদায়ও নেয় না তাই তাদের ক্ষেত্রে উক্ত তাওয়াফ নেই। মোটকথা, আমাদের মাযহাব মতে উক্ত তাওয়াফ বহিরাগতদের উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে তা সুন্নাত।

আমাদের দলিল হল রাসূলুল্লাহ্ সা. এর বাণী—

مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهٖ بِالْبَيْتِ الطَّوَافُ -

যে কেহ বায়তুল্লাহর হজ্ব করবে তার বায়তুল্লাহর সাথে শেষ সাক্ষাৎ যেন হয় তাওয়াফের মাধ্যমে। উক্ত হাদীসে فليكن নির্দেশ জ্ঞাপক শব্দ এসেছে যা امر এর সিগাহ যা ওয়াজিব বুঝায়। দ্বিতীয়তঃ উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সা. ঋতুবতী মহিলার জন্য তা রুখসাত দিয়েছেন, যাতে বুঝা যায় যে, তা ওয়াজিব। অন্যথায় তার রুখসাত দেয়ার অর্থ কি?

قوله : ثُمَّ اشْرَبَ الخ : তাওয়াফে সদর শেষ করে হাজী জমজমের পানি পান করবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. নিজেই বালতি দ্বারা পানি তুলেছেন এবং পান করেছেন। অতঃপর বালতির অবশিষ্ট পানি কূপে ফেলে দিয়েছেন। হাজী জমজমের পানি পান করার পর তার জন্য মুস্তাহাব হলো বায়তুল্লাহর দরজার চৌকাঠ চুম্বন করা। এবং মুলতাযীমে (যা হাজরে আসওয়াদ ও কাবা শরীফের দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত) স্বীয় বুক ও চেহারা লাগাবে এবং বায়তুল্লাহর গিলাফ জড়িয়ে ধরবে। অতঃপর নিজ ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করবে।

فَصْلٌ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنَ الزَّوَالِ إِلَى فَجْرِ النَّحْرِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَلَوْ جَاهِلًا أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَوْ أَهَلَّ عَنْهُ رَفِيقُهُ بِإِغْمَائِهِ صَحَّ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ غَيْرَ أَنَّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا لَا رَأْسَهَا وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا وَلَا تَرْمُلُ وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ وَلَا تَحْلِقُ رَأْسَهَا وَلَكِنْ تُقَصِّرُ وَتَلْبَسُ الْمَخِيطَ وَمَنْ قَلَّدَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا أَو نَذْرًا أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ أَو نَحْوَهُ وَتَوَجَّهَ مَعَهَا يُرِيدُ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ فَإِنْ بَعَثَ بِهَا ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَيْهَا لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا حَتَّى يَلْحَقَهَا إِلَّا فِي بَدَنَةِ الْمُتْعَةِ فَإِنْ جَلَّلَهَا أَو أَشْعَرَهَا أَوْقَلَّدَ شَاةً لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا وَالْبُدْنُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ -

---

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : যে মুহরিম মক্কাতে প্রবেশ করে নাই এবং আরাফাতে (আমাদের পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুসারে) অবস্থান করে তবে তার থেকে তাওয়াফে কুদুম রহিত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি আরাফাতে (নয় তারিখ) সূর্য হেলে পড়া থেকে কুরবানীর ফজর পর্যন্ত সময় থেকে কোন এক সময় অবস্থান করে নেয় তবে তার হজ্জ পূর্ণ হল। যদিও সে (ইহা আরাফা হওয়ার ব্যাপারে) অজ্ঞ কিংবা ঘুমন্ত অথবা বেহুশ অবস্থায় হয়। যদি তার অজ্ঞানতায় তথা অজ্ঞান অবস্থায় তার বন্ধু তালবিয়া পাঠ করে ইহরাম বেধে নেয়, তবে তা সহীহ। (এ সকল বিষয়াদিতে) স্ত্রীলোক পুরুষের অনুরূপ। তবে সে তার চেহারা খোলা রাখবে এবং মাথা খোলা রাখবে না। উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে না। তাওয়াফে রমল করবে না (সাফা মারওয়াতে সা'ঈ করতে) চুল মুন্ডন করবে না, বরং ছাটবে। সেলাই করা কাপড় পরিধান করবে। যে ব্যক্তি উটনিকে কালাদা (কুরবানীর পুশর চিহ্ন) পরান নফল কিংবা মান্নত অথবা শিকারের ক্ষতিপূরণ বা তার মতো অন্য কোন উদ্দেশ্যে এবং তা নিয়ে হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল তবে তার ইহরাম হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। যদি উক্ত পশুকে প্রেরণ করে দেয় অতঃপর রওয়ানা হয় তবে সে উক্ত পশুর সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সে মুহরিম হবে না। তবে হজ্বে তামাত্তু এর উটনী এর ব্যতিক্রম। (কেননা, সে ক্ষেত্রে রওয়ানা দেয়ার সাথে সাথে সে মুহরিম হয়ে যায়।) যদি কেহ প্রাণীকে চট পরিয়ে দেয় কিংবা কোঁজ আচরে কেটে দেয় কিংবা বকরীর গলায় কালাদা ঝুলিয়ে দেয় তাহলে সে মুহরিম হবে না। আর বুদনা হল উট এবং গরু থেকে।

শব্দার্থ : جَلَّلَ - تفعيل থেকে। تَجْلِيْلٌ আবৃত করা, চট পরিয়ে দেয়া। اَشْعَرَ- افعال থেকে اِشْعَارٌ কোজ আচড় কেটে দেয়া, পতিক গ্রহণ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله : مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْمَكَّةَ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. উক্ত অনুচ্ছেদে কিছু বিচ্ছিন্ন মাসআলা মাসাইল নিয়ে আলোচনা করতেছেন। তা থেকে প্রথমটি হল : যদি মক্কার বহিরাগত কেহ মক্কায় না পৌছে সোজা আরাফায় চলে যায় এবং যথারীতি আরাফায় অবস্থান করে তবে তার থেকে তাওয়াফে কুদুম রহিত হয়ে যাবে। কেননা, তাওয়াফে কুদুম এভাবে শরীয়তে প্রবর্তীত হয়েছে যে, তার উপর হজ্জের সকল ক্রিয়াকর্ম আবর্তিত। সুতরাং তা পরবর্তীতে করলে হবে না। কেননা, তাওয়াফে কুদুম সুন্নাত।

قوله : وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ الخ : মাসআলা হল আরাফার ময়দানে ৯ তারিখ সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে ১০ জিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোন সময় কিছু সময় আরাফায় অবস্থান করতঃ চলে গেলে তার আরাফায় অবস্থান করাটা সহীহ। অর্থাৎ তার হজ্জ সহীহ। তবে ইমাম মালিক রহ. এর মতে ৯ই জিলহজ্জ এর সূর্যাস্তের পর অর্থাৎ রাত্রেরও কিছু সময় আরাফায় অবস্থান করা আবশ্যক। নতুবা আরাফা পালন হবে না। আমাদের দলিল হল— রাসূলুল্লাহ্ সা. এর হাদীস—

اَلْحَجُّ عَرَفَةٌ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

হজ্ব হল আরাফায় অবস্থান। সুতরাং যে ব্যক্তি রাত্রের বা দিনের কিছু সময় আরাফায় অবস্থান করল তবে তার হজ্ব পূর্ণ হল।

উক্ত হাদীসে ব্যবহৃত او। অব্যয়টি ইচ্ছা প্রদানমূলক অর্থে এসেছে। সুতরাং উকুফ দিনে হউক বা রাতে হউক উভয় অবস্থায় হজ্ব পূর্ণ হবে। এতে কোন কিছু শর্ত করা হয় নি।

قوله : وَلَوْ جَاهِلًا الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. এখান থেকে ইঙ্গিত করতেছেন যে, আরাফায় অবস্থানের জন্য নিয়াতের প্রয়োজন নেই। তাই যদি কেহ না জেনেই আরাফা হয়ে অতিক্রম করে তবে তার আরাফা পালন তথা আরাফায় অবস্থান করা হয়ে যাবে।

قوله : وَلَوْ اَهَلَّ عَنْهُ الخ : হজ্বের সময়ে যদি কেহ অজ্ঞান হয়ে যায় আর তার সফরসঙ্গীরা তার পক্ষ থেকে ইহরাম বেধে দেয় তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তা জায়েয। এভাবে যে সফর সঙ্গীর ইহরাম হবে মূল হিসেবে। আর অজ্ঞান ব্যক্তিকে বেধে দেয়া ইহরাম হবে নৈকট্যের ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন রহ. এর মতে তার এ ইহরাম বেধে দেয়াটা জায়েয হবে না।

সাহেবাইনের দলিল হল : সে তো নিজে ইহরাম বাধেনি। আর নৈকট্যতার ভিত্তিতে তার সফর সঙ্গীদেরকেও বেধে দেয়ার নির্দেশ করেনি। স্পষ্টভাবেও নয় আবার লক্ষণগতভাবেও নয়। লক্ষণগতভাবে নয় এভাবে যে, সে যে বিষয়ে নির্দেশ দিবে তা প্রথমত নিজে জানা থাকা জরুরী। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে অন্যজনে ইহরাম বেধে দেয়ার দ্বারা তা জায়েয হয় যে প্রথমত সে নিজে জানতে হবে। অথচ এ মাসআলা অনেক ফকীহদেরও জানা নেই। অতএব, তার সফরসঙ্গীদেরকে উক্ত ইহরাম বেধে দেয়ার পিছনে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নি বিধায় ইহরাম বেধে দেয়াটা সহীহ হয়নি। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল—যখন উক্ত ব্যক্তি তার কতিপয় সফরসঙ্গীর সাথে বের হল এবং একই বন্ধনে আবদ্ধ হল, তখন উক্ত ব্যক্তি ঐ সকল বিষয়ে তাদের আশা পোষণ করে যেসব বিষয়ে সে অক্ষম। আর উক্ত সফরের মূল উদ্দেশ্যই হলো ইহরাম। অতএব, যখন সে ইহরাম বাধতে অক্ষম হল তখন সে লক্ষণগতভাবে তাদের সাহায্য কামনা করতেছে। সুতরাং লক্ষণগত অনুমতি বা নির্দেশের বিষয়টি প্রমাণিত হল। এরই ভিত্তিতে তার অজ্ঞান অবস্থায় অন্য সফরসঙ্গী তাকে ইহরাম বেধে দিলে তা সহীহ হবে। সাহেবাইন রহ. এর বর্ণিত লক্ষণগত অনুমতির জন্য বিষয়টি নিজে জানা থাকা জরুরী। একথার জবাব এভাবে যে এখানে বিষয়টি হল সফরসঙ্গীদের কাছ থেকে নিজের অক্ষমতার সময় সাহায্য চাওয়া আর এ বিষয় তো সবারই জানা। বিধায় লক্ষণগত অনুমতির জন্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করার কোন কিছু বাকী নেই।

قوله : وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ : হজ্বের সকল কার্যাবলীতে স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায়। কেননা, আল্লাহর বাণী— وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الخ উক্ত আয়াতে الناس শব্দটি পুরুষ ও মহিলাকে সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে সতর বা অন্য কোন কারণের মধ্যে বিঘ্নতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় কিছু কিছু বিষয়ে ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন মাথা খোলা রাখা জায়েয নেই। কেননা, তা সতরের অন্তর্ভুক্ত। তবে মুখ খোলা রাখবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا স্ত্রীলোকের ইহরাম হল তার চেহারার মধ্যে।

অনুরূপ স্ত্রীলোকগণ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে পারবে না। এতে ফিতনার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তেমনিভাবে স্ত্রীলোকেরা তাওয়াফে রমল করতে পারবে না এবং সাফা ও মারওয়াতে সা'ঈ করতে উভয় মিলের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াতে পারবে না। কেননা, উভয়টিই সতর ঢেকে রাখতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে স্ত্রীলোকেরা মাথা মুন্ডাতে পারবে না। তবে তা ছাটতে পারবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. স্ত্রীলোকদেরকে মাথা মুন্ডাতে নিষেধ করেছেন। দ্বিতীয়ত এতে মুছলার (বিকৃতির) পর্যায়ে হয়ে যায় যা নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকগণ সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করবে। কেননা, সেলাই বিহীন কাপড় পরাতে সতল ঢাকার মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। অথচ সতর ঢাকা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে ভিড় থাকলে হজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে না। কেননা, এতে পুরুষের সাথে মাখামাখির সম্ভাবনা রয়েছে।

قوله : وَمَنْ قَلَّدَ الخ : যদি কেহ নিজ উটনির গলায় কালাদা পরিয়ে দেয়, চাই তা নফলের কিংবা মান্নতের অথবা পূর্বের ইহরামের শিকারের ক্ষতিপূরণের কিংবা অন্য কোন কারণে হউক তা নিয়ে মক্কাতে প্রবেশ করে তবে সে মুহরিম বলে গণ্য হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةً أَحْرَمَ যে ব্যক্তি উটনিকে কালাদা পরালো সে মুহরিম। দ্বিতীয়ত হযরত ইব্রাহীম আ. এর আহ্বানে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে যাওয়া তালবিয়া পাঠের সমতুল্য।

قوله : فَإِنْ بَعَثَ بِهَا الخ : যদি কেহ প্রাণীকে কালাদা পরিয়ে মক্কায় পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু নিজে না যায় তবে সে মুহরিম হবে না। কেননা, হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন—

إِنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَعَثَ بِهَا وَ أَقَامَ فِيْ أَهْلِهِ حَلَالًا -

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সা. এর কুরবানীর পশুর কালাদা পাকিয়ে দিয়েছিলাম। আর তিনি তা পাঠিয়ে দেন এবং হালাল অবস্থায় পরিবারের মধ্যে অবস্থান করেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, শুধু হাদী প্রেরণ দ্বারা মুহরিম হওয়া যায় না। বরং স্বয়ং হাদীর সাথে যেতে হয়। তবে সে প্রেরণের পর একাকী যেতে থাকে এবং পথিমধ্যে হাদীর সাথে মিলে যায় তবে সে মুহরিম হিসাবে পরিগণিত হবে।

قوله : إِلَّا فِيْ بَدَنَةِ الْمُتْعَةِ الخ : যদি কেহ ইহরামের নিয়তে হজ্বে তামাত্তু এর হাদী মক্কাতে পাঠিয়ে দেয় তবে সে মুহরিম হিসাবে পরিগণিত হবে। কেননা, তার এ হাদী মক্কার সাথে নির্দিষ্ট। কেননা, তা হজ্ব ও উমরা একত্রে পালনের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং তা শুরু থেকেই হজ্বের আমল সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমলরূপে নির্ধারিত। আর অন্যান্য হাদী তা অন্য কারণে তথা অপরাধ জনিত কারণেও ওয়াজিব হতে পারে। তাই হজ্বে তামাত্তুর হাদীর ক্ষেত্রে রওয়ানা হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

قوله : فَإِنْ جَلَّلَهَا أَوْ أَشْعَرَهَا الخ : যদি কেহ উটনিকে চট পরিয়ে দেয় কিংবা কুঁজে আচড় কেটে রক্ত বের করে দেয় কিংবা বকরীর গলায় কালাদা পরিয়ে দেয় তবে সে মুহরিম হবে না, যদিও সে ইহরামের নিয়ত করে। কেননা, এভাবে চট পরানো কখনও গরম অথবা মাছি থেকে রক্ষার জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং এজন্য এসব কর্ম হজ্বের বৈশিষ্ট্য ভুক্ত নয়। অধিকন্তু إشعار বা কুঁজে আচড় কাটা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে মাকরূহ। আর যা মাকরূহ তা হজ্বের কর্ম হতে পারে না।

قوله : وَالْبُدْنُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الخ : আমাদের মাযহাব মতে বুদনা শব্দটি উট ও গরু উভয়কে বুঝায়। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে বুদনা শুধু উটকে বুঝায়। আমাদের দলিল হল, বুদনা بدنة এর অর্থ স্থূলদেহী অর্থাৎ বড় শরীর বিশিষ্ট প্রাণীকে বুদনা বলে। আর স্থূল দেহী উট ও গরু উভয়ের মাঝে পাওয়া যায়। সুতরাং বুদনা উট ও গরু উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এজন্যই তো কুরবানীতে উট ও গরু প্রতিটি সাতজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়।

بَابُ الْقِرَانِ

পরিচ্ছেদ : হজ্জে কিরানের বিবরণ

هُوَ أَفْضَلُ ثُمَّ التَّمَتُّعُ ثُمَّ الْإِفْرَادُ وَهُوَ أَنْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مِنَ الْمِيقَاتِ وَيَقُولُ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي وَيَطُوفُ وَيَسْعٰى لَهَا ثُمَّ يَحُجُّ كَمَا مَرَّ فَإِنْ طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعٰى سَعْيَيْنِ جَازَ وَأَسَاءَ وَإِذَا رَمٰى يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً أَوْ بَدَنَةً أَوْ سُبُعَهَا وَصَامَ الْعَاجِزُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَسَبْعَةً إِذَا فَرَغَ وَلَوْ بِمَكَّةَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ تَعَيَّنَ الدَّمُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ وَقَضَاؤُهَا -

অনুবাদ : হজ্জে কিরান উত্তম অতঃপর হজ্জে তামাত্তু তার পর হজ্জে ইফরাদ। হজ্জে কিরান হল মীকাত থেকে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাধবে এবং বলবে হে আল্লাহ আমি হজ্জ ও উমরার নিয়ত করেছি। সুতরাং এ দুটি আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে গ্রহন কর। উমরার জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করবে তারপর হজ্জ করবে। (সে পদ্ধতিতে) যা পূর্বে চলে গেছে। যদি কেহ উভয়টির জন্য দু তাওয়াফ ও দু সা'ঈ করে তবে তা জায়েয। তবে মন্দ করল। কুরবানীর দিন যখন কঙ্কর নিক্ষেপ করবে তখন একটি বকরী কিংবা একটি বুদনা (গরু বা উট) অথবা বুদনার এক সপ্তমাংশ কুরবানী দিবে। আর কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তি তিনটি রোজা রাখবে যার শেষ দিন হবে আরাফার দিন। আর সাতটি রাখবে হজ্বের কার্যাবলী থেকে অবশর হয়ে যদি সে (তখন) মক্কাতে হয়। আর যদি কুরবানীর দিন পর্যন্ত রোজা রাখে না তবে দম (কুরবানী) নির্দিষ্ট হবে। (কিরান হজ্জকারী) মক্কাতে প্রবেশ না করে আরাফায় অবস্থান করলে উমরা তরক করার দরুন তার উপর দম ও উমরার কাজা ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

গ্রন্থকার রহ. হজ্জে ইফরাদের বিস্তারিত আলোচনার পর মুরাক্কাব তথা কিরান ও তামাত্তু এর আলোচনা শুরু করতেছেন। এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের মাযহাব মতে কিরান উত্তম। তাই প্রথমে কিরান পরে তামাত্তু এর

আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে মুহরিম চার প্রকার। (১) মুফরিদ বিল হজ্জ। এর আলোচনা ইতিপূর্বে বিস্তারিত হয়েছে। (২) মুফরিদ বিল উমরা। যে শুধু উমরার নিয়তে শুধু উমরাই পালন করে। (৩) কেরান হল হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাধা হবে এবং প্রথমত উমরার কার্যাদী সম্পন্ন করতঃ ইহরাম না খোলেই হজ্জের ক্রিয়াদী সম্পন্ন করে। (৪) তামাত্তু হল প্রথমত ইহরাম বেধে উমরার কার্যাদী সম্পন্ন করতঃ ইহরাম মুক্ত হবে। অতঃপর এ বৎসরই পুনর্বার ইহরাম বেধে হজ্জের কার্যাদী সম্পন্ন করবে।

قوله : وَهُوَ أَفْضَلُ الخ : আমাদের মাযহাব মতে হজ্জে কিরান তা হজ্জে ইফরাদ ও তামাত্তু থেকে উত্তম ইমাম মালিক রহ. এর মতে তামাত্তু উত্তম। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে হজ্জে ইফরাদই উত্তম। ইমাম মালিক রহ. এর দলিল হল—কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ উক্ত আয়াতে তামাত্তু এর কথা উল্লেখ আছে। অথচ কিরানের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। সুতরাং যা কুরআনে উল্লেখ আছে তা অনুল্লেখ বস্তু থেকে উত্তম হয় বিধায় হজ্জে তামাত্তু উত্তম। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিল- হযরত আয়েশা রাযি. এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে— القران رخصة - কিরান হলো শরীয়ত কর্তৃক অবকাশ। আর ইফরাদ হল আজিমত। উল্লেখ যোগ্য যে, রুখসত থেকে আজিমতকে গ্রহন করা অধিক উত্তম। তাই ইফরাদই উত্তম। আমাদের দলিল হল- রাসূলুল্লাহ্ সা. এর হাদীস— يَا آلَ مُحَمَّدٍ أَهِلُّوْا بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعَهَا হে মুহাম্মদ এর অনুসারীবৃন্দ! হজ্জ ও উমরায় ইহরাম তোমরা এক সাথে বাধো।

লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. তাদেরকে হজ্জ ও উমরার ইহরাম একসাথে বাধার নির্দেশ করেছেন। আর তাই হল কিরান। আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে হুজুর সা. উত্তম বস্তুরই নির্দেশ করবেন। দ্বিতীয়ত হজ্জে কিরানে দুটি ইবাদত তথা হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় হয়। সুতরাং তা এমন যে রোযা রেখে ইতিকাফ করে অথবা জিহাদে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে তাই এক সাথে দু ইবাদত আঞ্জাম দেয়া অনেক পুণ্যের কাজ। বিধায় হজ্জে কিরানই উত্তম।

ইমাম মালিক রহ. এর দলিলের জবাব হল—কুরআন মাজীদে কিরানের কথাটি উল্লেখ নেই। একথাটি ভুল। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الخ উক্ত আয়াতে হজ্জ ও উমরার ইহরাম এক সাথে বেধে আপন পরিবার পরিজনের কাছ থেকে বের হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে যা মূলত হজ্জে কিরানই।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিলের জবাব হল, القران رخصة দ্বারা জাহেলীয়াতের একটি বাতিল মতকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। তা হল, তারা বলত হজ্জের মাসে উমরা করা নিকৃষ্টতম পাপ। তাদের এ নিকৃষ্টতম কথাকে নাকচ করার জন্য ইহরামের অবকাশ দেয়া হয়েছে। এখানে আজিমতের ও রুখসতের কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা হজ্জে কিরান উত্তম হওয়াটা প্রমাণিত হল।

قوله : فَإِنْ طَافَ لَهُمَا طَافَيْنِ الخ : হজ্জে কিরানকারী উমরার জন্য সাত চক্করে এক তাওয়াফের পর হজ্জের জন্য তাওয়াফে কুদুম করে অতঃপর উমরার জন্য সা'ঈ করে হজ্জের জন্য সা'ঈ করে তবে তা জায়েয। কেননা, তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সে আদায় করেছে। তবে সে উমরার সা'ঈকে তাওয়াফে কুদুম থেকে বিলম্বিত করার দরুন মন্দ কাজ করল। কিন্তু তার উপর কোনরূপ দম বা কুরবানী ওয়াজি হবে না।

قوله : وَإِذَا رَمَى يَوْمَ النَّحْرِ الخ : হজ্জে কিরানকারী জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর বুদনা তথা উট বা গরু অথবা বকরী কিংবা বুদনার এক সপ্তমাংশ কুরবানী দিবে। আর তাই কিরানের দম.বা কুরবানী যা কিরানকারীর উপর ওয়াজিব।

কেননা হজ্জ ও উমরাকে একত্রিত করণটি তামাত্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর তামাত্তুর জন্য হাদী ওয়াজিব। তাই হজ্জে তামাত্তুর ন্যায় আল্লাহর বাণী যেমন— فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

কুরবানীর উক্ত পশুকে কুরবানী করতে সক্ষম না হয় তবে কারীনের উপর দম ওয়াজিব। আর যদি কারীনকারী কুরবানীর হজ্জের দিনগুলোতে তিনটি রোজা রাখবে এবং পরবর্তীতে পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হয়ে সাতটি রোজা রেখে দশটি পূর্ণ করবে। দলিল হল, আল্লাহ তাআলার বাণী—

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

যে ব্যক্তি জবাই করার কিছু না পায় তবে সে হজ্জের সময় তিনটি রোজা রাখবে। আর সাতটি রোজা রাখবে যখন তোমরা ফিরে আসবে। এতে পূর্ণ দশ হল।

যদিও উক্ত আয়াত তামাত্তুর জন্য অবতীর্ণ কিন্তু পূর্ব আলোচনার ভিত্তিতে তা হজ্জে কিরানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

قوله : واخرها يوم عرفة الخ : হজ্জের সময় তিনটি রোজা রাখা হবে হাদীর পরিবর্তে। তবে প্রশ্ন হল হজ্জের সময় কখন? উত্তরে বলা যায় যে, হজ্জের সময় যেহেতু শাওয়াল মাস থেকে তাই ইহরাম বাধার পর যে কোন সময় তা পালন করা জায়েয। তবে গ্রন্থকারের ভাষ্য অনুযায়ী তিনদিনের শেষ দিন হবে আরাফার দিন। সুতরাং ৭, ৮, ৯ তারিখ রোজা রাখা হবে যা হিদায়া গ্রন্থকারের মতামত অনুযায়ী উত্তম। কেননা, রোজা হল হাদীর স্থলবর্তী। তাই মূল বস্তু অর্থাৎ হাদী সংগ্রহে সক্ষম হওয়ার প্রত্যাশায় শেষ সময় অর্থাৎ সাতই জিলহাজ্জ পর্যন্ত বিলম্ব করা হবে।

قوله : فان لم يصم الى يوم النحر الخ : যদি কিরানকারী কুরবানীর জন্তু পায় না তবে রোজা রাখবে (যা আলোচিত হয়েছে)। আর যদি ইয়াওমুন্নাহর তথা দশ তারিখের আগে আদিষ্ট তিনটি রোজা রাখে না তবে তার উপর দম তথা কুরবানীই নির্দিষ্ট হবে, কাজা হিসাবে রোজা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে ইয়াওমুত তাশরীকের পর তা কাযা হিসাবে আদায় করবে। আর ইমাম মালিক রহ. এর মতে ইয়াওমুত তাশরীকেই তা আদায় করলে চলবে। আমাদের দলিল হল, মূলত হাদী না পাওয়াতে খিলাফে কিয়াস রোজা রাখা ওয়াজিব হয়েছিল। কিন্তু যখন রোজা পালন করেনি, বিধায় মূল হিসাবে হাদীই ওয়াজিব হবে। কেননা, খিলাফে কিয়াস যা ওয়াজিব হয় তার কাজা ওয়াজিব হয় না। সুতরাং যখনই তার জন্য হাদীর জন্তু সহজসাধ্য হবে তখনই তা কুরবানী করতে হবে।

قوله : وان لم يدخل مكة الخ : হজ্জে কিরানকারী ৯ই জিল হজ্জ সূর্য হেলে পড়ার পর যদি মক্কায় না পৌঁছেই আরাফায় অবস্থান করে নেয় তবে তার উমরা পালনের নিয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে।

তবে শুধু আরাফার দিকে যাত্রা দ্বারাই সে উমরা পরিত্যাগকারী হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আরাফায় তার নির্ধারিত সময়ে উকূফ পাওয়া যাবে না। তবে উক্ত সময় উমরা বর্জনের দরুন তার উপর দম ওয়াজিব হবে এবং যেহেতু নফল শুরু করে শেষ করে দিয়েছে তাই তা তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে গেছে অর্থাৎ পুনরায় উমরা পালন করা তার উপর ওয়াজিব হয়েছে।

بَابُ التَّمَتُّعِ

পরিচ্ছেদ : হজ্জে তামাত্তু এর বিবরণ

هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ الْمِيقَاتِ فَيَطُوفَ لَهَا وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَقَدْ حَلَّ مِنْهَا وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ الطَّوَافِ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يوم التَّرْوِيَةِ من الْحَرَمِ وَيَحُجُّ وَيَذْبَحُ فَإِنْ عَجِزَ فَقَدْ مَرَّ فَإِنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ وَاعْتَمَرَ لَمْ يُجْزِهِ عَنِ الثَّلَاثَةِ وَصَحَّ لَوْ بَعْدَ ما أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ فَإِنْ أَرَادَ سَوْقَ الْهَدْيِ أَحْرَمَ وَسَاقَ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ بِمَزَادَةٍ أو نَعْلٍ وَلَا يُشْعِرُ وَلَا يَتَحَلَّلُ بَعْدَ عُمْرَتِهِ وَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَهُ أَحَبُّ فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ مِنْ إِحْرَامَيْهِ وَلَا تَمَتُّعَ وَلَا قِرَانَ لِمَكِّيٍّ وَمَنْ يَلِيهَا -

অনুবাদ : হজ্জে তামাত্তু হল মিকাত থেকে উমরার ইহরাম বাধা হবে এবং উমরার জন্য তাওয়াফ করবে এবং সা'ঈ করবে এবং মাথা মুন্ডাবে বা ছাটবে। তখন সে তার উমরা থেকে হালাল হয়ে যাবে। প্রথম তাওয়াফেই তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করে দেবে। অতঃপর ইয়াওমুত্তারবীয়া (৮ই জিল হাজ্জ) মসজিদে হারাম থেকে হজ্জের ইহরাম বেধে হজ্জ ও কুরবানী করবে। আর যদি (কুরবানী দিতে) অক্ষম হয় তবে তার পদ্ধতি এইমাত্র গত, (অর্থাৎ, হজ্জের সময় তিনটি রোজা রাখবে এবং পরে সাতটি রেখে দশটি পূর্ণ করবে) আর যদি সে শাওয়ালে তিনটি রোজা রেখে উমরা আদায় করে তবে ঐ রোজার জন্য যথেষ্ট হবে না। আর উমরার ইহরামের তাওয়াফের পূর্বে রোজাগুলো রাখে তবে সহীহ। আর যদি সে নিজের সাথে হাদী নিতে চায় তবে ইহরাম বাধবে এবং হাদী হাকিয়ে নিবে। আর (বুদনা হলে) বুদনাকে কালাদা পরাবে চামড়ার টুকরা বা জুতা দ্বারা এবং اشعار করবে না (তথা উটের কুজ চিরবে না) উমরার পরে হালাল হবে না এবং ইয়ামুত তারবীয়াতে (৮ই জিলহাজ্জ) হজ্জের ইহরাম বাধবে তবে তার পূর্বে ইহরাম বাধাটা অধিক পছন্দনীয়। অতঃপর যখন ইয়াওমুন নাহর (তথা ১০ই জিলহজ্জ) মাথা মুন্ডাবে তখন উভয় ইহরাম থেকে হালাল হবে। (তথা ইহরাম পরিত্যাগকারী হবে)। আর মক্কাবাসীও তার আশপাশের বাসিন্দাদের জন্য হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে কিরান নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : هُوَ أَنْ يُحْرِمَ الخ : গ্রন্থকার রাযি. এখান থেকে হজ্জে তামাত্তুর বিশদ বর্ণনা শুরু করতেছেন। তাই তিনি বলেন, মিকাত থেকে উমরা পালনের নিয়াতে ইহরাম বেধে উমরার জন্য তাওয়াফ ও সায়ী করবে। অতঃপর মাথা মুন্ডাবে বা চুল ছাঁটবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. এভাবেই উমরা পালন করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রহ. বলেন, উমরা পালনকারীর উপর হলক (চুল মুণ্ডানো) ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ সা. উমরাতুল কাজা আদায় করতে তাওয়াফ, সায়ী ও হলক এ তিনটি করেছেন।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ -

উক্ত আয়াতটিই উমরাতুল কাজা এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে চুল মুন্ডানো ও ছাটার কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং উমরার ক্ষেত্রে চুল ছাটা ও মুন্ডানো আবশ্যক। মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাটার পর সে ইহরাম মুক্ত হয়ে যাবে।

قوله : وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ الخ : উমরা আদায়কারী তাওয়াফ শুরু করার সাথে সাথেই তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে। কেননা, হুজুর সা. উমরাতুল কাযা আদায় করার সময় হজরে আসওয়াদ চুম্বন কালে তালবিয়া পড়া বন্ধ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত উমরার উদ্দেশ্য হল তাওয়াফ, সুতরাং তা শুরু করার সাথে সাথেই তালবিয়া পড়া বন্ধ করা হবে।

قوله : ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ الخ : উমরাকারী ইহরাম মুক্ত হওয়ার পর আটই জিলহজ্জ ইহরাম বাধবে। তবে হারাম থেকে এ ইহরাম বাধা শর্ত। আর মসজিদুল হারাম থেকে ইহরাম বাধা উত্তম। অনুরূপভাবে আটই জিল হজ্জের আগেও ইহরাম বাধা উত্তম।

قوله : فَإِنْ صَامَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ الخ : যদি তামাত্তুকারী শাওয়াল মাসে তিনটি রোজা রাখে অতঃপর ইহরাম বাধে তবে উক্ত রোজা কুরবানীর বদলারূপে গৃহীত হবে না। কেননা, উক্ত রোজা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল তামাত্তু। অথচ উমরার ইহরাম বাধার পূর্বে সে তামাত্তুকারী রূপে গণ্য নয়। কেননা, কারণ পাওয়ার পূর্বে সে ঐসব রোজা রেখেছে। এদিকে বিদ্যমান হওয়ার পূর্বে কোন জিনিসের আদায় সাব্যস্ত হয় না। তাই উক্ত রোজা তামাত্তু এর দমের স্থলবর্তী রোজারূপে গণ্য হবে না। আর যদি সে উমরার ইহরাম বাধার পর তাওয়াফের আগে আদায় করে ফেলে তবে আমাদের মাযহাব মতে তা জায়েয। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে তা জায়েয নয়।

আমাদের দলিল হল : সে রোজাগুলো কারণ পাওয়া যাওয়ার পর রেখেছে, অর্থাৎ তামাত্তু এর ইহরাম বাধার পর রেখেছে। আর কারণ পাওয়া যাওয়ার পর আদায় করাটা শরীয়াত সম্মত।

তাই তার ইহরাম বাধার পরের রোজাগুলো তামাত্তুর স্থলবর্তী হিসাবে যথেষ্ট হবে।

قوله : فَإِنْ أَرَادَ سَوْقَ الْهَدْيِ الخ : তামাত্তুকারী যদি কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে যেতে চায় তবে ইহরাম বেধে হাদীকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. হাদী সমূহকে নিজের সাথে নিয়ে গেছেন। দ্বিতীয়ত হাদীকে সাথে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে নেক কাজের প্রস্তুতি এবং ওয়াজিব আদায়ের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করার আগ্রহ প্রকাশ হয়। উভয় কাজদ্বয় প্রশংসার দাবীদার।

তামাত্তুকারী যদি সঙ্গে করে হাদী নিয়ে যায় আর তা উট বা গরু হয় তবে উক্ত হাদীকে কালাদা পরাবে চামড়ার টুকরা দ্বারা বা জুতা দ্বারা। কেননা, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন—

كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(তিনি বলেন) 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সা. এর হাদীর কালাদা পাকিয়ে দিয়ে ছিলাম।' আর হা কালাদা পরানোটা চট বা কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া থেকে উত্তম। কেননা, চট বা কাপড় পরানো দ্বারা অন্য উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা থাকে। তবে কালাদা নির্ধারিতভাবে হাদীরই চিহ্ন। আর اشعار তথা কুঁজে আচড় কাটা যাবে না। কেননা, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তা মাকরূহ। কেননা, তা বিকৃতি স্বরূপ, যা নিষিদ্ধ।

قوله : وَلَا يَتَحَلَّلُ بَعْدَ عُمْرَتِهِ الخ : ইতিপূর্বে বর্ণিত উমরাকারী তথা যে সঙ্গে করে হাদী নিয়ে যায় সে উমরা ও হজ্জের মধ্যে হালাল হবে না। বরং আটই জিলহাজ্জ তথা ইয়াওমুত তারবীয়াতে হজ্জের ইহরাম বাধবে। তবে তার পূর্বে বেধে নেয়া উত্তম। কেননা, এতে ভাল কাজের প্রতি অগ্রগামীতা, যা উত্তম হওয়ার দাবীদার। আর যদি তামাত্তুকারী হাদী সাথে না নেয় তবে সে উমরা পালনের পরই হালাল হয়ে যাবে। দলিল হল, রাসূলুল্লাহ্ সা. যখন

মক্কাতে প্রবেশ করে সাহাবায়ে কেরামদের নির্দেশ করলেন তোমরা হজ্জের ইহরাম ভেঙ্গে দাও এবং উমরার ইহরাম বেধে নাও। অতঃপর তারা তাই করলেন। উমরার কার্যাদী সম্পন্ন করতঃ তারা অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করলেন, যদি আমি আগে জানতাম যে হাদী সাথে আনা হালাল হওয়াকে বাধা দেয় তবে হাদী সঙ্গে আনতাম না। উক্ত ঘটনা থেকে প্রতিয়মান হলো যে, হাদী সঙ্গে আনলে তামাত্তুকারী উমরার পরে হালাল হবে না। অতঃপর ৮ই জিলহজ্জ হজ্জের ইহরাম বেধে হজ্জের কার্যাবলী পালন করতঃ কুরবানীর দিন মাথা মুন্ডাবে অথবা ছাটবে তখন সে হজ্জ ও উমরার ইহরাম থেকে হালাল হবে। কেননা, নামাজের ক্ষেত্রে সালাম ফিরানো যেমন হালালকারী তদ্রূপ হজ্জের ক্ষেত্রে হলক হল হালালকারী। তাই হলকের দ্বারা উমরা ও হজ্জ থেকে হালাল হয়ে যাবে।

قوله : وَلَا تَمَتُّعَ وَلَا قِرَانَ الخ : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী মাক্কী ও মীকাতের অভ্যান্তরে বসবাসকারীরা হজ্জে তামাত্তু বা কিরান করবে না বরং তারা হজ্জে ইফরাদই করবে। তবে হা যদি এমন ব্যক্তি কিরান বা তামাত্তু করে ফেলে তবে তা আদায় হবে। কিন্তু সে গুনাহগার হবে। এ কারণে তার উপর অপরাধের দম ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে মক্কা বা মীকাতের অভ্যন্তরের লোকদের ক্ষেত্রে কিরান ও তামাত্তু জায়েয, আর এজন্য তাদের উপর কিরান বা তামাত্তুর দম ওয়াজিব হবে না। যেমন বহিরাগতদের উপর ওয়াজিব হয়। তিনি দলিল পেশ করেন—

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الخ

উক্ত আয়াতখানা মুতলাক। বহিরাগত ও অভ্যন্তরের সবাই সমান। আমাদের দলিল হল : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الخ

আর তা (তামাত্তু) ঐ ব্যক্তির জন্য যার পরিবার পরিজন মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। অর্থাৎ হজ্জে তামাত্তু বহিরাগতদের জন্য। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, মক্কাবাসীদের জন্য হজ্জে তামাত্তু নেই। আমাদের দ্বিতীয় দলিল হল : হজ্জে তামাত্তু ও কিরান শরীয়তে অনুমোদিত একারণে যে যাতে এক সফরে দুটি ইবাদত হয়ে যায় এবং দুটি সফর থেকে একটি রহিত করে অধিক কষ্টকে রহিত করণ ও সুবিধা গ্রহণ করা। আর এ সুবিধাটা মিকাতের বাহিরের অবস্থানকারীদের বেলায় প্রযোজ্য।

فَإِنْ عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ بَطَلَ تَمَتُّعُهُ وَإِنْ سَاقَ لَا وَمَنْ طَافَ أَقَلَّ أَشْوَاطِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَتَمَّهَا فِيهَا وَحَجَّ كَانَ مُتَمَتِّعًا وَبِعَكْسِهِ لَا وَهِيَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَصَحَّ الْإِحْرَامُ بِهِ قَبْلَهَا وَكُرِهَ وَلَوْ اعْتَمَرَ كُوفِيٌّ فِيهَا وَأَقَامَ بِمَكَّةَ أَوْ بَصْرَةَ وَحَجَّ صَحَّ تَمَتُّعُهُ وَلَوْ أَفْسَدَهَا فَأَقَامَ بِمَكَّةَ وَقَضَى وَحَجَّ لَا إِلَّا أَنْ يَعُودَ إِلَى أَهْلِهِ وَأَيُّهُمَا أَفْسَدَ مَضَى فِيهِ وَلَا دَمَ عليه وَلَوْ تَمَتَّعَ وَضَحَّى

অনুবাদ : আর যদি তামাত্তুকারী উমরা পালনের পর নিজ শহরে ফিরে যায় এবং হাদী সাথে নেয়নি তবে তার তামাত্তু বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি হাদী সঙ্গে নিয়ে থাকে তবে তার তামাত্তু বাতিল হবে না। আর যে ব্যক্তি হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে উমরার কম তাওয়াফ করে এবং হজ্জের মাসে তা পূর্ণ করে তবে সে তামাত্তুকারীরূপে গণ্য হবে। এর বিপরীত হলে তামাত্তুকারীরূপে গণ্য হবে না। (অর্থাৎ হজ্জের মাসের পূর্বে অধিকাংশ তাওয়াফ করে ফেলে এবং হজ্জের মাসে তা পূর্ণ করে তবে সে তামাত্তুকারীরূপে গণ্য হবে না) আর আশহুরে হজ্জ (তথা হজ্জের মাস হল শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহজ্জের দশদিন, আর আশহুরে হজ্জের পূর্বেও ইহরাম বাধা সহীহ, কিন্তু তা মাকরূহ। আর যদি কূফী ব্যক্তি উমরা করে মক্কাতে বা বসরাতে অবস্থান করে এবং (এবৎসরই) হজ্জ করে, তবে তার তামাত্তু সহীহ। আর যদি সে উমরাকে নষ্ট করে ফেলে এবং মক্কাতে অবস্থান করে তার কাজা আদায় করে এবং হজ্জ করে তবে সে তামাত্তুকারী হবে না। তবে যদি সে পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যায় এবং উভয়টি থেকে কোনটি ফাসিদ করে ফেলে তবে সেটির কমসমূহ পূর্ণ করবে। আর তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। আর যদি তামাত্তু করে এবং কুরবানী করে তবে তা তামাত্তুর কুরবানীর জন্য যতেষ্ট হবে না। যদি স্ত্রীলোক ইহরামের পর ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কার্যাবলী পালন করবে। আর যদি তাওয়াফে সদর এর সময় ঋতুগ্রস্ত হয় তবে মক্কায় অবস্থানকারীর ন্যায় তা ছেড়ে দিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : فَإِنْ عَادَ الْمُتَمَتِّعُ الخ : যদি বহিরাগত কেহ হজ্জের মাসগুলোতে হাদী না নিয়ে এসে উমরা পালন করে পরিবার পরিজনের সাথে মিলে যায় অতঃপর এ বৎসরই হজ্জ পালন করে তবে সে আহনাফের নিকট তামাত্তু পালনকারীরূপে গণ্য হবে না। কেননা, সে হজ্জ ও উমরার মাঝে বৈধভাবে পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। সুতরাং বৈধভাবে পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যাওয়াটা তামাত্তুকে রহিত করে। আর যদি হাদীর পশু সাথে নিয়ে যায় অতঃপর উমরা পালন করতঃ পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যায় তারপর এ বৎসরই এসে হজ্জ করে তবে শায়খাইন রহ. এর মতে তার তামাত্তু বাতিল হবে না। কেননা, সে যতক্ষণ পর্যন্ত তামাত্তু এর নিয়াতের উপর অটল থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মক্কাতে ফিরে আসা ওয়াজিব। কেননা, সে যে হাদী সাথে নিয়ে আসছে তা তার হালাল হওয়ার প্রতিবন্ধক। তার বাড়িতে আসা বৈধ হয়নি। এদিকে الالم فاسد দ্বারা তামাত্তু ফাসিদ হয় না বিধায় তার তামাত্তুর ইহরাম বাতিল হবে না।

قوله : وَمَنْ طَافَ اَقَلَّ اَشْوَاطٍ الخ : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী যদি কেহ হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে তামাত্তুর ইহরাম বাধে অতঃপর হজ্জের মাস সমূহের পূর্বে কম চক্কর তথা তিন চক্কর পর্যন্ত তাওয়াফ করে নেয়, আর হজ্জের মাসে এসে বাকি অধিকাংশ চক্কর পূর্ণ করে তবে সে তামাত্তুকারীরূপে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ চক্কর তথা চার চক্কর পর্যন্ত হজ্জের মাস সমূহের পূর্বে করে নেয় অতঃপর হজ্জের মাসে বাকি চক্কর পূর্ণ করে তবে সে তামাত্তুকারী হিসাবে গণ্য হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে উমরার ইহরাম হজ্জের মাসগুলোর আগে বেধে নেয় তবে সে তামাত্তুকারী হিসাবে গণ্য হবে না। ইমাম মালিক রহ. এর মতে যদি সে উমরার কার্যাদী হজ্জের মাসগুলোর মধ্যে আদায় না করে তবেও সে তামাত্তুকারী হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীল হল, হজ্জ ও উমরাকে হজ্জের মাসগুলোতে একত্র করার নামই হচ্ছে তামাত্তু। আর এখানে তা পাওয়া যায় নি। বিধায় সে তামাত্তুকারীরূপে গণ্য হবে না। ইমাম মালিক রহ. এর দলিল হল : তামাত্তু এর অর্থ হল হজ্জ

ও উমরাকে একত্র করা। আর তা তো বিদ্যমান। কেননা, সে উমরার ইহরাম থেকে হজ্জের মাসে হালাল হয়েছে আর ঐ একই সময়ে হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হয়েছে। অর্থাৎ হালাল হওয়ার বিবেচনায় উভয় ইবাদত হজ্জের মাসে পাওয়া গেছে। সুতরাং এ একত্রীতকরণের ভিত্তিতে তাকে তামাত্তুকারী বলা যাবে। আমাদের দলিল হল : আমাদের মতে ইহরাম হচ্ছে উমরার শর্ত, তাই নামাজের সময়ের পূর্বে যেভাবে ওযু তথা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয। অনুরূপভাবে হজ্জের মাস সমূহের পূর্বে ইহরাম বাধাও জায়েয। তবে উমরার আমলগুলো হজ্জের মাসে পালন করাটা ধর্তব্য। তাই তাওয়াফের চার চক্কর তথা অধিকাংশ যেহেতু হজ্জের মাসে পাওয়া গেল বিধায় ধরে নেয়া হবে যে সে উমরার পুরো তাওয়াফ হজ্জের মাসে পেয়েছে। কেননা, অধিকাংশের উপর সমগ্রের হুকুম আরোপিত হয়ে থাকে। তবে হা যদি হজ্জের মাস শুরু হওয়ার আগেই যদি অধিকাংশ তাওয়াফ করে নেয় তবে তা হজ্জের মাসে হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না। কেননা, এ অবস্থায় পুরো তাওয়াফই হজ্জের মাসের আগে হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। দ্বিতীয় দলিল হল : সুযোগ লাভ সাব্যস্ত হয় ক্রীয়াকর্ম আদায়ের দ্বারা। আর তামাত্তুকারীও হজ্জের মাসে এক সফরে হজ্জ ও উমরা এ দুই ইবাদতের কর্মসমূহ আদায়ের সুযোগ লাভ করে থাকে। সুতরাং তামাত্তুকারী হওয়াটা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য হজ্জের মাসে উমরার সকল আমল বা অধিকাংশ আমল পাওয়া যাওয়া। সুতরাং হজ্জের মাসে অধিকাংশ আমল তথা নিম্নে চার চক্কর তাওয়াফ পাওয়া গেলে সে তামাত্তুকারী বলে গণ্য হবে।

قوله : وَلَوِ اعْتَمَرَ كُوْفِيٌّ الخ : যদি কূফী ব্যক্তি অর্থাৎ বহিরাগত কেহ হজ্জের মাসে উমরা পালনের জন্য মক্কাতে আসে এবং তা পালন করতঃ মাথা মুন্ডায় বা চুল ছেটে হালাল হয় অতঃপর মক্কাতেই অবস্থান করে ঐ বৎসরই হজ্জ পালন করে তবে সে তামাত্তু পালনকারী বলে গণ্য হবে। কেননা, মধ্যবর্তী সময়ে পরিবার পরিজনের নিকট যায়নি এবং মক্কা থেকেও বের হয়নি। আর যদি সে পরিবার পরিজনের নিকট না গিয়ে বসরায় তথা অন্য কোথাও চলে যায় অতঃপর এ বৎসরই হজ্জ পালন করে, তবুও সে তামাত্তু পালনকারীরূপে গণ্য হবে

قوله : وَلَوْ اَفْسَدَهَا فَاَقَامَ الخ : যদি কেহ বাড়ি থেকে ইহরাম বেধে মক্কাতে এসে তা নষ্ট করে নেয় এবং মক্কাতে অবস্থান করে এবং অন্য শহরে বা নিজ পরিবার পরিজনের নিকট যায়নি অতঃপর হজ্জের মাঝে নষ্ট কৃত উমরার কাজা করে এবং হজ্জ আদায় করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে সে তামাত্তুকারী হবে না। কেননা, তার প্রথম ইহরাম নষ্ট করে তা শেষ করে দিয়েছে। অতঃপর সে মক্কা থেকে ইহরাম বেধে উমরা ও হজ্জ পালন করেছে। সুতরাং সে মক্কাবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হল। তাই যেহেতু মক্কাবাসীদের উপর তামাত্তু নেই বিধায় সে তামাত্তুকারী বলে বিবেচিত হবে না। আর যদি কেহ উমরার ইহরাম বেধে মক্কাতে আসে। অতঃপর নষ্ট করে দেয় এবং তা নষ্ট হওয়ার পরও সে চুল কেটে বা ছেটে হালাল হয়ে যায় এবং বসরায় অবস্থান গ্রহণ করে। তারপর হজ্জের মাস আসাতে সে উমরার কাজা আদায় করতঃ সে বৎসরই হজ্জ করে তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে সে তামাত্তুকারী হবে না। কেননা, নিজ বাড়ি না আসা পর্যন্ত সে তার পূর্ব সফরেই রয়ে গেছে আর এ সফরে তার প্রথম উমরা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে দুটি ইবাদত বিশুদ্ধরূপে পাওয়া যায়নি। অথচ তামাত্তুকারী হল এক সফরে বিশুদ্ধরূপে হজ্জ ও উমরা পাওয়া যাওয়া। আর যদি তার ইহরাম নষ্ট হওয়ার পর পরিবার পরিজনের নিকট চলে আসে অতঃপর হজ্জের মাসসমূহে আবার মক্কায় গিয়ে উমরার কাজা আদায় করে হালাল হয়ে হজ্জ আদায় করে, তবে সে যথারীতি তামাত্তুকারী হিসাবে গণ্য হবে এবং তার উপর তামাত্তু এর জন্য হাদী ওয়াজিব হবে। কেননা, সে তার এ দ্বিতীয় সফর দ্বারা মূলত এক সফরে দুটি আমল তথা উমরা ও হজ্জ পাওয়া গেছে। তাই সে তামাত্তুকারী বলে গণ্য হবে।

قوله : وَاَيُّهُمَا اَفْسَدَ الخ : যদি কেহ হজ্জের মাঝে ইহরাম বেধে এ বৎসরই হজ্জ ও উমরা করে। অতঃপর একটি ফাসিদ হয়ে গেলে তা পূর্ণ করা একান্ত আবশ্যক। কেননা, যাবতীয় আমল পূর্ণ করা ছাড়া ইহরাম থেকে

মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে এ ক্ষেত্রে তামাত্তু এর দম রহিত হয়ে যাবে। কেননা, বিশুদ্ধরূপে এক সফরে দুটি আমল পাওয়া যায় নি। বিধায় তার উপর তামাত্তুর দম ওয়াজিব হবে না।

قوله : وَلَوْ تَمَتَّعَ وَ ضَحّٰى الخ : যদি কেহ তামাত্তু করে এবং কুরবানী করে তবে তার এ কুরবানীটি তামাত্তু এর দমের স্থলবর্তী হবে না। কারণ, সফরের দরুন ঈদুল আযহার কুরবানী তার উপর ওয়াজিব নয়। বরং তার উপর তামাত্তু এর দম ওয়াজিব। সুতরাং যা ওয়াজিব নয় তা ওয়াজিবের স্থলবর্তী হতে পারে না।

قوله : وَلَوْ حَاضَتْ عِنْدَ الْاِحْرَامِ الخ : ইহরামের সময় যদি কোন স্ত্রীলোক ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে তিনি গোসল করতঃ ইহরাম বেধে নিবেন। এবং তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকি সমস্ত ক্রীয়াকর্ম আদায় করবেন। দলিল হল : হযরত আয়েশা রাযি. যরিফ নামক স্থানে ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়াতে কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ সা. বুঝতে পেরে বললেন, সম্ভবত তুমি ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়েছ। তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, ইহা তো প্রতিটি নারীরই হয়ে থাকে। কেহ এ থেকে বাঁচতে পারে না বিধায় হাজীরা যেসব রুকন আদায় করে তুমিও তা আদায় কর। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফে বায়তুল্লাহ্ করবে না।

দ্বিতীয়তঃ তাওয়াফ করা হয় মসজিদে হারামে। আর ঋতুগ্রস্ত মহিলা মসজিদে হারমে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে উকুফ ইত্যাদি করা হয় মাঠে যেখানে যেতে ঋতুগ্রস্ত মহিলাদের কোন বাধা নিষেধ নেই। তাই তারা তাওয়াফ ব্যতিত হজ্জের বাকী আমল আদায় করবে। অতঃপর পবিত্র হলে তাওয়াফ করবে।

গ্রন্থকার রহ. বলেন, যদি তাওয়াফে সদর এর পূর্বে ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে মক্কায় অবস্থানকারীদের ন্যায় উক্ত মহিলা তা বর্জন করতঃ আপন বাড়ীতে ফিরে আসবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ঋতুগ্রস্ত নারীদের বিদায়ী তাওয়াফ তরক করার অনুমতি দিয়েছেন।

بَابُ الْجِنَايَاتِ

পরিচ্ছেদ ঃ অপরাধের বিবরণ

تَجِبُ شَاةٌ إِنْ طَيَّبَ مُحْرِمٌ عُضْوًا وَإِلَّا تَصَدَّقَ أَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِحِنَّاءٍ أَوْ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ أَوْ لَبِسَ مَخِيطًا أَوْ غَطّٰى رَأْسَهُ يَوْمًا وَإِلَّا تَصَدَّقَ أَوْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَإِلَّا تَصَدَّقَ كَالْحَالِقِ أَوْ رَقَبَتَهُ أَوْ إِبِطَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ مِحْجَمَهُ وَفِي أَخْذِ شَارِبِهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَفِي شَارِبِ حَلَالٍ أَوْ قَلْمِ أَظْفَارِهِ طَعَامٌ أَوْ قَصَّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِمَجْلِسٍ أَوْ يَدًا أَوْ رِجْلًا وَإِلَّا تَصَدَّقَ كَخَمْسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَا شَيْءَ بِأَخْذِ ظُفْرٍ مُنْكَسِرٍ وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ أَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ ذَبَحَ شَاةً أَوْ تَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ عَلَى سِتَّةٍ أَوْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ -

অনুবাদ : মুহরিম ব্যক্তি পূর্ণ একটি অঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার করলে তার উপর বকরী (দম) ওয়াজিব হবে। নতুবা (তথা পূর্ণ অঙ্গের কমে সুগন্ধি ব্যবহার করলে) সদকা ওয়াজিব হবে। অথবা মেহেদি দ্বারা মাথা রঞ্জিত

করলে কিংবা যয়তুনের তৈল ব্যবহার করলে (তার উপর বকরী [দম] ওয়াজিব হবে।) কিংবা পূর্ণ একদিন সেলাইকৃত কাপড় পরিধান বা মাথা ঢেকে রাখলে, (তার উপর বকরী [দম] ওয়াজিব হবে) তবে পূর্ণ দিন থেকে কম হলে সদকা ওয়াজিব হবে। অথবা মাথার বা দাড়ির এক চতুর্থাংশ মুন্ডালে (তার উপর বকরী [দম] ওয়াজিব হবে। তবে তার চেয়ে কম করলে সদকা ওয়াজিব হবে যেভাবে (মুহরিমের আদেশে বা বিনা আদেশে) মুন্ডনকারীর উপর সদকা ওয়াজিব হয়। কিংবা তার (সম্পূর্ণ) ঘাড় বা উভয় বগল বা যে কোন একটি বগল মুন্ডালে (তার উপর বকরী [দম] ওয়াজিব হবে) আর মোচ কাটা দ্বারা ন্যায়বিচার অনুযায়ী সদকা ওয়াজিব হবে মুহরিম হালাল ব্যক্তি মোঁচ ছেটে দেওয়াতে অথবা তার নখ কেটে দেওয়াতে খাদ্য শষ্য (দান করবে) অথবা এক বৈঠকে তার উভয় হাতের ও উভয় পায়ের নখ কাটলে অথবা এক হাতের অথবা এক পায়ের নখ কাটলে তার উপর বকরী [দম] ওয়াজিব হবে। (এ থেকে কম হলে) সকদা ওয়াজিব হবে বিভিন্ন আঙ্গুলের পাঁচটি নখ কাটার ন্যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন আঙ্গুলের পাঁচটি নখ কাটাতে সদকা ওয়াজিব হবে। আর ভেঙ্গে পড়া নখ কাটাতে কোন কিছু নেই। আর যদি কেহ ওজরের কারণে খোশবু ব্যবহার করে অথবা সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করে কিংবা মাথা মুন্ডায় তবে বকরী জবেহ করবে অথবা ছয় জন মিসকিনকে তিন সা' গম দান করবে কিংবা তিনদিন রোজা রাখবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : تَجِبُ شَاةٌ اِنْ طَيَّبَ الخ : মুহরিম ব্যক্তি সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন اَلْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ হজকারী ধুলামলিন ও অপরিপাটি হয়। আর সুগন্ধি ব্যবহার দ্বারা হাজী এ গুনাগুন দূর হয়ে যায়। সুতরাং যদি পূর্ণ একটি অঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার করে তবে একটি বকরীওয়াজিব হবে। আর যদি এক অঙ্গের কম হয় তবে সদকা ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, অঙ্গের পরিমাণ অনুপাতে দম ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ, অর্ধেক অঙ্গে খোশবো ব্যবহার করলে অর্ধেক দম ওয়াজিব হবে। আর এক চতুর্থাংশ খোশবো ব্যবহার করলে এক চতুর্থাংশ দম ওয়াজিব হবে।

قوله : اَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ الخ : যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি মাথায় মেহেদীর খেজাব ব্যবহার করে তবে তার এ অপরাধের দরুন তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা, মেহেদী এক প্রকার সুগন্ধি স্বরূপ। কেননা, রাসূল সা. ইরশাদ করেন— اَلْحِنَّاءُ طِيْبٌ মেহেদী হলো সুগন্ধি। সুতরাং তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

قوله : اَوِ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ الخ : মুহরিম ব্যক্তি যদি যাইতুনের তৈল ব্যবহার করে তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তার উপর ক্ষতি পুরণের দম ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন রহ. এর মতে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মালিক রহ. এর মতে যদি সে চুলে ব্যবহার করে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর চুল ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার করলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিল হল : চুলে ব্যবহার করার দরুন তার অপরিপাঠিতা দূর হয়ে গেল যা নিষিদ্ধ ছিল। বিধায় তার উপর দম ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে চুল ছাড়া অন্যস্থানে ব্যবহার করার দরুন তার মলিনতা দূর হয় না। বিধায় কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইন রহ. এর দলিল হল : জয়তুনের তৈল সুগন্ধি কিংবা বিলাসিতার দ্রব্য নয়। তবে যেহেতু তা উকুনকে ধ্বংস ও মলিনতা কিছুটা দূর করার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় তা ব্যবহার করলে সদকা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল : জয়তুনের তৈল তা সুগন্ধি নয় তবে সুগন্ধির মূল। সুতরাং যেভাবে সুগন্ধি ব্যবহারে দম ওয়াজিব হয় তদ্রূপ তার মূল ব্যবহার করা দ্বারা দম ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয়তঃ জয়তুনেরও কিছু না কিছু সুঘ্রান রয়েছে এবং তা ক্রটি ধ্বংস করে চুল নরম করে, যার দ্বারা চুল পরিপাটি হয়। সুতরাং এসব মিলে অপরাধ পূর্ণতায় পৌঁছে গেল বিধায় তার উপর দম ওয়াজিব হবে। উল্লেখ্য যে যদি জয়তুনের তৈলের সাথে কোন সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত করে ব্যবহার করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে দম ওয়াজিব হবে।

قوله : اَوْ لَبِسَ مَخِيطًا الخ : মুহরিম ব্যক্তি যদি পূর্ণ এক দিন বা এক রাত সেলাই কৃত কাপড় পরিধান করে অথবা মাথা ঢেকে রাখে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি একদিন বা একরাতের কম সময় সেলাইকৃত কাপড় পরে বা মাথা ঢেকে রাখে তবে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে মুহরিম যদি অর্ধ দিবস কিংবা অর্ধ রাতের বেশি সময় কাপড় পরিধান করে অথবা মাথা ঢেকে রাখে তবে তার উপর দম ওয়াজিব। আর যদি কম হয় তবে ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে সেলাইকৃত কাপড় পরলেই দম ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলিল হল : বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য হল ঠান্ডা বা গরম দূর করার উপকার লাভ। আর তা হতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের বিবেচনায়, যাতে উপকার পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়। সুতরাং একদিন বা এক রাতকে পার্থক্য নির্ধারণকারী সীমানারূপে বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, পূর্ণ একদিন বা পূর্ণ এক রাত সেলাই করা কাপড় পরিধান করা বা মাথা ঢেকে রাখা পূর্ণ মাত্রার উপকার। আর হাজী যদি নিষিদ্ধ বস্তু থেকে পূর্ণ মাত্রায় উপকার অর্জন করে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হয়। তাই এক্ষেত্রেও দম ওয়াজিব হবে। আর যদি একদিন বা একরাত না হয় তবে যেহেতু পূর্ণ মাত্রায় অপরাধ পাওয়া গেল না বিধায় সদকা ওয়াজিব হবে।

قوله : اَوْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ الخ : মুহরিম ব্যক্তি যদি তার মাথার চুল এক চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি মুন্ডন করে অথবা এক চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি দাড়ি মুন্ডন করে তবে তার উপর দম আবশ্যক হবে। আর যদি উভয়টি থেকে যে কোনটি এক চতুর্থাংশের কম মুন্ডন করে তবে তার উপর সাদকা আবশ্যক হবে। ইহা হল আমাদের মাযহাব। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রহ. দম ওয়াজিব হওয়ার জন্য পূর্ণ মাথা বা পূর্ণ দাড়ী মুন্ডানো আবশ্যক বলেন। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মাথা বা পূর্ণ দাড়ী মুন্ডানো পাওয়া যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত দম ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে তিনটি চুল হলক করার দ্বারাও দম ওয়াজিব হয়ে যায়। ইমাম মালিক রহ. এর দলিল হল : আল্লাহ তাআলার বাণী- لَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ - তোমরা মাথা মুন্ডাবে না। উক্ত আয়াতে মাথা দ্বারা পূর্ণ মাথাই বুঝায়। তাই পূর্ণ মাথা হলক করা নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলিল হল : মুহরিমের জন্য যেভাবে হেরেম শরীফের ঘাস কর্তনের ক্ষেত্রে কমবেশি সব বরাবর তেমনি মাথার চুল বা দাড়ির ক্ষেত্রে কম বেশি বরাবর। আমাদের দলিল হল : এক চতুর্থাংশ মুন্ডানোর দ্বারা পূর্ণ উপকার লাভ হয়। কেননা, মানুষের মাঝে ইহাই প্রচলিত। সুতরাং এক চতুর্থাংশ মুন্ডানো অপরাধ ও পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়। তাই এক্ষেত্রে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি তার চেয়ে কম হয় তবে অপরাধ লঘু বিধায় সদকা ওয়াজিব হবে।

যেভাবে কোন মুহরিম ব্যক্তি অন্যের আদেশে বা বিনা নির্দেশে অন্য কোন মুহরিমের মাথা মুন্ডন করে বা দাড়ি মুন্ডন করে তবে তার উপরও সদকা ওয়াজিব হয়। তবে হা যে মুহরিমের মুন্ডন করা হল তার উপর দম ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, বিনা নির্দেশে মুন্ডন করা হলে মুন্ডন কৃতের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে মুন্ডন কারীর উপর সদকা ওয়াজিব হবে।

قوله : اَوْ رَقَبَتَهُ اَوْ اِبْطَيْهِ الخ : আর যদি মুহরিম ব্যক্তি তার ঘাড় মুন্ডন করে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এতে সৌন্দর্য ও ময়লা দূর করার মাধ্যমে আরাম লাভ করা হয়। (যদিও কাজটি মূল হিসাবে মাকরূহ) অনুরূপভাবে মুহরিম যদি তার উভয় বগল বা একটি বগল হলক করে তবেও তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এতেও স্বস্তি ও সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ বিদ্যমান। অনুরূপভাবে যদি মুহরিম ব্যক্তি শিঙ্গা লাগানোর স্থান হলক করে, তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর সাহেবাইন রহ. এর মতে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে।

সাহেবাইন রহ. এর দলিল হল, শিঙ্গার স্থান হলক করা শুধু শিঙ্গা লাগানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর শিঙ্গা

লাগানো মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ নয়। সুতরাং সিঙ্গা লাগানোর জন্য যা সহায়ক হবে তাও নিষিদ্ধ হবে না। তবে যেহেতু এতেও কিছুটা ময়লা দূর হয় বিধায় মুহরিমের উপর সদকা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল : এখানে তথা শিঙ্গা লাগানোর স্থান হলক করাও উদ্দিষ্ট। কেননা, এছাড়া শিঙ্গা লাগানো সম্ভব নয়। সুতরাং একটি পূর্ণ অঙ্গ থেকে ময়লা দূর করা হল যা দ্বারাই দম ওয়াজিব হয়েছে।

قوله : وَفِيْ اَخْذِ شَارِبِهِ الخ : যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি স্বীয় মোঁচ ছেটে বা মুন্ডিয়ে পেলে তবে দুজন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তির ফয়সালা অনুযায়ী তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তারা বিবেচনা করে দেখবেন যে, ছাটা বা মুন্ডানো মোঁচ এক চতুর্থাংশ হয় তবে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি তার চেয়ে কম হয় তবে সদকা ওয়াজিব হবে।

قوله : وَفِيْ شَارِبِ حَلَالٍ الخ : যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি অন্য কোন হালাল ব্যক্তির মোঁচ ছেটে দেয় বা নখ কেটে দেয় তবে সে কিছু খাদ্যশষ্য দান করে দেবে। কেননা, হালাল ব্যক্তির মোঁচ যা কর্তন দ্বারা এক ধরনের উপকার লাভ হয়। একারণে অনেক ক্ষেত্রে অন্যের ময়লা দেখলে নিজের কষ্ট অনুভব হয়। সুতরাং তা পরিস্কার করার দ্বারা স্বস্তি ও আনন্দ অনুভব হয়ে থাকে। যা এক ধরনের উপকার বলে গণ্য। অথচ ইহরাম অবস্থায় উপকার লাভ করা নিষিদ্ধ। তবে এটা লঘু অপরাধ হওয়াতে কিছু খাবার দান করতে হবে।

قوله : اَوْقَصَّ اَظْفَارَ يَدَيْهِ الخ : যদি মুহরিম এক বৈঠকে উভয় হাতের ও উভয় পায়ের নখ কাটে অথবা শুধু এক হাতের বা এক পায়ের নখ কাটে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এতে ময়লা দূর করা হয় ও শরীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত জিনিস দূর করা হয়। যা দ্বারা ময়লা দূর সহ উপকার লাভ করা হয়। সুতরাং এক মজলিসে উভয় হাত ও উভয় পায়ের অথবা শুধু এক হাতের বা এক পায়ের অর্থাৎ সর্বনিম্ন পূর্ণ এক হাতের সব কটি নখ কাটাতে পূর্ণ উপকার লাভ হয়। যা দ্বারা পূর্ণ অপরাধ সংঘটিত হয়। যার ক্ষতি পুরণের জন্য দম ওয়াজিব হবে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম শায়খাইন রহ. এর মতে যদি চার বৈঠকে হাত ও পায়ের সম্পূর্ণ নখগুলো কেটে ফেলে এভাবে যে প্রতি বৈঠকে এক হাত বা এক পা তবে চারটি দম ওয়াজিব হবে। সুতরাং বৈঠক ভিন্ন হওয়াতে হুকুমও ভিন্ন ভিন্নভাবে হবে। যেমন, তেলাওয়াতে সিজদার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ একই সিজদার আয়াত একই বৈঠকে বার বার পড়ার দরুন একই সিজদা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে একই বৈঠকে পূর্ণ নখ কেটে ফেললে একই দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু পৃথক পৃথক বৈঠকে একই তিলাওয়াতে সিজদা পড়াতে যতবার পড়বে ততবারই সিজদা করা ওয়াজিব হবে। তেমনি বিভিন্ন বৈঠকে এক হাত বা এক পা করে নখগুলো কাটে তবে তার উপর পৃথক পৃথক দম ওয়াজিব হবে। যেভাবে একই আয়াতে সিজদা বিভিন্ন বৈঠকে পড়া হয় তবে সে অনুযায়ী সিজদা ওয়াজিব হবে। আর যদি এক হাতের পাঁচ নখের কম কাটা হয় অথবা বিভিন্ন হাত পায়ের পাঁচটি নখ কাটে তবে সদকা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ প্রতিটি নখের বিনিময়ে একটি সদকা ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম যুফার রহ. এর মতে তিনটি নখ কাটার দ্বারাই দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তা এক হাতের অধিকাংশ। এর জবাবে আমরা বলি, যদি এভাবে অধিকাংশ নির্ধারণ করা হয় তবে তিনের অধিকাংশ দুই আবার দেড় দুই এর অধিকাংশ আড়াই এভাবে চলতেই থাকবে যা যুক্তির পরিপন্থি। সুতরাং আমরা অধিকাংশ নির্ধারণ করেছি সবগুলোর চারভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ এক হাত বা এক পা। সুতরাং তাই অধিকাংশরূপে গণ্য।

قوله : وَلَاشَئَ بِاَخْذِ ظُفْرٍ مُنْكَسِرٍ الخ : যদি মুহরিমের নখ এমনিতেই ভেঙ্গে পড়ে তবে তা পৃথক করাতে কোন অপরাধ নেই। সুতরাং তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, ভেঙ্গে যাওয়াতে তা আর বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং তা হারামের অভ্যন্তরের শুষ্ক বৃক্ষের সাদৃশ্য হল। কেননা, যদি কেহ এর শুষ্ক কাঠ কেটে ফেলে তবে তার উপর কোন প্রকার দম বা সদকা ওয়াজিব হবে না।

قوله : وَانْ طَيَّبَ اَوْ لَبِسَ الخ : মুহরিম ব্যক্তি যদি ইহরাম অবস্থায় কোন কারণ বশত অর্থাৎ উজরের কারণে খোশবু ব্যবহার করে কিংবা সেলাই করা কাপড় পরিধান করে অথবা মাথা মুন্ডায় তবে তার ক্ষেত্রে তিনটি বিধান রয়েছে। যা থেকে যে কোন একটি আদায় করলে যথেষ্ট হবে। ১। বকরী জবাই করা, ২। ছয়জন মিসকিনকে তিন সাআগম সদকা করা, ৩। তিনদিন রোজা রাখা।

কেননা, আল্লাহ তাআলার বাণী—

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ -

যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা মাথায় কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোজা রাখবে কিংবা সদকা করবে অথবা কুরবানী করবে। উক্ত আয়াতে او শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা বর্ণিত তিনটি বিষয় থেকে যে কোন একটি গ্রহন করার স্বাধীনতা বুঝায়।

فَصْلٌ : وَلَا شَيْءَ إِنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى وَتَجِبُ شَاةٌ إِنْ قَبَّلَ أو لَمِسَ بِشَهْوَةٍ أو أَفْسَدَ حَجَّهُ بِجِمَاعٍ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ قبل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَيَمْضِي وَيَقْضِي وَلَمْ يَفْتَرِقَا فِيهِ وَبَدَنَةٌ لَوْ بَعْدَهُ وَلَا فَسَادَ أَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ أَوْ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا الْأَكْثَرَ وَتَفْسُدُ وَيَمْضِي وَيَقْضِي أَوْ بَعْدَ طَوَافِ الْأَكْثَرِ وَلَا فَسَادَ وَجِمَاعُ النَّاسِي كَالْعَامِدِ -

---

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : মুহরিম যদি কোন স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গের প্রতি কামভাব দৃষ্টিতে তাকায় এবং বীর্যস্খলিত হয়ে যায় তবে (তার উপর) কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি কামভাবে চুম্বন করে অথবা উকুফে আরাফার পূর্বে সামনে বা পিছনের রাস্তা থেকে কোনটিতে সহবাসের দ্বারা তার হজ্ব ফাসিদ করে ফেলে বা স্পর্শ করে তবে (তার উপর) বকরী (দম) ওয়াজিব হবে। হজ্বের ক্রীয়াসমূহ পালন করবে এবং কাজ্বা করবে আর কাজা আদায়ে উভয় পৃথক হবে না। (অর্থাৎ ফাসিদ হয়ে যাওয়া হজ্বের কাজা করতে স্ত্রীকে দূরে রাখা জরুরী নয়।) আর যদি উকুফে আরফার পরে (স্ত্রীর উভয় পথের কোন এক পথে সঙ্গম করে) তবে বুদনা ওয়াজিব হবে এবং হজ্ব নষ্ট হবে না। অথবা মাথা মুন্ডানোর পর কিংবা উমরার মধ্যে অধিকাংশ তাওয়াফের পূর্বে সঙ্গম করে (তবে তার উপর) বকরী (দম) ওয়াজিব হবে। এবং উমরা নষ্ট হয়ে যাবে। উমরার ক্রীয়াসমূহ পালন করবে এবং কাজা করবে অথবা (উমরার) অধিকাংশ তাওয়াফের পরে সঙ্গম করে তবে (তার উপর) বকরী ওয়াজিব হবে। এবং এক্ষেত্রে তার উমরা ফাসিদ হবে না। আর ভুলে সহবাসকারী ইচ্ছাকৃত সহবাসকারীর ন্যায়। (অর্থাৎ ভুলে সহবাসকারীর হুকুম ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ইচ্ছাকৃত সহবাস করে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَا شَيْءَ اِنْ نَظَرَ الخ : যদি মুহরিম কোন মহিলার যৌনাঙ্গের প্রতি কামভাবে তাকায় অতঃপর বীর্যস্খলিত হয়ে যায় তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ দম বা সদকা কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, হারাম হল সহবাস করা আর এখানে তা পাওয়া যায়নি। কেননা, হারাম সহবাস হল صورة বা معنى সহবাস পাওয়া যাওয়া। صورة হল স্ত্রী লিঙ্গে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো। আর معنى হল প্রবেশের পর বীর্যস্খলিত

হওয়া। সুতরাং এখানে শুধু তাকানোটি পাওয়া গেছে যা সহবাস বা সে দিকে ধাবিতকারীরূপে গণ্য নয়। তাই এক্ষেত্রে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

قوله : وَتَجِبُ شَاةٌ اِنْ قَبَّلَ الخ : যদি মুহরিম কোন স্ত্রীলোককে চুম্বন করে বা স্পর্শ করে কামভাবের সাথে, বীর্য স্খলিত হউক বা না হউক। তার উপর বকরী তথা দম ওয়াজিব। অনুরূপভাবে লজ্জাস্থানের বাইরে সঙ্গমেও দম ওয়াজিব হবে। এতে বীর্য স্খলিত হউক বা না হউক। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে বর্ণিত সূরতসমূহে বীর্যস্খলিত হলে তার ইহরাম নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি ইহরামকে রোজার উপর কিয়াস করে বলেন, বর্ণিত অবস্থায় বীর্যস্খলন হলে যেভাবে রোযা নষ্ট হয়ে যায় তেমনি ইহরাম নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের দলিল হল : সঙ্গমের কারণে হজ্জ নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজে তথা সেলাইকৃত কাপড় পরলে কিংবা সুগন্ধি ব্যবহার করলে হজ্জ নষ্ট হয় না। সুতরাং চুম্বন করা স্পর্শ করা তা সঙ্গম নয় বরং এক ধরনের আনন্দ লাভ করা। তাই তাতে ইহরাম ফাসিদ হবে না, বরং তা হজ্জে নিষিদ্ধ হওয়াতে বকরী (দম) ওয়াজিব হবে।

قوله : اَوْ اَفْسَدَ حَجَّهُ بِجِمَاعٍ الخ : যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বা পায়ু পথে সহবাস করে তবে তাদের (উভয় মুহরিম হলে) হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে। আর প্রত্যেকের উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে এবং যথারীতি হজ্জ চালিয়ে যাবে এবং আগামী বৎসর এ হজ্জের কাযা করবে। দলিল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা.কে এক ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল, যে ইহরামে থাকা অবস্থায় আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে বসে। রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করলেন—

يُرِيْقَانِ دَمًا وَ يَمْضِيَانِ فِىْ حَجَّتِهِمَا وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

উভয়ই একটি দম দিবে এবং নিজেদের হজ্জের ক্রীয়াকর্ম চালিয়ে যাবে এবং আগামী বৎসর হজ্জ করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত থেকে এরূপই বর্ণিত আছে। অপর দিকে হজ্জ ফাসিদ হওয়ার কারণে যেহেতু তার উপর কাজা করাও ওয়াজিব হয়েছে তখন তার অপরাধ লঘু বলে বিবেচিত হবে। আর লঘু অপরাধে বকরীই ওয়াজিব হয়ে থাকে। তাই এ ব্যাপারেও বকরী ওয়াজিব হবে।

আর আমাদের মাযহাব মতে হজ্জের বা উমরার কাজা পালনে স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন থাকাটা জরুরী নয়। তাই ইমাম মালিক রহ. এর মতে তারা নিজ ঘর থেকে বেরহতেই আলাদা হয়ে যাবে। ইমাম যুফার রহ. এর মতে ইহরাম বাধার সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে যখন তারা বিগত সহবাসের স্থানে পৌঁছবে তখন পৃথক হয়ে যাবে। উক্ত মাসআলায় ইমামগণের মতানৈক্যের মূল ভিত্তি হল সাহাবায়ে কেরামের উক্তি— إِذَا رَجَعَا لِلْقَضَاءِ يَفْتَرِقَانِ 'তারা যখন কাজা করতে আসবে বিচ্ছিন্ন থাকবে।'

আমাদের দলিল হল : উভয়ের মাঝে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার কারণ হল তাদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক যা ইহরামের পূর্বেও আছে এবং পরেও আছে। সুতরাং ইহরামের পূর্বে বিচ্ছিন্ন থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। আর ইহরামের পর একত্র থাকাতে অনুতপ্ততা ও লজ্জা বৃদ্ধি পাবে। কারণ, তাদের স্মরণ হবে যে গত বৎসর অল্প আনন্দের জন্য এবৎসর কতই না কষ্ট উঠাতে হচ্ছে। সুতরাং এক সাথে থাকাটাই ভাল। তবে হ্যা ফিতনার আশংকা থাকলে পৃথক থাকবে যা সাহাবায়ে কিরামের উক্তির মর্ম।

قوله : اَوْ بَدَنَةٌ لَوْ بَعْدَهُ الخ : মুহরিম ব্যক্তি উকুফে আরাফার পর স্ত্রী সহবাস করাতে তার হজ্ব নষ্ট হবে না তবে তার উপর দুবনা তথা উট বা গরু কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে সহবাস করলে হজ্ব নষ্ট হয়ে যাবে। হা জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর সহবাস

করাতে হজ্ব নষ্ট হবে না। কেননা, জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুহরিম তবে যেহেতু জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর হালাল হওয়ার সময় এসে যায় তাই এক্ষেত্রে হজ্ব নষ্ট হবে না।

আমাদের দলিল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা. এর বাণী— مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করল তার হজ্ব পূর্ণ হয়ে গেল।

উক্ত হাদীসে যদিও সর্ব কাজ শেষ হওয়াটা উদ্দেশ্য নয়, তথাপি উকুফে আরাফার পর হজ্ব নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ। তবে তার বুদনা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর উক্তি—

إذَا جَامَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ نُسُكُهُ وَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ إذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ فَحَجَّتُهُ تَامَّةٌ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ

যে ব্যক্তি উকুফে আরফার পূর্বে সহবাস করল তার হজ্ব নষ্ট হয়ে গেল এবং তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। আর যে ব্যক্তি উকুফে আরাফার পর সহবাস করল তার উপর বুদনা ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয়ত সহবাস উপকার লাভের সর্বোচ্চ মাধ্যম তাই এর ফলে বড় ধরণের কিছু আবশ্যক হবে। আর তা হল বুদনা। সুতরাং উকুফে আরাফার পর সহবাস দ্বারা হজ্ব নষ্ট হয় না। তবে বুদনা ওয়াজিব হবে।

قوله : أَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ الخ : হলকের পরে তাওয়াফের পূর্ব পর্যন্ত মুহরিম পূর্ণরূপে হলাল হয়নি। সুতরাং এমতাবস্থায় সহবাস করলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। যেহেতু ইহা লঘু অপরাধ। তবে হা সেলাইকৃত কাপড় পরলে বা সুগন্ধ ব্যবহার করলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে যদি উমরার অধিকাংশ তাওয়াফ তথা চার চক্কর দেওার পর সহবাস করে তাহলে তার উমরা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে সে উমরার ক্রীয়াকর্ম সম্পন্ন করবে এবং তার কাজা আদায় করবে। আর সহবাসের দরুন বকরী (দম) ওয়াজিব হবে। আর যদি অধিকাংশ তাওয়াফের পর সহবাস করে ফেলে তাহলে তার উমরা ফাসিদ হবে না। তবে এ সহবাসের দরুন বকরী (দম) ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন উভয় ক্ষেত্রে উমরা ফাসিদ এবং উভয় ক্ষেত্রে উট কুরবানী দিতে হবে। তিনি উমরাকে হজ্বের উপর কিয়াস করেছেন। কেননা, তার মতে উমরা হজ্বের ন্যায় ফরজ। তাই হজ্ব যেভাবে তাওয়াফের অধিকাংশের পূর্বে বা পরে সহবাস দ্বারা ফাসিদ হয়ে যায়। তদ্রূপ উমরা ও ফাসিদ হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল হল : উমরা সুন্নাত, তাই তা হজ্বের তুলনায় নিম্ন মানের আমল। তাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য ওমরাতে বকরী আর হজ্বের বেলায় উট কুরবানী ওয়াজিব।

قوله : وَ جِمَاعُ النَّاسِيْ كَالْعَامِدِ الخ : ভুলে সহবাস করার দরুন ইহরাম নষ্ট হয়ে যাবে যেভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করলে ইহরাম নষ্ট হয়ে যায়। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, ভুলে সহবাস করার দরুন হজ্ব নষ্ট হবে না। যেভাবে ভুলে সহবাস করলে রোযা নষ্ট হয় না।

আমাদের দলিল হল : ইহরাম অবস্থায় বিশেষ উপকার অর্জন করাতে হজ্ব নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং তা ভুলে হউক বা সুস্থ হউক সবই যেভাবে ভুলে সহবাস বা খুন্ড স্ত্রীলোকের সাথে সহবাসের দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয় এবং حرمت مصاهرة ও সাব্যস্ত হয়। অনুরূপ হজ্ব নষ্ট হওয়ার মূল সহবাসের সাথে সম্পৃক্ত।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর কিয়াসের জবাব হল, ইহরামের অবস্থা হল নামাযের অবস্থার ন্যায়। সুতরং যেভাবে নামাজে ভুল করাকে ওজর হিসাবে গণ্য করা হয় না তেমনি ইহরামের বেলায়ও ভুলকে ওজর হিসাবে গণ্য করা হবে না।

أَوْ طَافَ لِلرُّكْنِ مُحْدِثًا وَبَدَنَةٌ لَوْ جُنُبًا وَيُعِيدُ وَصَدَقَةٌ لَوْ مُحْدِثًا لِلْقُدُومِ وَالصَّدْرِ أَوْ تَرَكَ أَقَلَّ طَوَافِ الرُّكْنِ وَلَوْ تَرَكَ أَكْثَرَهُ بَقِيَ مُحْرِمًا أَو تَرَكَ أَكْثَرَ الصَّدْرِ أَو طَافَهُ جُنُبًا وَصَدَقَةٌ بِتَرْكِ أَقَلِّهِ أَو طَافَ لِلرُّكْنِ مُحْدِثًا وَلِلصَّدْرِ طَاهِرًا فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَدَمَانِ لَوْ طَافَ لِلرُّكْنِ جُنُبًا أَوْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَسَعَى مُحْدِثًا وَلَم يُعِدْهُمَا أَوْ تَرَكَ السَّعْيَ أَوْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ تَرَكَ الْوُقُوفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ رَمَى الْجِمَارَ كُلَّهَا أَوْ رَمَى يَوْمٍ أَوْ أَخَّرَ الْحَلْقَ أَوْ طَوَافَ الرُّكْنِ أَوْ حَلَقَ فِي الْحِلِّ وَدَمَانِ لَوْ حَلَقَ الْقَارِنُ قَبْلَ الذَّبْحِ -

অনুবাদ : অথবা অজু ছাড়া কা'বা শরীফের তাওয়াফ (জিয়াত) করে (তবে তার উপর বকরী ওয়াজিব হবে।) আর যদি জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফ করে তবে বুদনা ওয়াজিব। আর অজু ছাড়া তাওয়াফে কুদুম বা তাওয়াফে সদর হলে তা পুণরায় করবে এবং সদকা ওয়াজিব হবে। অথবা তাওয়াফে জিয়ারতের কম চক্কর ছেড়ে দেয় (অর্থাৎ এক দুই বা তিন চক্কর ছেড়ে দেয়) তবে তার উপর বকরী ওয়াজিব হবে।) যদিও সে বেশি ছেড়ে দেয় (অর্থাৎ চার বা ততোধিক ছেড়ে দেয়) তবে সে ইহরাম অবস্থায় থাকবে। কিংবা তাওয়াফে সদরের অধিকাংশ ছেড়ে দেয় বা জুনুবি অবস্থায় তাওয়াফ করে (তবে তার উপর বকরী ওয়াজিব হবে)। আর তার (তাওয়াফে সদরের) কম চক্কর ছেড়ে দিলে সদকা ওয়াজিব হবে অথবা অজু ছাড়া তাওয়াফে জিয়ারত করে এবং তাশরীকের দিনগুলোর শেষ দিকে তাহারাত অবস্থায় বিদায়ী তাওয়াফ করে (তবে তার উপর বকরী ওয়াজিব হবে।) আর যদি জুনুবী অবস্থায় উক্ত তাওয়াফে জিয়ারত করে তবে দুটি দম ওয়াজিব হবে। কিংবা অজুহীন অবস্থায় উমরার তাওয়াফ ও সায়ী করে (তবে তার উপর বকরী ওয়াজিব।) এবং তা পুনরায় করতে হবে না। অথবা সায়ী ছেড়ে দেয় (তবে তার উপর বকরী ওয়াজিব।) কিংবা ইমামের পূর্বে আরাফা থেকে ফিরে আসে (তবে তার উপর বকরী ওয়াজিব হবে।) অথবা মুযদালিফায় অবস্থান বা সকল দিনের কঙ্কর নিক্ষেপ বা এক দিনের কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেয় (তবে তার উপর বকরী ওয়াজিব হবে।) অথবা হিল্লে (হারামের বাইরে) মাথা মুন্ডায় তবে (তার উপর) বকরী (দম) ওয়াজিব হবে। আর যদি কারীন হজ্বকারী কুরবানীর পূর্বে মাথা মুন্ডায় তবে দুটি দম ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : أَوْ طَافَ لِلرُّكْنِ مُحْدِثًا الخ : **মুহরিম ব্যক্তি যদি তাওয়াফে জিয়ারত অজুহীন** অবস্থায় করে তবে সে **রুকনের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করাতে দম তথা বকরী কুরবানী করা** ওয়াজিব হবে। আর যদি সে তাওয়াফে জিয়ারত **জানাবত অবস্থায়** করে তবে তার উপর বাদনাহ তথা উট বা গরু কুরবানী করা এবং তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হবে।

দলিল হল হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এরূপই বর্ণিত আছে। দ্বিতীয়তঃ জানাবত হদসের তুলনায় গুরুতর। সুতরাং উভয়টির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য হদসের ক্ষেত্রে বকরী আর জানাবতের ক্ষেত্রে বুদনা আবশ্যক হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী তাওয়াফে জিয়ারত হদস অবস্থায় করলে পুনরায় তা

আদায় করা মুস্তাহাব। আর যদি জানাবাত অবস্থায় আদায় করে তবে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি হদসের সাথে তাওয়াফের পর পুনঃ বা অজুর সাথে করে তবে তার উপর দম বা অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। তেমনি যদি জানাবতের সাথে তাওয়াফের পর কুরবানির দিনগুলোতে পুনঃ তাওয়াফ করে ফেলে তবে তার উপরও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

قوله : وَصَدَقَةٌ لَوْ مُحْدِثًا لِلْقُدُوْمِ الخ : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তাওয়াফে কুদূম বা তাওয়াফে সদর অজুহীন অবস্থায় করলে তা গ্রহণীয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ - উক্ত আয়াতে তাহারাতের কোন শর্তারোপ করেন নি। আর অন্য কোন খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর জিয়াদতী সহীহ নয়। মোটকথা তাওয়াফে কুদুম বা সদর অজুহীন অবস্থায় করলে তা গ্রহণীয় কিন্তু তা অজুহীন অবস্থায় করাতে তাতে ক্রটি এসে গেছে। সুতরাং ক্রটির ক্ষতিপুরণের জন্য সদকা ওয়াজিব হবে।

قوله : اَوْ تَرَكَ اَقَلَّ طَوَافِ الرُّكْنِ الخ : মুহরিম ব্যক্তি যদি তাওয়াফে জিয়ারতের অধিকাংশের কম অর্থাৎ এক বা দুই বা তিন চক্কর ছেড়ে দেয় তবে তার উপর বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা, সাত চক্করের মধ্যে তিন বা তার চেয়ে কম চক্কর ছেড়ে দেয়ার ক্রটি সামান্য হওয়ার কারণে তা হদসের কারণে সৃষ্টি হওয়া ক্রটি সাদৃশ্য হয়ে যায়। তাই যেভাবে হদসের দরুন সৃষ্ট ক্রটির জন্য বকরী ওয়াজিব হয় তদ্রূপ তাওয়াফে কম করাতেও বকরী ওয়াজিব হবে। আর যদি মুহরিম ব্যক্তি তাওয়াফে জিয়ারতের অধিকাংশ চক্কর তথা চার বা তার উর্ধ্বে ছেড়ে দেয় তবে তার ইহরাম বাকি থাকবে পুণরায় তাওয়াফ করা পর্যন্ত। কেননা অধিকাংশ ছেড়ে দেয়া তা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়ার হুকুম। সুতরাং সে তার মত হল যে মূলত তাওয়াফই করে নি। আর তাওয়াফে জিয়ারত না করা পর্যন্ত সে মুহরিমই থাকে।

قوله : اَوْ تَرَكَ اَكْثَرَ الصَّدْرِ الخ : যদি কোন হাজী তাওয়াফে সদর (বিদায়ী তাওয়াফ) ছেড়ে দেয় বা তার অধিকাংশ ছেড়ে দেয় অথবা জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফে সদর করে তবে সে ওয়াজিব ছেড়ে দেয়াতে বা তার অধিকাংশ ছেড়ে দেয়াতে কিংবা জুনুবী অবস্থায় আদায় করাতে বকরী (দম) ওয়াজিব হবে। আর মক্কায় অবস্থান রত কাল পর্যন্ত সে তাওয়াফে সদরে আদিষ্ট বলে গণ্য হবে। আর যদি সে এ তাওয়াফের কম ছেড়ে দেয়, অর্থাৎ এক, দুই বা তিন চক্কর তবে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে।

قوله : اَوْ طَافَ لِلرُّكْنِ مُحْدِثًا الخ : ১। যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি অজুহীন অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত করে অতঃপর কুরবানীর দিনসমূহের শেষের দিকে তাহারাতের সাথে তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তাওয়াফ করে তবে তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা, তার তাওয়াফে জিয়ারত হদস অবস্থায় করাতে তা পুণরায় করা ওয়াজিব নয়। বরং মুস্তাহাব। এজন্য তাওয়াফে সদরকে তাওয়াফে জিয়ারতে রূপান্তর করা আবশ্যক নয়। সুতরাং তার তাওয়াফে সদর স্বস্থানে বহাল থাকবে। কিন্তু তাওয়াফে জিয়ারতে ক্রটি করাতে তার ক্ষতিপুরণ হিসাবে একটি বকরী ওয়াজিব হবে।

২। আর যদি মুহরিম ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত করে তবে তার পরবর্তী তাহারতসহ বিদায়ী তাওয়াফকে তাওয়াফে জিয়ারতে রূপান্তরিত করা হবে। এবং ধরে নেয়া হবে যেন সে বিদায়ী তাওয়াফ করে নি। সুতরাং এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তাওয়াফে জিয়ারতে বিলম্ব করাতে একটি দম ওয়াজিব হবে। এবং বিদায়ী তাওয়াফ যা ওয়াজিব তা ছেড়ে দেয়াতে একটি দম ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুটি দম ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন রহ. এর মতে তাওয়াফে জিয়ারতে বিলম্ব করাতে কোন দম ওয়াজিব হবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে শুধু একটি দম ওয়াজিব হবে।

উল্লেখ্য যে, এ ব্যক্তি মক্কা থেকে ফেরার আগ পর্যন্ত তাওয়াফে সদরের অনুমতি রয়েছে। তবে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করলে সে হুকুম রহিত হয়ে যাবে।

قوله : اَوْ طَافَ لِعُمْرَتِه الخ : যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি অজু ছাড়া উমরার তাওয়াফ করে অতঃপর অজুহীন অবস্থায় সায়ী করে তবে মক্কাতে উপস্থিত থাকা পর্যন্ত পুনরায় অজু অবস্থায় তাওয়াফ ও সায়ী করা আবশ্যক যদি সে পুনরায় আদায় করে নেয় তবে দম বা সদকা ওয়াজিব হবে না। তাওয়াফ পুণরায় আদায় করার কারণ হল যাতে পূর্বের সৃষ্ট ত্রুটি রহিত হয়ে যায়। আর যদিও সায়ী এর ক্ষেত্রে তাহারাত শর্ত নয়, তবে তা তাওয়াফের অনুগামী হওয়াতে পুণরায় তাওয়াফের পর সায়ী করবে। আর যদি সে পুণরায় আদায় না করেই মক্কা থেকে বের [illegible] যায় তবে তার উপর বকরী (দম) ওয়াজিব হবে। কেননা, সে তাহারাত ছেড়ে দিয়েছে যা তাওয়াফের জন্য ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিব ছেড়ে দেয়াতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে যাতে ক্ষতি পুরণ হয়ে যায়। তবে পুণরায় কাজা হিসাবে মক্কাতে যেয়ে তা আদায়ের নির্দেশ দেয়া হবে না। বরং তা দমের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে যাবে।

قوله : اَوْ تَرَكَ السَّعْىَ الخ : যদি কেহ সায়ী ছেড়ে দেয় তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। তবে হা তার হজ্ব পূর্ণ হবে পুণরায় তা আদায় করতে হবে না। কেননা, আমাদের মতে সায়ী হল ওয়াজিব আর ওয়াজিব ত্যাগ করাতে হজ্ব নষ্ট হয় না, বরং কুরবানীর মাধ্যমে সে ক্ষতি পুরণ হয়ে যায়।

قوله : اَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ الخ : যদি মুহরিম ব্যক্তি আরাফা থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরে আসে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক রহ., ইমাম আহমদ রহ. এর মতামত তাই। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর একটি মতামত ইহা। আর দ্বিতীয় মতামত হল তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর উক্ত মতের দলিল হল হজ্বের রুকন হল আরাফায় অবস্থান। তাই উকুফে আরাফাকে দীর্ঘায়ীত না করায় তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আমাদের দলিল হল, উকুফে আরাফাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা ওয়াজিব। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— فَادْفَعُوْا بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ তোমরা সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হবে। অন্যত্র রাসূল সা. ইরশাদ করেন—

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اَهْلَ الشِّرْكِ كَانُوْا يَدْفَعُوْنَ مِنْ هٰذَا الْمَوْضِعِ اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ عَلٰى رُئُوْسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِمِ الرِّجَالِ فِىْ وُجُوْهِهَا وَ اِنَّا نَدْفَعُ بَعْدَ اَنْ تَغِيْبَ -

মুশরিকরা এস্থান (আরাফা) থেকে রওয়ানা হতো যখন সূর্য পুরুষের মুখায়বের উপর পাগড়ীর ন্যায় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে। আর আমরা সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হব। উক্ত দু হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, আরাফাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা ওয়াজিব। সুতরাং ইমামের পূর্বে সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজীব লঙ্ঘন, তাই দম ওয়াজিব হবে।

قوله : اَوْ تَرَكَ الْوُقُوْفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الخ : যদি মুহরিম ব্যক্তি মুযদালিফায় অবস্থান ছেড়ে দেয় তবে তার উপর দম ওয়াজিব। কেননা, মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিব লঙ্ঘন করাতে দম ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি মুহরিম কঙ্কর নিক্ষেপ করে না যা ওয়াজিব, অর্থাৎ ১০-১১-১২-১৩ ই জিলহজ্জের কোন দিনই কঙ্কর নিক্ষেপ করে না অথচ তা ওয়াজিব, তবে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, সত্তাগত এস্থানের দিক থেকে সবকটি কঙ্কর নিক্ষেপ একই শ্রেণীভুক্ত। অতএব সব কটি رمى কে একটি رمى গণ্য করে একটি দম ওয়াজিব হবে। যেমন মুহরিম শরীরের চুল মুন্ডালে একই দম ওয়াজিব হয়ে থাকে।

আর যদি একদিনের رمى ছেড়ে দেয় তবেও একটি ওয়াজিব ছেড়ে দেয়াতে একটি দম ওয়াজিব হবে। যেভাবে শরীরের একস্থানের চুল মুন্ডালে একটি দম ওয়াজিব হয়।

قوله : اَوْ اَخَّرَ الْحَلْقَ الخ : যদি কেহ মাথা মুন্ডাতে বিলম্ব করে এমনকি কুরবানির দিনগুলো চলে যায় তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যদি তাওয়াফে জিয়ারতে বিলম্ব

করে তবুও তার উপর দম ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন রহ. এর মতে দম ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইন রহ. এর দলিল হল : যদি নিজ সময় থেকে ফউত হয়ে যায় তবে তার কাজা আদায় করাতে ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। তার সাথে অন্য কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যেমন নামায স্বীয় সময় থেকে বিলম্বিত হয়ে কাজা হয়ে যাওয়াতে শুধু কাজা ওয়াজিব হবে, অন্য কোন কিছু ওয়াজিব হয় না। তেমনি হজ্বের কোন ওয়াজিব বিলম্বিত বা আগপিছ করাতে কাজা ছাড়া কোনরূপ দণ্ড ওয়াজিব হয় না। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল— হযরত আব্বাস রাযি. এর হাদীস— أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا عَلَى نُسُكٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ যে ব্যক্তি হজ্বের একটি আমলের উপর অন্য আমলকে অগ্রবর্তী করবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয়তঃ যে আমল কোন স্থানের সাথে নির্দিষ্ট সে আমল সে স্থান থেকে বিলম্বিত করলে দম ওয়াজিব হয়। যেমন, যদি কেহ ইহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম করে অতঃপর ইহরাম বাধে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ কোন আমল তার সময় থেকে বিলম্বিত করলে দম ওয়াজিব হবে।

قوله : أَوْ حَلَقَ فِي الْحِلِّ الخ : যদি হাজী হারামে মাথা না মুন্ডায়ে হিল তথা হারামের বাইরে মুন্ডন করে তবে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী দম ওয়াজিব হবে। কেননা, হলকের ক্ষেত্রে মিনায় হলক করা সুন্নাত। ইহা রাসূলুল্লাহ্ সা. ও সাহাবায়ে কেরামসহ পরবর্তী মুসলমানগণের ধারাবাহিক আমল এভাবে চলে আসছে। এদিকে মিনা হারামের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ ধারাবাহিকতা থেকে সাব্যস্ত হয় যে, হারামের মধ্যে হলক করা ওয়াজিব। তাই এর বাইরে হলক করলেও ওয়াজিব তরক হয়। যার ক্ষতিপূরণের জন্য দম ওয়াজিব হবে।

قوله : وَدَمَانِ لَوْ حَلَقَ الخ : হজ্বে কিরান কারী যদি কুরবানী করার পূর্বে হলক করে তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তার উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা, যেহেতু সে হলককে কিরানের কুরবানীর পূর্বে করেছে যা অসময়ে হয়েছে বিধায় একটি দম ওয়াজিব হবে। আর কিরানের দমকে বিলম্বিত করার কারণে আর একটি দম ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন রহ. এর মতে এক্ষেত্রে একটি দম ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ হলক তার সময় মত না করাতে একটি দমই ওয়াজিব হবে। আর কিরানের কুরবানী বিলম্বিত করার দরুন কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

فَصْلٌ : إِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَهُوَ قِيمَةُ الصَّيْدِ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ فِي مَقْتَلِهِ أَوْ أَقْرَبِ مَوْضِعٍ مِنْهُ فَيَشْتَرِي بِهَا هَدْيًا وَذَبَحَهُ إِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ هَدْيًا أَوْ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَالْفِطْرَةِ أَوْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا وَلَوْ فَضَلَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا وَإِنْ جَرَحَهُ أَوْ قَطَعَ عُضْوَهُ أَوْ نَتَفَ شَعْرَهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَ مِنْهُ وَتَجِبُ الْقِيمَةُ بِنَتْفِ رِيشِهِ وَقَطْعِ قَوَائِمِهِ وَحَلْبِهِ وَكَسْرِ بَيْضِهِ وَخُرُوجِ فَرْخٍ مَيِّتٍ بِهِ -

---

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : মুহরিম যদি শিকার (হত্যা) করে কিংবা যে হত্যা করেছে তাকে দিক নির্দেশনা দেয় তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর তা হল শিকারের মূল্য। (শিকার করার স্থানে বা তার নিকটে কোন স্থানে দুজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে।) অতঃপর যদি তা হাদি ক্রয় করার সমপর্যায়ের হয় তবে একটি হাদী ক্রয় করে জবাই করবে। অথবা প্রত্যেক মিসকিনকে একদিন খাওয়ানোর পরিবর্তে রোজা

রাখবে। আর যদি আধা সা' থেকে কম বেচে থাকে তবে তা সদকা করে দেবে, নতুবা তার পরিবর্তে একদিন রোজা রাখবে। আর যদি মুহরিম শিকারকে আহত করে দেয় বা তার অঙ্গ কেটে দেয় কিংবা তার পশম উপড়ে ফেলে তবে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সে পরিমাণ ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। আর পাখির পালক উপড়ে ফেলাতে শিকারের হাত পা কেটে ফেলাতে দুধ দুহন করাতে ডিম ভেঙ্গে ফেলাতে এবং মৃত পাখির ছানা বের হওয়াতে মূল্য ওয়াজিব হবে।

শব্দার্থ : دَلَّ عَلٰی - পথ দেখানো। পরিচালিত করা। تَقْوِيْم - জরিফ। نَتَفَ (ض) نَتْفًا - উপড়ানো, তুলে ফেলা। رِيْش (ج) أَرْيَاش - (পাখির) পালক, সম্পদ। فَرْخ (ج) فِرَاخ - أَفْرَاخ - পাখির ছানা, মুরগির বাচ্চা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : اِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدًا الخ : মুহরিম যদি নিজে কোন প্রাণী শিকার করে অথবা অন্য কাউকে শিকার সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে আর সে তা হত্যা করে তবে উভয় ক্ষেত্রেই মুহরিমের উপর দম আবশ্যক হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

মুহরিম অবস্থায় তোমরা শিকার করো না, আর তোমাদের মধ্য থেকে যে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করল তার উপর নিহত শিকারের অনুরূপ চতুষ্পদ প্রাণীর দণ্ড ওয়াজিব। মুহরিম নিজে হত্যা করলে তা তো স্পষ্ট অপরাধ। অনুরূপ শিকার দেখিয়ে দেওয়া বা শিকারের স্থান বলে দেওয়া ও শিকারের মত অপরাধ। সুতরাং যদি কোন মুহরিম অন্য কোন মুহরিমকে অথবা হালালকে দিক নির্দেশনা দেয় আর অন্য কোন হালাল ব্যক্তি তা হত্যা করে তবে মুহরিমের উপর দন্ড ওয়াজিব আর যদি নির্দেশ প্রাপ্ত মুহরিম হয় তবে দুনু জনের উপর দন্ড ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নিকট নির্দেশকারীর উপর কোন অবস্থাতেই দন্ড ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিক রহ. এর অভিমত অনুরূপ। তার দলিল হল : আল্লাহর বাণী—

وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে দন্ডের সম্পর্ক হচ্ছে হত্যার সাথে সুতরাং শিকারের দিকে দিক নির্দেশনা করা হত্যা নয়। একারণেই নির্দেশদাতার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আমাদের দলিল হল : হযরত আবু কাতাদা রাযি. এর হাদীস—

أَنَّهُ أَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ حَلَالٌ وَ أَصْحَابُهُ مُحْرِمُوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ أَشَرْتُمْ هَلْ دَلَلْتُمْ هَلْ أَعَنْتُمْ فَقَالُوْا لَا فَقَالَ إِذًا فَكُلُوْا -

তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি হালাল ছিলেন এবং তার সাথীরা মুহরিম ছিল। নবী কারীম সা. তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি ইঙ্গিত করেছিলে, তোমরা কি দিক নির্দেশনা দিয়েছিলে, তোমরা কি সাহায্য করেছিলে? তারা সকলে বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তাহলে তোমরা খেতে পার।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকারের দিকে ইঙ্গিত করা, শিকারের পথ বলে দেয়া অথবা শিকার করতে সাহায্য করা সবই নিষেধ। দ্বিতীয়ত হযরত আতা ইবনে রাবাহ রহ. বলেন, লোকদের এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে হারামের শিকার যে দেখিয়ে দিবে তার উপর দন্ড ওয়াজিব। ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন, কোন সাহাবী থেকে এর বিপরীত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নি। অতএব, ইজমা প্রতিষ্ঠিত হল যে, মুহরিম শিকার দেখিয়ে দিলে তার উপর দন্ড ওয়াজিব হবে।

অপর দিকে বন্য প্রাণী তার বন্যতা ও লোকচক্ষুর আড়ালে থাকায় নিরাপত্তায় ছিল। আর উল্লেখিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সে নিরাপত্তাকে বিনষ্ট করা হল। আর এ কারণে মুহরিমের উপর দন্ড ওয়াজিব হবে। উল্লেখ্য যে, মুহরিমের জন্য স্থলের প্রাণী হারাম, তবে জলের প্রাণী তথা মাছ শিকার করা হালাল। কেননা, আল্লাহর বাণী— أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 'তোমাদের জন্য জলের শিকার হালাল।' উক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল মুহরিমের জন্য জলের শিকার শিকার করা এবং খাওয়া সবই হালাল।

قوله : وهو قيمة الصيد الخ : ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে শিকারের দন্ড হল যেখানে শিকার হয়েছে সেখানে দুজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি গিয়ে শিকারের মূল্য নির্ধারণ করবে। আর যদি সেখানে শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য পাওয়া যায় না, তবে তার নিকটতম স্থানে গিয়ে মূল্য নির্ধারণ করা হবে। অতঃপর যদি উক্ত মূল্য হাদীর মূল্য পর্যন্ত পৌছে তবে মুহরিমের ইচ্ছা স্বাধীনতা রয়েছে, সে চাইলে উক্ত মূল্য দ্বারা হাদী ক্রয় করে জবেহ করবে, নতুবা উক্ত মূল্য দ্বারা খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতঃ তা মিসকীনদের মাঝে ফিতরার ন্যায় অর্থাৎ তা গম হলে প্রতি মিসকীনকে অর্ধসা' গম করে দিবে। আর যদি তা খেজুর বা যব হয় তবে প্রতি মিসকীনকে এক সা' করে দিবে। অথবা ইচ্ছা করলে মুহরিম প্রতি মিসকীনকে খাওয়ানোর পরিবর্তে রোজাও রাখতে পারে। তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে যে সকল প্রাণীর সমতুল্য গঠনের প্রাণী রয়েছে সে ক্ষেত্রে সমতুল্য প্রাণী দন্ডরূপে ওয়াজিব হবে। আর যেসকল প্রাণীর আকৃতিগত সাদৃশ্যতা নেই ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে তার মূল্য ওয়াজিব হবে। তাদের দলিল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী— فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ যে প্রাণী হত্যা করা হয়েছে তার সমতুল্য প্রাণী দন্ডরূপে ওয়াজিব হবে। আর শিকারকৃত প্রাণীর সমতুল্য সেটাই হবে যা আকৃতির দিক থেকে হত্যাকৃত প্রানীর সাদৃশ্য। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত نَعَمِ তো আর মূল্যকে বলা হয় না। তাই মূল্য ওয়াজিব হবে না বরং হত্যাকৃত পশুর সমপর্যায়ের প্রাণী ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে যেসব প্রাণীর আকৃতিগত সাদৃশ্য প্রাণী নেই যেমন চড়ুই, কবুতর ইত্যাদি সেগুলোর ক্ষেত্রে মূল্য ওয়াজিব হবে। শায়খাইন রহ. এর দলিল : আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত مثل শব্দটি مطلق সুতরাং তা আকৃতিগত ও গুণগত সমতুল্যতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে আয়াতে আকৃতিগত সমতুল্যতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, চড়ুই কবুতর ইত্যাদির আকৃতিগত প্রাণী নেই। তাই আয়াতে مثل দ্বারা গুণগত সমতুল্যতা উদ্দেশ্য। আর তাই হল প্রাণীর মূল্য। আর শরিয়তে গুণগত সমতুল্যতার নজীর রয়েছে। যেমন, যদি কেহ কারো কাপড় নষ্ট করে ফেলে তবে তার উপর উক্ত কাপড়ের গুণগত সমতুল্যতা অনুযায়ী মূল্যই নির্ধারিত হয়। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর কাউল অনুযায়ী যদি কিছু সংখ্যাকে আকৃতিগত আর কিছু সংখ্যাকে গুণগত সমতুল্য নির্ধারণ করা হয়। তবে عموم مشترك বা প্রকৃত ও রূপকার্থে একত্র করা লাজিম হয়। অথচ عموم مشترك ও جمع بين الحقيقة والمجاز উভয়টিই অগ্রহণযোগ্য। তাই আয়াতে ব্যবহৃত مثل এর দ্বারা গুণগত সমতুল্যতা অর্থাৎ মূল্যই উদ্দেশ্য হবে।

قوله : يقومه عدلان الخ : শিকারের মূল্য নির্ধারণ করা হবে দুজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির নির্ধারণের ভিত্তিতে। সুতরাং যখন হত্যাকৃত প্রাণীর মূল্য নির্ধারণ করা হল তখন শায়খাইনের মতে হত্যাকারী মুহরিম সে ইচ্ছা করলে এ মূল্য দ্বারা হাদী ক্রয় করে মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দেবে। অথবা খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতঃ তা সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ মিসকীনদেরকে দিয়ে দিবে অথবা একটি সদকায়ে ফিতর একটি রোজা রাখবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ রহ. ও শাফেয়ী রহ. এর মতে হত্যাকারীর এখতিয়ার দুজন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিই নির্ধারণ করবে। যা হোক শায়খাইন রহ. এর দলিল হল : হাদী ক্রয় করা বা খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করা কিংবা রোজা রাখা এগুলির ইখতিয়ার প্রদানের মূলে দায়গ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সহজ করার অনুমোদন। তাই শিকারীর হাতেই সে এখতিয়ার থাকবে। তা এমন যেভাবে আল্লাহর নামে শপৎ ভঙ্গকারীর কাফফারার বিষয়টি শপথ ভঙ্গকারীর এখতিয়ারে

থাকে। অতএব, এখানেও উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির এখতিয়ার শিকারীর হাতেই থাকবে।

قوله : وَلَوْ فَضَلَ اَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ الخ : যদি শিকারী তার উপর আরোপিত দন্ডের ক্ষতিপূরণ করতে চায় রোজার মাধ্যমে তাবে তো প্রতি এক ফিতরার পরিমাণের পরিবর্তে একটি রোজা রাখবে। অর্থাৎ যদি তার শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য হয় ১০০ টাকা পরিমাণ তবে এ ১০০ টাকা পরিমাণে যত গম বা যব ক্রয় করা যাবে তা থেকে প্রতি মিসকীনকে এক ফিতরা পরিমাণ তথা গম হলে অর্ধসা' করে দিতে হবে। সুতরাং অনুমান করে এভাবে যতটি ফিতরা হবে ততটা রোজা রাখবে। যদি শেষ পর্যন্ত অর্ধসা এরকম পরিমাণ থেকে কম থেকে যায় তবে সে চাইলে খরিদ করতঃ তা দান করতে পারবে। নতুবা চাইলে এক দিন রোজা রাখবে। কেননা, এক দিনের কম সময়ের রোজা শরীয়াত সম্মত নেই।

قوله : وَاِنْ جَرَحَهُ اَوْ قَطَعَ عَضْوَهُ الخ : যদি মুহরিম প্রাণীকে যখম করে ফেলে অথবা কোন অঙ্গ কেটে ফেলে অথবা তার পশম উপড়ে ফেলে তবে প্রাণীর যে পরিমাণ অধিক ক্ষতি হয়েছে তা এ মুহরিম শিকারীর উপর ওয়াজিব হবে। যেমন পশু পূর্ণ সুস্থ থাকা অবস্থায় তার মূল্য ছিল ২০ টাকা, কিন্তু প্রাণীর মধ্যে উল্লেখিত ক্ষতি করাতে তার মূল্য হল ১০ টাকা। তবে বাকী দশ টাকা মুহরিমের উপর আবশ্যক হবে। যেভাবে কোন মানুষ কারো কোন প্রকার ক্ষতি করে তবে দেখতে হবে ক্ষতিটি কেমন। যদি পূর্ণ ক্ষতি হয় তবে পূর্ণ জরিমানা আবশ্যক হবে। আর যদি অংশ বিশেষ ক্ষতি হয়ে থাকে তবে অংশবিশেষই তার উপর ওয়াজিব হবে। সুতরাং এক্ষেত্রেও ক্ষতি অনুযায়ী দন্ড ওয়াজিব হবে।

قوله : تَجِبُ الْقِيْمَةُ الخ : আর যদি মুহরিম কোন পাখির পালক উপড়ে ফেলে কিংবা শিকারের হাত পা কেটে ফেলে যার দরুন ঐ পাখি বা প্রাণী মানুষ থেকে আত্মরক্ষা করার উপর সক্ষম থাকে না তবে ঐ শিকারী মুহরিমের উপর পূর্ণ দন্ড তথা প্রাণী বা পাখির পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা, মুহরিম তার নিরাপত্তা বিনষ্ট করা এর অর্থ হল যেন তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে যদি মুহরিম পাখির ডিম ভেঙ্গে ফেলে তবে উক্ত ডিমের মূল্যই ওয়াজিব হবে। তবে যদি ডিম থেকে মৃত ছানা বের হয় তাহলে উক্ত ছানার মূল্যই মুহরিমকে দন্ড হিসাবে দিতে হবে। কেননা, ডিম হচ্ছে শিকারের মূল্য। কারণ এতে শিকারে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। তাই নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তা শিকারের স্থলবর্তী হিসাবে ধার্য্য করা হবে। আর ডিম থেকে মৃত ছানা বের হওয়া যা পূর্বে মৃত ছিল বলে ধারণা করা যায় না। কেননা, হতে পারে ভাঙ্গার কারণে ছানার মৃত্যু হয়েছে সুতরাং এ সম্ভাবনা থাকার কারণে মৃত ছানা বের হলেও তার মূল্য দন্ড হিসাবে ওয়াজিব হবে।

وَلَا شَيْءَ بِقَتْلِ غُرَابٍ وَحِدَأَةٍ وَذِئْبٍ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبَ وَفَارَةٍ وَكَلْبٍ عَقُوْرٍ وَبَعُوْضٍ وَنَمْلٍ وَبُرْغُوْثٍ وَقُرَادٍ وَسُلَحْفَاةٍ وَبِقَتْلِ قَمْلَةٍ وَجَرَادَةٍ تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ وَلَا يُجَاوِزُ عَنْ شَاةٍ بِقَتْلِ السَّبُعِ وَاِنْ صَالَ لَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ وَلِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ شَاةٍ وَبَقَرَةٍ وَبَعِيْرٍ وَدَجَاجَةٍ وَبَطِّ اَهْلِيٍّ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ بِذَبْحِ حَمَامٍ مُسَرْوَلٍ وَظَبْيٍ مُسْتَأْنَسٍ وَلَوْ ذَبَحَ مُحْرِمٌ صَيْدًا حَرُمَ وَغَرِمَ بِأَكْلِهِ لَا مُحْرِمٌ آخَرُ -

---

অনুবাদ : আর কাক, চিল, নেকড়ে, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, দংশনকারী কুকুর, মশা, পিঁপড়া, বোলতা, আঠালী এবং কচ্ছপ হত্যা করাতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আর উকুন, টিডডি হত্যা করাতে যা ইচ্ছা সদকা করবে।

হিংস্র প্রাণী হত্যা করাতে (এর মূল্য) বকরী থেকে অতিক্রম করবে না। যদি সে (হিংস্র প্রাণী) হামলা করে তবে তা হত্যা করাতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে (শিকার করতে) বাধ্য ব্যক্তি এর বিপরীত, (অর্থাৎ, দন্ড ওয়াজিব হবে) আর মুহরিমের জন্য (গৃহ পালিত) বকরী, গরু, উট, মুরগী এবং পালিত হাস জবেহ করা জায়েয। আর পায়ে লুম বিশিষ্ট কবুতর ও গৃহ পালিত হরিণ জবেহ করাতে তার উপর দন্ড ওয়াজিব হবে। যদি মুহরিম শিকার জবেহ করে তবে তা হারাম। (মৃত হিসাবে ধরা হবে।) এবং তা খাওয়াতে জরিমানা তথা দন্ড ওয়াজিব হবে। তবে অন্য মুহরিমে খাওয়াতে দন্ড ওয়াজিব হবে না।

শব্দার্থ : غُرَابٌ (ج) غِرْبَانٌ - কাক। حِدَاةٌ - চিল। ذِئْبٌ (ج) ذِئَابٌ - নেকড়ে। حَيَّةٌ - সাপ। عَقْرَبٌ - বিচ্ছু। فَارَةٌ (ج) فَارَاتٌ - ইঁদুর, মুষিক। كلب عقور - দংশনকারী কুকুর। بَعُوضٌ - মশা। بُرْغُوثٌ (ج) بَرَاغِيثٌ - বোলতা, পাখা বিহীন এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট। قُرَادٌ - আঠালী। سُلَحْفَاتٌ (ج) سَلَاحِفٌ - কচ্ছপ, কাছিম। قَمْلٌ - উকুন। جَرَادَةٌ - পঙ্গপাল, ফড়িং। مُضْطَرٌّ - বাধ্য, মজবুর। بَطٌّ اَهْلِيٌّ - গৃহপালিত হাস। مُسَرْوَلٌ - পায়ে লোম বিশিষ্ট। غَرِمَ (ض) غُرْمٌ - জরিমানা দেয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَا شَيْئَ بِقَتْلِ الخ : গ্রন্থকার রহ. বলেন, মুহরিম ব্যক্তি কাক, চিল, নেকড়ে, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, দংশনকারী কুকুর মশা, পিপিলিকা, বোলতা, আটালি ও কচ্ছপ হত্যা করে তবে তার উপর কোনরূপ দন্ড ওয়াজিব হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. পাঁচটি দুষ্ট প্রকৃতির প্রাণীকে হিল ও হারামে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছেন। তাহল, চিল, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ও দংশনকারী কুকুর। আর মশা, পিঁপড়া, বোলতা, আটালী এবং কচ্ছপ বন্য শিকার নয়। কেননা, এগুলো মানুষ থেকে পলায়ন করে না বরং মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে এগুলো মানুষের শরীর থেকে সৃষ্টি নয়। তাই বন্য না হওয়ার দরুনও মানুষের শরীর থেকে সৃষ্ট না হওয়ার কারণে তা হত্যা করাতে দন্ড ওয়াজিব হবে না।

উল্লেখ্য যে, হিদায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, কাক দ্বারা ঐ কাক উদ্দেশ্য যে মৃত খায় কখনো শস্য দানাও খায়। কেননা, না পাকই তার প্রধান খাদ্য। সুতরাং সেটা না পাক ভক্ষণকারীর মতোই। তবে যে কাক সাদা ও কালো মিশ্রিত আঃ শব্দ করে তা হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, সেটাকে কাক বলা হয় না। কারণ, তার মূল খাবার হল শস্যদানা। আর কুকুরের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে একটি রিওয়ায়েত হলো যে, দংশনকারী কুকুর ও সাধারণ কুকুর, তেমনি গৃহ পালিত কুকুর ও বন্য কুকুর সবই দন্ড ওয়াজিব না হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। কেননা, এখানে মূলগতভাবে কুকুর শ্রেণীই উদ্দেশ্য।

قوله : وَبِقَتْلِ قَمْلَةٍ وَ جَرَادٍ الخ : যদি মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা বা শরীর থেকে উকুন বের করে মেরে ফেলে অথবা মাটিতে ফেলে দেয় তবে সে যা ইচ্ছা দান করবে। কুদূরী গ্রন্থকারের ভাষ্য অনুযায়ী এক মুঠো খাদ্য সামগ্রীর মতো যৎসামান্য দান করতে হবে। কেহ কেহ বলেন, দুটি অথবা তিনটি মারাতে এক মুষ্ঠি গম, তার চেয়ে বেশি মারলে অর্ধ সা' গম সদকা করবে। সদকা করার দলিল হল : উকুন মানুষের শরীরের ময়লা আবর্জনা থেকে সৃষ্টি হয়। সুতরাং শরীরের ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করলে যেভাবে সদকা ওয়াজিব হয় তদ্রূপ এক্ষেত্রে যৎসামান্য খাদ্য সদকা করা ওয়াজিব হবে।

অনুরূপভাবে যদি মুহরিম টিড্ডি হত্যা করে তবে সে ইচ্ছা মাফিক কিছু সদকা করে দেবে। কেননা, টিড্ডি হল স্থলের শিকার। ইমাম কুদূরী রহ. বলেন, একটি খেজুর একটি টিড্ডি থেকে উত্তম। অর্থাৎ একটি টিড্ডি হত্যা করলে একটি খেজুর দান করতে হবে।

قوله : وَلَايُجَاوِزُ عَنْ شَاةِ الخ : মুহরিম ব্যক্তি যদি হিংস্র প্রাণী হত্যা করে তবে তার উপর এ পরিমাণ দন্ড ওয়াজিব হবে যে, তা বকরীর মূল্যকে অতিক্রম করবে না। তবে ইমাম যুফার রহ. বলেন, হত্যাকৃত প্রাণীর মূল্যই ওয়াজিব হবে, তা যে পরিমাণই হউক না কেন। কেননা তিনি হারাম গুস্ত প্রাণীকে হালাল গুস্ত প্রাণীর উপর কিয়াস করেন। আমাদের দলিল হল, রাসূলুল্লাহ্ সা. এর বাণী- اَلضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيْهِ الشَّاةُ - হিংস্র প্রাণী শিকারভুক্ত এবং তাতে একটি বকরী ওয়াজিব। দ্বিতীয়ত হারাম গুস্ত তথা অভক্ষন যোগ্য প্রাণীর মূল্য নির্ধারণ করা হয় মূলত তার চামড়ার বিবেচনায়। কেননা, হিংস্র প্রাণীর গুস্ত ভক্ষণ করা যায় না। তবে তার চামড়া থেকে উপকৃত হওয়া যায়। সুতরাং শুধু চামড়া বিবেচনা করা হবে। আর বাহ্যত তার চামড়ার মূল্য বকরীর চামড়ার মূল্যকে অতিক্রম করে না। তাই আমরা হিংস্র প্রাণীর জরিমানা নির্ধারণ করেছি বকরীর মূল্য অতিক্রম না করার ভিত্তিতে।

قوله : وَاِنْ صَالَ لَاشَئَ الخ : যদি কোন মুহরিমকে কোন হিংস্র প্রাণী হামলা করে বসে, অতঃপর মুহরিম তাকে হত্যা করে ফেলে তবে ঐ মুহরিমের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, হযরত উমর রাযি. এর উক্তি- اَنَّهُ قَتَلَ سَبُعًا وَ اَهْدَى كَبْشًا وَقَالَ اِنَّا اِبْتَدَأْنَاهُ - তিনি একটি হিংস্র প্রাণী হত্যা করে একটি মেষ হাদীরূপে জবাই করেছিলেন এবং বললেন, আমরা আগে বেড়ে তাকে হত্যা করেছি। হযরত উমর রাযি. এর উক্ত কথার ব্যাখ্যা হল যে, যদি সে আমাদের দিকে তেড়ে আসত তবে মেষ ওয়াজিব হত না।

দ্বিতীয়তঃ মুহরিম শিকারের পিছনে লেগে থাকা নিষেধ, তবে যদি তার উপর অত্যাচার করা হয় তবে তা প্রতিহত করতে নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই তো দুষ্টপ্রকৃতির হিংস্র প্রাণীর অত্যাচারে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিধায় তা প্রতিহত করার অনুমতি রয়েছে। তাই তা হত্যা করার ক্ষেত্রে শরীয়তের অধিকার হিসাবে জাযা ওয়াজিব হবে না।

তবে যদি কেহ প্রচন্ড ক্ষুধায় কিংবা অন্যকোন কারণে শিকার হত্যা করতে বাধ্য হয় আর শিকার করেফেলে তাবে তার উপর কাফ্ফারা তথা দন্ড ওয়জিব হবে। কেননা শরিয়াতে মুহরিমের অপারগতা বশত নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়াকে কাফ্ফারার সাথে আবদ্ধ করেছে। যেমন আল্লাহর বাণী—

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْبِهِ اَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনের সময় মাথা মুন্ডানোর অনুমতি দিয়েছেন। তবে কাফ্ফারার ফিদয়া ওয়াজিব তেমনি যে ব্যক্তি শিকার হত্যা করার তীব্র প্রয়োজনের সম্মুখ হয় তার জন্য ও শিকার হত্যা পূর্বক জাযা আদায় করা ওয়াজিব হবে।

قوله : وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ الخ : গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন মুহরিম যদি ঘন পশম বিশিষ্ঠ কবুতর জবাই করে অথবা গৃহ পালিত হরিন জবাই করে তবে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা এগুলি মূলগত ভাবেই বণ্য স্বভাবের। আর মানুষের সঙ্গলাভে অভ্যস্ত অস্থায়ী। এদিকে মূলনীতি হল মূল অর্থ ধর্তব্য হয়। অস্থায়ী গুণ ধর্তব্য হয়না। এ কারণেই যদি গৃহ পালিত উট জঙ্গলে গিয়ে জঙ্গলী হয়ে যায় অত:পর তা কোন মুহরিম হত্যা করে তবে তার উপর কোনরূপ জাযা ওয়াজিন হবেনা। কেননা মূলগত ভাবে সে গৃহ পালিত প্রানীর অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং উল্লেখিত প্রানীদয়ের মূল যেহেতু বণ্য তাই এগুলি শিকারের অন্তর্ভূক্ত। মুহরিম তা হত্যা করলে জাযা ওয়াজিব হবে।

قوله : وَلَوْ ذَبَحَ مُحْرِمٌ صَيْدًا الخ : মুহরিম ব্যক্তির জবাই কৃত শিকার মৃত ও হারাম হিসাবে গণ্য হবে। তা মুহরিম ও গায়রে মুহরিম সবার জন্য খাওয়া নিষিদ্ধ। তবে ইমাম শাফিঈ (রহঃ) এর মতে যদি মুহরিম অন্য গায়রে মুহরিমের জন্য জবাই করে তবে তা ঐ গায়রে মুহরিমের জন্য খাওয়া জায়েজ, কেননা মুহরিম এ কাজটি গায়রে মুহরিমের জন্য সম্পাদন করেছে, সুতরাং তা যেন গায়রে মুহরিম নিজেই জবেহ করেছে। আমাদের দলিল হল জবাই হল একটি শরীয়াত সম্মত কর্ম। এদিকে মুহরিমের জবাই করা শরিয়াত সম্মত নয়। কেননা আল্লাহতা'আলা ইরশাদ করেন- وَلَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যা করোনা। উক্ত

আয়াতে মুহরিমের শিকার কে হত্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই মুহরিমের জবাই কে জবাই বলেগণ্য করাহয়নি। মোটকথা মুহরিমের জবাইকৃত পশু শরিয়ত সম্মত না হওয়াতে তা মৃত পশুর পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং তা মুহরিম কিংবা গায়রে মুহরিম কারোর জন্য হালাল নয়। অধিকন্তু যদি মুহরিম তার নিজ শিকার কৃত পশু থেকে খেয়েফেলে (অর্থাৎ উক্ত হুকমান মৃত প্রানী থেকে খেয়ে ফেলে) তবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মতে সে যে অংশ ভক্ষণ করেছে তার জরিমানা আবশ্যক হবে। তবে হা এজরিমানা শিকারের কারণে ওয়াজিব হওয়া দন্ডের ভিন্ন। আর যদি শিকারের দন্ড আদায়ের পুর্বে গোশত ভক্ষন করে তাহলে ভক্ষিত গোশতের মূল্য শিকারের দন্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে, ভিন্ন ভাবে আদায় করা আবশ্যক নয়। আর এই জবাই কৃত পশু থেকে অন্য কোন মুহরিম ভক্ষন করে তবে সকলের মতেই তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবেনা। কেননা তার ভক্ষণ করাটা ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়।

وَحَلَّ له لَحْمُ ما اصْطَادَهُ حَلَالٌ وَذَبَحَهُ إِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِصَيْدِهِ وَبِذَبْحِ الْحَلَالِ صَيْدَ الْحَرَمِ قِيمَةٌ يَتَصَدَّقُ بِهَا لَا صَوْمَ وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ أَرْسَلَهُ فَإِنْ بَاعَهُ رَدَّ الْبَيْعَ إِنْ بَقِيَ وَإِنْ فَاتَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَمَنْ أَحْرَمَ وفي بَيْتِهِ أو قَفَصِهِ صَيْدٌ لَا يُرْسِلُهُ وَلَوْ أَخَذَ حَلَالٌ صَيْدًا فَأَحْرَمَ ضَمِنَ مُرْسِلُهُ وَلَايَضْمَنُ لَوْ أَخَذَهُ مُحْرِمٌ

অনুবাদ : হালাল ব্যক্তি যে শিকার ধরেছে বা জবেহ করেছে তার গোশত মুহরিমের জন্য হালাল যদি (মুহরিম) দেখিয়ে না দেয় অথবা শিকারের নির্দেশ না দেয়। আর হারাম এলাকার শিকার হালাল ব্যক্তির জবেহ করাতে মূল্য ওয়াজিব হবে। তা (দরিদ্র দের মাঝে) সদকা করে দেবে। রোজা (যতেষ্ঠ) হবে না। আর যে ব্যক্তি হারামে শিকার নিয়ে প্রবেশ করল (তবে) সে তা ছেড়ে দিবে। (অর্থাৎ ছেড়ে দেয়াটা তার উপর আবশ্যক) আর যদি তা বিক্রয় করে দেয় তবে তা থাকা অবস্থায় বিক্রয় প্রত্যাহার করতে হবে। যদি তা হারিয়ে যায় তবে তার উপর জাযা আবশ্যক। যে ব্যক্তি ইহরাম বাধল অথচ তার বাড়িতে অথবা খাঁচায় শিকার থাকে তবে তা ছাড়বেনা। (অর্থাৎ ছাড়া আবশ্যক নয়।) যদি কোন হালাল ব্যক্তি শিকার ধরে অত:পর ইহরাম বাধে তবে মুক্ত কারী জরিমানা দিবে। আর যদি মুহরিম ধরে (অত:পর তা অন্য কোন ব্যক্তি মুক্ত করে) তবে মুক্তকারীর উপর জরিমানা দিতে হবেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَحَلَّ لَهُ لَحْمُ الخ : যদি কোন হালাল ব্যক্তি শিকার করে এবং মুহরিম তাকে তা দেখিয়ে না দেয় বা হত্যার নির্দেশও না দেয় তবে উক্ত মুহরিমের জন্য উক্ত শিকার থেকে ভক্ষনকরা জায়েজ এবং খাওয়াতে জরিমানা আসবেনা। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রাহঃ) এর মতে যদি হালাল ব্যক্তি মুহরিমকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে শিকার করে চাই মুহরিম তা শিকার করার নির্দেশ করুক বা না করুক সর্ব অবস্থায় মুহরিমের উপর ভক্তিত অংশের মুল্য ওয়াজিব হবে। আমাদের দলিল হল একবার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মুহরিমের জন্য অন্য কোন হালাল ব্যক্তির শিকারের গোশ্‌ত খওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। তা শুনে রাসুলুল্লাহ (সঃ) নিজ কক্ষে শুয়া থেকে উঠে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন কি নিয়ে শোরগোল হচ্ছে। সাহাবায়ে কিরাম পুর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বল্লেন তাতে কোন অসুবিধা নেই। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হল যে, মুহরিমের কোনরূপ ইশারা বা ইংগিত ছাড়া হালাল ব্যক্তির শিকার কৃত প্রাণী মুহরিম খেতে পারবে।

قوله : وَيَذْبَحُ الْحَلَالُ الخ : যদি কোন হালাল ব্যক্তি হারামের ভিতর শিকার জবেহ করে, তবে তার উপর ঐ শিকারের মূল্য ওয়াজিব হবে। সে এমূল্য হারাম এলাকার দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করেদিবে। কেননা হারামের সম্মানার্থে তার অন্তর্ভূক্ত শিকারও নিরাপত্তার অধিকারী। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন হারামের ঘাসকর্তন করা যাবেনা এবং শিকারকে তাড়ানো যাবেনা। অত এব যেহেতু শিকারকে তাড়ানো নিষেধ তাই তাকে হত্যা করার অনুমতির প্রশ্নই উঠেনা। আর যদি হালাল ব্যক্তি শিকার হত্যা করেই ফেলে তবে হরমের সম্মানার্থে শিকারের মূল্য সদকা করা আবশ্যক। তবে হা সে মুহরিমের ন্যায় রোজা রেখে ক্ষতি পুরণ করতে পারবেনা। কেননা মুহরিম ব্যক্তি কর্মের শাস্তি হিসাবে রোজা রাখে, আর রোজা কৃত কর্মের সাজাসরুপ জায়েজ। কিন্তু হালাল ব্যাক্তির উপরক্ষতি পুরণ আবশ্যক হয়। আর ক্ষতি পুরণ মূল্য আদায় করা দ্বারা হয়। রোজা রাখার দ্বারা হয়না।

قوله : وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ الخ : যদি কোন মুহরিম কিংবা হালাল ব্যক্তি কোন শিকার নিয়ে হারামে প্রবেশ করে। তবে তা ছেড়ে দেয়া তার কর্তব্য যদি তা তার হাতে থাকে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ (রাঃ) এর মতে তা ছেড়ে দেয়া তার কর্তব্য নয়। কারণ সে উক্ত প্রাণীর মালিক, আর শরিয়তের হক হল তা ছেড়ে দেয়া। কিন্তু বান্দার মালিকানাধীন বিষয়ে তা প্রকাশ পায়না বিধায় তা ছেড়ে দেয়া তার কর্তব্য নয়। আমাদের দলিল হল: শিকারটি হারামে এসে যাওয়ায় তা হারামের অন্তর্ভক্ত হয়ে গেছে। বিধায় হারামের সম্মান রক্ষার্থে শিকারকে ছেড়ে দেয়া কর্তব্য। তা আটকিয়ে রাখা জায়েজ নেই। কেননা এতে নিরাপত্তার বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়।

قوله : فَإِنْ بَاعَهُ رَدَّ الخ : যদি কোন ব্যক্তি হারামের এলাকায় শিকার নিয়ে প্রবেশ করত: তা বিক্রয় করেফেলে তবে তা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিক্রয় প্রত্যাখান করে তাকে ছেড়ে দেয়া কর্তব্য। কেননা এ বিক্রয় সম্পুর্ন নাজায়েজ। এ তে করে শিকারের উপর হস্তক্ষেপ পাওয়া গেছে যা নিষিদ্ধ। সুতরাং তা প্রত্যাখান করা ওয়াজিব। আর যদি বিক্রয়ের পর তা ধংস বা হারিয়ে যায় তবে বিক্রেতার উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা এ তে নিরাপত্তার মধ্যে হস্তক্ষেপ পাওয়া গেছে যা নিষিদ্ধ।

قوله : وَمَنْ أَحْرَمَ وَفِي بَيْتِهِ أَوْقَفَصِهِ صَيْدًا الخ : যদি কেহ ইহরাম বাধে আর তার বাড়িতে অথবা তার সঙ্গে খাচায় কোন শিকার আটক থাকে। তবে উক্ত শিকার ছেড়ে দেয়া তার উপর ওয়াজিব নয়। কেননা অনেক সাহাবায়ে কেরামগণ এমন অবস্থয় ইহরাম বাধতেন যে তাদের বাড়িতে শিকার ও গৃহ পালিত পশু বন্ধি থাকত। তাদের থেকে সেগুলো ছেড়ে দেয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়নি। আর তা না ছাড়াটাই ব্যাপক ভাবে চলে আসছে। দ্বিতীয়ত এতে করে মুহরিমের জন্য হস্তক্ষেপ পাওয়া যায়নি। কেননা হয়ত শিকার বাড়িতে অথবা খাচায়। এতে করে হস্তক্ষেপের অর্থ পাওয়া যায়না। বিধায় বাড়ির অথবা খাচার শিকারকে ছেড়ে দেয়া আবশ্যক নয়।

قوله : وَلَوْأَخَذَ حَلَالٌ صَيْدًا الخ : ইমাম আবু হানিফা (রঃ)এর মতে যদি কোন হালাল ব্যক্তি শিকার ধরে অত:পর ইহরাম বাধে আর ঐ মুহরিমের হাত থেকে কেহ শিকার ছেড়েদেয় তবে যে ছেড়েদিল তার উপর মালিককে শিকারের ক্ষতি পুরণ দেয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রঃ) এর মতে এমতাবস্থায় ক্ষতি পুরণ দিতে হবেনা। কেননা সে "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" এর পবিত্র দায়ীত্ব আনজাম দিয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন وَمَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ সৎ কর্মশীনদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অতএব যে ব্যক্তি ইহরাম আবস্থায় শিকার কে আটকিয়ে রেখে অপরাধে জড়িত ছিল অত:পর উক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি তা ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে একটি ভাল কাজ করল বিধায় সে দুনিয়াতে ও দন্ড প্রাপ্ত হবেনা এবং আখেরাতে ও শাস্তির যোগ্য হবেনা। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর দলিল : সে ব্যক্তি হালাল আবস্তায় শিকার ধরার কারণে এমন মালিকানা অর্জন করেছে, যা সংরক্ষণ শীল। তাই তার ইহরামের কারণে এমালিকানার সংরক্ষণ শীলতা রহিত হবে না। তাই তা ছেড়েদেয়ার কারনে সংরক্ষণীয় মালিকানা বিনষ্ট করে দিয়েছে, সতরাং মালিকানা বিনষ্ট করার কারণে ক্ষতি পুরণ দিতে হবে। তাই ইহরাম অবস্থায় শিকার ধরার কারণে সে উক্ত শিকারের মালিক হয় না

বিধায় তা কেহ ছেড়েদিলে তার উপর ক্ষতি পুরণ ওয়াজিব হবেনা । কেননা সে মুহরিমের মালিকানা কোন কিছু **বিনষ্ট** করেনি । আর ইহরাম অবস্থায় মালিকানা না হওয়ার কারণ হল যে তখন শিকার করা না জায়েয । আর না জায়েজ পন্থায় কেহ কোন মালের মালিক হতে পারেনা ।

فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ ضَمِنَا وَرَجَعَ آخِذُهُ على قَاتِلِهِ فَإِنْ قَطَعَ حَشِيشَ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرًا غير مَمْلُوكٍ وَهُوَ مِمَّا لَايُنْبِتُهُ النَّاسُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ إِلَّا فِيمَا جَفَّ وَحَرُمَ رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَقَطْعُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ فَعَلَى الْقَارِنِ دَمَانِ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَلَوْ قَتَلَ مُحْرِمَانِ صَيْدًا تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ وَلَوْ حَلَالَانِ لَا وَبَطَلَ بَيْعُ الْمُحْرِمِ صَيْدًا وَشِرَاؤُهُ وَمَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَةَ الْحَرَمِ فَوَلَدَتْ وَمَاتَا ضَمِنَهُمَا وَإِنْ أَدَّى جَزَاءَهَا فَوَلَدَتْ لَا يَضْمَنُ الْوَلَدَ-

অনুবাদ : আর যদি মুহরিমের হাতের শিকার অন্য কোন মুহরিম হত্যা করে তবে উভয়ই জামিন হবে, (অর্থাৎ উভয়ের উপরই জাযা ওয়াজিব হবে ।) এবং যে শিকার ধরেছে সে তা হত্যাকারীর কাছ থেকে (ক্ষতিপুরণ) ফেরত নেবে । আর যদি কেহ হারামের ঘাস বা মালিকানা হীন বৃক্ষ কেটে ফেলে যা সাধারণত মানুষ লাগায়না তাহলে সে তার মূল্যের জামিন হবে, (অর্থাৎ তার মূল্য সদকা করে দিবে ।) তবে (এগুলি থেকে) শুকিয়ে গেলে (এবং তা কর্তন করলে) মূল্য ওয়াজিব হবে না । আর ইজখির (নামক ঘাস) ছাড়া হারামের ঘাসে পশু চরানো বা কাটা হারাম । আর প্রত্যেক বস্তু যা দ্বারা মুফরিদের উপর একটি দম ওয়াজিব হয় তাতে কারীনের উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে । তবে সে যদি ইহরাম না বেধেই মিকাত অতি ক্রম করে (তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে ।) আর যদি দুজন মুহরিম শিকার হত্যা করে তবে জাযা দ্বিগুন হবে । (তাদের প্রত্যেকের উপর পুর্ন জাযা ওয়াজিব হবে ।) আর যদি হালাল হয় তরে দ্বিগুণ হবে না । (অর্থাৎ একটিই জাযা ওয়াজিব হবে ।) আর মুহরিমের শিকার বিক্রয় করা বা তা ক্রয় করা বাতিল বলে গণ্যহবে । যে ব্যক্তি হারামের হরিণী ধরে নিল অতঃপর হরিণী প্রসব করল এবং উভয়ই মরে গেল তবে সে উভয়ের জামিন হবে (অর্থাৎ হরিণী ও সাবকের মূল্য ওয়াজিব হবে ।) সে যদি হরিণীর জাযা আদায় করে নেয় তারপর হরিনী প্রসব করে তবে সে উক্ত বাচ্চার জামিন হবেনা ।

শব্দার্থ : حَشِيشٌ (ج) حَشَائِشُ ঘাস, তরুলতা । جَفَّ (ن) جَفَافًا শুকিয়ে যাওয়া, শুস্ক হওয়া । يُنْبِتُ - افعال থেকে إِنْبَاتًا উৎপন্ন করা, জন্মানো । رَعْيٌ চরানো, যত্ন নেয়া । اَلْإِذْخِرُ একধরনের সুগন্ধ ঘাস । ظَبْيَةٌ (ج) ظَبْيَاتٌ হরিণী, মৃগী ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ الخ : শিকারকারি মুহরিমের হাতের শিকার অন্য কোন মুহরিম হত্যা করলে উভয়ই জামিন হবে । অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকের উপর পুর্ন ক্ষতি পুরণ ওয়াজিব হবে । কেননা শিকার পাকড়াও কারী শিকারের নিরাপত্তা বিলোপ করার মাধ্যমে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করেছে । তাই তার উপর পূর্ণ জাযা ওয়াজিব হবে । আর অন্য মুহরিম তা হত্যা করার মাধ্যমে তাতে স্থায়ীত্ব দান করেছে । নতুবা সম্ভাবনা ছিল তা ছেড়ে

দেয়ার। আর ক্ষতি পুরণ প্রয়োগ করার ব্যাপারে স্থায়ীত্ব দান করা প্রথম অপরাধের সমতুল্য। তাই তা হত্যা কারীর উপরও পুর্ণ জাযা ওয়াজিব হবে। গ্রন্থকার (রাহঃ) বলেনঃ পাকড়াও কারী মুহরিম যে ক্ষতি পুরণ দেবে তা হত্যা কারী মুহরিম থেকে ফেরত নেবে। এটাই হল আমাদের মাযহাব। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার ও সাহাবাইন (রাঃ) এর মতে পাকড়াও কারী ক্ষতি পুরণ নিতে পারবেনা। আমাদের দলিল হল মুহরিম ব্যক্তির শিকার পাকড়াও করা তখন ক্ষতি পুরণের কারণ হবে যখন তার সঙ্গে বিনষ্ট হওয়া সংযুক্ত হবে। কিন্তু সে নিজে তা বিনষ্ট করেনি বরং অন্য মুহরিম তা বিনষ্ট করেছে। সুতরাং হত্যা কারী হত্যা করার মাধ্যমে পাকড়াও কারীর কর্মটিকে বিনষ্ট করার কারণ হয়েছে। এ কারণে ক্ষতি পুরণের বিষয়টি হত্যাকারীর দিকে পত্যাবর্তিত হবে।

قوله : فَإِنْ قَطَعَ حَشِيْشَ الْحَرَمِ الخ : যদি কেহ হারামের ঘাস কেটে ফেলে অথবা মালিক বিহীন **বৃক্ষ** কেটে ফেলে অর্থাৎ এমন বৃক্ষ যা স্বাধারণত মানুষ রোপন করেনা। তবে উক্ত **ঘাস** বা বৃক্ষ কাটার দরুন **তার মূল্য** তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে হা উক্ত ঘাস বা বৃক্ষ শুকিয়ে গেলে তা কর্তন করলে তার মুল্য ওয়াজিব হবেনা। কেননা হারামের কারণে বৃক্ষ কিংবা ঘাস কর্তন করাটা নিষিদ্ধ হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন- لَايُخْتَلٰي خَلَاهَا وَلَايُعْضَدُ شَوْكُهَا :হারামের ঘাস উপড়ানো যাবে না এবং কাটা গাছ ও কাটা যাবেনা সুতরাং মুহরিম ব্যক্তি হারামের ঘাস বা বৃক্ষ স্বাভাবিক ভাবে মানুষে রুপন করে তা নিরাপত্তালাভ কারী নয়। এর উপরই ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা রাসুল (সাঃ) এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত লোকেরা হারাম এলাকায় ফসল ফলায় এবং তা কর্তন করে।

قوله : وَحَرُمَ رَعْيُ حَشِيْشِ الخ : হারামের ঘাসে পশুচরানো কিংবা তা কর্তন করা জয়েজ নেই। তবে হা ইযখির নামক বৃক্ষ হারাম অঞ্চলে কর্তন করা জায়েজ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসূফ (রহঃ) এর মতে হারাম এলাকায় পশু চরানো জায়েয। হা তা কাটার অনুমতি নেই। কেননা, হারামে পশুচরানোর প্রয়োজন রয়েছে। এভাবে যে কেহ সওয়ারী নিয়ে হজ্জ বা উমরা পালনার্থে মক্কায় আসল। এমতাবস্থায় পশু কে হারামের ঘাস থেকে বিরত রাখা ও হারামের বাইরের ঘাসের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দুস্কর। এজন্যই তো চরানোর প্রয়োজনীয়তা প্রমানিত হল আমাদের দলিল: ইতি পুর্বে বর্ণিত হাদীস। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন- لَايُخْتَلٰي خَلَاهَا হারামের ঘাস উপড়ানো যাবেনা। আর উপড়ানো ছাড়াতো পশু চরানো সম্ভব নয়। অপরদিকে হিল এলাকা থেকে ঘাস কেটে এনে প্রয়োজন মিটানো সম্ভব। তবে ইযখির ঘাসের ব্যাপার ভিন্ন। কেননা রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন হারামের ঘাস উপড়ানো যাবেনা এবং এর কাটা বিশিষ্ট উদ্ভিদও কাটা যাবেনা। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন হে আল্লাহর রাসুল (সঃ) ইযখির ছাড়া। কেননা কবরে ও ঘরে তা দ্বারা সুগন্ধি ব্যবহার হয়। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তা শুনে বললেন হ্যা ইযখির ছাড়া। সুতরাং প্রতিয়মান হল হারামের ইযখির ঘাস কাটা বা উপড়ানো তে মুল্য ওয়াজিব হবেনা।

قوله : وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَي الْمُفْرِدِالخ : প্রত্যেক এঅপরাধ যে গুলোর একটিতে লিপ্ত হলে ইফরাদ **হজ্জ** কারীর উপর একটি দম ওয়াজিব হয় সে ক্ষেত্রে কিরান হজ্জ কারীর উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ একটি হজ্জের কারণে আর অপরটি উমরার কারণে তারউপর আবশ্যক হবে। পক্ষন্তরে ইমাম শাফিঈ (রাঃ) এর মতে কিরান কারীর উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। ইমাম মলিক ও আহমদ (রাঃ) এর মতামত অনুরুপ। ইমাম শাফিঈ (রাঃ) এর মতে কারিন ব্যক্তি একটি ইহরাম দ্বারা মুহরিম সুতরাং অপরাধের কারণে একটিই দম ওয়াজিব হবে। আর আমাদের মতে কারিন দুটি ইহরাম তথা হজ্জ ও উমরার ইহরাম দ্বারা মুহরিম। তাই এক অপরাধের কারণে দুটি দম অবশ্যক হবে। তবে হা একটি কারণে আমাদের মতে ও কারীনের উপর একটিই দম ওয়াজিব হতে পারে তাহল কিরানের ইছুক ব্যক্তি ইহরাম না বেধেই মীকাত অতিক্রম করলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে।

قوله : وَلَوْقَتَلَ مُحْرِمَانِ صَيْدًا الخ : যদি দুজন মুহরিম একত্র হয়ে একটি শিকার হত্যা করে তবে উভয়ের উপর দুটি পূর্ণ জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা উভয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ অপরাধ পাওয়া গেছে তাই তাদের উভয়ের উপর পূর্ণ জাযা ওয়াজিব হবে, আর যদি যে কোন দুজন হালাল ব্যক্তি মিলে হারামে কোন শিকার হত্যা করে তবে উভয়ের উপর একটি জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা এক্ষেত্রে ক্ষতি পুরনটি শিকারের স্থলবর্তী। তবে হা তাদের থেকে অপরাধের শাস্তি নেই। আর শিকার একটি হওয়াতে ক্ষতি পুরণ একটিই ওয়াজিব হবে। যেমন দুজন ব্যক্তি মিলে ভুল ক্রমে একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে একটি ই দিয়াত ওয়াজিব হবে। তবে কাফ্ফারা উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা দিয়াত হল পাত্রের ক্ষতি পুরণ তা একজন হওয়াতে একটিই দিয়াত ওয়াজিব। আর কাফ্ফারা হল অপরাধ তথা কর্মের ক্ষতি পুরণ তাই যেহেতু উভয়ের ক্ষেত্রে অপরাধ সমান ভাবে প্রযোজ্য তাই কাফ্ফারা আদায় করা উভয়ের ক্ষেত্রে ওয়াজিব।

قوله : وَيَبْطُلُ بَيْعُ الْمُحْرِمِ الخ : মুহরিম ব্যক্তির শিকার ক্রয় বিক্রয় করা নাজায়েজ। মুহরিম হয়ত শিকার জীবিত ক্রয় করবে।এক্ষেত্রে শিকারের উপর মুহরিমের হস্তক্ষেপ থাকায় তার নিরা পত্তার বিঘ্নতা সৃষ্টি হল অথচ তা নিষিদ্ধ। আর যদি সে জবেহ করে বিক্রয় করে তবে ও তা নিষিদ্ধ। কেননা মুহরিম শিকার হত্যা করাতে তা হারাম তথা মৃত প্রানীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। আর মৃত প্রানী বিক্রয় করা হারাম তাই উভয় ক্ষেত্রে ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ।

قوله : وَمَنْ اَخْرَجَ ظَبْيَةَ الْحَرَمِ الخ : যদি কেহ হারাম অঞ্চল থেকে কোন হরিনীকে তথা শিকার কে ধরে নিয়ে যায়। অত:পর হরিনীটি সন্তান প্রসব করে সে নিজে ও তার সব কটি সাবক মৃত্যু বরন করে তবে পাকড়াও কারীর উপর সবকটির জাযা ওয়াজীব হবে। কেননা সে হরিনী তথা শিকারের নিরাপত্তা ভঙ্গ করে দিয়েছে। অথচ এই হরিনীটি নিরাপত্তার অধিকারী ছিল। আর তার বাচ্চারা স্থলাভিষিক্ত হওয়াতে তার এ গুন তথা নিরাপত্তা বাচ্চাদের মাঝে ও সম্প্রসারিত হবে। হা যাদি সে হরিনের জাযা আদায় করার পর বাচ্চা প্রসব করে এবং তা মৃত্যু বরন করে তবে পাকড়াও কারীর উপর বাচ্চাদের ক্ষতি পুরণ ওয়াজিব নয়। কারন হরিনীর জাযা আদায় করাতে সে আর নিরাপত্তার গুনে গুনান্বিত নয়। এজন্যে হরিনীর জাযা আদায় করার পর প্রসব কৃত বাচ্চারাও নিরাপত্তার অধিকারী হবে না।

بَابُ مُجَاوَزَةِ الْوَقْتِ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ

পরিচ্ছেদ : ইহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম করার বিবরণ

مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَّ عَادَ مُحْرِمًا مُلَبِّيًا أَوْ جَاوَزَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَ وَقَضَى بَطَلَ الدَّمُ فَلَوْ دَخَلَ الْكُوفِيُّ الْبُسْتَانَ لِحَاجَةٍ لَهُ دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ ثُمَّ حَجَّ عَمَّا عَلَيْهِ فِي عَامِهِ ذٰلِكَ صَحَّ عَنْ دُخُولِهِ مَكَّةَ بِلَا إِحْرَامٍ فَإِنْ تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ لَا -

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ইহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম করল অতঃপর ইহরাম বাধা ও তালবিয়া পাঠকরা অবস্থায় ফিরে আসে অথবা (মিকাত) অতিক্রম করে তার পর ওমরার ইহরাম বেধে ফাসিদ করে দেয় এবং

(তার) কাজা আদায় করে তবে দম বাতিল হয়ে যাবে ।আর যদি কোন কুফি(তথা আফাকী) (বনু আমীর এর) বাগানে কোন প্রয়োজনে প্রবেশ করে তাহলে সে ইহরাম ছাড়া মক্কাতে প্রবেশ করতে পারে এবং (সেক্ষেত্রে) তার মিকাত হবে উক্ত বাগান । আর যে ব্যক্তি ইহরাম ছাড়া মাক্কাতে প্রবেশ করে তার উপর দুটি ইবাদত (তথা হজ্ব ও ওমরা) থেকে একটি আবশ্যক । অতঃপর সে এবৎসরই হজ্ব করল বিনা ইহরামে মক্কাতে প্রবেশের জন্য যা তার যিম্মায় ছিল তাহলে তা সহীহ । (বদলারূপে) আর যদি বৎসর বদলে যায় তবে তার এ হজ্ব বিনা ইহরামে মক্কাতে প্রবেশের বদলা রুপে গণ্য হবেনা ।

প্রসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : مَنْ جَاوَزَ الْمِيْقَاتَ الخ : যদি কোন ব্যক্তি হজ্ব বা ওমরা পালনের নিয়াতে হইরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম করে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে । তবে যাদি সে পুনরায় মিকাতে ফিরে এসে ইহরাম বেধে তালবিয়া পড়ে নেয় অথবা মিকাতের ভিতরই ওমরা এর ইহরাম বেধে তা নষ্ট করে ফেলে অতঃপর তার কাজা আদায় করে তবে তার থেকে দম রহিত হয়ে যাবে । আর যদি সে মিকাতে এসে তালবিয়া পাঠ ব্যাতিত মক্কাতে প্রবেশ করে ওমরার তাওয়াফ করে ফেলে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে । পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রা.) এর মতে সে যদি ইহরাম অবস্থায় মিকাতে ফিরে এসে যায় তবে তালবিয়া পাঠ করুক বা না করুক তার উপর কোন রুপ দম ওয়াজিব হবেনা ।

আমাদের দলিল হল উক্ত ব্যক্তি তার ছেড়ে যাওয়া কাজটি তথা ইহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম করাটা যথা সময়ে আদায় করেছে আর যথা সময় হল হজ্বের কার্যক্রম শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত । সুতরাং যথা সময়ে তার ছেড়ে যাওয়া আমল কার্যকর করাতে তার উপর দম রহিত হয়ে যাবে ।

قوله : فَلَوْ دَخَلَ الْكُوْفِيُّ الْبُسْتَانَ الخ : যদি কুফী ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে বাগানে প্রবেশ করে তবে তার জন্য ইহরাম ছাড়া মক্কাতে প্রবেশের অনুমতি রয়েছে । অর্থাৎ গ্রন্থকার (র) এর বর্নিত كوفه দ্বারা উদ্দেশ্য হারামের বহিরাগত এলাকা আর বাগান দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো বনু আমির এর বাগান যা হারামের অন্তর্ভূক্ত ।

যা হোক মাসআলা হল যদি হারামের বহিরাগত কোন ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনে ইহরাম ছাড়া হারামে প্রবেশ করে তবে ক্ষতি পুরণ হিসাবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবেনা । এখন সে যদি মক্কাতে প্রবেশ করতে চায় তবে সে ইহরাম ছাড়া মক্কাতে প্রবেশ করতে পারবে । তবে একথা উদ্দেশ্যে নয় যে ইহরাম ছাড়াই মক্কাতে প্রবেশ করা জায়েয । কেননা মক্কাতে প্রবেশ করতে হলে ইহরাম বাধা আবশ্যক । গ্রন্থকারের উক্তি " তার মীকাত হল বাগান" একথার মর্মার্থ হল উক্ত ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনে নিজ মিকাত অতিক্রম করে হারামের নিকটের বাগানে প্রবেশ করার জন্য ইহরামের প্রয়োজন নেই । এবার যদি সে মক্কাতে প্রবেশ করতে চায় তবে উক্ত স্থানের অধিবাসীদের ন্যায় সে উক্ত বাগান থেকে অর্থাৎ হিল স্থান থেকে ইহরাম বাধবে । তবে হা গ্রন্থকারের বাগান উল্লেখ দ্বারা শুধু বাগান উদ্দেশ্য নয় বরং হিল এর সম্পূর্ণ এলাকা যা মিকাত ও হারামের মধ্যবর্তীতে অবস্থিত সুতরাং অত্র এলাকার বাসিন্ধাও নিজ প্রয়োজনে প্রবশ কারী ব্যক্তি এখান থেকে ইহরাম বাধাতে তাদের উপর কোন ক্ষতিপুরণ ওয়াজিব হবেনা । কেননা এটাই তাদের মিকাত । আর তারা এখান থেকেই ইহরাম বেধেছে ।

قوله : وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِلَا اِحْرَامِ الخ : যদি কেহ ইহরাম ছাড়া মক্কাতে প্রবেশ করে । তবে তার উপর দুটি ইবাদাত তথা হজ্জ কিংবা উমরার যে কোন একটি ওয়াজিব হবে । অত:পর যদি উক্ত ব্যক্তি এ বৎসরই হজ্জ বা উমরার জন্য নিজ মিকাত থেকে ইহরাম বেধে আদায় করে নেয় তবে তার জিম্মায় ওয়াজিব হওয়া হজ্জ আদায় হয়ে যাবে । দ্বিতীয় বার আদায় করতে হবেনা । কেননা ছেড়ে দেয়া আমল তথা বিনা ইহরামে মক্কাতে প্রবেশের দরুণ ওয়াজিব হওয়া হজ্জ কিংবা উমরা সে যথাসময়ে আদায় করেছে । কারণ তার উপর ওয়াজিব ছিল যে কোন ভাবে মক্কার পবিত্রতা রক্ষা করনার্থে ইহরাম বেধে প্রবেশ করা । আর এ বৎসরই উমরা বা হজ্জ আদায়ের মাধ্যমে

তা কার্যকর হয়েছে। তাই দ্বিতীয় বার পৃথক ভাবে তা আদায়ের প্রয়োজন নেই। হা যদি এ বৎসর আদায় না করে অন্য বৎসর হজ্জ কিংবা উমরা আদায় করে তবে পূর্বের ওয়াজিব হওয়া ইবাদাত এ বৎসরের হজ্জ কিংবা উমরার সাথে আদায় হবেনা। বরং দ্বিতীয় বার আদায় করতে হবে। কেননা মক্কায় বিনা ইহরামে প্রবেশের দরুন যে হজ্জ ওয়াজিব ছিল তা তার জিম্মায় অনাদায়ী রূপে রয়ে গেছে। কেননা উদ্দেশ্য হল পূর্ণভাবে পৃথক ইহরামের দ্বারা তা আদায় করা। যেমন কেহ ইতিকাফের নিয়্যাত করলে সে এ বৎসরই রমজান মাসে রুজার সাথে তা আদায় করতে পারবে। পক্ষান্তরে এ বৎসর আদায় না করলে অন্য যে কোন মাসে পৃথক রুজার সাথে তা আদায় করতে হবে। অন্য রমজান মাসে তা আদায় করলে হবেনা।

بَابُ اِضَافَةِ الْاِحْرَامِ اِلَي الْاِحْرَامِ

পরিচ্ছেদ ঃ এক ইহরামের সম্বন্ধ অন্য ইহরামের দিকে করার বিবরণ

مَكِّيٌّ طَافَ شَوْطًا لِعُمْرَةٍ فَأَحْرَمَ بِحَجٍّ رَفَضَهُ وَعَلَيْهِ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ وَدَمٌ لِرَفْضِهِ فَلَوْ مَضَى عَلَيْهِمَا جَازَ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ بِآخَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ حَلَقَ فِي الْأَوَّلِ لَزِمَهُ الْآخَرُ وَلَا دَمَ وَإِلَّا لَزِمَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ قَصَّرَ أَوْ لَا وَمَنْ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ إِلَّا التَّقْصِيرَ فَأَحْرَمَ بِأُخْرَى لَزِمَهُ دَمٌ وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ رَفَضَ عُمْرَتَهُ وَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهَا لَا فَلَوْ طَافَ لِلْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَمَضَى عَلَيْهِمَا يَجِبُ دَمٌ وَنُدِبَ رَفْضُهَا وَإِنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ لَزِمَتْهُ وَلَزِمَهُ الرَّفْضُ وَالدَّمُ وَالْقَضَاءُ فَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا صَحَّ وَيَجِبُ دَمٌ وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أَوْ حَجَّةٍ رَفَضَهَا -

অনুবাদ : মক্কী (উমরার ইহরাম বেধে) উমরার এক চক্কর তাওয়াফ করার পর হজ্জের ইহরাম বেধে নেয় তবে সে হজ্জ ছেড়ে দেবে। এবং তার উপর হজ্জ ও উমরা ওয়াজিব এবং হজ্জ ছেড়ে দেয়াতে দম ওয়াজিব হবে। যদি উভয়টি (হজ্জ ও উমরা) করে নেয় তবে সহীহ (জায়েজ,) এবং তার উপর দম ওয়াজিব। আর যদি কেহ হজ্জের ইহরাম বাধে অত:পর জিল হজ্জের দশ তারিখে আরেকটি হজ্জের ইহরাম বেধে নেয়। সুতরাং যদি প্রথমটিতে হলক করে তবে দ্বিতীয়টি ওয়াজিব হবে এবং দম ওয়াজিব হবেনা নতুবা (প্রথমটিতে হলক না করে দ্বিতীয়টি লাযিম হবে এবং) দম ওয়াজিব হবে। সে চুল কাটুক বা না কাটুক তার উপর দম ওয়জিব হবে যে ব্যক্তি চুল ছাটা ছাড়া উমরা থেকে ফরিগ হয়েছে অত:পর অন্য উমরার ইহরাম বেধেছে তবে দম লাজিম হবে। যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বেধেছে অত:পর উমরার ইহরাম বাধল। তারপর আরাফায় অবস্থান করে তবে তার উমরা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি শুধু আরফার দিকে মুখ করে (অবস্থান করে না) তবে উমরা বর্জন হবে না।

যদি কেহ হজ্জের জন্য তাওয়াফ করে নেয় আত:পর উমরার জন্য ইহরাম বাধে এবং উভয়টির উপর চলে (অর্থাৎ উভয়টির কর্ম চালিয়ে যায়) তবে দম ওয়জিব হবে এবং উক্ত ইহরাম ছেড়ে দেয়া মুস্তাহাব। আর যদি কুরবানির দিনে উমরার ইহরাম বাধে তবে তা তার উপর লাজিম হবে এবং (এদিন) তা বর্জন করা এবং দম ও কাজা আদায় করা আবশ্যক হবে। আর যদি (সে দিনই) তার কার্যাদী চালিয়ে যায় তবে সহীহ এবং দম ওয়াজিব হবে আর যার হজ্জ ফউত হল অত:পর উমরা কিংবা হজ্জের ইহরাম বাধল তবে তা বর্জন করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : مَكِّيٌّ طَافَ شَوْطًا لِعُمْرَةٍ الخ : যদি মাক্কী তথা মক্কাতে অবস্থান কারী উমরার ইহরাম বেধে এক চক্কর তাওয়াফ করে ফেলে তার পর হজ্জের ইহরাম বাধে তবে হজ্জ ছেড়ে দেবে। আর হজ্জ ছেড়ে দেয়ার কারণে তার উপর একটি কুরবাণী ওয়াজিব হবে। আর কাজা সরুপ একটি হজ্জ ও একটি উমরা ওয়াজিব হবে। তবে সাহাবাইন (রাহঃ) এরমতে সে এমতাবস্থায় উমরা ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে তার কাজা আদায় করবে। আর হা এমতাবস্থায় সে উমরা ছেড়ে দেয়ার কারনে একটি দম ওয়াজিব হবে। তাদের দলিল হল হজ্জ ও উমরার মধ্য থেকে একটি ছেড়ে দিতে হবে। কেননা মাক্কীর জন্য উভয়টি একত্র করা শরীয়াত সম্মত নয়। সুতরাং একটি ছাড়তেই হবে। আর হজ্জ ও উমরার ক্ষেত্রে হজ্বের তুলনায় উমরা ছেড়ে দেয়াটাই উত্তম। কেননা, উমরা মর্যাদার দিক থেকেও কর্মের দিক থেকে হজ্বের চেয়ে নিম্ন মানের। অতএব, নিম্ন মানের তথা উমরাহই ছেড়ে দেয়াটা উত্তম হবে। এদিকে কাজা আদায়ের ব্যাপারে ও উমরার কাজা আদায় করাটাও সহজ।

অনুরূপভাবে সাহেবাইন রহ. এর মতে যদি উমরার চার চক্করের কম তাওয়াফ করে তবুও উমরা ছেড়ে দেয়াটা উত্তম। পূর্বোক্ত দলিলের ভিত্তিতে। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে হজ্জ ছেড়ে দেয়াটা উত্তম। কারণ মক্কীর উমরার ইহরামের পর এক চক্কর বা চার চক্করের কম তাওয়াফ করার ফলে উমরার ইহরাম জুরদার হয়ে গেল। কিন্তু হজ্বের ইহরামের কোন আমল না পাওয়ার দরুন তা জোরদার হল না। সুতরাং উমরা যা জোরদার তা আদায় করা হবে আর হজ্ব যা জোরদার নয় তাই বর্জন করা হবে।

উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে হজ্ব কিংবা উমরা থেকে যেটাই বর্জন করবে তার দরুন তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, সে সময়ের পূর্বেই হালাল হয়েছে।

قوله : فَلَوْ مَضَى عَلَيْهِمَا صَحَّ الخ : মক্কী যদি পূর্বের মাসআলার মূল বিষয়বস্তু হিসাবে হজ্ব ও উমরা উভয়টিই পালন করে যায় তবে তা সহীহ হবে। কেননা, যেভাবে সে উভয়টিকে নিজের জন্য নির্ধারণ করেছে তদ্রূপ আদায়ও করেছে। তবে হা মক্কীর জন্য উভয় আমলকে একত্র করা নিষিদ্ধ। সুতরাং নিষেধের পরেও একত্র করাতে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। সে তা দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করে দিবে। কেননা, তা ক্ষতি পূরণের নিমিত্তে ওয়াজিব হয়েছে।

قوله : وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ بِآخَرَ الخ : যদি কেহ হজ্বের ইহরাম বাধে অতঃপর দশই জিলহজ্জ অন্য একটি হজ্জের ইহরাম বাঁধে তবে তার দুটি অবস্থা হতে পারে। ১। দ্বিতীয় হজ্বের ইহরাম বাধার পূর্বে প্রথম হজ্ব থেকে ফারিগ হওয়ার লক্ষ্যে মাথা মুন্ডন করেছে। ২। মাথা মুন্ডন করেনি।

সুতরাং প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ জিল হজ্বের দশ তারিখে দ্বিতীয় হজ্বের ইহরাম বাধার পূর্বে প্রথম হজ্ব থেকে ফারিগ হওয়ার লক্ষ্যে মাথা মুন্ডালে তার উপর এ দ্বিতীয় হজ্ব ওয়াজিব হবে। সুতরাং সে এ দ্বিতীয় হজ্বটি আগামী বৎসর আদায় করবে। সে সময় পর্যন্ত সে মুহরিম থাকবে এবং তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে দুটি ইহরাম একত্র করে নি, বরং প্রথম ইহরাম থেকে মাথা মুন্ডানোর মাধ্যমে ফারিগ হয়ে দ্বিতীয় ইহরাম বেধেছে। সুতরাং দুটি ইহরাম একত্র পাওয়া গেল না। বিধায় তার উপর দম বা অন্য কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আর দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ প্রথম ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মাথা মুন্ডায়না তবে দ্বিতীয় হজ্বটি তার জিম্মায়

ওয়াজিব। এতে চুল ছাটুক বা না ছাটুক, তার উপর দম ওয়াজিব। ইহা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন রহ. এর মতে যদি দ্বিতীয় ইহরামের পর চুল না ছাঁটে তবে তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না। আর যদি আগামী বৎসরে হজ্জ করার পূর্বে হলক না করে তবে তো প্রথম ইহরামের হলককে অনেক বিলম্বিত করে ফেলল। এজন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব। পক্ষান্তরে সাহেবাই রহ. এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব। কারণ তাদের মতে আমলকে যথা সময় থেকে বিলম্বিত করলে দম ওয়াজিব হয় না। (যা আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি)।

قوله : وَمَنْ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ الخ : যে ব্যক্তি চুল ছাঁটা ছাড়া উমরার ইহরাম থেকে ফারিগ হয়ে দ্বিতীয় উমরার ইহরাম বেধে নিবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, সে সময়ের পূর্বে ইহরাম বেধেছে এভাবে যে সে দুটি উমরার ইহরামকে একত্র করেছে যা মাকরূহ। সুতরাং কাফফারা সরূপ তার উপর দম ওয়াজিব।

قوله : وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ بِعُمْرَةٍ الخ : মক্কাবাসী ভিন্ন কোন হাজী যদি হজ্বের ইহরাম বাধার পর হজ্জের কর্ম আঞ্জাম দেয়ার পূর্বে উমরার ইহরাম বেধে নেয় তবে তার উপর উভয়টিই আদায় করা ওয়াজিব। কেননা, বহিরাগতদের জন্য দুনুটিকে একত্রে আদায় করার অনুমতি রয়েছে। এক্ষেত্রে সে কিরান হজ্জকারীরূপে গণ্য হবে। তবে হা সে সুন্নাতের বরখেলাফ করার কারণে গুনাহগার হবে। অতঃপর যদি ঐ বহিরাগত ব্যক্তি উমরার আমলগুলো না করে আরাফায় অবস্থান করে নেয় তবে সে উমরা বর্জনকারীরূপে গণ্য হবে। কেননা, আরাফাতে অবস্থানের পর তার পক্ষে উমরা করা সম্ভব নয়। আর যদি ঐ বহিরাগত ব্যক্তি উমরার কার্যাদী আঞ্জাম দেয়ার পূর্বে আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায় তবে আরাফাতে অবস্থানের পূর্ব পর্যন্ত সে উমরা বর্জনকারীরূপে গণ্য হবে না।

قوله : فَلَوْ طَافَ لِلْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ الخ : যদি কোন বহিরাগত ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বেধে তাওয়াফ করে নেয় (অর্থাৎ তাওয়াফে কুদুম যা সুন্নাত) অতঃপর উমরার ইহরাম বেধে নেয় তবে তার উপর দুনুটি ওয়াজিব এবং একটি দম ওয়াজিব। আর হা বহিরাগতদের ক্ষেত্রে উভয়টি একত্রে পালন করা শরীয়াত সম্মত। সুতরাং এখন পর্যন্ত যখন সে হজ্বের কোন রুকন আদায় করে নি বিধায় তার পক্ষে প্রথমত উমরার কার্যাদী সম্পন্ন করতঃ হজ্বের কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব। তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কারণ সে একদিক থেকে উমরার কর্মকে হজ্বের কর্মসমূহের উপর ভিত্তি করেছে। কেননা, তাওয়াফে কুদুম সুন্নাত হলেও তা হজ্জের একটি আমল। তাই তাওয়াফে কুদুমের পর উমরার ক্রীয়াকর্ম আদায় করা মাকরূহ। আর এমাকরূহের ক্ষতি পূরণ করতে দম ওয়াজিব হবে। গ্রন্থকার রহ. বলেন এক্ষেত্রে উমরা ছেড়ে দেয়াটা মুস্তাহাব। কেননা, হজ্বের একটি আমল সম্পাদন করাতে তথা তাওয়াফে কুদুম করাতে হজ্বের ইহরামটি জুরদার হয়ে গেছে।

قوله : وَإِنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ الخ : যদি কেহ কুরবানির দিন অথবা তাশরীকের দিনে মাথা মুন্ডানোর পূর্বে অথবা তাওয়াফে জিয়ারতের পূর্বে উমরার ইহরাম বাধে তবে তা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। কেননা, উমরা শুরু করাটা বিশুদ্ধ হয়েছে। তবে হা তা ছেড়ে দেয়া আবশ্যক। কারণ সে হজ্বের রুকন আদায় করে এখন উমরার ইহরাম বাধাতে হজ্বের কার্যসমূহের উপর উমরার কার্যসমূহ ভিত্তিকারী হয়ে যাবে। আর তা সুন্নাতের পরিপন্থি। সুতরাং উমরা বর্জন করাতে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে এবং তদস্থলে একটি উমরা করা ওয়াজিব হবে। অবশ্য যদি সে উভয়টির কাজ একসাথে চালিয়ে যায় তবে তা শুদ্ধ হবে। কেননা, মূলগতভাবে উমরার মধ্যে কোন কারাহাত নেই। বরং উমরার বাহিরের কারণে তার মধ্যে কারাহাত এসেছে। আর তা হল এদিনগুলোতে হজ্বের অবশিষ্ট কর্মে ব্যস্ত থাকা আবশ্যক। তাই হজ্বের তা'জীম রক্ষার্থে বাকী সময়সমূহ হজ্বের জন্য মুক্ত রাখা আবশ্যক। এতদসত্বেও যদি তা চালিয়ে যায় তবে দম ওয়াজিব হবে।

قوله : وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ : যদি কারো হজ্বের ইহরাম ফউত হয়ে যায় অতঃপর উমরা কিংবা হজ্বের ইহরাম

বাধে তবে সে তা প্রত্যাখ্যান করবে। চাই তা উমরার করুক বা হজ্বের। সুতরাং যদি সে উমরার করে তবে তা বর্জন করতে হবে একারণে যে, তার প্রথম হজ্বের ইহরাম ফউত হওয়ায় তার ইহরাম উমরার ইহরামে পরিবর্তিত হওয়া ব্যতিত সে উমরার ক্রিয়া কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে হালাল হয়েছে। তাই কর্মহিসাবে দু উমরা একত্র হয়ে গেল এজনই একটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আর যদি দ্বিতীয় ইহরাম হজ্বের করে থাকে তবুও তা বর্জন করতে হবে। কেননা, সে ইহরাম হিসাবে দু হজ্বকে একত্র করেছে, যা শরীয়ত সম্মত নয়। সুতরাং দ্বিতীয় ইহরামটি বর্জন করতে হবে।

بَابُ الْاِحْصَارِ

পরিচ্ছেদ : (হজ্জ ও উমরা থেকে) অবরুদ্ধ হওয়ার বিবরণ

لِمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ أَنْ يَبْعَثَ شَاةً تُذْبَحُ عَنْهُ فَيَتَحَلَّلُ وَلَوْ قَارِنًا بَعَثَ دَمَيْنِ وَيَتَوَقَّتُ بِالْحَرَمِ لَا بِيَوْمِ النَّحْرِ وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ إِنْ تَحَلَّلَ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَعَلَى الْمُعْتَمِرِ عُمْرَةٌ وَعَلَى الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ فَإِنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ وَالْحَجِّ تَوَجَّهَ وَإِلَّا لَا وَلَا اِحْصَارَ بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ مَنْ مُنِعَ بِمَكَّةَ عَنِ الرُّكْنَيْنِ فَهُوَ مُحْصَرٌ وَ اِلَّا لَا -

অনুবাদ : কোন ব্যক্তি (মুহরিম) অসুস্থতা বা শত্রু কতৃক অবরুদ্ধ হলে সে যেন একটি বকরী প্রেরণ করে, যা তার পক্ষ থেকে জবেহ করা হবে। অতঃপর সে হালাল হয়ে যাবে। আর যদি সে কারীণ হজ্বকারী হয় তবে দুটি দম প্রেরণ করবে এবং তা হরমের সাথে নির্দিষ্ট কুরবানীর দিনের সাথে নির্দিষ্ট নয়। হজ্ব থেকে অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি (হালাল হয়ে যায় তবে) তার উপর (পরবর্তী বৎসর) একটি হজ্ব ও একটি উমরা ওয়াজিব। (এমতাবস্থায়) উমরা-কারীর উপর উমরা (কাজা করা ওয়াজিব) আর কারিণ এর উপর হজ্ব ও উমরা (কাজা করা ওয়াজিব) আর যদি (বকরী) প্রেরণ করার পর অবরুদ্ধ দূর হয়ে যায় এবং হজ্ব ও হাদী ধরতে সক্ষম হয় তবে সে যাবে। অন্যথায় যাবে না। আরাফায় অবস্থানের পর অবরুদ্ধতা নেই। আর যে ব্যক্তি মক্কাতে দুটি রুকন বাধা প্রাপ্ত হবে সে অবরুদ্ধ হিসাবে গণ্য হবে নতুবা নয়। (অর্থাৎ একটি রুকন থেকে বাধা প্রাপ্ত হলে সে অবরুদ্ধ হিসাবে গণ্য হবে না)।

শব্দার্থ : اَلْاِحْصَارُ : অবরুদ্ধ, বাধাগ্রস্ত করা। أُحْصِرَ বাধাপ্রাপ্ত হল। يَتَحَلَّلُ - تفعل থেকে تَحَلُّلٌ হালাল হওয়া, ভেঙ্গে যাওয়, খুলে যাওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الْاِحْصَارِ الخ : শরীয়তের পরিভাষায় মুহরিম কোন ভয়ভীতি, শত্রু কিংবা অসুস্থতার কারণে হজ্ব কিংবা উমরা থেকে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়াকে احصار বলা হয়। অবরুদ্ধ হওয়া যেহেতু মুহরিমের ক্ষেত্রে অপরাধ বলে

গণ্য তাই ইহা অপরাধ ও ত্রুটি অধ্যায়ের পর উল্লেখ করা হয়েছে।

قوله : لِمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍ الخ : আমাদের মাযহাব মতে মুহরিম ব্যক্তি শত্রু কিংবা অসুস্থতা বা অন্য কোন বিশেষ কারণে হজ্জ বা উমরা পালন করতে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে সে হজ্জ কিংবা উমরার কর্ম সম্পাদন করেও হালাল হওয়া জায়েয। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন, শুধু যদি শত্রু কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে সে কর্ম সম্পাদন না করেও হালাল হওয়া জায়েয। তবে অসুস্থতা বা অন্য কোন বিশেষ কারণে احصار সাব্যস্ত হবে না।

আমাদের দলিল : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে উক্ত আয়াত অসুস্থতার দরুন অবরুদ্ধ ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, কেননা, তাদের দৃষ্টিতে احصار হল অসুস্থতার দরুন বাধাগ্রস্ত হওয়া আর حصر হল শত্রুকর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। অতএব, অসুস্থতার বিষয়টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল। আর শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি হুদাইবিয়ার ঘটনা থেকে প্রমাণিত হল। অর্থাৎ হুজুর সা. হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসার ইচ্ছাতে হুদাইবিয়া পর্যন্ত এসে শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলে মাথা মুন্ডানো ও হাদী জবেহের মাধ্যমে তিনি হালাল হয়েছেন। সুতরাং অসুস্থতা বা শত্রু কর্তৃক কিংবা অন্য কোন বিশেষ কারণ বশতঃ অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য যখন হালাল হওয়াটা জায়েয হল তাই সে একটি বকরী পাঠিয়ে দিবে যা হারামে জবাই করা হবে। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে হাদী জবাই করার জন্য দিন নির্দিষ্ট করতে হবে। কেননা, তার মতে অবরুদ্ধ হওয়া দমের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোন দিন নেই। তাই একদিনকে নির্দিষ্ট করার কারণ হল, যাতে সে এ দিন হালাল হতে পারে।

সাহেবাইন রহ. এর মতে অবরুদ্ধ হওয়ার দম কুরবানীর দিনে জবাই করতে হবে। এজন্য তাদের নিকট দিন নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। তবে উমরার ক্ষেত্রে দিন নির্ধারণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। অবরুদ্ধ ব্যক্তি দম পাঠিয়ে দিলে সে ইচ্ছা করলে সেখানে অবস্থান করবে অথবা বাড়িতে চলে আসতে পারবে। অতঃপর নির্ধারিত দিন আসলে হাদী জবাই হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বস্ত হলে সে পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যাবে।

قوله : وَلَوْ قَارِنًا بَعَثَ دَمَيْنِ الخ : অবরুদ্ধ ব্যক্তি কারীন হলে দুটি দম পাঠাতে হবে। কেননা, সে কারীন হওয়ায় দুটি ইহরামে মুহরিম। সুতরাং তা থেকে হালাল হতে হলে দুটিই দম প্রেরণ করা প্রয়োজন। এখন যদি সে শুধু হজ্জের ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একটি দম প্রেরণ করে তবে দুটি ইহরাম থেকে কোনটি থেকেই হালাল হবে না। কেননা, একই সাথে উভয় ইহরাম থেকে হালাল হওয়া শরীয়ত অনুমোদিত।

قوله : وَعَلَى الْمُحْصِرِ بِالْحَجِّ الخ : যদি হজ্জ গমনকারী ব্যক্তি বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং হাদী প্রেরণ করে হালাল হয়ে যায় তবে তাকে পরবর্তী হজ্জ ও উমরা উভয়টিই করতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন,

مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلْ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

যার রাতে উকুফে আরফা ফউত হয়ে গেল, তার হজ্জ ফউত হয়ে গেল। তাই সে উমরা করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে তার উপর হজ্জ করা আবশ্যক ও উমরা কাযা করা ওয়াজিব। আর অবরুদ্ধ ব্যক্তিও যেহেতু হজ্জ ফউতকারীর ন্যায় তাই তার উপরও উভয়টি কাযা করা ওয়াজিব। দ্বিতীয়ত সে আমল শুরু করে তা কারণ বশতঃ ছেড়ে দিয়েছে তাই তা তার জিম্মায় এমনিতেই আবশ্যক হয়ে গেছে। এজন্য আগামীতে তা কাযা করা তার উপর ওয়াজিব আর উমরা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল, হজ্জ ফউতকারীর উপর উমরাও আবশ্যক হয়ে থাকে, তাই অবরুদ্ধ ব্যক্তিও যেহেতু হজ্জ ফউতকারীর সমপর্যায়ে তাই তার উপরও উমরা ওয়াজিব হবে।

قوله : وَعَلَى الْمُعْتَمِرِ عُمْرَةً الخ : আমাদের মাযহাব মতে যদি কেহ উমরা করতে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত হয় তবে এ বাধা ধর্তব্য হবে এবং পরবর্তীতে তার উপর উমরার কাযা আদায় করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রহ. এর মতে উমরার ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ সাব্যস্ত হবে না। তার দলিল হল : উমরার ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত সময়ের সাথে

নির্দিষ্ট নয় যে, তা চলে যাওয়াতে উমরা হবে না। তাই উমরা ফউত হওয়ার আশঙ্কা না থাকায় অবরুদ্ধ সাব্যস্ত হবে না।

আমাদের দলিল হল : রাসূলুল্লাহ্ সা. ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. উমরার জন্য আসার পথে হুদাইবিয়্যাতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পরবর্তী বৎসর তা কাজা করেছিলেন। তাইতো পরবর্তী বৎসরের উমরার নাম করণ করা হয়েছে উমরাতুল কাযা করে।

দ্বিতীয়তঃ অসুবিধা দূর করার জন্যই হালাল হওয়ার বিধান প্রবর্তীত হয়েছে। আর উমরার ক্ষেত্রেও ইহা বিদ্যমান রয়েছে। তাই উমরার ইহরামের পরও অবরুদ্ধ হতে পারে। আর যখন অবরুদ্ধ হওয়া সাব্যস্ত হল তখন হালাল হওয়ার পর তা কাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে।

قوله : وَعَلَى الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ الخ : কিরানের নিয়্যাতে ইহরাম বাধা মুহরিম ব্যক্তি বাধাগ্রস্ত হলে পরবর্তীতে হজ্জ ও উমরা দুটি তার উপর ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

قوله : فَإِنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ الخ : যদি অবরুদ্ধ ব্যক্তি দম পাঠিয়ে দেয় অতঃপর তার অবরোধ উটে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার চারটি সূরত হতে পারে— (১) সময় এত কম যে সে হাদী ও হজ্জ ধরতে পারবে না, তবে এক্ষত্রে তার জন্য মক্কা অভিমুখে যাওয়া জরুরী নয় এবং হাদী জবাই করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কেননা, এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য তথা হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার সময় ফউত হয়ে গেছে। (২) এখনও অনেক সময় রয়েছে, সে হজ্জ ও হাদী ধরতে পারবে। তাহলে মক্কা অভিমুখে গমন করা তার জন্য আবশ্যক। কেননা, হাদি তথা স্থলবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার পূর্বে অক্ষমতা তথা অবরুদ্ধতা দূর হয়ে গেছে। তাই স্থলবর্তীতা তথা হাদী আর কার্যকর নয়। (৩) উক্ত ব্যক্তি হাদীর নাগাল পাবে, তবে হজ্জ ধরতে পারবে না। এক্ষেত্রে হাদী জবাই এর মাধ্যমে সে হালাল হবে। কেননা, উদ্দেশ্য তথা হজ্জ পালনে অপারগ রয়েছে। তাই হাদী জবাই করার মাধ্যমে হালাল হওয়ার উপকারিতা অর্জন করবে। (৪) হজ্জ ধরতে পারবে কিন্তু হাদীর নাগাল পাবে না তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে তার জন্য হালাল হওয়া জায়েয কিন্তু মক্কাতে গিয়ে হজ্জের কর্ম সম্পাদন করা উত্তম।

قوله : وَلَا إِحْصَارَ بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ الخ : যদি কেহ আরাফাতে অবস্থানের পর অবরুদ্ধ হয়, তবে সে বাধাগ্রস্ত হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা, সে আরাফাতে অবস্থানের পর হজ্জ ফউত হয়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে গেল। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ 'যে আরাফাতে অবস্থান করল তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং অবরুদ্ধের কারণ বিদ্যমান না থাকার দরুন অবরোধও অবশিষ্ট থাকবে না। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতানুযায়ী তার উপর চারটি দম ওয়াজিব হবে। (১) মুযদালিফায় অবস্থান বর্জন করার দরুন, (২) কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেওয়ার দরুন, (৩) তাওয়াফে জিয়ারতে বিলম্ব করার দরুন। (৪) হলককে বিলম্বিত করার দরুন। সাহাবাইন (রহ.) এর মতে নিচের দুটি তথা তাওয়াফে জিয়ারত ও হলককে বিলম্ব করার দরুন তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না।

قوله : وَمَنْ مُنِعَ مَكَّةَ الخ : যে ব্যক্তি মক্কাতে অবরুদ্ধ হল সে যদি হজ্জের দুটি রুকন আদায় করতে সক্ষম হয় তবে বাধাগ্রস্ত হিসাবে গণ্য হবে না। আর যদি সর্বনিম্ন দুটি রুকন আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তবে সে বাধাগ্রস্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। যেমন কেহ তাওয়াফ ও উকুফে আরাফা করতে পারল অতঃপর বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবুও সে বাধাগ্রস্ত হিসাবে গণ্য হবে না। আর যদি উভয়টি থেকে মাত্র একটি করতে সক্ষম হয় তবে সে বাধাগ্রস্ত হিসেবে গণ্য হবে।

بَابُ الْفَوَاتِ

পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফউত হওয়া

مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِفَوْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ من قَابِلٍ بِلَا دَمٍ وَلَا فَوْتَ لِعُمْرَةٍ وَهِيَ طَوَافٌ وَسَعْيٌ وَتَصِحُّ في السَّنَةِ وَتُكْرَهُ يوم عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَهِيَ سُنَّةٌ -

অনুবাদ : উকুফে আরাফা ফউত হওয়ার কারণে যার হজ্জ ফউত হল তবে সে উমরা করে হালাল হয়ে যাবে এবং তার উপর দম ছাড়াই আগামী বৎসর হজ্জ ফরজ। উমরা ফউত হয় না। আর উমরা হল তাওয়াফ এবং সাঈ। সারা বৎসর তা সহীহ। আর উমরা মাকরূহ আরাফার দিনে, কুরবানির দিনে এবং আইয়্যামে তাশরীকের দিনে। উমরা হল সুন্নাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ الخ : যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি উকুফে আরাফা করে না এমন কি কুরবানির দিনের সূর্য উদিত হয়ে গেল। তবে তার হজ্জ ফউত হয়ে গেল। কেননা উকুফে আরাফার সময় হল সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এখন উক্ত ব্যক্তির কর্তব্য হল সে উমরা করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বৎসর হজ্জ আদায় করবে। তবে হাঁ তার উপর কোনরূপ দম ওয়াজিব হবে না। উকুফ ছেড়ে দেয়ার কারণে হজ্জ ফউত হয়ে যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন—

مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةٌ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ -

'যে ব্যক্তি রাত্রেও উকুফে আরাফা ফউত করল তার হজ্জ ফউত হয়ে গেল। অতএব, সে যেন উমরার মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়। আর তার উপর পরবর্তী বৎসর হজ্জ করা ফরজ। দ্বিতীয় দলিল : ইহরাম বাধাটা বিশুদ্ধ হয়েছে বিধায় হজ্জ কিংবা উমরা আদায় করা ছাড়া ইহরাম থেকে বের হওয়ার কোন পন্থা নেই। কিন্তু হজ্জ ফউত হওয়ার কারণে সে হজ্জ করতে অক্ষম। তাই তার জন্য উমরা নির্ধারিত হয়ে গেল। সুতরাং সে উমরা আদায় করে হালাল হয়ে যাবে। এবং ছেড়ে দেওয়া হজ্জ আগামী বৎসর কাজারূপে আদায় করবে।

قوله : وَلَافَوْتَ لِعُمْرَةٍ الخ : উমরা হজ্জ কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট না থাকায় বৎসরের যে কোন সময় তা আদায় করা জায়েয। তবে হাঁ পাঁচদিন উমরা করা মাকরূহ তা হল আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং আইয়্যামে তাশরীকের তিনদিন। সুতরাং যেহেতু তা বৎসরের যে কোন দিন আদায় করলে আদায় হয় তাই তা ফউত হবে না। আর উমরা হল বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়াতে সায়ী করা।

قوله : وَتُكْرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ الخ : আমাদের মাযহাব মতে পূর্বে উল্লেখিত পাঁচ দিন তথা আরাফার দিন কুরবানীর এবং আইয়্যামে তাশরীকের তিনদিন উমরা আদায় করা মাকরূহ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে এ পাঁচদিনে ও উমরা করা মাকরূহ নয়। আমাদের দলিল হল হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদীস তিনি এ পাঁচদিন উমরা করা মাকরূ বলতেন। দ্বিতীয়ত এ পাঁচদিন হজ্জের দিন। তাই এ দিনগুলো হজ্জের জন্য নির্ধারিত থাকবে। অবশ্য যদি কেহ এ পাঁচদিনেও উমরা করে নেয় তবে তা সহীহ হবে এবং এ দিনগুলোতে সে মুহরিমই থাকবে।

কেননা, সত্তাগতভাবে উমরার ক্ষেত্রে কোন কারাহাত নেই। বরং মাকরূহ হয়েছে অন্য কারণে। তা হল হজ্জের বিষয়টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও হজ্জের দিনগুলো শুধু হজ্জের জন্য মুক্ত করে দেয়া। সুতরাং উমরার মধ্যে যেহেতু মূলগতভাবে কোন কারাহাত নেই, তাই তা আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। যদিও তা মাকরূহ।

قوله : وَهِيَ سُنَّةٌ الخ : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী উমরা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে তা ফরজ। তিনি দলিল হিসাবে পেশ করেন হুজুর সা. এর হাদীস— اَلْعُمْرَةُ فَرِيْضَةٌ كَفَرِيْضَةِ الْحَجِّ 'হজ্জের ফরজের মতো উমরাও একটি ফরজ'।

আমাদের দলিল রাসূলুল্লাহ্ সা. এর বাণী—

اَلْحَجُّ فَرِيْضَةٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ 'হজ হল ফরজ আর উমরা হল নফল' দ্বিতীয়ত উমরার জন্য কোন সময়ের নির্দিষ্টতা নেই বরং যখনই মন চায় তখনই আদায় করা যায় এবং তা কখন অন্য নিয়্যাত দ্বারাও আদায় হয়ে যায়। যেমন কেহ হজ্জের নিয়্যত করল অতঃপর হজ্জ ফউত হয়ে যাওয়াতে উমরা আদায় করতে পারে। সুতরাং বুঝা গেল তা নফল। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর দলিলের জবাব হল হাদীসে العمرة فريضة দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে হজ্জের ক্ষেত্রে যেমন আমল নির্ধারিত তেমনি উমরার ক্ষেত্রেও আমল নির্ধারিত। এ দিকে উমরা ফরজ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর বিরুধী হাদীস রয়েছে। আর পরস্পর বিরোধী হাদীস দ্বারা ফরজ প্রমাণিত হয় না।

بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ

পরিচ্ছেদ : অন্যের পক্ষে হজ্জ করার বিবরণ

اَلنِّيَابَةُ تُجْزِئُ فِي الْعِبَادَةِ الْمَالِيَّةِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَالْقُدْرَةِ وَلَمْ تَجُزْ فِي الْبَدَنِيَّةِ بِحَالٍ وَفِي الْمُرَكَّبِ مِنْهُمَا تُجْزِي عِنْدَ الْعَجْزِ فَقَطْ وَالشَّرْطُ الْعَجْزُ الدَّائِمُ إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا شَرْطُ عَجْزِ الْمَنُوْبِ لِلْحَجِّ الْفَرْضِ لَا لِلنَّفْلِ وَمَنْ أَحْرَمَ عَنْ آمِرَيْهِ ضَمِنَ النَّفَقَةَ وَدَمُ الْإِحْصَارِ عَلَى الْآمِرِ وَدَمُ الْقِرَانِ وَدَمُ الْجِنَايَةِ على الْمَأْمُورِ فَإِنْ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ مَنْزِلِهِ بِثُلُثِ ما بَقِيَ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ عن أَبَوَيْهِ فَعَيَّنَ صَحَّ -

অনুবাদ : স্থলবর্তিতা আর্থিক ইবাদাতে অক্ষমতা বা সামর্থ্য থাকা অবস্থায় জায়েয। কিন্তু দৈহিক ইবাদতে কোন অবস্থায় (স্থলবর্তিতা) জায়েয নয়। আর উভয়টি দ্বারা যৌগিক (ইবাদত) শুধু অক্ষমতার অবস্থায় জায়েজ। (হজ্জের ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতা জায়েয হওয়ার জন্য) শর্ত হলো মৃত্যুর সময় পর্যন্ত স্থায়ী অক্ষমতা থাকা। ফরজ হজ্জ থেকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্তকারী অক্ষম হওয়া শর্ত করা হয়েছে। নফল হজ্জের জন্য নয়। আর যে ব্যক্তি দুজন নির্দেশ দাতার পক্ষ থেকে ইহরাম বাধল সে খরচের জামিন হবে। অবরোধের দম আদেশ দাতার উপর (আবশ্যক হবে) এবং কেরানের দম ও অপরাধের দম আদিষ্ট ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে। আর যদি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি (হজ্জে যাওয়ার) পথে মৃত বরণ করে তবে মৃতের পক্ষে তার বাড়ি থেকে তার অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ

থেকে হজ্জ করানো হবে। যে ব্যক্তি তার মাতা পিতার পক্ষ থেকে হজ্জের ইহরাম বাধল, অতঃপর (তা যেকোন এক জনের জন্য) নির্দিষ্ট করল তবে সহীহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. এযাবত হজ্জের মূল ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখান থেকে হজ্জের প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করার বিধান নিয়ে আলোচনা শুরু করতেছেন।

قوله : اَلنِّيَابَةُ تَجْزِئُ الخ : ইবাদত তিন প্রকার (১) আর্থিক ইবাদাত যেমন জাকাত, সদকা ইত্যাদি। (২) দৈহিক ইবাদাত যেমন : নামায, রোযা, (৩) আর্থিক ও দৈহিক উভয়ের সমন্বয়ে যেমন, হজ্জ এতে দৈহিক শ্রমের পাশাপাশি আর্থিক ব্যয় হয়। অতএব, প্রথম প্রকার তথা আর্থিক ইবাদাতে স্থলাভিসিক্ততা কার্যকর হবে স্থলবর্তীকারী অক্ষম হউক বা সক্ষম হউক। যেমন যাকাতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হল তা দরিদ্রদের কাছে পৌছে যাওয়া। যে কেউ তা প্রাপকের নিকট পৌছিয়ে দিলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রকার তথা দৈহিক ইবাদাতে স্থলবর্তী কার্যকর হবে না। স্থলবর্তীকারী সক্ষম হউক বা অক্ষম। কেননা, দৈহিক ইবাদাতের উদ্দেশ্য হল নফসের স্বাধনা ও কষ্ট অনুভব করা। নফসের স্বাধনা যে করল তা তার জন্য। অন্যের নফসে স্থানান্তরিত হয় না।

তৃতীয় প্রকার তথা দৈহিক ও আর্থিক উভয়ের সমন্বয়ে আর তা হল হজ্জ। উক্ত ইবাদতে যেহেতু দৈহিক ও আর্থিক উভয়টির সমন্বয় ঘটেছে বিধায় উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করে আমরা বলি অক্ষমতার সময় স্থলবর্তী নিয়োগ করা জায়েয আছে, তবে হা সক্ষম ব্যক্তির জন্য স্থলবর্তী নিয়োগ করা জায়েয নেই তবে হা নফল হজ্জের ক্ষেত্রে সক্ষম ব্যক্তি ও স্থলবর্তী নিয়োগ করতে পারবে। কেননা, নফলের বিষয়ে অধিকতর প্রশস্ততা রয়েছে। যেমন নফল নামাজ দাড়িয়ে পড়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বসে পড়া জায়েয। গ্রন্থকার রহ. বলেন হজ্জের জন্য স্থলবর্তীতা নিয়োগ করা জায়েয হওয়ার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী অক্ষমতা পাওয়া শর্ত। কেননা, হজ্ব হল সারা জীবনে একবার ফরজ। যে কোন বৎসর তা আদায় করলে আদায় হয়ে যায়।

قوله :وَمَنْ اَحْرَمَ عَنْ اٰمِرَيْهِ الخ : যদি কোন দুজন অক্ষম ব্যক্তি একজনকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে আর সে তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে ইহরাম বেধে নেয় এবং ইহরামকে নির্দিষ্ট না করেই উভয়ের পক্ষ থেকে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম শুরু করল তাহলে তা হজ্জকারীর পক্ষ থেকেই হবে। আর আদেশকারী দুজন যে খরচ দিয়েছিল সে তার ক্ষতিপূরণ দিবে। কেননা, সে যখন উভয়ের পক্ষ থেকে নিয়ত করল তখন সে প্রত্যেকের আদেশ লজ্ঞন করল। কেননা, প্রত্যেকের নির্দেশ ছিল সে যেন শুধু তার পক্ষ থেকে হজ্জ করে। এতে শরীক না বানায়। সুতরাং উভয়ের আদেশ লজ্ঞন করায় এ হজ্ব তার নিজেরই থেকে গেল। আর এ কারণে যে তাদের উভয় থেকে কোন একজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে হজ্জটি তার জন্য নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। কারণ নিয়্যাতের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান। যদ্দরুন কোন একজনকে অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব নয়। অন্যথায় উপযোক্ত কারণ ছাড়া কোন একজনকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। যা জায়েয নয়। এজন্য এ হজটি আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এজন্যই তো তাকে উভয়ের ক্ষতিপুরণ দিতে হবে। আর যদি আদিষ্ট ব্যক্তি ইহরামকে অস্পষ্ট রাখে, অর্থাৎ আদেশ দাতাদের মধ্য থেকে একজনের নিয়াত অনির্দিষ্টভাবে করে তবে সে আদেশ দাতার বিরুধীতা করল। এজন্য হজ্জও তার পক্ষ থেকে গণ্য হবে, আদেশদাতাদের পক্ষ থেকে হবে না। তাই তাকে উভয়ের খরচের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি সে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম শেষ করার পূর্বে যে কোন একজনকে নির্ধারিত করে নেয় তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে পূর্বের ন্যায় হবে। অর্থাৎ হজ্জ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে হবে। আর তাহাই কিয়াসের দাবী। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে নির্ধারণ করা শুদ্ধ। আর তাই استحسان এর দাবী। এক্ষেত্রে যুক্তি হল, ইহরাম নিজগতভাবে উদ্দেশ্য নয়, বরং তা আসলের মাধ্যমে অসিলা বা উপায় হতে পারে।

তাই শর্তরূপে তা যথেষ্ট হবে।

قوله : وَدَمُ الْاَحْصَارِ الخ : আদিষ্ট ব্যক্তি হজ্জের পথে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়লে দমের মাধ্যমে হালাল হয়ে যাবে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে এ দম আদেশদাতার উপর ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে এ দম আদিষ্ট ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। তিনি দলিল দেন احصار এর দম হালাল হওয়ার জন্য ওয়াজিব হয়। যাতে কষ্ট দূর হয়। আর এই কষ্ট আদিষ্ট ব্যক্তির সাথেই সম্পৃক্ত। তাই তার উপর দম ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দলিল হল আদেশদাতা যেহেতু তাকে আদেশ দিয়েছে তাই আদেশদাতার উপরই তা ওয়াজিব হবে।

قوله : اَوْ دَمُ الْقِرَانِ الخ : কিরান হজ্জের নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিরানের দম আদিষ্ট ব্যক্তির উপরই ওয়াজিব হবে। কেননা, কিরানের দম আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ, তিনি যে তাকে হজ্জ ও উমরা পালনের তাওফীক দিয়েছেন এজন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দম ওয়াজিব হয়। আর উক্ত তাওফীক দেয়া ও নিয়ামত দেয়া আদিষ্ট ব্যক্তির সাথেই সংশ্লিষ্ট বিধায় তার উপরই কিরানের দম ওয়াজিব হবে।

قوله : وَ دَمُ الْجِنَايَةِ الخ : অনুরূপভাবে জিনায়াত তথা অপরাধের দম আদিষ্ট ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। কেননা, অপরাধ তার পক্ষ থেকেই প্রকাশ হয়েছে। তাই তার জিম্মাদারী নির্দেশদাতার উপর যাবে না।

قوله : فَاِنْ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِهِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে হজ্জের ওয়াসিয়াত করে মারা যায় অতঃপর তার উত্তরসূরীরা কোন ব্যক্তিকে হজ্জের জন্য প্রেরণ করল। আদিষ্ট ব্যক্তি হজ্জে যেতে রাস্তায় মৃত্যুবরণ করল, বা তার খরচের অর্থ চুরি হয়ে গেল। তবে এখানে দুটি বিষয় রয়েছে। (১) প্রথম বিষয় : ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে মৃত ব্যক্তির অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা দ্বিতীয়বার সফরের খরচ বহন করা হবে। আর চুরি হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও এক তৃতীয়াংশ দ্বারা তা পূর্ণ করা হবে যদি তা দিয়ে সম্ভব হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, সর্বমোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে চুরি হয়ে যাওয়ায় বা মৃত্যুবরণ হওয়ার পর যা অবশিষ্ট আছে তা থেকেই দ্বিতীয় হজ্জ বা চুরির পর প্রথম প্রতিনিধির অবশিষ্ট সফরের খরচ আঞ্জাম দেয়া হবে যদি তা দিয়ে সম্ভব হয়।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, প্রতিনিধিকে যে মাল দেয়া হয়েছিল যদি তা থেকে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তা দ্বারাই দ্বিতীয়বার হজ্জ করানো হবে। আর যদি তা দ্বারা হজ্জ করানো সম্ভব না হয় তবে অসিয়াতকারীর অসিয়াত বাতিল বলে গণ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল- অসিয়তকারী যেভাবে মাল নির্ধারণ করেছে তেমনিভাবে রক্ষণাবেক্ষণকারীর মাল বন্টন করা বা পৃথক করা সহীহ হবে না। কেননা, সম্পদ গ্রহন করার জন্য তার কোন হক্বদার নেই। আর এজন্য অসিয়তকারীর নির্ধারিত সুরতে সম্পদ অর্জন করা পাওয়া যায়নি, কেননা, অসিয়াতের দিকটি ছিল হজ্জ। আর তা পাওয়া যায়নি। তাই তার সম্পদের তৃতীয়াংশ থেকে দ্বিতীয় বার হজ্জ করানো হবে।

দ্বিতীয় বিষয় : ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে হজ্জের দ্বিতীয় সফর (ওয়াসীর) মৃতঃ ব্যক্তির বাড়ি থেকে শুরু করা হবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন রহ. এর মতে দ্বিতীয় সফর যেখানে আদিষ্ট ব্যক্তি মৃতবরণ করেছে সেখান থেকে শুরু করা হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হল স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির সফর যা বাড়ি থেকে হয়েছিল তা তো দুনিয়ার দৃষ্টিতে বাতিল বলে গণ্য। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল নিঃশেষ হয়ে যায় তিনটি ছাড়া। (১) সদকায়ে জারিয়া (২) এমন ইলম যা দ্বারা সে উপকৃত হয়েছে। (৩) নেক সন্তান। আর উক্ত সফরটি বর্ণিত তিনটি আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ অসিয়াত কার্যকর করা দুনিয়ার বিধান সুতরাং হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী দুনিয়ার দৃষ্টিতে বাতিল বলে গণ্য। তাই সে যেমন এমন যে, সফর শুরু করে

নাই। অতএব ওয়াসিয়ত পুরণার্থে মৃত ব্যক্তির বাড়ি থেকে তার দ্বিতীয় সফর শুরু করা কর্তব্য।

قوله : وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ عَنْ أَبَوَيْهِ الخ : যে বক্তি তার পিতা-মাতার নিয়াতে হজ্জের ইহরাম বাধল তবে সে যে কোন একজনের নিয়াত করে নেয়াতে যথেষ্ট হবে। কেননা, যে ব্যক্তি অন্যের হুকুম ছাড়া হজ্জ করল মূলত সে হজ্জের সাওয়াব তাকে প্রদান করল। আর তা আমল করার পরই হয়ে থাকে। তাই হজ্জ আদায়ের পরও যে কোন একজনের নিয়্যাত করে নেয়াটা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

بَابُ الْهَدْيِ

পরিচ্ছেদ : কুরবানীর প্রাণী

أَدْنَاهُ شَاةٌ وَهُوَ إِبِلٌ وَ بَقَرٌ وَ غَنَمٌ وَمَا جَازَ فِي الضَّحَايَا جَازَ فِي الْهَدَايَا وَالشَّاةُ تَجُوزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي طَوَافِ الرُّكْنِ جُنُبًا وَوَطْءٍ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَيُوكَلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَقَطْ وَخُصَّ ذَبْحُ هَدْيِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَقَطْ وَالْكُلُّ بِالْحَرَمِ لَا بِفَقِيرِهِ وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ بِالْهَدْيِ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا ولم يُعْطِ أُجْرَةَ الْجَزَّارِ منها وَلَا يَرْكَبُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا يَحْلُبُهُ وَيَنْضَحُ ضَرْعَهُ بِالنُّقَّاخِ وَإِنْ عَطِبَ وَاجِبًا أو تَعَيَّبَ أَقَامَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ وَالْمَعِيبُ لَهُ وَلَوْ تَطَوُّعًا نَحَرَهُ وَصَبَغَ نَعْلَهُ بِدَمِهِ وَضَرَبَ بِهِ صَفْحَتَهُ ولم يَأْكُلْهُ غَنِيٌّ وَتُقَلَّدُ بَدَنَةُ التَّطَوُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ فَقَطْ -

অনুবাদ : সর্বনিম্ন হাদী হল বকরী। আর হাদী হল উট, গরু, বকরী এবং যেসব প্রাণী কুরবানিতে জায়েয তা হাদীরূপেও জায়েয। আর বকরী জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফে রুকন এবং উকুফের পর স্ত্রী সহবাস ছাড়া প্রত্যেক বিষয়ে (ক্ষতিপুরণ হিসাবে) জায়েয। শুধু নফল, তামাত্তু ও কিরানের হাদী থেকে খাওয়া যাবে। কেরানের ও তামাত্তু এর হাদী জবেহ করা শুধু কুরবানীর দিনের সাথে এবং প্রত্যেক হাদী হরমের সাথে নির্দিষ্ট। হরমের ফকীরদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। (অর্থাৎ হাদীর গোশত হরমের ফকীর এবং অন্যান্য স্থানের ফকীরদের মাঝে বন্টন করা যাবে) আর হাদীকে আরাফাতে নিয়ে যাওয়া জরুরী নয়। হাদীর গায়ের চট ও রশি সদকা করে দেবে আর এগুলো দ্বারা কশাইয়ের মজুরী দেয়া হবে না। বিনা প্রয়োজনে তাতে আরোহন করবে না। তার দুধ দোহন করবে না, বরং তার স্তনে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দিবে। আর যদি ওয়াজিব হাদী মারা যায় অথবা ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়, তবে তদস্থলে অন্যটি স্থির করবে এবং ত্রুটি যুক্ত হাদী তারই থেকে যাবে। আর যদি তা নফল হয় (অর্থাৎ ত্রুটি যুক্ত হাদী নফল হয়) তবে রঞ্জিত করে দেবে আর তা দ্বারা তার (কুঁজের) পাশে ছাপ মেরে দেবে এবং (সে কিংবা) কোন ধনী লোক তা খাবে না। নফল, তামাত্তু ও কিরানে বুদনাকে শুধু কালাদা পরাবে।

শব্দার্থ : اَلْهَدْىُ (ج) هَدَايَا - هُدِيَّةٌ - কুরবানীর পশু। ضَحَايَا - ইহা ضَحِيَّةٌ এর ব. ব. অর্থ- কুরবানীর পশু উৎসর্গ। تَعْرِيْفُ - আরাফায় নিয়ে যাওয়া, পরিচিত করণ। جَلاَلٌ - ইহা جَلٌّ এর ব. ব.,অর্থ- মোটা, হাদীর গায়ের চট। خِطَامٌ - রশি। اَلْجَزَّارُ (ج) جَزَّارَةٌ - جَزَّارُوْنَ - কসাই, নিষ্ঠুর লোক। لاَيَحْلِبُ (ن.ض) حَلْبًا - حِلاَبٌ - দোহন করা, দোহানো। يَنْضَحُ (ض) نَضْحًا - ছিটানো, পানি দেয়া, ভিজানো। ضَرْعٌ (ج) ضُرُوْعٌ - ضِرَاعٌ - পশুর স্তন, ওলান। اَلنُّقَاخُ - স্বচ্ছ পানি, মজ্জা, ঠান্ডা পানি। عَطِبَ (س) عَطَبًا - ধ্বংস হওয়া, নষ্ট হওয়া। تَعْيِيْبُ - تفعل থেকে تَعَيُّبًا - ত্রুটিযুক্ত হওয়া। صَبَغَ (ن.ف) صَبْغًا - রঞ্জিত করা, রং করা। صَفْحَةٌ (ج) صَفْحَاتٌ - পার্শ্ব, পাতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَهُوَ اِبِلٌ وَ بَقَرٌ وَ غَنَمٌ الخ : উট, গরু, বকরী তিনটি হাদীরূপে গণ্য। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. বকরীকে সর্বনিম্ন হাদীরূপে আখ্যায়িত করেছেন। আর সর্বনিম্ন হতে হলে তার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের পরিমাণ থাকা আবশ্যক। আর তা হলো গরু ও উট। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হারাম শরীফের দিকে প্রেরিত প্রাণী হলো হাদী। আর বর্ণিত তিনটিতে সমানভাবে পাওয়া যায়।

قوله : وَيُؤْكَلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ الخ : নফল, কিরান ও তামাত্তু এর হাদী থেকে নিজে খেতে পারবে এবং খাওয়াটা মুস্তাহাব। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. হাদীর গোশত খেয়েছেন এবং তার ঝুলও পান করেছেন। যেভাবে কুরবানীর গোশত বন্টন করা মুস্তাহাব। অনুরূপ উক্ত হাদীসমূহের গোশতও বন্টন করা মুস্তাহাব। যথা- (১) এক তৃতীয়াংশ সদকা করা, (২) এক তৃতীয়াংশ হাদিয়া দেয়া, (৩) এক তৃতীয়াংশ খাওয়া। নফল, কিরান ও তামাত্তু এর হাদী ছাড়া অন্যান্য দম এর গোশত নিজে খাওয়া জায়েয নয়। অনুরূপভাবে ধনীরাও খাওয়া জায়েয নয়। কারণ, এগুলো হল কাফফারার দম। তাই তা নিজে যেভাবে খেতে পারবে না তদ্রূপ ধনী ব্যক্তিও খেতে পারবে না। বরং তা দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে। কেননা, হুজুর সা. যখন হুদায়বিয়াতে পৌঁছে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তখন নাজিয়া আল আসলামী রাযি. এর হাতে হাদী প্রেরণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তুমি ও তোমার সাথীরা তা থেকে কিছুই খাবে না। তাদেরকে খেতে নিষেধ করার কারণ হল তারা সবাই ধনী। সুতরাং প্রমাণিত হল কাফফারার জন্য জবেহকৃত প্রাণী নিজে ও ধনীদের জন্য খাওয়া নিষেধ।

قوله : وَالْكُلُّ بِالْحَرَمِ الخ : নফল ও অন্যান্য হাদীসমূহ হারামেই জবেহ করতে হবে, হারাম ছাড়া অর্থাৎ হিলে জবেহ করলে হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা শিকারের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে ইরশাদ করেন- هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ। আয়াতে কা'বা দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য। উক্ত আয়াতটি কাফফারা জাতীয় প্রতিটি হাদীর ক্ষেত্রে মূলনীতিরূপে গণ্য হবে। সুতরাং কাফফারা স্বরূপ যে দম ওয়াজিব হবে তা হারামে জবেহ করতে হবে। মহান প্রভু احصار। এর দমের কথা বলেন—

وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ -

আর সাধারণ হাদীর ব্যাপারে বলেন- ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلٰى بَيْتِ الْعَتِيْقِ মহান প্রভুর উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হাদী জবাই এর স্থান হল হারাম। দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন- مِنٰى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَ فِجَاجُ مَكَّةَ - সমস্ত মিনা হল জবাই এর স্থল এবং মক্কার সমস্ত পথ হল জবাই এর স্থল। এ থেকেও প্রতিয়মান مَنْحَرٌ كُلُّهَا হল যে, হারামে জবাই করা হবে। আভিধানিক ভাবেও হাদী বলা হয় যা কোন স্থানে হাদীয়ারূপে পাঠানো হয়। মোটকথা, হাদী হারামেই জবাই করতে হবে। হিলে জবাই করা জায়েয নয়।

قوله : وَلَا بِفَقِيْرِهِ الخ : হাদী যেভাবে জবেহের ক্ষেত্রে হারামের সাথে নির্দিষ্ট তেমনি হাদীর গোশত বন্টনের

ক্ষেত্রেও হারামের দরিদ্রদের সাথে নির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ, হাদীর গোশত যে কোন স্থানে দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করলে যথেষ্ট হবে। উক্ত দরিদ্র হারামের হউক বা অন্যস্থানের হউক হাদীর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে সবাই সমান।

তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, যেভাবে জবাই এর ক্ষেত্রে হারামই নির্দিষ্ট তেমনি বন্টনের ক্ষেত্রেও হারামের দরিদ্র হওয়া অপরিহার্য্য। তিনি হাদীর গোশত বন্টনকে জবেহের উপর ক্বিয়াস করেছেন। আমরা বলি হাদী জবেহ করা একটি বোধগম্যহীন ইবাদত। পক্ষান্তরে সদকা হল বোধগম্য সম্পন্ন ইবাদাত। এদিকে বোধগম্য সম্পন্ন ইবাদতকে বোধগম্যহীন ইবাদতের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। তাই যে কোন দরিদ্রকে সদকা করলে তা আদায় হবে। সুতরাং হেরেমের বা অন্য স্থানের যে কোন দরিদ্রকে তা দেওয়া জায়েয।

قوله : وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيْفُ الخ : تعريف এর দুটি অর্থ হতে পারে। (১) হাদীকে আরাফাতে নিয়ে যাওয়া, (২) পশুর গলায় হার ঝুলিয়ে চিহ্নিত করা। উভয়টি থেকে কোনটিই হাদীর ক্ষেত্রে জরুরী নয়। কেননা, হাদী শব্দের অর্থের মধ্যে তারীফের কোন প্রমাণ নেই এবং স্পষ্ট কোন নসের ভিত্তিতেও প্রমাণিত নেই, বরং হাদী হারামে নিয়ে সেখানে জবাই করার মাধ্যমে ছওয়াব অর্জন করাই উদ্দেশ্য। তাই হাদীর ক্ষেত্রে তা'রীফ পরিত্যাক্ত।

قوله : وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهِ الخ : গ্রন্থকার রহ. বলেন, উটের গায়ের চট ও রশি সদকা করে দেবে এবং এগুলো দ্বারা কসাইয়ের মজুরী প্রদান করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. হযরত আলী রাযি. কে বলেন- تَصَدَّقْ بِجِلَالِهَا وَ بِخِطَامِهَا وَلَا تُعْطِ أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا 'তার গায়ের চট ও রশি সদকা করে দাও। আর এগুলো দ্বারা কসাইয়ের মজুরি দিও না। মোটকথা, প্রাণীর সাথে সম্পৃক্ত কোন বস্তু বা প্রাণীর গোস্ত দ্বারা কসাইয়ের মজুরী প্রদান করা যাবে না।

قوله : وَلَا يَرْكَبُهُ بِلَاضَرُوْرَةٍ الخ : বিনা প্রয়োজনে হাদীতে আরোহণ করা জায়েয নয়। তবে যদি সে পায়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়ে তবে তাতে আরোহণ হতে পারবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সা. জনৈক ব্যক্তিকে উট নিয়ে যেতে দেখে বললেন, إِرْكَبْهَا وَيْلَكَ তোমার সর্বনাশ! এতে আরোহণ কর। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা হল লোকটি পায়ে চলতে অক্ষম ছিল এবং তার নিজ হাদী তথা উটে আরোহণের প্রয়োজন ছিল। এবার মুহরিম হাদীতে আরোহণের কারণে যদি হাদীর আর্থিক ক্ষতি হয়ে যায় তবে তা পূরণ করতে হবে। আর হাদী মাদী হলে এবং তাতে দুধ হলে তা দোহন করা যাবে না। কেননা, দুধও তার থেকে জন্মায়। তাই তা নিজের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বরং জবাইয়ের সময় নিকটবর্তী হলে তাতে ঠান্ডা পানি ছিটাবে, এতে করে দুধ বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি জবাইয়ের সময় বিলম্বিত হয় তবে হাদীর কোন ক্ষতি না করে তা দোহন করে সদকা করে দেবে।

قوله : فان عطب واجبا الخ : যদি ওয়াজিব হাদী নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে বিনষ্ট করে ফেলে অথবা বড় ধরনের ক্রটিযুক্ত করে ফেলে তবে সে ইহার স্থলে অন্য একটি হাদী জবাই করবে। কেননা, শুধু ক্রয় করার মাধ্যমে সে দায়িত্ব মুক্ত হবে না বরং তা জবেহ করতে হবে। তাই ধ্বংস হয়ে গেলে তদস্থলে অন্য একটি হাদী জবেহ করবে। আর বড় ধরনের ক্রটি হয়ে গেলেও তা আদায় হবে না, বরং ক্রটিহীন কোন হাদী ক্রয় করে জবেহ করতে হবে। আর প্রথমের ক্রটি যুক্ত হাদী এখন তার মালিকাধীন, সুতরাং তা সে যেভাবে চায় ব্যবহার করতে পারবে। আর যদি তা নফল হাদী হয় এবং তা ধ্বংস হয়ে যায় তবে অন্য একটি প্রাণী ওয়াজিব হবে না। কেননা, ইবাদাত ও নৈকট্য এ হাদীর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, যা ফউত হয়ে গেছে। তাই তার উপর অন্য একটি ওয়াজিব হবে না। আর যদি নফল হাদী পথিমধ্যে ক্রটিপূর্ণ হয়ে যায়, তবেও অন্য একটি প্রাণী তার উপর আবশ্যক হবে না। বরং তাই জবেহ করবে। এবার যদি তা এমন ক্রটি পূর্ণ হয় যে তা মুমুর্ষ হয়ে পড়েছে এবং তা নফল হয় তবে তথায় জবেহ করবে এবং তার রক্ত দ্বারা কালাদার জুতা ও কুঁজের পার্শে ছাপ মেরে দেবে। এবং কোন ধনী ব্যক্তি তা থেকে খাবে না। কেননা, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ সা. হযরত নাজিয়া আল আসলামি রাযি. কে তার সাথীসহ হাদী থেকে খেতে নিষেধ করেছেন। (কারণ তিনি মালদার ছিলেন।)

نعل দ্বারা হাদীর গলায় ঝুলানো কালাদা উদ্দেশ্য। উক্ত কালাদাতে ও কুঁজের পার্শ্বে রক্ত রঞ্জিত করার হিকমত হল যাতে সবাই বুঝতে পারে যে তা হাদী। সুতরাং তা থেকে ধনীরা খাবে না বরং দরিদ্ররা খাবে; তবে সব চাইতে উত্তম হল দরিদ্রদের মাঝে সদকা করে দেওয়া। অন্যথায় হিংস্র প্রাণীরা খেয়ে নিতে পারে; সুতরাং দরিদ্রদের মাঝে সদকা করাতে এক ধরনের ইবাদাত রয়েছে। আর তাই তার হল মূল উদ্দেশ্য

مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ

বিবিধ মাসাইল

وَلَوْ شَهِدُوا بِوُقُوفِهِمْ قبل يَوْمِهِ تُقْبَلُ وَبَعْدَهُ لَا وَلَوْ تَرَكَ الْجَمْرَةَ الْأُولَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي رَمَى الْكُلَّ أَوِ الْأُولَى فَقَطْ وَمَنْ أَوْجَبَ حَجًّا مَاشِيًا لَا يَرْكَبُ حَتَّى يَطُوفَ لِلرُّكْنِ وَلَوِ اشْتَرَى مُحْرِمَةً حَلَّلَهَا وَجَامَعَهَا -

অনুবাদ : যদি লোকেরা হাজীদের ক্ষেত্রে আরাফার দিনের একদিন পূর্বে (আরাফায়) অবস্থানের সাক্ষ্য দেয় তবে তা গ্রহণ করা হবে। আর একদিন পরের সাক্ষ্য দেয় তবে তা গ্রহণ করা হবে না। আর যদি দ্বিতীয় দিন প্রথম জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেয় তবে পূর্ণ রমি করবে অথবা শুধু প্রথম রমি করবে। আর যে ব্যক্তি পায়ে হেটে হজ্জ (নিজের উপর) আবশ্যক করল সে তাওয়াফে যিয়ারত করা পর্যন্ত সওয়ারিতে আরোহণ করবে না। যদি কেহ মুহরিমা দাসীকে ক্রয় করে তাকে ইহরাম মুক্ত করে তবে তার সাথে সহবাস করতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : সম্মানিত গ্রন্থকার বৃন্দ তাদের কিতাবের শেষে পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিবরণ এবং কিছু অপ্রচলিত মাসআলা উপস্থাপন করেন এবং এগুলোর নাম দেন مسائل منثورة বা مسائل متفرقه কিংবা مسائل شتى - সম্মানিত গ্রন্থকার রহ. তার কিতাবের শেষেও مسائل منثورة হজ্জের বিষয়ের কিছু পৃথক মাসআলা উল্লেখ করেছেন।

قوله : وَلَوْ شَهِدُوا بِوُقُوفِهِمْ الخ : হাজীগণ উকুফে আরাফা করলেন। কিন্তু এক দল লোক সাক্ষ্য দিল যে তোমরা আরাফার দিনের একদিন পূর্বে অবস্থান করেছ। অর্থাৎ নয়ই যিলহজ্জ আরাফাতে অবস্থান না করে আটই যিলহজ্জ অবস্থান করেছ, তবে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য হবে এবং নয়ই যিলহজ্জ সে পুনরায় উকুফ করবে। কেননা, বড় ধরণের জটিলতা ছাড়াই তার ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব আরাফার দিনে উকুফ করে সন্দেহ নিরসনের মাধ্যমে। কেননা, আটই যিলহজ্জ থেকে দশই যিন হজ্জের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঠিক সময় নির্ধারণ না করাটা অযৌক্তিক কথা। দ্বিতীয়ত ওকুফ তার সময় থেকে বিলম্বে করলেও জায়েয। যেমন রমজানের রোযার কাজা ও নামাজের কাজা বিলম্বে করা জায়েয। তেমনিভাবে কুরবানির দিনে ওকুফ করা জায়েয়। তবে ফরজ হওয়ার আগে কোন আমল করা জায়েয হবে না। যেমন রমজান মাস আসার পূর্বে ফরজ রোযা রাখা বা ওয়াক্ত আসার পূর্বে উক্ত ওয়াক্তের নামাজ পড়া। তেমনিভাবে নয় তারীখের পূর্বে আট তারিখে ওকুফে আরাফা করা জায়েয হবে না। বরং উকুফে আরাফার দিন আবার উকূফে আরাফা করতে হবে আর যদি সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয় যে হাজীরা আরাফার দিনের পর আরাফাতে অবস্থান করেছে, অর্থাৎ তারা দশই যিলহজ্জ আরাফাতে অবস্থান করেছে, তাই আরাফায় অবস্থান পাওয়া যায়নি বিধায় তাদের হজ্জ হয়নি। সম্মানিত

গ্রন্থকার রহ. বলেন, তাদের এহেন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের ওকুফ হয়েছে এবং হজ্জও হয়েছে। কেননা, এক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য নেতিবাচক বিষয়ের উপর আছে। কেননা, এভাবে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হল তাদের হজ্জ হয়নি। আর তা বিচারের আওতাভুক্ত নয়। কারণ, হজ্জ বিচারকের আওতাভুক্ত নয়। আর যে সাক্ষ্য নেতিবাচক তা বিচার বর্হির্ভূত বিষয়ে হয়ে থাকে তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং উক্ত মাসআলায় হাজীদের উকুফ সহীহ হল আর উকুফ সহীহ হওয়াতে তাদের হজ্জও সহীহ হল।

قوله : وَلَوْ تَرَكَ الْجَمْرَةَ الخ : যদি কোন হাজী দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ যিলহাজের এগার তারীখ মধ্যবর্তী ও তৃতীয় জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করল কিন্তু প্রথমটিতে নিক্ষেপ করল না, অথচ ঐ দিনেই তার উপর তিনটি জামারাতেই কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব ছিল। এবার যদি ঐ দিনের অন্য এক মুহূর্তে শুধু প্রথম জামারাতে নিক্ষেপ করে ফেলে তবে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। কেননা, তার এ নিক্ষেপ করাটি সময়ের ভিতর হয়েছে। তবে হা সে সুন্নাতের বরখেলাফ করল। এজন্য তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে উক্ত দিনের ভিতর দ্বিতয়বার তিনটি জমারাতেই رمى করে ফেলে তবে তা তার জন্য উত্তম হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে সুন্নাতের ধারাবাহিকতা রক্ষা হল। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, সে যদি ঐ দিন দ্বিতীয় বার শুধু প্রথমটিতে নিক্ষেপ করে তবে তার জন্য যথেষ্ট হবে না, বরং তিনটি জামারায় পুণর্বার নিক্ষেপ করতে হবে। কেননা, তিনটি জমারায় এভাবেই নিক্ষেপ শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং এর বিপরীত করাতে তা জায়েয হবে না। আমাদের দলীল হল- প্রতিটি জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করাটা স্বয়ং সম্পূর্ণ ইবাদাত। সুতরাং তাতে ধারাবাহিকতার শর্ত যা জায়েয হওয়া না হওয়ার ভিত্তি হিসাবে রাখা ঠিক হবে না। তবে হা এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সুন্নাত। বিধায় ধারাবাহিকতার বরখেলাফ করলে সুন্নাতের বরখেলাফ হবে, তাই বলে কি ধারাবাহিকতা রক্ষা না করার দরুন তার رمى জায়েয হবে না? মোটকথা, প্রতিটি জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা স্বয়ংসম্পূর্ণ ইবাদাত। সুতরাং আগপিছ করে আদয় করলেও তা যথেষ্টই হবে।

قوله : وَمَنْ اَوْجَبَ حَجًّا مَاشِيًا الخ : যদি কোন ব্যক্তি পায়ে হেটে হজ্জ করবে বলে মান্নত করে তবে তাওয়াফে যিয়ারত পর্যন্ত সওয়ারীতে আরোহণ না করা তার উপর ওয়াজিব। কেননা, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ গুণ নিয়ে কোন আমল নিজের উপর আবশ্যক করে তা অসম্পূর্ণভাবে আদায় করাতে যথেষ্ট হবে না। আর হজ্জের ক্ষেত্রে পায়ে হেটে হজ্জ করা হল পূর্ণ একটি গুণ, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং যেভাবে সে নিজের উপর আবশ্যক করেছে সেভাবেই তা আদায় করতে হবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ হজ্জই সে পায়ে হেটে হেটে করতে হবে। তা ই তার উপর আবশ্যক। হজ্জ যেহেতু তাওয়াফে যিয়ারতের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় তাই তাকে তাওয়াফে যিয়ারত পর্যন্ত পায়ে হেটে করতে হবে। অতঃপর সে সওয়ারীতে আরোহণ করতে পারবে।

قوله : وَلَوْ اِشْتَرَى مُحْرِمَةً الخ :যদি কোন মালিক ইহরাম রত দাসীকে বিক্রয় করে এমতাবস্থায় যে মালিক তাকে ইহরাম বাধার অনুমতি দিয়েছিল। তবে ক্রেতা মুহরিম না হলে চাইলে তাকে ইহরাম মুক্ত করে সহবাস করতে পারবে। ইমাম যুফার রহ. বলেন, ক্রেতার জন্য এ অধিকার থাকবে না। আমাদের দলীল হল- উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। আর বিক্রেতা তার কাছে মুহরিমা দাসী থাকা অবস্থায়ও সে তাকে ইহরাম মুক্ত করে সহবাস করাটা জায়েয ছিল। তাই তার এ অধিকার ক্রেতার দিকেও স্থানান্তরিত হল এবং সেও চাইলে তাকে ইহরাম মুক্ত করতে পারবে। তবে হা তার এ ইহরাম মুক্ত করাটা মাকরূহ। والله اعلم

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التوّاب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين -

والصلوة والسلام على خير خلقه محمد و اله واصحابه اجمعين -

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥